উপন্যাসসমগ্র

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

উপন্যাসসমগ্র

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক স্তম্ভপ্রতিম কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-৭১)। 'কল্লোল'-এর ধারাবাহিকতা তাঁর ভিতরে প্রবাহিত, আবার তিনি নতুন বাংলা কথাসাহিত্যেরও এক বলিষ্ঠ উদ্‌গাতা। জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী এই লেখক অগ্রজদের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন; ক'রে এগিয়ে গিয়েছেন অনেক দূর অবধি। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেও যে তাঁর উৎসারিত জনধারা প্রবহমাণ, এও তাঁর সৃজনী সচলতার এক সাক্ষ্য। অথচ তাঁর সমগ্র রচনা কতটুকুই-বা : দুইটি গল্পগ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, তিনটি নাটক, কিছু অনুবাদ, অগ্রন্থিত কিছু কবিতা-গল্প-একাঙ্ক-প্রবন্ধ-গ্রন্থালোচনা। এই গল্প ও মহার্ঘ ঐশ্বর্যই তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক কৃতী পুরুষে পরিণত করেছে, প্রথম আধুনিক বাঙালি-মুসলমান কথাসাহিত্যিক রূপে মহিমা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীর মশাররফ হোসেন থেকে যে-বাংলা কথাসাহিত্যের ধারা উৎসারিত হয়েছে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তার উত্তরসূরী ঔপন্যাসিক। ঔপন্যাসিক হিশেবে, নতুন রীতির নাট্যকার ও গল্পকার হিশেবেও, তাঁর অবস্থান বাংলা সাহিত্যে অমোঘ। মাত্র আটটি গ্রন্থ রচনা করে এই কৃতিত্ব বাংলা কথাসাহিত্যে আর কে অর্জন করেছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প-উপন্যাস-নাটকের কেন্দ্রমর্মে আছে 'উন্মুখ প্রবৃত্তি' আর 'মনোভাবের বিশ্লেষণ' (জগদীশ গুপ্তের ভাষায়)। বিংশ শতাব্দীর সূচনামুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়। বহির্জগতের রূপায়ণ তো আছে, থাকবেই, তার সঙ্গে যুক্ত হল ব্যক্তি ও সমাজের দোলাচল, ব্যক্তির আত্মিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। আধুনিক কথাসাহিত্য বাস্তবের এই অন্তঃশায়ী জল টিকে আবিষ্কার করেছে, 'ভিতরকার মানুষ'-এর অবিরল উন্মোচন তার অন্বীষ্ট। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমগ্র সাহিত্যকর্মে

উপন্যাসসমগ্র

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

জন্ম : ১৫ আগস্ট ১৯২২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মৃত্যু : ১০ অক্টোবর ১৯৭১

উপন্যাসসমগ্র

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

সম্পাদনা ✿ জীবনপঞ্জি ✿ গ্রন্থপঞ্জি

হায়াৎ মামুদ

©
Anne-Marie Waliullah

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৬
দ্বিতীয় মুদ্রণ : আগস্ট ২০০৫
তৃতীয় মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭
চতুর্থ মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি ২০০৮
পঞ্চম মুদ্রণ : এপ্রিল ২০১১
ষষ্ঠ মুদ্রণ : নভেম্বর ২০১২
সপ্তম মুদ্রণ : মে ২০১৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
নূর-ই-মোনতাকিম আলমগীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 446 - 039 - 5

UPANYAS SAMAGRA (Collected Novels by Syed Waliullah)
Published by PROTIK. 38/2Ka Banglabazar (1st floor), Dhaka-1100
Seventh Edition : May 2014. Price : Taka 270.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক : অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
০১৭৪৩৯৫৫০০২, ০১৬৮০১৫৩৭০৭

Website : **www.abosar.com, www.protikbooks.com**
Facebook : www.facebook.com/AbosarProkashanaSangstha
e-mail : protikbooks@yahoo.com, abosarprokashoni@yahoo.com
Online Distributor | www.rokomari.com, Phone : 16297, 01833168190
www.akhoni.com. Phone : +88 096 11 55 77 88

সূচি

লালসালু ১
চাঁদের অমাবস্যা ৬৭
কাঁদো নদী কাঁদো ১৪৭

পরিশিষ্ট : এক
গ্রন্থপরিচয় ২৬৩

পরিশিষ্ট : দুই
জীবনপঞ্জি ২৬৭
গ্রন্থপঞ্জি ২৭১

ভূমিকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অতিপ্রজ লেখক ছিলেন না। তিনি স্বল্পায়ু ছিলেন, কিন্তু আনুপাতিকভাবে তাঁর লেখকজীবন দীর্ঘ ছিল, যেহেতু বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স থেকেই তাঁর রচনা প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিন্তু পঁচিশোর্ধ্ব বৎসরের সৃষ্টিশীলতায় মাত্র তিনটি উপন্যাস, দুটি গল্পগ্রন্থ, কিছু অগ্রন্থিত গল্প এবং তিনটি নাটক ও কতিপয় ইংরেজি-বাংলা বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সম্ভারকে কোনো অর্থেই বিশালায়তন বলা সম্ভব নয়; তাঁর সমস্ত লেখা পুঞ্জীভূত করে দু' খণ্ডে যে-রচনাবলি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করেছেন তার পৃষ্ঠাসংখ্যা আট শ'র ওপরে যায় নি। এতৎসত্ত্বেও তিনি আমাদের কথাশিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য তো বটেই, অদ্যাবধি সর্বাধুনিক লেখককুলের অন্যতম বলেও বিবেচিত হয়ে আসছেন। এই মূল্যায়নে, আমাদের স্বভাবজ আবেগপ্রাবল্য ও অতিকথনের ত্রুটি সত্ত্বেও, কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। তাঁর শারীরিক দূরস্থিতি তথা উচ্চপদাসীনতার কারণে প্রবাসজীবন এদেশের মধ্যবিত্ত পাঠকের মনে সম্ভ্রম ও প্রশ্রয় জন্ম দিয়েছিল—যদি মনেও করি, তথাপি 'লালসালু'র জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে তা আদৌ যথেষ্ট নয়।

'লালসালু'র প্রকাশ শিল্পী ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখকজীবনে কত বড় অতিক্রমণ তা পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'নয়নচারা'র গল্পাবলির কাহিনী, নির্মাণকৌশল ও ভাষাশৈলীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। অধিকন্তু তাঁর শিল্পদৃষ্টি ও কথনভঙ্গিমা সেখানে এমন এক পরিণতিতে স্থায়িত্ব পায় যে উপন্যাসত্রয়ীতে তো বটেই, তার ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন থাকে নাট্যরচনাসমূহেও। আমরা গভীর বিস্ময়ে লক্ষ করি যে যাপিত ধর্মাচারের তলায় লুকোনো ধর্মখোলসের অন্তরালে সাধারণ ও আবিল দেহধারী মানুষের আদিম নগ্ন চেহারা বারংবার তাঁর রচনায় ফুটে ওঠে। মজিদ, কাদের ও 'বহিপীরে'র পীরসাহেব যে-সরল সম্পর্করেখা নির্মাণ করে তার সমান্তরালে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায় জমিলা, শিক্ষক আরেফ আলী ও তাহেরা। তবে, পীরসাহেবকে শেষাবধি অন্যভাবে যে জেগে উঠতে দেখি তার কারণ সম্ভবত এই যে, এ্যাবসার্ড নাটকের ছায়াপাতে এ-কাহিনী সত্য-মিথ্যার মাঝখানে কাঁপতে থাকে। বস্তুতপক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র যাবতীয় রচনাকে দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করা চলে বলে আমার ধারণা : এক দিকে তিনি বাস্তব জগৎসংসারের অভিজ্ঞতা ছেনে তৈরি করেন দুনিয়ার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা ও তার অন্তরালে ক্রিয়াশীল জীবনসত্যকে; অন্য দিকে তিনি ঐ অভিজ্ঞতার সারাৎসার বুনে দেন অস্বচ্ছ এক মায়াবী জগতের মাটিতে যেখানে কুসুম ফুটে

ওঠে প্রতীকে ও ব্যঞ্জনায়। তাঁর কাহিনীগঠনের এক প্রান্তে যদি থাকে 'লালসালু', তো আরেক প্রান্তে 'কাঁদো নদী কাঁদো'। তাঁর সংসার এভাবে নির্মিত হয়ে ওঠে বাস্তব ও পরাবাস্তব মিশিয়ে; কখনো একই কাহিনীশরীরে উভয়ের সংশ্লেষণ, কখনো–বা মোটা দাগে এ–দুয়ের পৃথক অস্তিত্ব।

'নয়নচারা', তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, বেরুবার পরে প্রথম সমালোচনার পর্যবেক্ষণ লক্ষ্যযোগ্য। 'পরিচয়' পত্রিকায় সুশীল জানা লিখেছিলেন : "ওয়ালীউল্লাহ্ সাহেবের ঝোঁক মনঃসমীক্ষণের দিকেই বেশি। এতে বিপদ আছে, বিশেষ করে যে শ্রেণীর মর্মকথা তিনি লিখছেন সে ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্তিক ভাবপ্রবণতা আবেগের ঝোঁকে ঘাড়ে চেপে বসে গিয়ে নিপীড়িত শ্রেণী–জীবনের ওপরে। জীবন আড়াল হয়ে যায়। যা বর্তমান সাহিত্যে খুবই সুলভ। এতে রচনা জীবন–ধর্মী না হ'য়ে, হ'য়ে পড়ে ভাবধর্মী।" অর্ধশতাব্দী পূর্বে, ১৩৫৩ সালে, প্রকাশিত এ–রচনায় আশা ব্যক্ত করা হয়েছিল যে তাঁর মতো "মুসলমান লেখকের আবির্ভাব বহুদিনের একটি মর্মান্তিক অভাব ক্রমেক্রমে পরিপূর্ণ করে তুলবে, বাংলা সাহিত্য পাবে তার সমগ্ররূপ"।

মনঃসমীক্ষণের ঘটনা বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর পূর্বেও ছিল, এবং মধ্যবিত্তসুলভ যে–ভাবপ্রবণতার আশঙ্কা বিষয়ে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা তাঁর রচনায় দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু ভাবধর্মিতা ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার এক সামান্যলক্ষণ, বলতেই হয়; অথচ তা 'জীবন–ধর্মী' নয় এমনও বলা যাবে না। এ দুই বিপরীত চারিত্র্যের মেলবন্ধন কী আশ্চর্য কৌশলে তিনি ঘটিয়ে তোলেন তা অভিনিবিষ্ট ও সন্ধানী পাঠকের চোখ এড়ায় না। জীবদ্দশায় তাঁকে তিনটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল : তেতাল্লিশের মন্বন্তর, সাতচল্লিশের দেশভাগ এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। তাঁর প্রথম গল্পসংকলনের "নয়নচারা" ও "মৃত্যু–যাত্রা"য় কাহিনীর নকশা দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ফুটে উঠেছে, তেমনি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে "একটি তুলসী গাছের কাহিনী"তে দেশভাগের চালচিত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও মানুষী লোভের ক্লিন্নতা স্থাপিত হয়ে থাকে। বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের মধ্যপথে তাঁর জীবনাবসান না–হলে সম্ভবত সেই দুঃসময়ও তাঁর কোনো কথকতায় প্রতিবিম্বিত হত। কিন্তু এর পরেও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে যে তাঁর কাহিনীতে বাস্তবপ্রসূত অভিজ্ঞতা কমই ধরা আছে; বরং ভিন্নস্বাদী প্রতীকব্যঞ্জনামুখর গল্প–কাহিনী সংখ্যায় গরিষ্ঠ ও অধিক বলশালী। তাঁর গল্পাবলির ভিতরে এক ঝাঁক কাহিনী—"জাহাজী" কি "রক্ত" কিংবা "কেরায়া" বা "স্তন" অথবা "দ্বীপ" কি "না কান্দে বুবু"—মিলবে যেখানে গল্প–কবিতা মেশামিশি হয়ে আমাদের মনের বুদ্ধি বা চেতনার স্তরে নয়, অন্য কোনো গহীন অচেতন স্তরে বা বোধে অনুরণন তোলে। দারিদ্র্যের হাহাকার ও অমানবিকতার রূপায়ণও তাঁর গল্পে কম নেই, অথচ আমাদের কারুণ্য বা ক্ষোভ বা ক্রোধ তাঁর অভীপ্সিত নয়, তিনি বস্তুজাগতিক বিশ্বের ভিতরেই স্বপ্ন ও বাস্তবের মাঝামাঝি এক প্রদোষান্ধকারে নিয়ে যান আমাদের।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনের প্রবণতা ছিল, আমার ধারণায়, দার্শনিকের। এই সত্য তাঁর নিজের নিকটেও উন্মোচিত হয়েছিল। সমবয়সী কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানকে

তিনি জীবনের শেষদিকে লিখেছিলেন : "আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্ধ্বে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। সেটি হবে না। তা হলে কষ্ট ক'রে লেখার প্রয়োজন কী? মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সে সবের দাম যা-ই হোক) কথা কিছু প্রকাশ না করলে চলে কী ক'রে?" এই অনুসন্ধান, বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়, কাহিনীকথকের নয়। তিনি নিজস্ব ভূমিকা সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন : তিনি মনুষ্যজন্মের অন্তর্লীন যুক্তি খুঁজে পেতে আগ্রহী, মানুষকে কেন বেঁচে থাকতে হবে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কোন্ লক্ষ্যে তার যাত্রা—এই দার্শনিক অন্বেষণই তাঁর শিল্পীদায়িত্ব। বৃদ্ধ করিম সারেঙ্গ বা ধর্মব্যবসায়ী শঠ মজিদের মনে যে-প্রশ্নাবলি উত্থিত হয়, কিংবা যুবক শিক্ষকের মনে সে-সব জীবনজিজ্ঞাসা এত নান্দনিক, সাত্ত্বিক ও মেধাবী যে নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত মানুষের তা বোধশক্তির বাইরে রয়ে যাওয়ার কথা; ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীর ভিতরে গোপন সম্পর্কসূত্র বস্তুতপক্ষে তারা খোঁজে না, খোঁজেন শিল্পী নিজে। অথচ যে-পরিপ্রেক্ষিত তিনি রচনা করে নেন সেখানে তাদের নিষ্ফলা অনুসন্ধান বিশ্বাসযোগ্যতা পায়।

'লালসালু' উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য ভণ্ড পীরের নষ্ট হৃদয় খুলে দেখানো কিংবা গ্রামীণ বাংলায় পীরবাদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নেওয়া—এমন ব্যাখ্যায় আমার যুক্তিবোধ সায় দেয় না। মজিদের ভণ্ডামি আমাদের সমর্থন পায় না ঠিকই, কিন্তু আমাদের ঘৃণা তার দিকে ছুটে যায় না; কারণ দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব তার প্রবঞ্চনাকে ক্ষমার্হ করে তাকে আমাদেরই মতো সাধারণ ও দুঃখদীর্ণ মানুষে রূপান্তরিত করে এবং তার অ-সুখ যে জীবনের অর্থহীনতাকে বুঝতে-বুঝতে অর্থ খুঁজে পাওয়ার সিসিফাস-শ্রম—তা লেখক আমাদের বুঝতে দেন, তার জন্য এক অব্যাখ্যেয় গোপন কষ্টও ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে আমাদের ভিতরে। 'চাঁদের অমাবস্যা'য় বাহ্যত পীরসুলভ কাদের যে প্রকৃতই এক নীচ-নিষ্ঠুর জল্লাদ তেমন সন্দেহ পাঠকের মনে প্রথমাবধিই উঁকি দেয়, ক্রমশ তা সংক্রমিত হয়ে দাদাসাহেবের বিশ্বাসেও ঘুণ ধরায়। তবে, 'চাঁদের অমাবস্যা'র কেন্দ্রবিন্দু কাদের নয়, যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। যদিও কোথাও বলা হয় নি তবু অবিশ্বাস্য ও ভয়াবহ এক পরিণাম আরেফ আলীর জন্য অপেক্ষমাণ দেখতে পাই—যে-খুন সে করে নি অবস্থাবৈগুণ্যে তারই দায়ভাগ কাঁধে নিয়ে হয়তো প্রাণ দিতে হবে তাকে। পাপী নিষ্কৃতি পায় এবং অন্যের অপরাধে শহীদ হয় নিষ্পাপ—কাহিনীর ভিতরের এই সত্য শুধু জাগতিক বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না, তৎসঙ্গে যে-প্রশ্ন তোলে তার স্বরূপ নৈতিক ও দার্শনিক। তিনি জানতেন এবং বলেওছেন যে "দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও ও-সব ভাবে না করে না যা 'চাঁদের অমাবস্যা'র যুবক শিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে।" ফলে, আরেফ আলীর বৃত্তিসঞ্জাত পরিচয় আমাদের কাছে গৌণ হয়ে যায়; সে তখন নির্বিশেষ 'মানুষে'র প্রতিভূকল্প হয়ে মানুষের অস্তিত্বের জন্য মৌলিক কিছু প্রশ্ন তুলে সমাধান খুঁজে ফেরে। জনৈক তরুণ গবেষক জানিয়েছেন যে প্রয়াত শিল্পীর কাগজপত্রের মধ্যে এই উপন্যাসের অভিপ্রায় সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পাওয়া গেছে। ওয়ালীউল্লাহ্‌র জিজ্ঞাসার স্বরূপ বুঝতে তা আমাদের সাহায্য করে : The central theme is the knowledge of a Crime—the

evil act—of which the young teacher becomes the possessor and which frightens him because of the responsibility attached with it : the evil act, as it were, passes on to the teacher as well. What I want to say is that the most important thing is not so much an evil act, nor its perpetrator but the attitude of the man outside such an act. From a coward the young teacher rises to a brave man and a martyr as well. 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসের মুহাম্মদ মুস্তফা, যে নিজে বিচারক, বাহ্যত প্রায়-অকারণে নিজের জন্য যুবক শিক্ষকের মতো শহীদের ভূমিকা বেছে নেয়। তারই মতো আরও এক বিচারককে আমরা উদ্বন্ধনরজ্জুতে দুল্যমান দেখি, সে 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকের জজসাহেব। খোদেজার নীরবে গভীর সংগোপনে আত্মবিলোপ ও জনরোষে নির্বাক প্রতিবাদহীন আমেনার আত্মবিসর্জন জীবনের ওপর মৃত্যুকে জিতিয়ে দেয়। লক্ষ করবার বিষয়, ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনায় মৃত্যু এক প্রিয় প্রসঙ্গ, গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে ঘুরেফিরে হাজির হয়। আসলে, জীবন ও মৃত্যুর দ্বৈরথে ক্লান্ত মনুষ্যভাগ্য তাঁর পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যবস্তু।

নাটক তাঁর মাত্র তিনটি, একাঙ্কিকাটি বিবেচনায় গণ্য না-করলে। কিন্তু তিনটিই বিভিন্ন গোত্রের। আমাদের নাট্যসাহিত্যে এ্যাবসার্ড নাটকের জন্মদাতা সম্ভবত তিনিই। 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'উজানে মৃত্যু'-কে অন্য কোনো ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব। 'সুড়ঙ্গ' নাটিকাটি ঘোষিতভাবেই "কিশোর-কিশোরীদের জন্যে লেখা" যার লক্ষ্য ঐ বয়সী পাঠক-দর্শককে "আমোদ" যোগানো। আর 'বহিপীর' রঙ্গব্যঙ্গপ্রবণ কমেডি। সন্দেহ জাগে, বক্তব্য হয়তো-বা তাঁর প্রধান বিবেচনার বিষয় হিসেবে গণ্য হয় নি এসব ক্ষেত্রে যেমনটি দেখা গেছে সাহিত্যের অন্য দুটি শাখায়। এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সম্ভবত কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না যে তুলনামূলকভাবে তাঁর নাট্যপ্রচেষ্টা দুর্বল। কিন্তু সেইসঙ্গে এও মানতে হবে যে তাঁর বয়ানকৌশল ও ভাষাশৈলী তাদের প্রাণ যেমনটি ঘটিয়ে তোলেন তিনি অন্য দুই শাখায়।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষা, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হওয়া প্রয়োজন যে, আমাদের সাহিত্যে একেবারেই দোসরহীন। নৈতিক বা দার্শনিক যে-সব প্রশ্ন তিনি নির্মাণ করেন তার অবলম্বন এমন এক ভাষা যা সর্বদাই বহুমাত্রিক, অস্বচ্ছ ও অস্পষ্ট। তাঁর উপন্যাসে সৃজিত চরিত্রাবলি সর্বদাই সংশয়গ্রস্ত ও অবলম্বনচ্যুত; পাঠককেও তিনি অবলম্বনহীন, প্রত্যয়হীন ও প্রশ্নদীর্ণ অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখেন কেবল ভাষারই কৌশলে। একটি বিষয় কোনোক্রমেই আকস্মিক বা আপতিক বলে মনে হয় না আমার, তা এই যে—তিনটি উপন্যাসেরই অন্তস্তলে পাপের উপস্থিতি আছে, তা সে মননে বা কর্মে যেমনই হোক-না-কেন। অগত্যা না মেনে উপায় নেই, তাঁর অন্বেষার কেন্দ্রীয় থীম মনুষ্যহৃদয়ের মৌলিক বা অর্জিত কালিমা। অথচ মনুষ্যজন্মের দায় কালিমালিপ্তির ভিতরে শেষ হতে পারে না বলে তাঁর সুগভীর প্রত্যয় ছিল; তাই তাঁর চরিত্রেরা কোনো কিছুরই শেষ বা চরম উত্তর পায় না, কারণ তারা কখনোই একসঙ্গে সমগ্রতা দেখতে পায় না—যদিও দেখার জন্য তৃষ্ণার কমতি নেই। শ্রীমতী আন্-মারি তাঁর স্বামীর শিল্পজিজ্ঞাসা বিষয়ে যখন বলেন 'He often said

he wanted to write about a clean man', তখন দিবালোকে বিন্যাসটি আমাদের মনে স্বচ্ছ হয়ে যায়—তাই তো, মজিদ তাহের-মোস্তফা কেউই 'clean' নয়। অথচ মানুষকে পরিশুদ্ধ হতেই হবে, তাই পরিশোধনের গবেষণাগার কলুষিত হৃদয়েরই ভিতরে তৈরি হতে থাকে ক্রমশ—বাস্তব থেকে ধীরে ধীরে বাস্তবাতিরেকের পানে যাত্রা ক'রে। এই যাত্রাপথই নির্মাণ করে দেয় তাঁর ভাষার সাংকেতিকতা।

কাহিনী মানেই শুধু ঘটনার আড়ম্বর নয় এবং ঘটনাহীন জীবনেরও কাহিনী থাকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেই জীবনকাহিনীরই স্থপতি।

হায়াৎ মামুদ

১০২/ক, দীননাথ সেন রোড
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
বিজয়দিবস, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬

লালসালু

শস্যহীন জনবহুল এ-অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে—প্রদেশেরও। হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখথোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সাবুর ফাঁসির শামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌঁছয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাঁকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এইখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মতো পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা-জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ-বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উন্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ-লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে-চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চিৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে—তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আত্মীয়স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা—যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না—কী করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়— এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকরা। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মতো দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে-কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতোই। আর অপেক্ষা করে। ধৈর্যের কাঁটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেছে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরান মাঠ, সরভাঙ্গা পাড় আর বন্যাভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোরবেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ।

ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্‌জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন-একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেশ্‌তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা-বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্ট ভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন-একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে-দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুঁকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্য ফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোনো এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরীভাবাপন্ন ব্যক্তিসুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে-চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণো পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে-থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসি হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার মেশিনম্যান, টেনারিতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলির মসজিদ—এমন কি গ্রামে-গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ-কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, নয়তো মনিদের দেশে। দূর-দূর গ্রামে—যে-গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল—সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলসপরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এ-দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠের আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

—আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

—আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে।

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবীর মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত, কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। ক্বচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে-কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে—মৌলবীর গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবীর চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়তো।

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠপ্রান্তর আর বিস্তৃত ধানক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রং দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেতে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধানক্ষেতে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেল। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে-ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুইয়ে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে একজন—চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে-ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের একপ্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে—চোখে তার তেমনি শিকারির সূচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাইয়ের ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নিচে পানি নয়. তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শীষ নড়ছে—নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙ্গুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয় নি। হয় নি তার প্রমাণ, ধানের শীষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধানক্ষেতের ফাঁকে-ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিল, সে-গুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মতো টান-হয়ে-ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠল, তীরের মতো বেরিয়ে গেল একটা কোঁচ। সা—ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হা-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

এক সময় ঘুরতে-ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙ্গুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শীষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়—সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নাবিয়ে রাখা পুঁটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহব্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্ণের দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারির ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা—নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নাই।

এ-ভাবেই মজিদের প্রবেশ হল মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতী। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেবে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এইজন্যে যে তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর।

শীর্ণ লোকটি চিৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারি ও মাতব্বর রেহান আলী ছিল, জোয়ান মদ্দ কালু, মতি, তারাও ছিল। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

—আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিল সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট-ছোট ইটগুলো বিবর্ণ, শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মতো। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিল। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

—আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ।—মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিল। গোলাভরা ধান, গরুছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যে অমন বিদেশ-বিভুঁই-এ সে বসবাস করছিল। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মতো। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির-যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিল; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ সে-দুর্গম অঞ্চলে মজিদ যে-বাড়ি গড়ে তুলেছিল তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার-কয়েক শুনেছে সে-কথা, তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

— উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন...

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লিদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সে-জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে-কথা স্পষ্ট বুঝেছিল। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিল যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিল, ভয়ও ছিল। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখেনি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। ইট-সুরকি নিয়ে সে-প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোনো মানুষের কবরের মতো নতুন দেহ ধারণ করল। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হল মাছের পিঠের মতো সে-কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগল, মোমবাতি জ্বলতে লাগল রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতস্যাঁতে ছিল, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠল; হাওয়ারও ভাপসা গন্ধ খড়ের মতো শুষ্ক হয়ে উঠল।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মতো অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা—ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগল।

ক্রমে-ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠল। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হল, গৃহস্থালি হল। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল, মাছের পিঠের মতো সালুকাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে-জীবন পদে পদে এগিয়ে চলল। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সে-কথাটা সে-সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড়-বের-করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে, নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিল। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা-আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে উঠেছিল।

শেষে সে-প্রশস্ত ব্যাপ্ত-যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এল। নাম তার রহিমা। সত্যি সে লম্বা-চওড়া মানুষ। হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেল, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে যায়, গোঁয়ার ধামড়া গাইকেও স্বচ্ছন্দে গোয়াল থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ—যে-দেহ দূর থেকে আলি-ঝালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিল—তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মতো মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর মধুর ভাবে হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

—অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

—অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এই মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা—থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহিমা। মুরব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে-চেয়ে দেখে। দেখে রহিমার চোখে ভয়।

মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

—অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইবে।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তেলাওয়াত শুরু করে। গলা ভাল তার, পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে-করতে রহিমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'লার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মতো থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অবক্তব্য ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্তবসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহিমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে-দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহিমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—খোলা জাগায় অমন বেশরমের মতো দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহিমা হাত নাবায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপটে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ওই তো কেবল মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে হুঁকা। গলা-সীসার মতো অবশেষে লজ্জা আসে রহিমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো।

গ্রামের লোকেরা যেন রহিমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ—চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে-জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝাণ্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মতো ভাগ করে ফেলে। সে-জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেবে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো-থাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মতো জমিও তখন প্রাণের বাড়া হয়ে ওঠে। খাবলা-খাবলা রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি—ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের

জমি—সব জমি একান্ত আপন; কোনোটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মীয়জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি—তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ-পানি খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে—তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকে পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে-জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট, ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা হাড়-বের-করা শ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা—ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে। নধর-নধর হয়ে-ওঠা কচি-কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে-কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ-খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে—মণ-কে মণ।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষাশেষি বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোনো এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোঁচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খিলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাটে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুঁতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহিমার শরীরে তো এদেরই রক্ত, আর তার মতোই এরা তাগড়া, গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহিমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শীষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের শামিল খেয়াল করে না? শ্যেনদৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মতো লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ-কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুনাগার।

জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে।

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিকদেনেওয়ালা এ-কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

—কলমা জান মিঞা ?

ঘাড় গুঁজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিঞা। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে উঠে মজিদ বলে,

—হাসিও না মিঞা !

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিল। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মতো হয়ে উঠেছে।

চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

—আমি গরিব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সবকিছু যেন বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে—গাধার মতো পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারি ধমকে ওঠে,

—কলমা জানস্ না ব্যাটা ?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারি একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলেমেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি—যে-দেশ ছেড়ে এসেছে, যে-শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান—সেখানে একদা এক মক্তবে এই রকম করে সে আমসিপারা পড়ত ।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

—ব্যাপারির মক্তবে তুমি কলমা শিখবা।

ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মতো বলে,

—গরিব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মতো ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে-কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারি ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ।

একদিন ধাড়ি ধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

—কী রে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

—অর অয় নাই।

সে রেগে বলে,—অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ। বলে যে, পরশুদিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয় তবে মুশকিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,

—হেই কবে আমার খৎনা হইছে!

তার বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,

—ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হুজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয় নি। গর্জন করে উঠে বলে,

—তোল লুঙ্গি ?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিল, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিল, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মতো চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

—আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।

দাড়িগোঁফ ওঠা মদ্দের মতো ছেলে ঠির-ঠির করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে।

সারাটি দুপুর কোরবানির ছাগলের মতো খুঁটি-বন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারিও এসেছিল ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়মড় করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মতো গান যখন ধরে, তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয় নি। ভাবতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারিকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

—আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠে বলে,

—আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই—তানারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারির পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা যোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারির কান পর্যন্ত লাল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেল। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হল। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিল বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলে পাড়ার যত মেয়েরা—ছুকরি, জোয়ান, বুড়ি। রহিমা পর্যন্ত না দেখে পারল না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা হাসল।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেরে মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্তবিস্তৃত হয়ে যে-মাঠ দূরে

আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রাম নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারি আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ অপরাহ্ণে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে : সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারি চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালুকাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহিমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহিমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করত—সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহিমা।

রহিমা শোনে তাদেব কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মতো স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোন বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন্ মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন—যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা ?

কখনো-কখনো অতি সঙ্গোপনে রহিমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আরজি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালুকাপড়ে-ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে,—না-হয় লজ্জা, না-হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এই সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজও অকর্তিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে-ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রূপালি ঝালর। রহিমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয় কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। কিন্তু ঝালর ঝলমলিয়ে আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশ-ভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনোদিন রহিমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ত্রণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে—তার ওপর করুণা করো। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপরও যেন তোমার রহমত হয়।

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহিমার কাছে। যেমন আসে ধান-

ভানানি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে-ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিল, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

—আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহিমার হাসি পায়। কিন্তু মনে-মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

—আমার আর্জি—ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহিমা বলে;

—ক্যান গো বিটি ?

—জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহিমা প্রশ্ন করে,

—তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

—তুমি নিবা বুবু । তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু।

রহিমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

—আমার এক আর্জি বুবু।

—কও।

—ওনারে কইবেন—বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহিমা প্রশ্ন করে,

—ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

—হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার যোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বার-বার, ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাপিয়ে-ঝাপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হানে।

—ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী—হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের কাদের, আর কনিষ্ঠ ভাই রতন—তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙ্গল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে—আর বর্ষায় টেকে কি না সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে-কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

—হুনছস্ কথা, হুনছস্?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

—ঠ্যাঙ্গা বেটিরে, ঠ্যাঙ্গা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

—থাক্, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করব।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ত্রণা হয়। তাই রহিমাকে এসে বলে কথাটা।

—হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক—নয় ওনারে কন এর একটা বিহিত করবার।

হঠাৎ সমবেদনায় রহিমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

—তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুস্থা মেয়ে। স্বামী মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনতিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মতো যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহিমা বলে,

—শ্বশুরবাড়িতে যাও না ক্যান?

—অরা মনুষ্যি না।

—নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর শখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রং ধরে। বতোর দিনে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই; মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোনো দিনে তাহের খোশমেজাজে বলে,

—শরীলে রং ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মতো মুখটা বাড়িয়ে বলে,

—খানকির বেটি নিকা করব বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে,

—গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিত।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ার, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায় : নিকা করবি মাগী, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে,—তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধম্‌কে ওঠে।

—কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

—তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যামনে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারি গলায় বলে,

—আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মদ্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেত—যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিত। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

—বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়াপানি দ্যান—

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

—বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোনোদিন কয় তাইলে মছিবৎ হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

—হুজুর, কোথিকা হুনলেন বেটির কথা?

—তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো—কোনো কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বলল কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোনো বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিল। সারাজীবন দুষ্টপ্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাইয়ের সাথে জায়গাজমি সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা-মকদ্দমা করে আজ সবদিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি—যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়তো তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকত না এক মুহূর্ত, নাচত কেবল নাচত, আর খইয়ের মতো কথা ফুটত মুখ দিয়ে। আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এই হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে, তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মায় গিয়ে খচ করে ধরে, কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে কি হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে যে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে-কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কি বাইরে ছড়াবার মতো? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না—তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে! এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিল, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হত কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব উঠেছিল। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কাণ্ডটি নাকি ঘটেছিল। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙ্গানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করে নি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে, তা দুষ্টপ্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মতো গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে-করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা—ওরে ভাতার-খাইকা জারুণি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিল না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেল মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর সে-ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহিমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহিমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিল। প্রথমে কিছু বোঝা গেল না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে

এইটুকু বোঝা গেল যে, সে রহিমাকে বলছে : ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুঁকা টানে আর চেয়ে-চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে—এমন একটা বউয়ের স্বপ্ন দেখত প্রথম যৌবনে। রহিমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোনো কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এইজন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীরকণ্ঠে রহিমাকে বলে,

—ওরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহিমা বলে,

—ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুঁটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে—থাক তাইলে এইখানে।

অপরাহ্ণে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙ্গা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারিও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তিবিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারি বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

—তোমার বিবি কী বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

—হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবার ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারি আবার প্রশ্ন করে,

—এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমতো—এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

—এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়—তা বইলা আমি কি পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারির মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকি-ধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারি ধম্‌কে উঠে বলে,

—কথা ঠিক কইরা কইবার পার না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও।

বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারি আবার বলে,

—তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙ্গাইছ ক্যান?

—আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙ্গাইছি!—লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায়, আঙ্গুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে—বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারি কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারিকে বুঝিয়ে বলেছিল সে, এবং ভেবেছিল তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারিই কাজটা ঠিকমতো চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদাতা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার ক্ষমতা নাই। দোষগুণে সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে ফেরেশ্‌তাও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরী বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে—তারা এইসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীরকণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে।

—পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরীতে প্রিয় পয়গম্বর বাণি-এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। একটি নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব—যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠল। হজরতের এত পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগল। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবদ্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা'লা মানবজাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিল্লাহ পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে, স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে-লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিল, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখাচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদাতা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন,

মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মতো করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ-শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙ্গুল ওঠায়। তার গুনাহ্ বড় মস্ত গুনাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

—তুমি কী মনে কর মিঞা? তুমি কি মনে কর তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কি হলফ কইরা বলতে পার তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারির মতো লোকের মুখের ওপর ঠাস্-ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাঁটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ—এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মতো নাচত, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আলো ছড়াত, তখন যে-জনরব উঠেছিল সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনোদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করে নি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতও, সে তাকে তালাক দিতে পারত। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাত না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিল, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস—তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

—কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোনো কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মতো তাহেরের বাপ বলে,

—কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙ্গাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাকে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছটফট করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরনার মতো বেয়ে-বেয়ে আসে,

ধারে ধারে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

—তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পইসার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবি করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সে-কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে নি, বরঞ্চ স্বীকারভাবে বলে এসেছে সে-কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, উঠে গিয়ে চেলাকাঠ দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ ছেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধূলিসাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠেই না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

—দেখ তো, ব্যাটা কি মরল নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কী যে কও! মুখে লাগাম নাই তোমার?

হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

—তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বড় ভয়ে-ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

—বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মতো আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মতো শোঁ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মতো ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মা'র হৈ-হৈ করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেল রে, ছাগলটা কোথায় গেল রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেল রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

—আমারে চাইরডা চিঁড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিঁড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মতো হয়ে উঠেছে।

চিঁড়া-কটা গলাধঃকরণ করে বলে,

—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে।

বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়। তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

—আর চাইরডা চিঁড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিঁড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেকক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে-অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে,

—মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতি-গতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হু-হু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেল। কেউ বলতে পারল না গেল কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবেছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার যো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাত, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তেলাওয়াত শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

—আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে উঠে কয়েকবার শিশুর মতো বলে, আল্লা, আল্লা—।

মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে যে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ—যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে—সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে উঠেছে কিনা জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি, তাদের মধ্যে

অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে-প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো ক্ষীণ, উঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম-মৃত্যু, ফসল হওয়া না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া না-পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিল, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিল—যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মতো চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহারহস্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টিরহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়—সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

—খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে।

—বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।

প্রথম-প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসত না। লজ্জা হত। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসতে লাগল। কখনো ক্বচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াত, আর বুকটা দুরু দুরু কাঁপত ভয়ে। বতোর দিনে এ-বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেল তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেল। মজিদের হাতে হুঁকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

—হুঁকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুঁকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুঁকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে,

—আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে-ক্রমে সে খোলামুখে সামনে' দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষ তো রহিমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা—কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরোনো আরজি জানায়। রহিমাকে বলে,

—ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহিমা রুষ্টস্বরে বলে,

—অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বলা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রং, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

—আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনিরে একটা জামা দিলে ও পরত'খন।

হঠাৎ কী হয়, রহিমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসত। আজ হাসেও না।

পৌষের শীত। প্রান্তর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় কাঁপায়। গভীর রাতে রহিমা আর হাসুনির মা ধান সিদ্ধ করে। খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়েছে, আলোকিত হয়ে উঠেছে সারা উঠানটা। ওপরে আকাশ অন্ধকার। গনগনে আগুনের শিখা যেন সে-কালো আকাশ গিয়ে ছোঁয়। ওধারে ধোঁয়া হয়, শব্দ হয় ভাপের। যেন শতসহস্র সাপ শিস দেয়।

শেষ-রাতের দিকে মজিদ ঘর থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করে। সে-ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে-আলো সাদা মসৃণ উঠানটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে-আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা-কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে মজিদের চোখ এখানে অন্ধকারে চকচক করে।

কিছুক্ষণ পর ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশপাশ করে। উঠান থেকে শিসের আওয়াজ এসে বেড়ার গায়ে শিরশির করে। তাই শোনে আর আশ-পাশ করে মজিদ। তারই মধ্যে কখন দ্রুততর, ঘনতর হয়ে ওঠে মুহূর্তগুলো।

এক সময় মজিদ আবার বেরিয়ে আসে, এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু-কাঁধ-গলার জন্য যে-রহিমাকে সে লক্ষ করে নি, সে-রহিমাকেই ডাকে। ডাকের স্বরে প্রভুত্ব! দুনিয়ায় তার চাইতে এই মুহূর্তে অধিকতর শক্তিশালী অধিকতর ক্ষমতাবান আর কেউ নেই যেন। খড়কুটোর আলোর জন্য ওপরে আকাশ তেমনি অন্ধকার। সীমাহীন সে-আকাশ এখন কালো আবরণে সীমাবদ্ধ। মানুষের দুনিয়া আর খোদার দুনিয়া আলাদা হয়ে গেছে।

রহিমা ঘরে এলে মজিদ বলে,

—পা-টা একটু টিপা দিবা?

এ-গলার স্বর রহিমা চেনে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মূর্তির মতো কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে বলে,

—ওইধারে এত কাম, ফজরের আগে শেষ করণ লাগব।

—থোও তোমার কাজ! মজিদ গর্জে ওঠে। গর্জাবে না কেন। যে-ধান সিদ্ধ হচ্ছে সে-ধান তো তারই। এখানে সে মালিক। সে-মালিকানায় এক আনারও অংশীদার নেই কেউ।

রহিমার দেহভরা ধানের গন্ধ। যেন জমি, ফসল ধরেছে। ঝুঁকে-ঝুঁকে সে পা টেপে। ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মজিদ, আর ধানের গন্ধ শোঁকে। শীতের রাতে ভারি হয়ে নাকে লাগে সে-গন্ধ!

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। মনের অস্থিরতা কাটে না। কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তারই দেয়া বেগুনি রঙের শাড়িপরা মেয়েলোকটিকে—খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্বলজ্বল করছিল উজ্জ্বল লালিত্যে—তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন। তবে জানানোর পথে বৃহৎ বাধার দেয়াল বলে রাত্রির এই মুহূর্তে অন্ধকার আকাশের তলে অসীম ক্ষমতাশীল প্রভুও অস্থির-অস্থির করে, দেয়াল ভেদ করার সূক্ষ্ম, ঘোরালো পন্থার সন্ধান করতে গিয়ে অধীর হয়ে পড়ে।

তখন পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। উঠানে আগুন নিতে এসেছে, উত্তর থেকে জোর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রহিমা ফিরে এসে মুখ তুলে চায় না। হাসুনির মা

দাঁতে চিবিয়ে দেখছিল, ধান সিদ্ধ হয়েছে কি না। সেও তাকায় না রহিমার পানে। কথা বলতে গিয়ে মুখে কথা বাধে।

তারপর পূর্ব আকাশ হতে স্বপ্নের মতো ক্ষীণ, শ্লথগতি আলো এসে রাতের অন্ধকার যখন কাটিয়ে দেয় তখন হঠাৎ ওরা দুজনে চমকে ওঠে। মজিদ কখন উঠে গিয়ে ফজরের নামাজ পড়তে শুরু করেছে। হালকা মধুর কণ্ঠ গ্রীষ্মপ্রত্যূষের ঝিরঝির হাওয়ার মতো ভেসে আসে!

ওরা তাকায় পরস্পরের পানে। নোতুন এক দিন শুরু হয়েছে খোদার নাম নিয়ে। তাঁর নামোচ্চারণে সংকোচ কাটে।

লোকদের সে যাই বলুক, বতোর দিনে মজিদ কিন্তু ভুলে যায় গ্রামের অভিনয়ে তার কোন পালা। মাজারের পাশে গত বছরে ওঠানো টিন আর বেড়ার ঘর মগরার পর মগরা ধানে ভরে ওঠে। মাজার জেয়ারত করতে এসে লোকেরা চেয়ে-চেয়ে দেখে তার ধান। গভীর বিস্ময়ে তারা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে, মজিদকে অভিনন্দিত করে। শুনে মজিদ মুখ গম্ভীর করে। দাড়িতে হাত বুলিয়ে আকাশের পানে তাকায়। বলে, খোদার রহমত। খোদাই রিজিকদেনেওয়ালা। তারপর ইঙ্গিতে মাজারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, আর তানার দোয়া।

শুনে কারো কারো চোখ ছলছল করে ওঠে, আর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ। কেন আসবে না। ধান হয়েছে এবার। মজিদের ঘরে যেমন মগরাগুলো উপচে পড়ছে ধানের প্রাচুর্যে, তেমনি ঘরে-ঘরে ধানের বন্যা। তবে জীবনে যারা অনেক দেখেছে, যারা সমঝদার, তারা অহঙ্কার দাবিয়ে রাখে। ধানের প্রাচুর্যে কারো কারো বুকে আশঙ্কাও জাগে।

বস্তুত, মজিদকে দেখে তাদের আসল কথা স্মরণ হয়। খোদার রহমত না হলে মাঠে-মাঠে ধান হতে পারে না। তাঁর রহমত যদি শুকিয়ে যায়—বর্ষিত না হয়, তবে খামার শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করে। বিশেষ দিনে সে-কথাটা স্মরণ করবার জন্য মজিদের মতো লোকের সাহায্য নেয়। তার কাছেই শোকর গুজার করবার ভাষা শিখতে আসে।

অপূর্ব দীনতায় চোখ তুলে মজিদ বলে, দুনিয়াদারি কি তার কাজ? খোদাতা'লা অবশ্য দুনিয়ার কাজকামকে অবহেলা করতে বলেন নি, কিন্তু যার অন্তরে খোদা-রসুলের স্পর্শ লাগে, তার কি আর দুনিয়াদারি ভালো লাগে?

—বলে মজিদ চোখ পিট-পিট করে : যেন তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। যে শোনে সে মাথা নাড়ে ঘন-ঘন। অস্পষ্ট গলায় সে আবার বলে,

—খোদার রহমত সব।

আরো বলে যে, সে-রহমতের জন্য সে খোদার কাছে হাজারবার শোকর গুজারি করে। কিন্তু আবার দু-মুঠো ভাত খেতে না পেলেও তার চিন্তা নেই। খোদার ওপর যার প্রাণ-মন -দেহ ন্যস্ত এবং খোদার ওপর যে তোয়াক্কল করে, তার আবার এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে ভাব বলতে বলতে এবার একটা বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মজিদের মুখে, কোটরাগত চোখ ঝাপ হয়ে ওঠে দিগন্তপ্রসারী দূরত্বে।

কিন্তু আজ সকালে মজিদের সে-চোখে একটা জ্বালাময় ছবি ভেসে ওঠে থেকে-থেকে গনগনে আগুনের পাশে বেগুনি রঙের শাড়িপরা একটি অস্পষ্ট নারীকে দেখে। স্মৃতিতে তার উলঙ্গ বাহু ও কাঁধ আরো শুভ্র হয়ে ওঠে। তার যে-চোখে দিগন্তপ্রসারী দূরত্ব জেগে ওঠে, সে-চোখ ক্রমশ সূক্ষ্ম ও সূচাগ্র-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ সচেতন হয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমার কেমন ধান হইল মিঞা?

তুমি বলুক আপনি বলুক সকলকে মিঞা বলে সম্বোধন করার অভ্যাস মজিদের। লোকটি

ঘাড় চুলকে নিতিবিতি করে বলে,

—যা-ই হইছে তাই যথেষ্ট। ছেলেপুলে লইয়া দুই বেলা খাইবার পারুম।

আসলে এদের বড়াই করাই অভ্যাস। পঞ্চাশ মণ ধান হলে অন্তত এক শ মণ বলা চাই। বতোর দিনে উঁচিয়ে-উঁচিয়ে রাখা ধানের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করানো চাই। লোকটির ধান ভালোই হয়েছে, বলতে গেলে গত দশ বছরে এমন ফসল হয় নি। কিন্তু মজিদের সামনে বড়াই করা তো দূরের কথা, ন্যায্য কথাটা বলতেই তার মুখে কেমন বাধে। তাছাড়া, খোদার কালাম জানা লোকের সামনে ভাবনা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। কী কথা বললে কী হবে বুঝে না উঠে সতর্কতা অবলম্বন করে।

কথার কথা কয় মজিদ, তাই উত্তরের প্রতি লক্ষ থাকে না। তার অন্তরে ক্রমশ যে-আগুন জ্বলে উঠছে, তারই শিখার উত্তাপ অনুভব করে। সে-উত্তাপ ভালোই লাগে।

লোকটি অবশেষে উঠে দাঁড়ায়। তবে যাবার আগে হঠাৎ এমন একটা কথা বলে যে, মজিদ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। এবং যে-আগুন জ্বলে উঠছিল অন্তরে, তা মুহূর্তে নির্বাপিত হয়।

সংক্ষেপে ব্যাপারটি হল এই।—গৃহস্থদের গোলায়-গোলায় যখন ধান ভরে ওঠে তখন দেশময় আবার পীরদের সফর শুরু হয়। এই সময় খাতির-যত্নটা হয়, মানুষের মেজাজটাও খোলাসা থাকে। যেবার আকাল পড়ে, সেবার অতিভক্ত মুরিদের ঘরেও দুদিন গা ঢেলে থাকতে ভরসা হয় না পীর সাহেবদের।

দিন কয়েক হল তিন গ্রাম পরে এক পীর সাহেব এসেছেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মতলুব খাঁ তাঁর পুরোনো মুরিদ। তিনি সেখানেই উঠেছেন।

পীর সাহেবের যথেষ্ট বয়স। লোকে বলে, এক কালে আগুন ছিল তাঁর চোখে, আর কণ্ঠে বজ্রনিনাদ। একদা তাঁর পূর্বপুরুষ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো এক স্থান থেকে নাকি খোদার বাণী প্রচার করবার উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড পথশ্রম স্বীকার করে এ দূরদেশে আসেন। সে কতদিন আগে তা পীর সাহেবও সঠিকভাবে জানেন না। কিন্তু এ-অজ্ঞতা স্বীকার্য নয় বলে কোনো এক পাঠান বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে হিসাব মিলিয়ে সে-স্মরণীয় আগমনকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ণীত করা হয়।

যে-দেশ ছেড়ে এসেছেন, সে-দেশের সঙ্গে আজ অবশ্য কোনো সম্বন্ধ নেই—কেবল বৃহৎ খড়্গনাসা গৌরবর্ণ চেহারাটি ছাড়া। ময়মনসিংহ জেলার কোনো-এক অঞ্চলে বংশানুক্রমে বসবাস করছেন বলে তাঁদের ভাষাটাও এমন বিশুদ্ধভাবে স্থানীয় রূপ লাভ করেছে যে, মুরিদানির কাজ করবার প্রাক্কালে উত্তর-ভারতে কোনো-এক স্থানে গিয়ে তাঁকে উর্দু জবান এস্তেমাল করে আসতে হয়েছিল।

পীর সাহেবের খ্যাতির শেষ নেই, তাঁর সম্বন্ধে গল্পেরও শেষ নেই। সে-গল্প তাঁর রুহানি তা'কত ও কাশ্‌ফ নিয়ে। মাজারের ছায়ার তলে আছে বলে সমাজে জানাজা-পড়ানো খোন্‌কার-মোল্লার চেয়ে মজিদের স্থান অনেক উঁচুতে, কিন্তু রুহানি তা'কত তার নেই বলে অন্তরে-অন্তরে দীনতা বোধ করে। কখনো-কখনো খোলাখুলিভাবে লোকসমক্ষে সে-দীনতা ব্যক্ত করে। কিন্তু করে এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যে, তা মহৎ ব্যক্তির দীনতা প্রকাশের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজিদ নিশ্চিন্ত থাকে।

কিন্তু জাঁদরেল পীররা যখন আশে-পাশে এসে আস্তানা গাড়েন তখন মজিদ কিন্তু শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভয় হয়, তার বিস্তৃত প্রভাব কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মতো মিলিয়ে যাবে, অন্য এক ব্যক্তি এসে যে-বৃহৎ মায়াজাল বিস্তার করবে তাতে সবাই একে-একে জড়িয়ে পড়বে।

অন্যের আত্মার শক্তিতে অবশ্য মজিদের খাঁটি বিশ্বাস নেই। আপন হাতে সৃষ্ট মাজারের পাশে বসে দুনিয়ার অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস হয় না। তবে এসব তার অন্তরের কথা,

প্রকাশের কথা নয়। এতএব কিছুমাত্র বিশ্বাস ছাড়াও সে আশ্চর্য ধৈর্যসহকারে অন্যের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করে। বলে, খোদাতা'লার ভেদ বোঝা কি সহজ কথা? কার মধ্যে তিনি কী বস্তু দিয়েছেন সে কেবল তিনিই বলতে পারেন।

এবার মজিদের মন কিন্তু ক-দিন ধরে থম থম করে। সব সময়েই হাওয়ায় ভেসে আসে পীর সাহেবের কার্যকলাপের কথা। এ-দিকে মাজারে লোকদের আসা-যাওয়াও প্রায় থেমে যায়। বতোর দিনে মানুষের কাজের অন্ত নেই ঠিক। কিন্তু যে-টুকু অবসর পায় তা তারা ব্যয় করতে থাকে পীর সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়। পদচুম্বন অবশ্য সবার ভাগ্যে ঘটে না। দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে অতি নিকটে পৌঁছেও অনেক সময় বাসনা চরিতার্থ হয় না। সন্নিকটে গিয়ে তাঁর নুরানি চেহারার দীপ্তি দেখে কারো চোখ ঝলসে যায়, কারো এমন চোখভাসানো কান্না পায় যে, আর এগোবার আশা ত্যাগ করতে হয়। ভাগ্যবান যারা তারা পীর সাহেবের হাতের স্পর্শ হতে শুরু করে দু-এক শব্দ আদেশ-উপদেশ বা তামাক-গন্ধ-ভারি বুকের হাওয়াও লাভ করে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মজিদ গম্ভীর হয়ে থাকে। রহিমা গা টেপে, কিন্তু টেপে যেন আস্ত পাথর। অবশেষে মজিদকে সে প্রশ্ন করে—

—আপনার কী হইছে?

মজিদ কিছু বলে না।

উত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করে রহিমা হঠাৎ বলে,

—এক পীর সাহেব আইছেন না হেই গেরামে, তানি নাকি মরা মাইনষেরে জিন্দা কইরা দেন?

পাথর এবার হঠাৎ নড়ে। আবছা অন্ধকারে মজিদের চোখ জ্বলে ওঠে। ক্ষণকাল নীরব থেকে হঠাৎ কটমট করে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে,

—মরা মানুষ জিন্দা হয় ক্যামনে?

প্রশ্নটা কৌতূহলের নয় দেখে রহিমা দমে গেল। তারপর আর কোনো কথা হয় না। এক সময় রহিমা পাশে শুয়ে আলগোছে ঘুমিয়ে পড়ে।

মজিদ ঘুমোয় না। সে বুঝেছে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে, এবার কিছু একটা না করলে নয়। আজও অপরাহ্ণে সে দেখেছে, মতিগঞ্জের সড়কটা দিয়ে দলে-দলে লোক চলছে উত্তর দিকে।

মজিদ ভাবে আর ভাবে। রাত যত গভীর হয় তত আগুন হয়ে ওঠে মাথা। মানুষের নির্বোধ বোকামির জন্য আর তার অকৃতজ্ঞতার জন্য একটা মারাত্মক ক্রোধ ও ঘৃণা উষ্ণ রক্তের মধ্যে টগবগ করতে থাকে। সে ছটফট করে একটা নিষ্ফল ক্রোধে।

এক সময় ভাবে, ঝালর-দেয়া সালুকাপড়ে আবৃত নকল মাজারটিই এদের উপযুক্ত শিক্ষা, তাদের নিমকহারামির যথার্থ প্রতিদান। ভাবে, একদিন মাথায় খুন চড়ে গেলে সে তাদের বলেই দেবে আসল কথা। বলে দিয়ে হাসবে হা-হা করে গগন বিদীর্ণ করে। শুনে যদি তাদের বুক ভেঙে যায় তবেই তৃপ্ত হবে তার রিক্ত মন। মজিদ তার ঘরবাড়ি বিক্রি করে সরে পড়বে দুনিয়ার অন্য পথে-ঘাটে। এ-বিচিত্র বিশাল দুনিয়ার কি যাবার জায়গার কোনো অভাব আছে?

অবশ্য এ-ভাবনা গভীর রাতে নিজের বিছানায় শুয়েই সে ভাবে। যখন মাথা শীতল হয়, নিষ্ফল ক্রোধ হতাশায় গলে যায়, তখন সে আবার গুম হয়ে থাকে। তারপর শ্রান্ত, বিক্ষুব্ধ মনে হঠাৎ একটি চিকন বুদ্ধিরশ্মি প্রতিফলিত হয়।

শীঘ্র তার চোখ চকচক করে ওঠে, শ্বাস দ্রুততর হয়। উত্তেজনায় আধা উঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে রহিমার পানে তাকায়। পাশে সে অঘোর ঘুমে বেচইন। একটি হাঁটু উলঙ্গ হয়ে মজিদের দেহ ঘেঁষে আছে।

তাকেই অকারণে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে-চেয়ে দেখে মজিদ, তারপর আবার চিৎ হয়ে শুয়ে চোখখোলা মৃতের মতো পড়ে থাকে।

মজিদ যখন আওয়ালপুর গ্রামে পৌছল তখন সূর্য হেলে পড়েছে। মতলুব মিঞার বাড়ির সামনেকার মাঠটা লোকে-লোকারণ্য। তার মধ্যে কোথায় যে পীর সাহেব বসে আছেন বোঝা মুশকিল। মজিদ বেঁটে মানুষ। পায়ের আঙ্গুলে দাঁড়িয়ে বকের মতো গলা বাড়িয়ে পীর সাহেবকে একবার দেখবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালো মাথার সমুদ্রে দৃষ্টি কেবল ব্যাহত হয়ে ফিরে আসে।

একজন বললে যে, বটগাছটার তলে তিনি বসে আছেন। তখন মাঘের শেষাশেষি। তবু জন-সমুদ্রের উত্তাপে পীর সাহেবের গরম লেগেছে বলে তাঁর গায়ে হাতির কানের মতো মস্ত ঝালরওয়ালা পাখা নিয়ে হাওয়া করছে একটি লোক। কেবল সে পাখাটা থেকে-থেকে নজরে পড়ে।

মুখ তুলে রেখে ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল মজিদ। সামনে শত শত লোক সব বিভোর হয়ে বসে আছে, কেউ কাউকে লক্ষ করবার কথা নয়। মজিদকে চেনে এমন লোক ভিড়ের মধ্যে অনেক আছে বটে, কিন্তু তারা কেউ আজ তাকে চেনে না। যেন বিশাল সূর্যোদয় হয়েছে, আর সে-আলোয় প্রদীপের আলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

পীর সাহেব আজ দফায়-দফায় ওয়াজ করছেন। যখন ওয়াজ শেষ করে তিনি বসে পড়েন তখন অনেকক্ষণ ধরে তার বিশাল বপু দ্রুত শ্বসনের তালে-তালে ওঠানামা করে, আর শুভ্র চওড়া কপালে জমে ওঠা বিন্দু-বিন্দু ঘাম খোলা মাঠের উজ্জ্বল আলোয় চকচক করে। পাখা হাতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি জোরে হাত চালায়।

এ-সময়ে পীর সাহেবের প্রধান মুরিদ মতলুব মিঞা হুজুরের গুণাগুণ সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলে। একথা সর্বজনবিদিত যে, সে বলে, পীর সাহেব সূর্যকে ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণ দিয়ে বলে, হয়তো তিনি এমন এক জরুরি কাজে আটকে আছেন যে ওধারে জোহরের নামাজের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলে কী হবে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত না হুকুম দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সূর্য এক আঙ্গুলও নড়তে পারে না। শুনে কেউ আহা-আহা বলে, কারো-বা আবার ডুকরে কান্না আসে।

কেবল মজিদের চেহারা কঠিন হয়ে ওঠে। সজোরে নড়তে থাকা পাখাটার পানে তাকিয়ে সে মূর্তিবৎ বসে থাকে।

আধঘণ্টা পরে শীতের দ্বিপ্রাহরিক আমেজে জনতা ঈষৎ ঝিমিয়ে এসেছে এমনি সময় হঠাৎ জমায়েতের নানাস্থান থেকে রব উঠল। একটা ঘোষণা মুখে-মুখে সারা ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল।—পীর সাহেব আবার ওয়াজ করবেন।

পীর সাহেবের আর সে-গলা নেই। সূক্ষ্ম তারের কম্পনের মতো হাওয়ায় বাজে তাঁর গলা। জমায়েতের কেউ না কেউ প্রতি মুহূর্তে হা-হা করে উঠছে বলে সে-ক্ষীণ আওয়াজও সব প্রান্তে শোনা যায় না। কিন্তু মজিদ কান খাড়া করে শোনে, এবং শোনবার প্রচেষ্টার ফলে চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পীর সাহেবের গলার কম্পমান সূক্ষ্ম তারের মতো ক্ষীণ আওয়াজই আধঘণ্টা ধরে বাজে। তারপর বিচিত্র সুর করে তিনি একটা ফারসি বয়েত বলে ওয়াজ ক্ষান্ত করেন।

বলেন, সোহবতে সো'য়ালে তুরা সো'য়ালে কুনাদ (সুসঙ্গ মানুষকে ভালো করে)। শুনে জমায়েতের অর্ধেক লোক কেঁদে ওঠে। তারপর তিনি যখন বাকিটা বলেন—সোহবতে তো'য়ালে তুরা তো'য়ালে কুনাদ (কুসঙ্গ তেমনি তাকে আবার খারাপ করে)—তখন গোটা জমায়েতেরই সমস্ত সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়, সকলে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে।

বসে পড়ে পীর সাহেব পাখাওয়ালার পানে লাল-হয়ে-ওঠা চোখে তাকিয়ে পাখা-সঞ্চালন

দ্রুততর করবার জন্য ইশারা করছেন এমন সময়ে সামনের লোকেরা সব ছুটে গিয়ে পীর সাহেবকে ঘেরাও করে ফেলল। হঠাৎ পাগল হয়ে উঠেছে তারা। যে যা পারল ধরল,—কেউ পা, কেউ হাত, কেউ-বা আস্তিনের অংশ।

তারপর এক কাণ্ড ঘটল। মানুষের ভাবমত্ততা দেখে পীর সাহেব অভ্যস্ত। কিন্তু আজকের ক্রন্দনরত জমায়েতের নিকটবর্তী লোকগুলোর সহসা এই আক্রমণ তাঁর বোধহয় সহ্য হল না। তিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যুবকের সাবলীল সহজভঙ্গিতে মাথার ওপরে গাছটার ডালে উঠে গেলেন। দেখে হায়-হায় করে উঠল পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা, আর তা শুনে জমায়েতও হায়-হায় করে উঠল। সাঙ্গপাঙ্গরা তখন সুর করে গীত ধরলে এই মর্মে যে, তাদের পীর সাহেব তো শূন্যে উঠে গেছেন, এবার কী উপায়!

পীর সাহেব অবশ্য ডালে বসে তখন দিব্যি বাতরস-ভারি পা দোলাচ্ছেন।

ফাগুনের আগুনের দ্রুতবিস্তারের মতো পীর সাহেবের শূন্যে ওঠার কথা দেখতে-না দেখতে ছড়িয়ে গেল। যারা তখন ফারসি বয়েতের অর্থ না বুঝে কেবল সুর শুনেই কেঁদে উঠেছিল, এবার তারা মরাকান্না জুড়ে বসল। পীর সাহেব কি তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছেন? কিন্তু গেলে, অজ্ঞ-মূর্খ তারা পথ দেখবে কী করে?

জোয়ারী ঢেউয়ের মতো সম্মুখে ভেঙে এল জনস্রোত। অনেক মরাকান্না ও আকুতি-বিকুতির পর পীর সাহেব বৃক্ষডাল হতে অবশেষে অবতরণ করলেন।

বেলা তখন বেশ গড়িয়ে এসেছে, আর মাঠের ধারে গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘতর হয়ে সে মাঠেরই বুক পর্যন্ত পৌঁছেছে, এমন সময় পীর সাহেবের নির্দেশে একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে,

—ভাই সকল, আপনারা সব কাতারে দাঁড়াইয়া যান।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নামাজ শুরু হয়ে গেল।

নামাজ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময় হঠাৎ সারা মাঠটা যেন কেঁপে উঠল। শত শত নামাজরত মানুষের নীরবতার মধ্যে খ্যাপা কুকুরের তীক্ষ্ণতায় নিঃসঙ্গ একটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

সে-কণ্ঠ মজিদের।

—যতসব শয়তানি, বে'দাতি কাজকারবার। খোদার সঙ্গে মশকরা! নামাজ ভেঙে কেউ কথা কইতে পারে না। তাই তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সবাই নীরবে মজিদের অশ্রাব্য গালাগাল শুনলে।

মোনাজাত হয়ে গেলে সাঙ্গ-পাঙ্গদের তিনজন এগিয়ে এল। একজন কঠিন গলায় প্রশ্ন করল,

—চেঁচামিচি করতা কিছকা ওয়াস্তে?

লোকটি আবার পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না।

মজিদ বললে,

কোন নামাজ হইল এটা?

—কাহে? জোহরকা নামাজ হুয়া।

উত্তর শুনে আবার চিৎকার করে গালাগাল শুরু করল মজিদ। বললে, এ কেমন বেশরিয়তি কারবার, আছরের সময় জোহরের নামাজ পড়া?

সাঙ্গপাঙ্গরা প্রথমে ভালোভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। তারা বললে যে, মজিদ তো জানেই পীর সাহেবের হুকুম ব্যতীত জোহরের নামাজের সময় যেতে পারে না। পশ্চিম থেকে যে এলেম শিখে এসেছে সে বোঝানোর পন্থাটা প্রায় বৈজ্ঞানিক করে তোলে। সে বলে যে, যেহেতু, ভাদ্র মাস থেকে ছায়া আছলী এক-এক কদম করে বেড়ে যায়, সেহেতু, এ কদমের ওপর দুই লাঠি হিসেব করে চমৎকার জোহরের নামাজের সময় আছে।

মজিদ বলে, মাপো। এবং পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা যতদূর সম্ভব দীর্ঘ দীর্ঘ ছয় কদম ফেলে তার সঙ্গে দুই লাঠি যোগ করেও যখন ছায়ার নাগাল পেল না তখন বললে, তর্ক যখন শুরু হয়েছিল তখন ছায়া ঠিক নাগালের মধ্যেই ছিল।

শুনে মজিদ কুৎসিততমভাবে মুখ বিকৃত করে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার মুখ খিস্তি করে বললে,

—কেন, তখন তোগো পীর ধইরা রাখবার পারল না সুরুযটারে? তারপর সরে গিয়ে সে বজ্রকণ্ঠে ডাকলে,

—মহব্বতনগর যাইবেন কে কে?

মহব্বতনগর গ্রামের লোকেরা এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কারো কারো মনে ভয়ও হয়েছিল—এই বুঝি পীর সাহেবের সাঙ্গপাঙ্গরা ঠেঙিয়ে দেয় মজিদকে! এবার তার ডাক শুনে একে-একে তারা ভিড় থেকে খসে এল।

মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে থুতু ফেলে, তওবা কেটে, নিশ্বাসের নিচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করল, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্করেখা।

সে-রাত্রে ব্যাপারিকে নিয়ে এক জরুরি বৈঠক বসল। সবাই এসে জমলে, মজিদ সকলের পানে কয়েকবার তাকাল। তার চোখ জ্বলছে একটা জ্বালাময়ী অথচ পবিত্র ক্রোধে। শয়তানকে ধ্বংস করে মূর্খ, বিপথে-চালিত মানুষদের রক্ষা করার কল্যাণকর বাসনায় সমস্ত সত্তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

মজিদ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সংক্ষেপে তার বক্তব্য পেশ করল—ভাই সকলরা সকলে অবগত আছেন যে, বে'দাতি কোনো কিছু খোদাতা'লার অপ্রিয়, এবং সেই থেকে সত্যিকার মানুষ যারা তাদেরকে তিনি দূরে থাকতে বলেছেন। এ-কথাও তারা জানে যে, শয়তান মানুষকে প্রলুব্ধ করবার জন্য মনোমুগ্ধকর রূপ ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত কৌশলসহকারে তাকে বিপথে চালিত করবার প্রয়াস পায়। শয়তানের সে-রূপ যতই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, খোদার পথে যারা চলাচল করে তাদের পক্ষে সে-মুখোশ চিনে ফেলতে বিন্দুমাত্র দেরি হয় না। তাছাড়া, শয়তানের প্রচেষ্টা যতই নিপুণ হোক না কেন, একটি দুর্বলতার জন্য তার সমস্ত কারসাজি ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা হল বে'দাতি কাজকারবারের প্রতি শয়তানের প্রচণ্ড লোভ। এখানে এ-কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, শয়তান যদি মানুষকে খোদার পথেই নিয়ে গেল, তাহলে তার শয়তানি রইল কোথায়।

ভণিতার পর মজিদ আসল কথায় আসে। একটু দম নিয়ে সে আবার তার বক্তব্য শুরু করে।—আওয়ালপুরে তথাকথিত যে-পীর সাহেবের আগমন ঘটেছে তার কার্যকলাপ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে উক্ত মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। মুখোশ তাঁর ঠিকই আছে—যে-মুখোশকে ভুল করে মানুষ তাঁর কবলে গিয়ে পড়ছে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে বিপথে নেয়া, খোদার পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের দিকে চালিত করা। সে-উদ্দেশ্যই তথাকথিত পীরটি কৌশলে চরিতার্থ করবার চেষ্টায় আছেন। পাঁচ ওক্ত নামাজের জন্য খোদা সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ভুয়ো কথা বলে তিনি এতগুলো ভালো মানুষের নামাজ প্রতিদিন মকরুহ্ করে দিচ্ছেন। তাঁর চক্রান্তে পড়ে কত মুসল্লি ইমানদার মানুষ—যাঁরা জীবনে একটিবার নামাজ কাজা করেন নি—তাঁরা খোদার কাছে গুনাহ্ করছেন।

এই পর্যন্ত বলে বিস্ময়াহত স্তব্ধ লোকগুলোর পানে মজিদ কতক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর আরো কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাড়িতে হাত বুলায়।

গলা কেশে এবার খালেক ব্যাপারি বৈঠকের পানে তাকিয়ে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

হনলেন তো ভাই সকল?

সাব্যস্ত হল, অন্তত এ-গ্রামের কোনো মানুষ পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

এরপর মহব্বতনগরের লোক আওয়ালপুরে একেবারে গেল না যে তা নয়। কিন্তু গেল অন্য মতলবে। পরদিন দুপুরেই একদল যুবক মজিদকে না জানিয়ে একটা জেহাদি জোশে বলীয়ান হয়ে পীর সাহেবের সভায় গিয়ে উপস্থিত হল। এবং পরে তারা বড় সড়কটার উত্তর দিকে না গিয়ে গেল দক্ষিণ দিকে করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জে একটি হাসপাতাল আছে।

অপরাহ্নে সংবাদ পেয়ে মজিদ ক্যানভাসের জুতো পরে ছাতি বগলে করিমগঞ্জ গেল। হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে শয়তান ও খোদার কাজের তারতম্য আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে বলল, বেহেশ্‌ত ও দোজখের জলজ্যান্ত বর্ণনাও করল কতক্ষণ।

কালু মিঞা গোঙায়। চোখে তার বেদনার পানি। সে বলে শয়তানের চেলারা তার মাথাটা ফাটিয়ে দু-ফাঁক করে দিয়েছে। মজিদ তাকিয়ে দেখে মস্ত ব্যাণ্ডেজ তার মাথায়। দেখে সে মাথা নাড়ে, দাড়িতে হাত বুলায়, তারপর দুনিয়া যে মস্ত বড় পরীক্ষা-ক্ষেত্র তা মধুর, সুললিতকণ্ঠে বুঝিয়ে বলে। কালু মিঞা শোনে কিনা কে জানে, একঘেয়ে সুরে গোঙাতে থাকে।

রাতে এশার নামাজ পড়ে বিদায় নিতে মজিদ হঠাৎ অন্তরে কেমন বিস্ময়কর ভাব বোধ করে। কম্পাউণ্ডারকে ডাক্তার মনে করে বলে,

—পোলাগুলিরে একটু দেখবেন। ওরা বড় ছোয়াবের কাম করছে! ওদের যত্ন নিলে আপনারও ছোয়াব হইব।

ভাং-গাঁজা খাওয়া রসকষশূন্য হাড়গিলে চেহারা কম্পাউণ্ডারের। প্রথমে দুটো পয়সার লোভে তার চোখ চকচক করে উঠেছিল, কিন্তু ছোয়াবের কথা শুনে একবার আপাদমস্তক মজিদকে দেখে নেয়। তারপর নিরুত্তরে হাতের শিশিটা ঝাঁকতে-ঝাঁকতে অন্যত্র চলে যায়।

গ্রামে ফিরে মজিদ কালু মিঞার বাপের সঙ্গে দু-চারটে কথা কয়। বুড়ো এক ছিলিম তামাক এনে দেয়। মজিদ নিজে গিয়ে ছেলেকে দেখে এসেছে বলে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে। হুঁকা তুলে নেবার আগে মজিদ বলে,

—কোনো চিন্তা করবা না মিঞা। খোদা ভরসা। তারপর বলে যে, হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে সে নিজেই বলে এসেছে, ওদের যেন আদর যত্ন হয়। ডাক্তারকে অবশ্য কথাটা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, গিয়ে দেখে, এমনিতেই শাহি কাণ্ডকারখানা। ওষুধপত্র বা সেবাশুশ্রূষার শেষ নাই।

খুব জোরে দম কষে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আরো শোনায় যে, তবু তার কথা শুনে ডাক্তার বলেন, তিনি দেখবেন ওদের যেন অযত্ন বা তকলিফ না হয়। তারপর আরেকটা কথার লেজুড় লাগায়। কথাটা অবশ্য মিথ্যা; এবং সজ্ঞানে সুস্থ দেহে মিথ্যা কথা কয় বলে মনে-মনে তওবা কাটে। কিন্তু কী করা যায়। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা। সময়-অসময়ে মিথ্যা কথা না বললে নয়।

বলে, ডাক্তার সাহেব তার মুরিদ কিনা, তাই সেখানে মজিদের বড় খাতির।

বাইরে নিরুদ্বিগ্ন ও স্বচ্ছন্দ থাকলেও ভেতরে-ভেতরে মজিদের মন ক-দিন ধরে চিন্তায় ঘুরপাক খায়। আওয়ালপুরে যে-পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছেন তিনি সোজা লোক নন। বহু-পুরুষ আগে দীর্ঘপথশ্রম স্বীকার করে আবক্ষ দাড়ি নিয়ে শানদার জোব্বাজুব্বা পরে যে-লোকটি এদেশে আসেন, তাঁর রক্ত ভাটির দেশের মেঘ-পানিতেও একেবারে আনোনা হয়ে যায় নি। পান্‌সা হয়ে গিয়ে থাকলেও পীর সাহেবের শরীরে সে-ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসী ব্যক্তিরই রক্ত। কাজেই একটা পাল্টা জবাবের অস্বস্তিকর প্রত্যাশায় থাকে মজিদ। মহব্বতনগরের লোকেরা আর ওদিকে যায় না। কাজেই, আক্রমণ যদি একান্ত আসেই আগে-ভাগে তার হদিস পাবার যো নেই। সে-জন্য মজিদের মনে অস্বস্তিটা রাতদিন আরো খচখচ করে।

মজিদ ও-তরফ থেকে কিছু একটা আশা করলে কী হবে, তিন গ্রাম ডিঙিয়ে মহব্বতনগরে এসে হামলা করার কোনো খেয়াল পীর সাহেবের মনে ছিল না। তার প্রধান কারণ তাঁর জঈফ অবস্থা। এ-বয়সে দাঙ্গাবাজি হৈ-হাঙ্গামা আর ভালো লাগে না। সাকরেদদের মধ্যে কেউ-কেউ, বিশেষ করে প্রধান মুরিদ মতলুব খাঁ, একটা জঙ্গি ভাব দেখালেও হুজুরের নিস্পৃহতা দেখে শেষ পর্যন্ত তারা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পীর সাহেব অপরিসীম উদারতা দেখিয়ে বলেন, কুত্তা তোমাকে কামড়ালে তুমিও কি উলটো তাকে কামড়ে দেবে? যুক্তি উপলব্ধি করে সাকরেদরা নিরস্ত হয়। তবু স্থির করে যে, মজিদ কিংবা তার চেলারা যদি কেউ এধারে আসে তবে একহাত দেখে নেয়া যাবে। সেদিন কালুদের কল্লা যে ধড় থেকে আলাদা করতে পারে নি, সে-জন্য মনে প্রবল আফসোস হয়।

গ্রামের একটি ব্যক্তি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পছন্দ করে না। সে অন্দরের লোক, আর তার তাগিদটা প্রায় বাঁচা-মরার মতো জোরালো। পীর সাহেবের সাহায্যের তার একান্ত প্রয়োজন। না হলে জীবন শেষ পর্যন্ত বিফলে যায়।

সে হল খালেক ব্যাপারির প্রথম পক্ষের বিবি আমেনা। নিঃসন্তান মানুষ। তের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, আজ তিরিশ পেরিয়ে গেছে। শূন্য কোল নিয়ে হা-হুতাশের সঙ্গে বুক বেঁধে তবু থাকা যেত, কিন্তু চোখের সামনে সতীন তানু বিবিকে ফি-বৎসর আস্ত-আস্ত সন্তানের জন্ম দিতে দেখে বড় বিবির আর সহ্য হয় না। দেখা-সওয়ার একটা সীমা আছে, যা পেরিয়ে গেলে তার একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আওয়ালপুরে পীর সাহেবের আগমন-সংবাদ পাওয়া অবধি আমেনা বিবি মনে একটা আশা পোষণ করছিল যে, এবার হয়তো-বা একটা বিহিত করা যাবে। আগামী বছর তানু বিবির কোলে যখন নোতুন এক আগন্তুক ট্যাঁ-ট্যাঁ করে উঠবে তখন সেও কণ্ঠ কাতর করে বলতে পারবে, তার গা-টা কেমন-কেমন করছে, বুক ঠেলে কেবল যেন বমি আসতে চায়। তখন নানি-বুড়ির ডাক পড়বে। শেষে নানি-বুড়ি মাথা নেড়ে হেসে রসিকতা করে বলবে, ওস্তাদের মার শেষকাটালে। কারণ যৌবনের দিক থেকে সে তানু বিবির মতো জোয়ারলাগা ভরাগাং না হলেও একেবারে টস্‌কানো নয়, বোঁচা-চ্যাবকা কালো মানুষও নয়। রঙে ছ্যাতা পড়বার উপক্রম করলেও এখনো সে-রং ধবধব করে; নাকে সতীনের মতো জ্বলজ্বলে নাকছাবি না থাকলেও তা খাড়া, টিকলো। তার সন্তান আকাশের চাঁদের মতো সুন্দর হবেই।

কিন্তু মুশকিল হল কথাটা পাড়া নিয়ে। প্রথমত, ব্যাপারিকে নিরালা পাওয়া দুষ্কর। দ্বিতীয়ত, চোখের পলকের জন্য পেলেও তখন আবার জিহ্বা নড়ে না। ফিকিরফন্দি করতে-করতে এদিকে মজিদ কাণ্ডটা করে বসল। কিন্তু আমেনা বিবি মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুযোগটা ছাড়া যায় না। সারা জীবন যে-মেয়েলোকের সন্তান হয় নি, পীর সাহেবের পানিপড়া খেয়ে সে-ও কোলে ছেলে পেয়েছে।

একদিন লজ্জা-শরমের বালাই ছেড়ে আমেনা বিবি বলেই বসে, পীর সা'বের থিকা একটু পানিপড়া আইনা দেন না।

শুনে অবাক হয় ব্যাপারি। নিটোল স্বাস্থ্য বিবির, কোনোদিন জ্বরজারি, পেট কামড়ানি পর্যন্ত হয় না।

—পানিপড়া ক্যান?

আমেনা বিবি লজ্জা পেয়ে আলগোছে ঘোমটা টেনে সেটি আরো দীর্ঘতর করে, আর তার মনের কথা ব্যাপারি যেন বিনা উত্তরেই বোঝে,—তাই দোয়া করে মনে মনে।

উত্তর পায় না বলেই ব্যাপারি বোঝে। তারপর বলে,—আইচ্ছা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যে, পীর সাহেবের ত্রিসীমানায় আর তো ঘেঁষা যায় না। অবশ্য পীর সাহেবকে মজিদ খোদ ইবলিশ শয়তান বলে ঘোষণা করলেও তবু বউয়ের খাতিরে পানিপড়ার জন্য তাঁর কাছে যেতে বাধত না, কারণ পীর নামের এমন মাহাত্ম্য যে, শয়তান ডেকেও সে-নামকে অন্তরে-

অন্তরে লেবাসমুক্ত করা যায় না। গাভুর-চাষা-মাঠাইলরা পারলেও অন্তত বিস্তর জমিজমার মালিক খালেক ব্যাপারি তা পারে না। কিন্তু সাধারণ লোকে যেটা স্বচ্ছন্দে করতে পারে সেটা আবার তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা হল শয়তানকে শয়তান ডেকে সমাজের সামনে ভরদুপুরে তাকে আবার পীর ডাকা। এবং সমাজের মূল হল একটি লোক—যার আঙ্গুলের ইশারায় গ্রাম ওঠে-বসে, সাদাকে কালো বলে, আসমানকে জমিন বলে। সে হল মজিদ। জীবনস্রোতে মজিদ আর খালেক ব্যাপারি কী করে এমন খাপে-খাপে মিলে গেছে যে, অজান্তে অনিচ্ছায়ও দুজনের পক্ষে উলটো পথে যাওয়া সম্ভব নয়। একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।

সে-জন্য সে ভাবিত হয়, দু-দিন আমেনা বিবির কান্নাসজল কণ্ঠের আকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে। অবশেষে বিবির কাতর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই হয়তো একটা উপায় ঠাহর করে ব্যাপারি।

ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর এক ভাই থাকে। নাম ধলামিঞা। বোকা কিছিমের মানুষ, পরের বাড়িতে নির্বিবাদে খায়দায় ঘুমায়, আর বোন-জামাইয়ের ভাত এতই মিঠা লাগে যে, নড়ার নাম করে না বছরান্তেও। আড়ালে-আড়ালে থাকে। ক্বচিৎ কখনো দেখা হয়ে গেলে দু-টি কথা হয় কি হয় না, কোনোদিন মেজাজ ভালো থাকলে ব্যাপারি হয়তো-বা শালার সঙ্গে খানিক মশকরাও করে।

তাকে ডেকে ব্যাপারি বললে,

—একটা কাম করেন ধলামিঞা।

ব্যাপারির সামনে বসে কথা কইতে হলে চরম অস্বস্তি বোধ করে সে। কেমন একটা পালাই-পালাই ভাব তাকে অস্থির করে রাখে। কোনোমতে বলে,

—কী কাম দুলামিঞা?

কী তার কাজ ব্যাপারি আগাগোড়া বুঝিয়ে বলে। আগে প্রথম বিবির দিলের খায়েশের কথা দীর্ঘ ভণিতাসহকারে বর্ণনা করে। তারপর বলে, ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং আওয়ালপুর তাকে রওনা হতে হবে শেষরাতের অন্ধকারে—যাতে কাকপক্ষীও খবর না পায়। আর সেখানে গিয়ে তাকে প্রচুর সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এ-গ্রাম থেকে গেছে এ-কথা ঘুণাক্ষরেও বলতে পারবে না। বলবে যে, করিমগঞ্জের ওপারে তার বাড়ি। বড় বিপদে পড়ে এসেছে পীর সাহেবের দোয়াপানির জন্য। তার এক নিকটতম নিঃসন্তান আত্মীয়ার একটা ছেলের জন্য বড় শখ হয়েছে। শখের চেয়েও যেটা বড় কথা, সেটা হল এই যে, শেষ পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে যদি নাই হয় তবে বংশে বাতি জ্বালবার আর কেউ থাকবে না। মোটকথা, ব্যাপারটা এমন করুণভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে যে, শুনে পীর সাহেবের মন গলে যেন পানি হয়ে যায়।

বিবির বড় ভাই, কাজেই রেস্তায় মুরব্বি। তবু ধম্‌কে-ধাম্‌কে কথা বলে ব্যাপারি। পরগাছা মুরব্বিকে আবার সম্মান, তার সঙ্গে আবার কেতাদুরস্ত কথা!

—কী গো ধলামিঞা, বুঝলান নি আমার কথাডা?

—জি, বুঝছি। কাঁধ পর্যন্ত ঘাড় কাত করে ধলামিঞা জবাব দেয়। প্রস্তাব শুনে মনে-মনে কিন্তু ভাবিত হয়। ভাবনার মধ্যে এই যে, আওয়ালপুর ও মহব্বতনগরের মাঝপথে একটা মস্ত তেঁতুলগাছ পড়ে, এবং সবাই জানে যে সেটা সাধারণ গাছ নয়, দস্তুরমতো দেবংশী।

কাকপক্ষী যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন অনেক রাত। অত রাতে কি একাকী ঐ তেঁতুলগাছের সন্নিকটে ঘেঁষা যায়? ভাবনার মধ্যে এও ছিল যে, যে-সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা শুনেছে, তারপর কোন সাহসে পা দেয় মতলুব খাঁর গ্রামে। তেঁতুলগাছের ফাঁড়াটা কাটলেও ওইখানে গিয়ে পীর সাহেবের দজ্জাল সাঙ্গপাঙ্গদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া নেহাত সহজ হবে না। নিজের পরিচয় নিশ্চয়ই সে লুকোবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ধরা পড়ে যাবে না, কী বিশ্বাস! কে কখন চিনে ফেলে কিছু ঠিক নেই। যে ঢেঙা লম্বা লোক ধলামিঞা!

—ভাবেন কী? হুমকি দিয়ে ব্যাপারি প্রশ্ন করে।

—জি, কিছু না!

তবু কয়েক মুহূর্ত তার পানে চেয়ে থেকে ব্যাপারি বলে,

—আরেক কথা। কথাডা যানি আপনার বইনে না হুনে। আপনারে আমি বিশ্বাস করলাম।

—তা করবার পারেন।

সারাদিন ধলামিঞা ভাবে, ভাবে। ভাবতে-ভাবতে ধলামিঞার কালামিঞা বনে যাবার যোগাড়। বিকেলের দিকে কিন্তু একটা বুদ্ধি গজায়। ব্যাপারির অনুপস্থিতির সুযোগে বাইরের ঘরে বসে নলের হুঁকায় টান দিচ্ছিল, হঠাৎ সেটা নাবিয়ে রেখে সে সরাসরি বাইরে চলে যায়। তারপর দীর্ঘ দীর্ঘ পা ফেলে হাঁটতে থাকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারের দিকে। হাঁটার ঢং দেখে পথে দু-চারজন লোক থ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়—তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাইরেই দেখা হয় মজিদের সঙ্গে। গাছতলায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে। কাছে গিয়ে গলা নিচু করে সে বললে,

—আপনার লগে একটু কথা আছিল।

গলাটা বিনয়ে নম্র হলেও উত্তেজনায় কাঁপছে।

খালেক ব্যাপারি তখন যে-দীর্ঘ ভণিতাসহকারে আমেনা বিবির মনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিল, তারই ওপর রং ফলিয়ে, এখানে-সেখানে দরদের ফোঁটা ছিটিয়ে, এবং ফেনিয়ে-ফুলিয়ে দীর্ঘতর করে ধলামিঞা কথা পাড়ে। বলে, মেয়েমানুষের মন, বড় অবুঝ। নইলে সাক্ষাৎ ইবলিশ শয়তান জেনেও তারই পানিপড়া খাবার সাধ জাগবে কেন আমেনা বিবির? কিন্তু মেয়েমানুষ যখন পুরুষের গলা জড়িয়ে ধরে তখন আর নিস্তার থাকে না। খালেক ব্যাপারি আর কী করে। ধলামিঞাকে ডেকে বলে দিল, আওয়ালপুরে গিয়ে পীর সাহেবটির কাছ থেকে সে যেন পানিপড়া নিয়ে আসে।

মজিদ নীরবে শোনে। হঠাৎ তার মুখে ছায়া পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। তারপর সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—তা কখন যাইবেন আওয়ালপুর?

ধলামিঞা হঠাৎ ফিচকি দিয়ে হাসে।

—আওয়ালপুর গেলে কি আর আপনার কাছে আহি? কী কেলা পানিপড়াডা দিব হে লোকটা? বেচারির মনে যখন একটা ইচ্ছা ধরছে তখন ফাঁকির কাম কি ঠিক হইব?—আমি কই, আপনেই দেন পানিপড়াডা—আর কথাডা একদম চাইপা যান।

অনেকক্ষণ মজিদ চুপ হয়ে থাকে। এর মধ্যে মুখে ছায়া আসে, যায়! তার পানে চেয়ে আর তার দীর্ঘ নীরবতা দেখে ধলামিঞার সব উত্তেজনা শীতল হয়ে আসে। অবশেষে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সে প্রশ্ন করে,

—কী কন?

—কী আর কমু। এই সব কাম কি চাপাচাপি দিয়া হয়। এ কি আইন-আদালত, না মামলা-মকদ্দমা? দলিল-দস্তাবেজ জাল হয়, কিন্তু খোদাতা'লার কালাম জাল হয় না। আপনে আওয়ালপুরেই যান।

মুহূর্তে ধলামিঞার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে ভয়ে। রাতের অন্ধকারে দেবংশী তেঁতুলগাছটা কী যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, ভাবতেই বুকের রক্ত শীতল হয়ে আসে। তাছাড়া পীর সাহেবের ডাণ্ডাবাজ চেলাদের কথা ভাবলেও গলা শুকিয়ে আসে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হয়তো ভয়টাকে হজম করে নিয়ে ভগ্নগলায় ধলামিঞা বলে,

—আপনে না দিলে না দিলেন। কিন্তু হেই পীরের কাছে আমি যামু না।

—যাইবেন না ক্যান? এবার একটু রুষ্টস্বরে মজিদ বলে, ব্যাপারি মিঞা যখন পাঠাইতেছেন তখন যাইবেন না ক্যান?

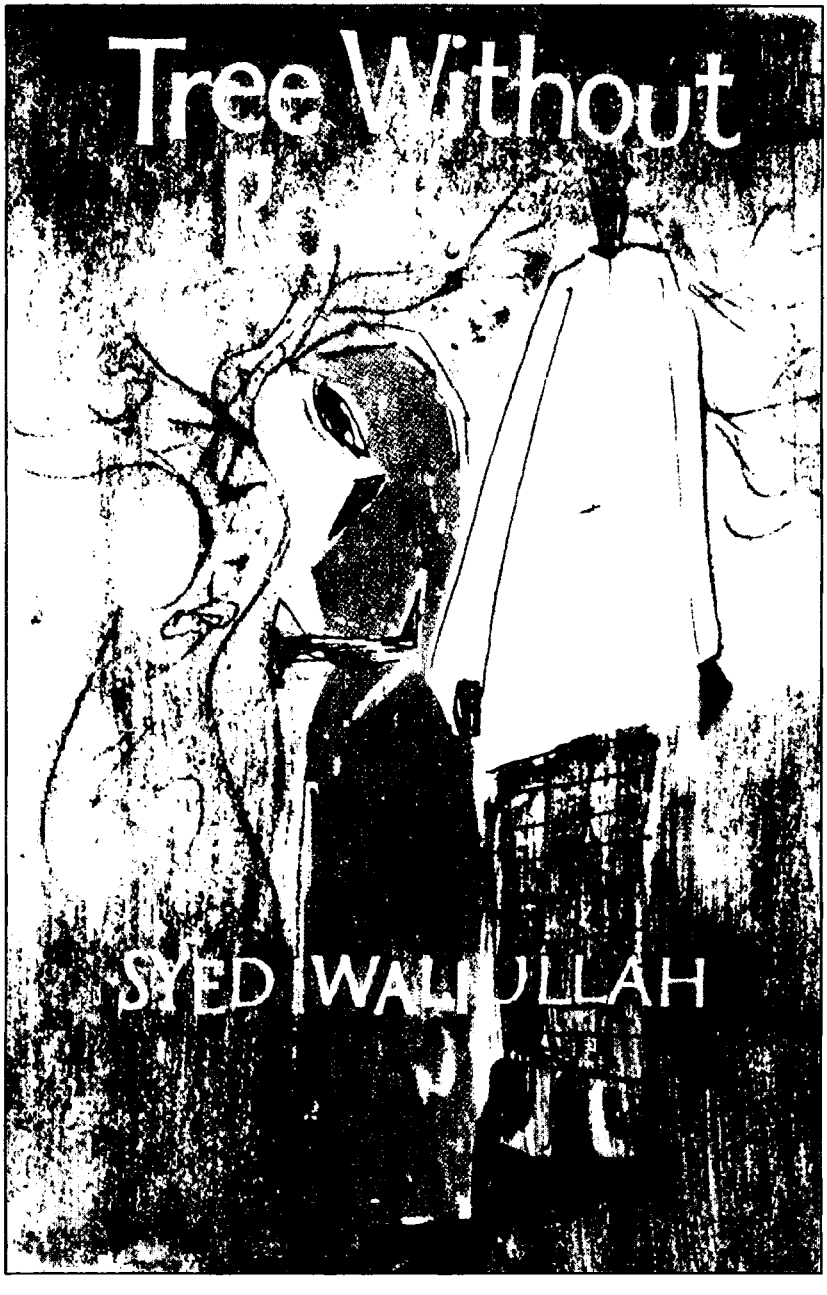

লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'লালসালু' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের
প্রচ্ছদটি এঁকেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিজে

উক্তিটা দুইদিকে কাটে। কোনটা নিয়ে কোনটা ফেলে ঠিক করতে না পেরে ধলামিঞা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। অবশেষে কথাটার সঠিক মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা ছেড়ে সরাসরি বলে,

—হেই কথা আমি বুঝি না। কাইল সকালে এক বোতল পানি দিয়া যামুনে, আপনি পইড়া দিবেন।

ধলামিঞার মতলব, শেষরাতে উঠে গ্রামের বাইরে কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে, দুপুরের দিকে ফিরে এসে মজিদের কাছ থেকে বোতলটা নিয়ে যাবে। আর পীর সাহেবের খেদমতে পৌঁছে দেবার জন্য ব্যাপারি যে-টাকা দিবে তার অর্ধেক বেমালুম পকেটস্থ করে বাকিটা মজিদকে দেবে। মজিদ প্রায় ঘরের লোক। ব্যাপারির কাছে তার দাবি-দাওয়া নেই। দিলেও চলে, না দিলেও চলে। তবু কথাটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে হলে মজিদের মুখকেও চাপা দিতে হয়।

—তাইলে পাকাপাকি কথা হইল। ভরদুপুরে আমি আসুম নে পানিপড়া নিবার জন্য। তারপর তাড়াতাড়ি বলে, ঠগের পিছনে বেহুদা টাকা ঢালন কি বিবেক-বিবেচনার কাম?

টাকার ইঙ্গিতটা স্পষ্ট এবং লোভনীয় বটে। কিন্তু তবু মজিদ তার কথায় অটল থাকে। নিমরাজিও হয় না। কঠিন গলায় বলে,

—না, আপনে আওয়ালপুরেই যান।

এতক্ষণ পর ধলামিঞা বোঝে যে, মজিদের কথাটা রাগের। বিবির খাতিরে ব্যাপারি মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করে সে-ঠক পীরের কাছেই লোক পাঠাবে পড়াপানি আনবার জন্য—সেটা তার পছন্দসই নয়। না হবারই কথা। ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মতো যেন।

ধলামিঞা ভারিমুখ নিয়ে প্রস্থান করে। ঘরে ফিরে আবার ভাবতে শুরু করে। কিন্তু কোনো বুদ্ধি ঠাহর করবার আগেই মজিদ এসে উপস্থিত হয় ব্যাপারির বৈঠকখানায়।

যতক্ষণ নোতুন এক ছিলিম তামাক সাজানো হয় কল্কিতে, ততক্ষণ দু-জনে গরুছাগলের কথা কয়। দুয়েক বাড়িতে গরুর ব্যারামের কথা শোনা যাচ্ছে। মজিদের ধামড়া গাইটার পেট ফুলে ঢোল হয়ে আছে। রহিমা কত চেষ্টা করছে কিন্তু গাইটা দানা-পানি নিচ্ছে না মুখে। খাচ্ছেও না কিছু, দুধও দিচ্ছে না এক ফোঁটা।

তামাক এলে কতক্ষণ নীরবে ধূমপান করে মজিদ। তারপর এক সময় মুখ তুলে প্রশ্ন করে,

—হেই পীরের বাচ্চা পীর শয়তানের খবর কী? এহনো ইমানদার মানুষের সর্বনাশ করতাছে না সটকাইছে?

প্রশ্ন শুনে খালেক ব্যাপারি ঈষৎ চমকে ওঠে, তারপর তার চোখের পাতায় নাচুনি ধরে। চোখ অনেক কারণেই নাচে। তাই শুধু নাচলেই ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ব্যাপারির মনে হয়, তামাক-ধোঁয়ার পশ্চাতে মজিদের চোখ হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে এবং সে-চোখ দিয়ে সে তার মনের কথা কেতাবের অক্ষরগুলোর মতো আগাগোড়া অনায়াসে পড়ে ফেলছে।

—কী জানি, কইবার পারি না। অবশেষে ব্যাপারি উত্তর দেয়। কিন্তু আওয়াজ শুনে মনে হয় গলাটা যেন ধসে গেছে হঠাৎ। সজোরে একবার কেশে নিয়ে বলে, হয়তো গেছে গিয়া।

মজিদ আস্তে বলে,

—তাইলে আর তানার কাছে লোক পাঠাইয়া কী করবেন?

—লোক পাঠামু তানার কাছে? বিস্ময়ে ব্যাপারি ফেটে পড়ে। কিন্তু মজিদের শীতল চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে বোঝে যে, মিথ্যা কথা বলা বৃথা। শুধু বৃথা নয়, চেষ্টা করলে ব্যাপারটা বড় বিসদৃশও দেখাবে। যে-করেই হোক, মজিদ খবরটা জেনেছে।

একবার সজোরে কেশে ধসে যাওয়া গলাকে অপেক্ষাকৃত চাঙা করে তুলে ব্যাপারি বলে,

—হেই কথা আমিও ভাবতাছি। আছে কি না আছে—হুদাহুদি পাঠান। তবু মেয়েমানুষের মন। সতীন আছে ঘরে। ক্যামনে কখন দিলে চোট পায় ডর লাগে। তা যাক। পাইলে পাইল, না পাইলে নাই। আসলে মন-বোঝানো আর কী। ঠগ-পীরের পানিপড়ায় কি কোনো কাম হয়?

ধাক্কাটা সামলে নিয়ে ব্যাপারি ধীরে ধীরে সব বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করে। বলে, মজিদকে সে বলে-বলে করেও বলতে পারে নি। আসল কথা তার সাহস হয় নি, পাছে মজিদ মনে ধরে কিছু। কথাটা মজিদের যে পছন্দ হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সে হুঁকায় জোর টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে চোখ গম্ভীর করে তোলে। ব্যাপারির মতো বিস্তর জমিজমার মালিক ও প্রতিপত্তিশালী লোক তাকে ভয় পায়—শুনে পুলকিত হবারই কথা। ব্যাপারি আরো বলে যে, ধলামিঞাকে বিস্তারিত নির্দেশ দিয়েছে—ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মহব্বতনগরের লোক। তাছাড়া, এ-গ্রামের কেউ যেন তাকে আওয়ালপুর যেতে না দেখে, কারণ তাহলে মজিদের নির্দেশের বরখেলাপ করা হয় খোলাখুলিভাবে।

—ধলামিঞারে যতটা বেকুব ভাবছিলাম, ব্যাপারি বলে, ততটা বেকুব হে না। হে ভাবছে ভুয়া পানি আইনা ফায়দা কী। তানার যখন একটা ছেলের শখ হইছেই—

মজিদ বাধা দেয়। ধলামিঞার গুণচর্চায় তার আকর্ষণ নেই। হঠাৎ মধুর হাসি হেসে বলে,

—খালি আমার দুঃখডা এই যে, আপনার বিবি আমারে একবার কইয়াও দেখলেন না। আমার থিকা ঠগ-পীর বেশি হইল? আমার মুখে কি জোর নাই?

—আহা-হা, মনে নিবেন না কিছু। মেয়েমানুষের মন। দূর থিকা যা হোনে তাতেই ঢলে।

—কথাডা ঠিক কইছেন। মজিদ মাথা নেড়ে স্বীকার করে। তারপর বলে, তয় কথা কী, তাগো কথা হুনলে পুরুষমানুষ আর পুরুষ থাকে না, মেয়েমানুষেরও অধম হয়। তাগো কথা হুনলে কি দুনিয়া চলে?

ব্যাপারির মস্ত গোঁফে আর ঘন দাড়িতে পাক ধরেছে। মজিদের কথায় সে গভীরভাবে লজ্জা পায়। তখনকার মতো মজিদের ভঙ্গিতেই বলে,

—ঠিকই কইছেন কথাডা। কিন্তু কী করি এহন। কাইন্দাকাইটা ধরছে বিবি।

—তানারে কন, পেটে যে বেড়ী পরছে হে বেড়ী না খোলন পর্যন্ত পোলাপাইনের আশা নাই। শয়তানের পানিপড়া খাইয়া কি হে-বেড়ী খুলব?

পেটে বেড়ী পড়ার কথা সম্পূর্ণ নোতুন শোনায়। শুনে ব্যাপারির চোখ হঠাৎ কৌতূহলে ভরে ওঠে। সে ভাবে, বেড়ী, কিসের বেড়ী?

মজিদ হাসে! ব্যাপারির অজ্ঞতা দেখেই তার হাসি পায়। তারপর বলে,

—পেটে বেড়ী পড়ে বইলাই তো স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না। কারো পড়ে সাত প্যাঁচ, কারো চোদ্দ। একুশ বেড়িও দেখছি একটা। তয় সাতের উপরে হইলে ছাড়ানো যায় না। আমার বিবির তো চোদ্দ প্যাঁচ!

ব্যাপারি উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আমার বিবিরডা ছাড়ানো যায় না?

—ক্যান যায় না? তয় কথা হইতেছে, আগে দেখন লাগব কয় প্যাঁচ তানার।—কথাটা শুনে ব্যাপারি আবার না ভাবে যে মজিদ তার স্ত্রীর উদরাঞ্চল নগ্নদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে দেখবে—তাই তাড়াতাড়ি বলে, এর একটা উপায় আছে।

উপায়টা কী, বলে মজিদ। একদিন সেহেরি না খেয়ে আমেনা বিবিকে রোজা রাখতে হবে। সেদিন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারবে না এবং শুদ্ধচিত্তে সারাদিন কোরান শরিফ পড়তে হবে। সন্ধ্যার দিকে এফতার না করে মাজার শরিফে আসতে হবে। সেখানে মজিদ বিশেষ ধরনের দোয়া-দরুদ পড়ে একটা পড়াপানি তৈরি করে তাকে পান করতে দেবে।

তারপর আমেনা বিবিকে মাজারের চারপাশে সাতবার ঘুরতে হবে।

যদি সাত প্যাঁচ হয় তবে সাত পাক দেবার পরই হঠাৎ তার পেট ব্যথায় টনটন করে উঠবে। ব্যথাটা এমন হবে যে, মনে হবে প্রসববেদনা উপস্থিত হয়েছে।

ব্যাপারি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—আর সাত পাকে যদি ব্যথা না ওঠে?

—তয় বুঝতে হইবে যে, তানার চোদ্দ প্যাঁচ কি আরো বেশি। সাত প্যাঁচ হইলে দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

তারপর মজিদ আবার গরুছাগলের কথা পাড়ে। এক সময় আড়-চোখে ব্যাপারির পানে তাকিয়ে দেখে, গৃহপালিত জীবজন্তুর ব্যারামের কথায় তেমন মনোযোগ যেন নেই তার। আরো দু-চারটে অসংলগ্ন কথার পর মজিদ উঠে পড়ে।

ফেরবার পথে মোল্লা শেখের বাড়ির কাছে কাঁঠালগাছের তলে একটা মূর্তি নজরে পড়ে। মূর্তি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল না, তাকে আসতে দেখে দাঁড়িয়েছে। মগরেবের কিছু দেরি আছে, কিন্তু শীতসন্ধ্যা ধোঁয়াটে বলে দূর থেকে অস্পষ্ট দেখায় সে-মূর্তি। তবু তাকে চিনতে মজিদের এক পলক দেরি হয় না! সে হাসুনির মা। মুখটা ওপাশে ঘুরিয়ে আলতোভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

নিকটবর্তী হতেই হাসুনির মা কেমন এক কান্নার ভঙ্গিতে মুখ হাতে ঢাকে। আরো কাছে গিয়ে মজিদ থমকে দাঁড়ায়, দাড়িতে হাত সঞ্চালন করে কয়েক মুহূর্ত তাকে চেয়ে দেখে। তারপর বলে,

—কী গো হাসুনির মা?

যে-কান্নার ভঙ্গিতে তখন হাতে মুখ ঢেকেছিল সে এবার মজিদের প্রশ্নে আস্তে নাকীসুরে কেঁদে ওঠে। কান্নাটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; আসল উদ্দেশ্য এই বলা যে, যা ঘটেছে তা হাসবার নয়, কান্নার ব্যাপার।

আকস্মিক উদ্বেগ বোধ করে মজিদ। মেয়েটার চলন-বলন কেমন যেন নম্র। বয়স হলেও আনাড়ি বেঠিকপানা ভাব। হাতে নিলে যেন গলে যাবে। মাসখানেক আগে একদিন শেষরাতে খড়কুটোর উজ্জ্বল আলোয় যার নগ্ন বাহু-পিঠ-কাঁধ দেখেছিল মজিদ, সে যেন ভিন্ন কোনো মানুষ। এখন তাকে দেখে শ্বসন দ্রুততর হয় না।

কণ্ঠে দরদ মাখিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী হইছে তোমার বিটি?

এবার নাক ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে হাসুনির মা অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে,

—মা মরছে!

বজ্রাহত হবার ভান করে মজিদ। আর তার মুখ দিয়ে অভ্যাসবশত সে-কথাটাই নিঃসৃত হয়, যা আজ কত শত বছর যাবৎ কোটি কোটি খোদার বান্দারা অন্যের মৃত্যু সংবাদ শুনে উচ্চারণ করে আসছে। তারপর বলে,

—আহা, ক্যামনে মরল গো বিটি?

—এ্যামনে।

এমনি মারা গেছে কথাটা কেমন যেন শোনায়। পলকের মধ্যে মজিদের স্মরণ হয় তাহেরের বৃদ্ধ ঢেঙা বাপের বিচারের দৃশ্য। তার জন্য অবশ্য অনুতাপ বোধ করে না মজিদ। কেবল মনে হয় কথাটা। থেমে আবার প্রশ্ন করে,

—ছ্যামরারা কই?

—আছে। ধান বিক্রি কইরা ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাঙ তুইলা আছে। ছোটডি কয় কেরায়া নায়ের মাঝি হইব।

—দাফন-কাফনের যোগাড়যন্ত্র করতাছে নি?

—করতাছে। মোল্লা শেখে জানাজা পড়ব।

খিলাল তুলে হঠাৎ দাঁত খোঁচাতে থাকে মজিদ, কপালে ক-টা রেখা ফোটে। তারপর চিন্তিত গলায় বলে,

—মওতের আগে খোদার কাছে মাফ চাইছিল নি তহুর মা?

ধাঁ করে হাসুনির মা মুখ ঘুরিয়ে তাকায় মজিদের পানে। দেখতে না দেখতে চোখে ভয় ঘনিয়ে ওঠে।

—মাফ চাইছিল কিনা কইবার পারি না!

কয়েক মুহূর্ত মজিদ নীরব থাকে। এ-সময়ে কপালে আরো কয়েকটি রেখা ফুটে ওঠে। কিছু না বললেও হাসুনির মা বোঝে, মজিদ তার মায়ের কবরের আজাবের কথা ভাবে। মায়ের মৃত্যুতে সে তেমন কিছু শোক পেয়েছে বলা যায় না। বার্ধক্যের শেষ স্তরে কারো মৃত্যু ঘটলে দুঃখটা তেমন জোরালোভাবে বুকে লাগে না। তবে মায়ের কুঁকড়ানো রগ-ঝোলা যে-মৃতদেহটি এখনো ঘরের কোণে নিস্পন্দভাবে পড়ে আছে সে-দেহটিকে নিয়ে যখন পেছনের জঙ্গলের ধারে কদমগাছের তলে কবর দেয়া হবে, তখন হয়তো দমকা হাওয়ার মতো বুকে সহসা হাহাকার জাগবে। তারপর শীঘ্র আবার মিলিয়ে যাবে সে-হাহাকার। কিন্তু তার মা নিঃসঙ্গ, সে-কবরে লোক-চোখের অন্তরালে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করবে—এ কথা ভাবতেই মেয়ের মন ভয়ে ও বেদনায় নীল হয়ে ওঠে। কলাপাতার মতো কেঁপে উঠে সে প্রশ্ন করে,

—মায়ের কবরে আজাব হইব?

সরাসরি কথাটার উত্তর দিতে মজিদের মুখে বাঁধে। থেমে বলে,

—খোদা তারে বেহেশ্‌তে-নছিব করো, আহা।

একবার আড়চোখে তাকায় হাসুনির মা-র দিকে। চোখে মরণভীতির মতো গাঢ় ছায়া দেখে হয়তো-বা একটু দুঃখও হয়। ভাবে, তার বাপের উপর এত কড়া না হলেও পারত। কিন্তু কী করবে। তার জন্য লোকটি নিজেই দায়ী। আর যাই হোক, মজিদের কথাকে যে অবহেলা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চায় তাকে সে মাফ করতে পারে না।

তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে মজিদ। বাঁ ধারে মাঠ। দিগন্তের কাছে ধূসর ছায়া দেখে মনে ভয় হয়। নামাজ কাজা হবে না তো?

পরের শুক্রবার আমেনা বিবি রোজা রাখে। পীর সাহেবের পানিপড়া পাবে না জেনে প্রথমে নিরাশ হয়েছিল কিন্তু পেটে বেড়ীর কথা শুনে এবং প্যাঁচ যদি সাতটির বেশি না হয় তবে মজিদ তার একটা বিহিত করতে পারবে শুনে শীঘ্র মন থেকে নিরাশা কেটে গিয়ে আশার সঞ্চার হল। আস্তে-আস্তে একটা ভয়ও এল মনে। প্যাঁচ যদি সাতের বেশি হয়, চোদ্দ কিংবা একুশ? মজিদের নিজের বউয়ের তো সাতের বেশি। সে নাকি একুশও দেখেছে।

ব্যাপারটা গোপন রাখবে স্থির করেছিল আমেনা বিবি কিন্তু এ-সব কথা হলে বাতাসে কথা কইতে শুরু করে। তানু বিবিই গল্প ছড়ায় এবং শুক্রবার সকাল থেকে নানা মেয়েলোক আসতে থাকে দেখা করতে। আমেনা বিবি কারো সঙ্গে কথা কয় না। ঘরের কোণে আবছায়ার মধ্যে মাদুরে বসে গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ে। মাথায় ঘোমটা, মুখটা ইতিমধ্যে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে উঠেছে। পাড়াপড়শীরা এসে দেখে-দেখে যায়, তারপর আড়ালে তানু বিবির সঙ্গে নিচু গলায় কথা কয়। তানু বিবি অবিশ্রান্ত পান বানায় আর মেহমানদের খাওয়ায়।

দুপুরের কিছু আগে মজিদের বাড়ি থেকে রহিমা আসে। হাতে ঘষা-মাজা তামার গ্লাসে পানি। এমনি পানি নয়—পড়াপানি। মজিদ বলে পাঠিয়েছে, গোসল করার আগে আমেনা বিবি পেটে পানিটা যেন ঘষে। দোয়া-দরুদ পড়া পানি, তার প্রতিটি ফোঁটা পবিত্র। কাজেই মাখবার সময় পুকুরের পানিতে দাঁড়িয়েই যেন মাখে।

রহিমা সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যায় না। পান-সাদা খায়, তানু বিবির সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কয়। এক সময় তানু বিবি প্রশ্ন করে,

—বইন, আপনেও তো মাজারের পাশে সাত পাক দিছেন, না?

—আমি দেই নাই।

—দেন নাই? বিস্মিত হয়ে তানু বিবি বলে।—তয় তানি ক্যামনে জানলেন আপনার চোদ্দ প্যাচ?

রহিমা লজ্জার হাসি হেসে বলে,

—তানি যে আমার স্বামী। স্বামী হইলে এ্যামনেই বোঝে।

—তয় তানি বোঝেন না ক্যান? তানু বিবির তানি মানে খালেক ব্যাপারি।

রহিমা মুশকিলে পড়ে। দুই তানিতে যে প্রচুর তফাত আছে সে কথা কী করে বোঝায়। তানু বিবি একটু বোকা অথচ আবার দেমাকি কিছিমের মানুষ। স্বামী বিস্তর জমিজমার মালিক বলে ভাবে, তার তুলনায় আর কেউ নেই। শেষে রহিমা আস্তে বলে,

—তানি যে খোদার মানুষ।

আমেনা বিবিকে গোসল করিয়ে বাড়িতে ফেরে রহিমা। মজিদ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে,

—পড়াপানিডা নাপাক জাগায় পড়ে নাই তো?

—না যা পড়ছে তালাবের মধ্যেই পড়ছে।

সূর্য যখন দিগন্ত-সীমারেখার কাছাকাছি পৌঁছেছে তখন জোয়ান-মদ্দ দু-জন বেহারা পালকি এনে লাগাল অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে।

এক ঢিলের পথ, কিন্তু ব্যাপারির বউ হেঁটে যেতে পারে না।

ব্যাপারি হাঁকে,—কই, তৈয়ার হইছেন নি?

আমেনা বিবি আবছায়ার মধ্যে তখনো গুনগুনিয়ে কোরান শরিফ পড়ছে। দুপুরের দিকে চেহারায় তবু কিছু জৌলুস ছিল, এখন বেলাশেষের ম্লান আলোয় একেবারে ফ্যাকাসে ঠেকে। তার চোখের সামনে আঁকাবাঁকা প্যাঁচানো অক্ষরগুলো নাচে, আবছা হয়ে গিয়ে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ছোট হয়ে আবার হঠাৎ বড় হয়ে যায়। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো থেকে থেকে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে।

তানু বিবি গিয়ে ডাকে,

—ওঠ বুবু, সময় হইছে।

ডাক শুনে ফাঁসির আসামির মতো আমেনা বিবি চমকে উঠে ভীতবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার তাকায় সতীনের পানে। তারপর ছুরা শেষ করে কোরান শরিফ বন্ধ করে, গেলাফে ভরে, শেষে পালকস্পর্শের মতো আলগোছে তাতে চুমু খায়। সেটা ও রেহেল নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ তার মাথা ঘুরে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়, আর শরীরটা টাল খেয়ে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম করে। তানু বিবি ধরে ফেলে তাকে। তারপর একটু আদা নুন মুখে দিয়ে ঘরের কোণেই মগরেবের নামাজটা আমেনা বিবি সেরে নেয়।

উঠানের পথটুকু অতিক্রম করতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করে আমেনা বিবি। পুরা ত্রিশ দিন রোজা রেখেও যে বিন্দুমাত্র কাহিল হয় না সে এক দিনের রোজাতেই একেবারে যেন ভেঙে গেছে। গায়ে-মাথায় বুটিদার হলুদ রঙের একটা চাদর দিয়েছে। সেটা বুকের কাছে চেপে ধরে গুটি-গুটি পায়ে হাঁটে। কিসের এত ভয় তাকে পিষে ধরেছে—ক-ঘণ্টায় যে-ভয় দীর্ঘ রোগভোগ-করা মানুষের মতো তাকে দুর্বল করে ফেলেছে? এক যুগেরও ওপরে যে নিঃসন্তান থাকতে পারল সে যদি আজ জানে যে, ভবিষ্যতেও সে তেমনি নিঃসন্তান থাকবে, তবে এমন মুষড়ে যাবার কী আছে? এ-প্রশ্ন আমেনা বিবি তার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা করে।

তবে কথা হচ্ছে কি, তের বছরের কথা একদিনে জানে নি, জেনেছে ধাপে-ধাপে ধীরে-ধীরে, প্রতিবৎসরের শূন্যতা থেকে। সে-শূন্যতাও আবার পরবর্তী বছরের আশায় শীঘ্র ক্ষয়ে তেজশূন্য হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতার কথা তেমনি বছরে-বছরে যদি জানে তবে আঘাতটা দীর্ঘকালব্যাপী সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে তীব্রতায় হ্রাস পাবে, মনে কিছু-বা

লাগলেও গায়ে লাগবে না। কিন্তু এক মুহূর্তে সে-কথা জানলে বুক কি ভেঙে যাবে না, বেঁচে থাকবার তাগিদ কি হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে না?

সে-ভয়েই দু-কদমের পথ ঘাসশূন্য মসৃণ ক্ষুদ্র উঠানটা পেরুতে গিয়ে আমেনা বিবির পা চলে না; সে-ভয়ের জন্যই জোর পায় না কোমরে, চোখে ঝাপসা দেখে। একবার ভাবে, ফিরে যায় ঘরে। কাজ কী জেনে ভবিষ্যতের কথা। যাই হোক, দয়ালুদের মধ্যে দয়ালুতম সে-খোদার ইচ্ছাই তো অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হবে।

কিন্তু গুটি-গুটি করে চললেও পা এগিয়ে চলে। মনের ইচ্ছায় না হলেও চলে লোকেদের খাতিরে। ঢাকঢোল বাজিয়ে যোগাড়যন্ত্র করিয়ে এখন পিছিয়ে যেতে পারে না। পুরুষ হলে হয়তো-বা পারত, মেয়েলোক হয়ে পারে না। সমাজ যাকেই ক্ষমা করুক না কেন, বিরুদ্ধ ইচ্ছা দ্বারা চালিত, দো-মনা, খুশির বশের মানুষের আয়োজন ভঙ্গ করা নারীকে ক্ষমা করে না। এ-সমাজে কোনো মেয়ে আত্মহত্যা করবে বলে একবার ঘোষণা করে সে মনের ভয়ে আবার বিপরীত কথা বলতে পারে না। সমাজই আত্মহত্যার মাল-মসলা যুগিয়ে দেবে, সর্বতোভাবে সাহায্য করবে যাতে তার নিয়ত হাসিল হয়, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে তাকে আবার বাঁচতে দেবে না। মেয়েলোকের মনের মশকরা সহ্য করবে অতটা দুর্বল নয় সমাজ। এখানে তাদের বেহুদাপনার জায়গা নেই।

মজিদ অপেক্ষা করছিল। বেহারারা পালকিটা মাজার ঘরের দরজার কাছে আস্তে নাবিয়ে রাখল।

ব্যাপারি মজিদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আস্তে বলে,—নাবব ?

মজিদ আজ লম্বা কোর্তা পরেছে, মাথায় ছোটখাটো একটা পাগড়িও বেঁধেছে। মুখ গম্ভীর। বলে,

—তানারে নামাইয়া মাজার ঘরের ভিতরে নিয়া যান। থেমে বলে, তানার ওজু আছে নি ?

ব্যাপারি ছুটে যায় পালকির কাছে । পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে নিচু গলায় প্রশ্ন করে,—আছে নি ওজু?

অস্পষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আমেনা বিবি জানায়, আছে।

—তয় নামেন।

মজিদ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ সে চিকন সুরে দোয়া-দরুদ পড়তে শুরু করে, গলায় বিচিত্র সূক্ষ্ম কারুকার্যের খেলা হতে থাকে। কিন্তু তাতে চোখের তীক্ষ্ণতা কাটে না। চোখ হঠাৎ তার তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। পালকির পর্দা ফাঁক করে নাববার জন্য আমেনা বিবি যখন এক পা বাড়ায় তখন সূচের তীক্ষ্ণতায় তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয় সে-পায়ে। সাদা মসৃণ পা, রোদ-পানি বা পথের কাদামাটি যেন কখনো স্পর্শ করে নি। মজিদের গলার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম হয়।

হলুদ রঙের বুটিদার চাদরটা আমেনা বিবি ঘোমটার ওপরে টান করে ধরে রেখেছে। তবু পালকি থেকে নেবে সে যখন মাজার ঘরে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আড়-চোখে তার পানে তাকিয়ে মজিদ কিছুটা বিস্মিত হয়। নোতুন বউয়ের মতো চোখ তার বোজা। তবে লজ্জায় যে নয় তা দ্বিতীয়বার তাকালেই বোঝা যায়। লজ্জায় ম্রিয়মাণ নোতুন বউয়ের আত্মসচেতন রক্তাভা তাতে নেই। সে-মুখ ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, এবং সে-মুখে দুনিয়ার ছায়া নেই।

আমেনা বিবি কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখটা আধা খোলে। ঘরে ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। দুটো মোমবাতি ম্লানভাবে আলো ছড়ায়। সে-আলোর সামনে সে দেখে ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত চিরনীরব মাজারটি। সে-নীরবতা যেন বিস্ময়করভাবে শক্তিমান। আর সে-শক্তি বিদ্যুৎ-চমকের মতো শত-ফলায় বিচ্ছুরিত হয় প্রতি মুহূর্তে। মানুষের রক্তস্রোত যদি থেমেও থাকে তবে তার আঘাতে আশা ও বিশ্বাসের জোয়ার আসে ধমনীতে। তথাপি

মহা-আকাশের মতো সে-মাজার প্রগাঢ়ভাবে নীরব, আর মহা-আকাশের মতোই বিশাল ও অন্তহীন সে-নীরবতা। যে-আমেনা বিবি চোখ আধা খুলে তাকায় সেদিকে, সে আর পলক ফেলে না।

মজিদ আবার আড়চোখে তাকায় তার পানে। কী দেখে আমেনা বিবি? মাজারকে অমন করে কাউকে সে দেখতে দেখে নি। তার ঠোঁট বিড়বিড় করে, গলায় তেমনি সূক্ষ্মসুরের লহরি খেলে। কিন্তু এবার সে থামে, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে গলা কাশে।

—তানারে বইবার কন।

ব্যাপারি বিবিকে বলে,

—বহেন।

মাজারের ধারটিতে আমেনা বিবি আস্তে বসে। তাকায় না কারো পানে। মাজারের নীরবতা যেন তার বুক ভরিয়ে দিয়েছে। সে আবার চোখ বুজে থাকে। মনে হয় তার শান্তি হয়েছে, আর আশা নেই। সন্তানের কামনা এক বৃহৎ সত্যের উপলব্ধির মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে, লোভ বাসনার অবসান হয়েছে। তাই হয়তো মজিদের ভয় হয়। সে আর তাকায় না এদিকে। তবু বিড়বিড় করে। নিজের ক্ষুদ্র কোটরাগত চোখে চমক জাগে থেকে-থেকে।

ঘরের কোণে একটি পাত্রে পানি ছিল। এবার সেটি তুলে নিয়ে মজিদ অন্য ধারে গিয়ে বসে। পানি পড়বে, যে-পড়াপানি খেয়ে আমেনা বিবি পাক দেবে। তার ঠোঁট তেমনি বিড়বিড় করে, হাতে পানির পাত্রটা তুলে নেয়ায় হয়তো-বা তা ঈষৎ দ্রুততর হয়। ঘরের মধ্যে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। এ-নিঃশব্দতার মধ্যে তার গলার অস্পষ্ট মিহি আওয়াজ কোন আদিম সাপের গতির মতো জীবন্ত হয়ে থাকে। তার কণ্ঠে যদি সাপের গতি থাকে তবে তার মনেও এক উদ্যত সাপ ফণা তুলে আছে ছোবল মারবার জন্য। আমেনা বিবির বোজা চোখ মজিদের ভালো লাগে না, কিন্তু পালকি থেকে নাববার সময় তার যে সাদা সুন্দর পা-টা দেখেছিল, সে-পাই তার মনে সাপকে জাগিয়ে তুলেছে। সাপ জেগে উঠেছে ছোবল মারবার জন্য। তার জিহ্বা লিকলিক করে, উদ্যত দীর্ঘ গলা বেয়ে উঠে আসে বিষ। সুন্দর পা—দেখে স্নেহ-মমতা না উঠে এসে, আসে বিষ। স্নেহ-মমতাই যদি গলগলিয়ে, গদগদ হয়ে জেগে উঠত তবে মজিদ রূপালি ঝালরওয়ালা চমৎকার সালুকাপড়টাই ছিঁড়ে এখানকার ঘরবাড়ি ভেঙে অনেক আগে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যেত। এবং যেত সেখানেই যেখানে নির্মল আলো-হাওয়া রোগজীবাণুভরা লালাসিক্ত কেতাবের জালির মধ্যে দিয়ে নিঃসৃত হয়ে আসে না, আসে উন্মুক্ত বিশাল আকাশপথে—যেখানে কাদামাটি লাগে নি এমন পা দেখে অন্তরে বিষাক্ত সাপ জেগে উঠে ফণা ধরে না।

থেকে-থেকে মজিদ পানিতে ফুঁ দেয়। আর আবছা আলোয় তার ক্ষুদ্র চোখ চক্কর খায়। কখনো তার দৃষ্টি খাল্‌েক ব্যাপারির ওপরও নিবদ্ধ হয়। আজ তার পানে তাকিয়ে মজিদের মনে হয়, ব্যাপারির মেদবহুল স্ফীতউদরসম্বলিত দেহটি কেমন যেন অসহায়। একটু তফাতে সে যে মাথা নিচু করে বসে আছে, সে-বসে-থাকার মধ্যে শক্তি নেই। সে কেমন ধসে আছে, বিস্তর জমিজমাও ঠেস দিয়ে ধরে রাখতে পারে নি তার স্থূল দেহটা। চোখ আবার ঘোরে, চক্কর খায়। হলুদ রঙের বুটিদার চাদরে ঢাকা মুখটা এখান থেকে নজরে পড়ে না। তবু থেকে থেকে সেখানেই ঠক্কর খায় মজিদের ঘূর্ণ্যমান দৃষ্টি।

এক সময় মজিদ উঠে দাঁড়ায়। গলা কেশে আস্তে বলে,

—পানিটা দেন।

ব্যাপারিও তার স্থূল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে পানিটা নেয়, তারপর আমেনা বিবির মৃত মানুষের মতো স্তব্ধ মুখের সামনে সেটা ধরে। আমেনা বিবি চোখ খুলে তাকায়, আস্তে, পাপড়ি খোলার মতো। তারপর চাদরের তলে একটা হাত নড়ে। সে হাতটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পাত্রটি যখন নেয় তখন একবার তার চুড়িতে অতি মৃদু ঝঙ্কার ওঠে।

আমেনা বিবি পাত্রটি কয়েক মুহূর্ত মুখের সামনে ধরে থাকে, তারপর তুলে ঠোঁটের কাছে

ধরে। একটু পরে প্রগাঢ় নীরবতায় মজিদের সজাগ কানে সাবধানী বেড়ালের দুধ খাওয়ার মতো চুকচুক আওয়াজ এসে বাজে। পান করার অধীরতা নেই। খোদার নামছোঁয়া পানি, তালাবের সাধারণ পানি নয়। তাছাড়া তৃষ্ণার পানিও নয় যে, শুষ্ক গলা নিমেষে শুষে নেবে সবটা। ধীরে ধীরে পান করে সে, বুকটা শীতল হয়। তারপর মুখ না ফিরিয়ে আস্তে শূন্য পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে। পায়ের মতো সুন্দর হাত। মোমবাতির ম্লান আলোয় মনে হয় সে হাত শুধু সাদা নয়, অদ্ভুতভাবে কোমল।

হাতটি যখন আবার চাদরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন মজিদ বলে,—তানারে উঠবার কন। এহন পাক দেওন লাগব।

আমেনা বিবি উঠে দাঁড়ায়! দাঁড়িয়েই মনে হয় বসে পড়বে, কিন্তু সামান্য দুলেই স্থির হয়ে যায়।

—আমি দোয়া-দরুদ পড়তাছি। তানারে পাক দিবার কন। ডাইন দিক থিকা পাক দিবেন, আগে ডাইন পা বাড়াইবেন। বাড়ানের আগে বিসমিল্লাহ্ কইবেন।

মজিদ কোণে বসে। একবার সামনে দিয়ে যখন আমেনা বিবি ঘুরে যায় তখন তার চোখ চকচক করে ওঠে আবছা অন্ধকারে। কালোরঙের পাড়ের তলে থেকে আমেনা বিবির পা নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে : একবার ডান পা, আরেকবার বাঁ। শব্দ হয় না। কাছাকাছি যখন আসে তখন মজিদের ভেতরে সাপের গলাটা সামান্য চমকে পেছনে যায়, যেন ছোবল দেবে। মজিদ একবার ঢোক গেলে, তারপর কণ্ঠের সুর আরো মিহি করে তোলে।

এক পাক, দুই পাক। আমেনা বিবি স্বপ্নের ঘোরে যেন হাঁটে। যে-স্তব্ধতায় তার মুখ জমে আছে, সে-স্তব্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রাণ নেই। ও মুখ কখনো যেন কথা কয় নি, হাসে নি, কাঁদেনি। মনেও তার কিছু নেই। অতীতের স্মৃতির মতো মনে পড়ে কী একটা বাসনার কথা—বছরে বছরে যে-বাসনা অপূর্ণ থেকে আরো তীব্রতর হয়েছে। কী একটা অভাবের কথা, কী একটা শূন্যতার কথা। কিন্তু সে-সব অতীতের স্মৃতির মতো অস্পষ্ট। একটা মহাশক্তির সন্নিকটে এসে মানুষ আমেনা বিবির আর সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগ নেই। একটা প্রখর-অত্যুজ্জ্বল আলো তার ভেতরটা কানা করে দিয়েছে। সেখানে তার নিজের কথা আর চোখে পড়ে না।

এক পাক, দুই পাক। তারপর তিন পাকের অর্ধেক। ক-পা এগুলেই মজিদকে পেরিয়ে যাবে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ বৈশাখী মেঘের আকস্মিক আবির্ভাবের মতো কী একটা বৃহৎ ছায়া এসে আমেনা বিবিকে অন্ধকার করে দিল। অর্থ না বুঝে মুখ ফিরিয়ে স্বামীর পানে তাকাবার চেষ্টা করল, হয়তো-বা তাকে আলিঝালি দেখল। কিন্তু তারপর আর কিছু দেখল না, জানল না ক-প্যাঁচ পড়েছে তার পেটে, জানল না মাজারের মধ্যে শায়িত শক্তিশালী লোকটির কী বলবার আছে, ক-পাক দিলে তাঁর অন্তরে দয়া উথলে উঠত।

ব্যাপারি বিদ্যুৎগতিতে উঠে পড়ে অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ করে বলে,—কী হইল?

চোখের সামনে আমেনা বিবি মূর্ছা গেছে। বুটিদার চাদরটা আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেনি বলে তার মুখটা খোলা। সে-মুখে দাঁত লেগে আছে।

বাইরে মাজারে রহিমা আসে না। আজ আমেনা বিবি এসেছে বলে হয়তো আসত যদি না সঙ্গে থাকত ব্যাপারি। মাজারঘরের বেড়ার ফুটোতে চোখ পেতে সে ব্যাপারটা দেখছিল। সঙ্গে হাসুনির মা-ও ছিল। রহিমা মনে-মনে স্থির করেছিল, পাক দেয়া চুকে গেলে আমেনা বিবিকে ভেতরে নিয়ে যাবে, শখ করে যে ফির্‌নিটা করেছে তা দেবে খেতে, তারপর দুয়েক খিলি পান চিবোতে চিবোতে দু-দণ্ড সুখ-দুঃখের গল্প করবে। নিজে সে স্বল্পভাষী মানুষ, কিন্তু আমেনা বিবির হৃদয়ের সঙ্গে তার হৃদয়ের কোথায় যেন সমতা, যাই কথা হোক না কেন দেখতে দেখতে আলাপ জমে ওঠে। কিন্তু ফুটো দিয়ে রহিমা যে-দৃশ্য দেখল তারপর গল্পগুজবের আশা তাকে ত্যাগ করতে হল। ব্যাপারির লজ্জা কাটিয়ে বাইরে এসে সে আর হাসুনির মা অতিথিকে

ভেতরে নিয়ে গেল। নিয়ে গেল পাঁজাকোলা করে, মুখে কথা ফোটাবার উদ্দেশ্যে। শখ করে তৈরি করা ফিরনির কথা বা পান খেয়ে দু-দণ্ড গল্প করার কথা ভুলে গেল।

মজিদ আর ব্যাপারি মাজার ঘরেই চুপ হয়ে বসে রইল, দু-জনের মুখে চিন্তার রেখা। তারপর মজিদ আস্তে উঠে অন্দর ঘরের বেড়ার পাশে বৈঠকখানায় গিয়ে হুঁকা ধরিয়ে আবার ফিরে এসে ব্যাপারিকে ডেকে নিয়ে গেল। দু-জনেই এক এক করে হুঁকা টানে, কথা নেই কারো মুখে।

মজিদ ভাবে এক কথা। যে-আমেনা বিবির পীরের পানিপড়া খাবার শখ হয়েছিল সে-আমেনা বিবির ওপর—আকার-ইঙ্গিত বা মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও—মজিদের মনে একটা নিষ্ঠুর রাগ দেখা দিয়েছিল। তার একটা নিষ্ঠুর শাস্তিও সে স্থির করেছিল। আজ সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট আলোয় আমেনা বিবির সাদা কোমল পা দেখে শাস্তি বিধানের সে-প্রবল ইচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত না হয়ে বরঞ্চ আরো নিষ্ঠুরতমভাবে শাণিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে আমেনা বিবির মূর্ছা যাওয়া সমস্ত কিছু যেন গোলমাল করে দিল। মুঠোর মধ্যে এসেও সে যেন ফস্কে গেল, যে-মজিদের ক্ষমতাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে তার প্রতি আজও অবজ্ঞা দেখাল, তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে সুযোগ দিয়েও দিল না। দিয়েও দিল না বলে মেয়েলোকটি যেন চরম বাহাদুরি দেখাল, সমস্ত আস্ফালনের মুখে চুন দিল।

হুঁকাটা রেখে হঠাৎ এবার ব্যাপারি কথা বলে। বলে,

—দিনভর রোজা রাখনে বড় দুর্বল হইছিল তানি।

মজিদ কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে,—রোজা রাখনে দুর্বল হইছিল কথাডা ঠিক, কিন্তু আমি যে পানিপড়াডা দিলাম—তা কিসের জন্য? শরীলে তা'কত হইবার জন্য না? এমন তাছির হেই পানিপড়ার যে পেটে গেলে এক মাসের ভুখা মানুষও লগে লগে চাঙ্গা হইয়া ওঠে। শরীলের দুর্বলতার জন্য তিনি অজ্ঞান হন নাই।

মজিদ থামে। কী একটা কথা বলেও বলে না। ব্যাপারি মুখ ফিরিয়ে তাকায় মজিদের পানে, কতক্ষণ তার চিন্তিত-ব্যথিত চোখ চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর প্রশ্ন করে,

—তয় ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন?

—আপনে তানার স্বামী—ক্যামনে কই মুখের উপরে?

হঠাৎ ব্যাপারির চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে এবং তা একবার কানিয়ে চেয়ে লক্ষ করে দেখে মজিদ। ব্যাপারির চোখে সন্দেহের জোয়ার আসুক, আসুক ক্রোধের অনলকণা। মজিদ আস্তে হুঁকাটা তুলে নেয়। তাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। বাইরে কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় জ্যোৎস্না উঠেছে। তার আলোয় ঘরের কুপিটার শিখা মনে হয় একবিন্দু রক্ত—টাট্‌কা, লাল টকটকে। খোলা দরজা দিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নার পানেই চেয়ে থাকে মজিদ, দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার বোঝা। তাতে বিদ্বেষ নেই, পতিতের প্রতি ক্রোধ-ঘৃণা নেই, আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা, হতপ্রশ্নের নিশ্চুপতা।

আচমকা ব্যাপারি মজিদের একটি হাত ধরে বসে। তার বয়স্ক গলায় শিশুর আকুলতা জাগে। বলে,

—কন, ক্যান তানি অজ্ঞান হইছেন? ভিতরে কি কোনো কথা আছে?

একবার বলে-বলে ভাব করে মজিদ, তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসে রসনা সংযত করে। মাথা নেড়ে বলে,

—না। কওন যায় না। থেমে আবার বলে, তয় একটা কথা আমার কওন দরকার। তানারে তালাক দেন।

আমেনা বিবিকে সে তালাক দেবে? তের বছর বয়সে ফুটফুটে যে-মেয়েটি এসে তার সংসারে ঢোকে এবং যে এত বছর যাবৎ তার ঘরকন্না করছে, তাকে তালাক দেবে সে? সত্যি কথা, বড় বিবির প্রতি তার তেমন মায়া-মহব্বত নাই। কিছু থাকলেও তানু বিবির

আসার পর থেকে তা ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু তবু বহুদিনের বসবাসের পর একটা সম্বন্ধ আড়ালে-আবডালে গজিয়ে না উঠেছে এমন নয়। তাই হঠাৎ তালাক দেবার কথা শুনে ব্যাপারি হকচকিয়ে ওঠে। তারপর কতক্ষণ সে বজ্রাহতের মতো বসে থাকে।

মজিদ কিছুই বলে না। বাইরের ম্লান জ্যোৎস্নার পানে বেদনাভারি চোখে চেয়ে তেমনি স্থিরভাবে বসে থাকে। আর অপেক্ষা করে। অনেকক্ষণ সময় কাটলেও ব্যাপারি যখন কিছু বলে না তখন সে আলগোছে বলে,

—কথাডা কইতাম, কিন্তু এক কারণে এখন না কওনই স্থির করছি। তহুর বাপের কথা মনে আছে নি ?

ব্যাপারি ভারি গলায় আস্তে বলে,

—আছে।

—হে তহুর বাপের কথা মাইনষেরা ভুইলা গেছে। এমন কি তার রক্তের পোলা-মাইয়ারাও ভুইলা গেছে। কিন্তু আমি ভুলবার পারি নাই। ক্যান জানেন?

যন্ত্রচালিতের মতো ব্যাপারি প্রশ্ন করে,

—ক্যান ?

—কারণ হেই ব্যাপার থিকা একটা সোনার মতো মূল্যবান কথা শিখছি আমি। কথাডা হইল এই : পাক-দিল আর গুনাগার-দিল যদি এক সুতায় বাঁধা থাকে আর কেউ যদি গুনাগার-দিলের শাস্তি দিবার চায় তখন পাক-দিলই শাস্তি পায়। তহুর বাপের দিল সাফ আছিল, তাই শাস্তি পাইল হেই। এদিকে তারে কষ্ট দিয়া আমি গুনাগার হইলাম।

বর্তমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হলেও ব্যাপারি কথাটা বোঝে। তার ও আমেনা বিবির দিল এক সুতায় বাঁধা। আমেনা বিবিকে শাস্তি দিতে হলে আগে সে-বন্ধন ছিন্ন করা চাই। অতএব তাকে তালাক দেয়া প্রয়োজন। মজিদ একবার ভুল করে একজন নিষ্পাপ লোককে এমন নিদারুণ কষ্ট দিয়েছে যে, সে-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্য অবশেষে তাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। তাকে কষ্ট দিয়ে মজিদ নিজেও গুনাগার হয়েছে, পাপীও ভালো মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মার মতো ভর করে শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে। এমন ভুল মজিদ আর কখনো করবে না।

মজিদের হাত তখনো ব্যাপারি ছাড়ে নি। সে-হাতে একটা টান দিয়ে ব্যাপারি অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—আপনে কি কিছু সন্দেহ করেন?

—সন্দেহের কোনো কথা নাই। পানিপড়াডা খাইয়া তানি যখন সাত পাক দিবার পারলেন না, মূর্ছা গেলেন, তখন তাতে সন্দেহের আর কোনো কথা নাই। খোদার কালামের সাহায্যে যে-কথা জানা যায় তা সূর্যের রোশনাইর মতো সাফ। আর বেশি আমি কিছু কমু না। তানারে তালাক দেন।

এই সময়ে হাসুনির মা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোমটা টেনে তেরছাভাবে দাঁড়াল। ব্যাপারি প্রশ্ন করে,

—কী গো বিটি ?

—তানার হুঁশ হইছে। বাড়িত যাইবার চাইতাছেন।

মজিদের হাত ছেড়ে ব্যাপারি উঠে দাঁড়াল। মুখ কঠিন। বেহারাদের ডেকে পাল্কিটা অন্দরে পাঠিয়ে দিল।

আমেনা বিবিকে নিয়ে সে-পাল্কি যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রহস্যময় চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে চলে কিছুক্ষণ পরে গাছগাছলার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মজিদ বৈঠকখানা ঘরের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্কভাবে খিলাল দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে; দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা অনিশ্চয়তার ভাব। কোনো কথা না কয়ে হঠাৎ ব্যাপারি চলে গেল। তার মনের কথা জানা গেল না।

হঠাৎ এক সময়ে একটা কথা স্মরণ হয় মজিদের। কথা কিছু না, একটা দৃশ্য—আবছা আলোয় দেখা কালো পাড়ের নিচে একটি সাদা কোমল পা। সে-পা দ্বিতীয়বার দেখল না বলে হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন আফসোস বোধ করে মজিদ। তারপর মনে-মনেই সে হাসে। দুনিয়াটা বড় বিচিত্র। যেখানে সাপ জাগে সেখানে আবার কোমলতার ফুল ফোটে। কিন্তু সে-ফুল শয়তানের চক্রান্ত। মজিদ শক্ত লোক। সাত জন্মের চেষ্টায়ও শয়তান তাকে কোনো দুর্বল মুহূর্তে আচম্বিতে আক্রমণ করতে পারবে না। সে সদা হুঁশিয়ার।

কণ্ঠে দোয়া-দরুদের মিহি সুর তুলে মজিদ ভেতরে যায়।

এতবড় সমস্যা ব্যাপারির জীবনে কখনো দেখা দেয় নি। নিজের চোখে কোনো গুরুতর অন্যায় দেখে যদি শরীরে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠত তাহলে ব্যাপারটা সমস্যাই হত না। আসল কথা জানে না, আবার একটা কিছু গোলযোগ যে আছে এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মানুষ মজিদের কথা না হয় অবিশ্বাস করা যেত, কিন্তু যে-কথা জেনেছে মজিদ তা তার নিজের বুদ্ধির জোরে জানে নি। খোদার কালামের সাহায্যেই সে-কথা জেনেছে এবং মানুষ মজিদ তার অন্তরের বিবেচনার জন্যই তা খুলে বলতে পারে নি। হাজার হলেও তারা বন্ধু মানুষ। ব্যাপারি কষ্ট পাবে এমন কথা কী করে বলে।

বৈঠকখানা হুঁকার নীলাভ ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে ওঠে। ব্যাপারির চোখে ধোঁয়া ভাসে, মগজেও কিছু গলিয়ে ঢুকে তার অন্তরদৃষ্টি আবছা করে দেয়। ব্যাপারি ভাবে আর ভাবে। মানুষের সঙ্গে হুঁ-হাঁ করে কথা কয়, দশ প্রশ্নে এক জবাব দেয়। একটা কথাই মনে ঘোরে। এক সময়ে সেটা সোজা মনে হয়, এক সময়ে কঠিন। একবার মনে হয় ব্যাপারটা হেস্ত-নেস্ত হয় একটি মাত্র শব্দের তিনবার উচ্চারণেই; আরেকবার মনে হয়, সে-শব্দটা উচ্চারণ করাই ভয়ানক দুরূহ ব্যাপার। জিহ্বা খসে আসবে তবু সেটা বেরিয়ে আসবে না মুখ থেকে।

তের বছর বয়স থেকে যে তার ঘরে বসবাস করছে, তার জীবনের অলিগলির সন্ধান করে। যদি কিছু নজরে পড়ে যায় হঠাৎ। দীর্ঘ বসবাসের সরল ও জানা পথ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড় খোঁজে, ডালপালা সরিয়ে অন্ধকার স্থানে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই নজরে পড়ে না। আমেনা বিবি রূপবতী, কিন্তু কোনোদিন তার রূপের ঠাট ছিল না, সৌন্দর্যের চেতনা ছিল না; চলনে-বলনে বেহায়াপনাও ছিল না। ঠাণ্ডা, শীতল, ধর্মভীরু ও স্বামীভীরু মানুষ। সে এমন কী অন্যায় করতে পারে?

প্রশ্নটা মনে জাগতেই মজিদের একটা কথা হুঙ্কার দিয়ে যেন তাকে সাবধান করে দেয়। কথাটা মজিদ প্রায়ই বলে। বলে, মানুষের চেহারা বা স্বভাব দেখে কিছু বিচার করা যায় না। তাকে দিয়ে কিছু বিশ্বাসও নেই। এমন কাজ নেই দুনিয়াতে যা সে না করতে পারে এবং করলে সব সময়ে যে সমাজের কাছে ধরা পড়বে এমন নয়। কিন্তু খোদার কাছে কোনো ফাঁকি নেই। তিনি সব দেখেন, সব জানেন। কথাটা ভাবতেই ব্যাপারির কান দুটোতে রং ধরে। পশুপক্ষীকেও না জানতে দিয়ে কোনো গর্হিত কাজ ব্যাপারি কি কখনো করে নি? ব্যাপারির মতো লোকও করেছে, যদিও আজ বললে হয়তো অনেকে তা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু সে-কথা খোদাতা'লা ঠিক জানেন। তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না।

না, মজিদের কথায় ভুল নাই। সহসা খালেক ব্যাপারি মনস্থির করে ফেলে।

এবং এর তিন দিন পর যে-আমেনা বিবি হঠাৎ সন্তান-কামনায় অধীর হয়ে উঠেছিল সে-ই সমস্ত কামনা-বাসনা বিবর্জিত একটা স্তব্ধ, বজ্রাহত মন নিয়ে সেদিনের পালকিতে চড়ে বাপের বাড়ি রওনা হয়। বহুদিন বাপের বাড়ি যায় নি। তবু সেখানে যাচ্ছে বলে মনে কিছু আনন্দ নেই। পালকির ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় চোখ মেলে নাক বরাবর তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তাতে অশ্রুও দেখা দেয় না।

তবে পথে একটা জিনিস দেখলে হয়তো হঠাৎ তার বুক ভাসিয়ে কান্না আসত। সেটা হল থোতামুখো তালগাছটা। বহুদিনের গাছ, ঝড়ে-পানিতে আরো লোহা হয়ে উঠেছে যেন। প্রথম যৌবনে নাইয়র থেকে ফিরবার সময় পালকির ফাঁক দিয়ে এ-গাছটা দেখেই সে বুঝত যে, স্বামীর বাড়ি পৌঁছেছে। ওটা ছিল নিশানা, আনন্দের আর সুখের।

সেদিন রাতে কে যেন একটা মস্ত মোমবাতি এনে জ্বালিয়ে দিয়েছে মাজারের পাদদেশে, ঘরটা রোশনাই হয়ে উঠেছে। সে-আলোয় রূপালি ঝালরটা আজ অত্যধিক উজ্জ্বল দেখায়। মজিদ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে সেদিকে। কিন্তু হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা জিনিস। ঝালরের একদিকে ঔজ্জ্বল্য যেন কম; উজ্জ্বলতার দীর্ঘপাতের মধ্যে ওইখানে কেমন একটু অন্ধকার! কাছে গিয়ে হাতে তুলে দেখে, ঝালরটার রূপালি ঔজ্জ্বল্য সেখানে বিবর্ণ হয়ে গেছে, সুতোগুলো খসেও এসেছে। দেখে মুহূর্তে মজিদের মন অন্ধকার হয়ে আসে। তার ভ্রূ কুঁচকে যায়, ঝালরের বিবর্ণ অংশটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার জীবনে শৌখিনতা কিছু যদি থাকে তবে তা এই কয়েক গজ রূপালি চাকচিক্য। এর ঔজ্জ্বল্যই তার মনকে উজ্জ্বল করে রাখে; এর বিবর্ণতা তার মনকে অন্ধকার করে দেয়।

অবশ্য দু-বছর তিন বছর অন্তর মাজারের গাত্রাবরণ বদলানো হয়, এবং বদলাবার খরচ বহন করে খালেক ব্যাপারিই। খরচ করে তার আফসোস হয় না। বরঞ্চ সুযোগটা পেয়ে নিজেকে শতবার ধন্য মনে করে। এদিকে মজিদও লাভবান হয়, কারণ পুরোনো গাত্রাবরণটি কেনবার জন্য এ-গ্রামে সে-গ্রামে অনেক প্রার্থী গজিয়ে ওঠে এবং প্রার্থীদের মধ্যে উপযুক্ততা বিচার করে দেখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সে বেশ চড়া দামে বিক্রি করে সেটা। কাজেই ঝালরটার কোনোখানে যদি রং চটে যায়, বা সালুকাপড়ের কোনো স্থানে ফাট ধরে তবে মজিদের চিন্তা করার কারণ নেই। কিন্তু তবু জিনিসটার প্রতি কী যে মায়া—তার সামান্য ক্ষতি নজরে পড়লেও বুকটা কেমন কেমন করে ওঠে।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মজিদের সামনেই রহিমা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমেনা বিবির জন্য সারাদিন আজ মনটা ভারি হয়ে আছে। একটা প্রশ্ন কেবল ঘুরে-ফিরে মনে আসে। কেউ যদি হঠাৎ কিছু অন্যায় করে ফেলেও, তার কি ক্ষমা নাই? কী অন্যায়ের জন্য আমেনা বিবির এত বড় শাস্তিটা হল তা অবশ্য জানে না, তবু সে ভাবতে পারে না আমেনা বিবি কিছু গর্হিত কাজ করতে পারে। আবার, করে নি এ-কথাও বা ভাবে কী করে? কারণ খোদাই তো জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে সে-অন্যায়ের কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রহিমা বিড়বিড় করে বলে,—তুমি এত দয়ালু খোদা, তবু তুমি কী কঠিন।

সে বিড়বিড় করে আর আওয়াজটা এমন শোনায় যেন মাজারের সালুকাপড়টা ছেঁড়ে ফড়ফড় করে। মুহূর্তের জন্য চমকে ওঠে মজিদ। মন তার ভারি। রূপালি ঝালরের বিবর্ণ অংশটা কালো করে রেখেছে সে-মন।

হাওয়ায় ক-দিন ধরে একটা কথা ভাসে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস নাকি গ্রামে একটি ইস্কুল বসাবে। আক্কাস বিদেশে ছিল বহুদিন। তার আগে করিমগঞ্জের ইস্কুলে নিজে নাকি পড়াশোনা করেছে কিছু। তারপর কোথায় পাটের আড়তে না তামাকের আড়তে চাকরি করে কিছু পয়সা জমিয়ে দেশে ফিরেছে কেমন একটা লাট-বেলাটের ভাব নিয়ে। মোদাব্বের মিঞা ছেলের প্রত্যাবর্তনে খুশিই হয়েছিল। ভেবেছিল, এবার ছেলের একটা ভালো দেখে বিয়ে দিলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত মনে তসবি টিপতে পারবে। বিয়ে দেবার তাগিদটা এইজন্য আরো বেশি বোধ করল যে, ছেলেটির রকম-সকম মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিল না। ছোটবেলা থেকে আক্কাস কিছুটা উচক্কা ধরনের ছেলে। কিন্তু আজকাল মুরুব্বিদের বুদ্ধি সম্পর্কে পর্যন্ত ঘোরতর

সন্দেহ নাকি প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তবে তাকে পাঁচ ওক্ত নামাজ পড়তে দেখে মুরুব্বিরা একেবারে নিরাশ হবার কোনো কারণ দেখল না। ভাবল, বিদেশী হাওয়ায় মাথাটায় একটু গরম ধরেছে। তা দু-দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হবার লক্ষণ না দেখিয়ে আক্কাস অন্যের মাথা গরম করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেল। বলে, ইস্কুল দেবে। কোত্থেকে শিখে এসেছে ইস্কুলে না পড়লে নাকি মুসলমানদের পরিত্রাণ নেই। হ্যাঁ, মুরুব্বিরা স্বীকার করে, শিক্ষা ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু গ্রামে কি দু-দুটো মক্তব বসানো হয় নি? সে কি বলতে পারবে এ-কথা যে, গ্রামবাসীদের শিক্ষার কোনোখান দিয়ে কিছুমাত্র অবহেলা হচ্ছে?

আক্কাস যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। সে ঘুরতে লাগল চরকির মতো। ইস্কুলের জন্য দস্তুরমতো চাঁদা তোলার চেষ্টা চলতে লাগল, এবং করিমগঞ্জে গিয়ে কাউকে দিয়ে একটা জোরালো গোছের আবেদনপত্র লিখিয়ে এনে সেটা সিধা সে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিল। কথা এই যে, ইস্কুলের জন্য সরকারের সাহায্য চাই।

বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে। কাজেই একদিন মজিদ ব্যাপারির বাড়িতে গিয়ে উঠল। কোনোপ্রকার ভণিতার প্রয়োজন নেই বলে সরাসরি প্রশ্ন করল,

—কী হুনি ব্যাপারি মিঞা?

ব্যাপারি বলে, কথাডা ঠিকই।

অতএব সন্ধ্যার পর বৈঠক ডাকা হল। আক্কাস এল, আক্কাসের বাপ মোদাব্বের এল।

আসল কথা শুরু করার আগে মজিদ আক্কাসকে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখল। দৃষ্টিটা নিরীহ আর তাতে আপন ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে থাকার অস্পষ্টতা।

সভা নীরব দেখে আক্কাস কী একটা কথা বলবার জন্য মুখ খুলেছে—এমন সময় মজিদ যেন হঠাৎ চেতনায় ফিরে এল। তারপর মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল তার মুখ, খাড়া হয়ে উঠল কপালের রগ। ঠাস করে চড় মারার ভঙ্গিতে সে প্রশ্ন করলে,

—তোমার দাড়ি কই মিঞা?

আক্কাস সর্বপ্রকার প্রশ্নের জন্য তৈরি হয়ে এসেছিল, কিন্তু এমন একটা অপ্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ইস্কুল হবে কি হবে না—সে-আলোচনাই তো হবার কথা। তার সঙ্গে দাড়ির কী সম্বন্ধ?

সভায় উপস্থিত সকলের দিকে তাকাল আক্কাস। দাড়ি নেই এমন একটি লোক নেই। কারো ছাঁটা, কারো স্বভাবত হাল্কা ও ক্ষীণ; কারো-বা প্রচুর বৃষ্টিপানিসিঞ্চিত জঙ্গলের মতো একরাশ দাড়ি। মজিদ আসার আগে গ্রামের পথে-ঘাটে দাড়িবিহীন মানুষ নাকি দেখা যেত। কিন্তু সেদিন গেছে।

পূর্বোক্ত সুরে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—তুমি না মুসলমানের ছেলে—দাড়ি কই তোমার?

একবার আক্কাস ভাবে যে বলে, দাড়ির কথা তো বলতে আসে নি এখানে। কিন্তু মুরুব্বির সামনে আর যাই হোক, বেয়াদবিটা চলে না। কাজেই মাথা নত করে চুপ করে থাকে সে।

দেখে মোদাব্বের মিঞা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গা ঢিলা করে। এতক্ষণ সে নিশ্বাস রুদ্ধ করে ছিল এই ভয়ে যে, উত্তরে বেয়াড়া ছেলেটা কী না জানি বলে বসে। মোদাব্বের মিঞা বলে,

—আমি কত কই দাড়ি রাখ ছ্যামড়া দাড়ি রাখ—তা হের কানে দিয়াই যায় না কথা।

খালেক ব্যাপারি বলে,

—হে নাকি ইংরাজি পড়ছে। তা পড়লে মাথা কি আর ঠাণ্ডা থাকে?

ইংরাজি শব্দটার সূত্র ধরে এবার মজিদ আসল কথা পাড়ে। বলে যে, সে শুনেছে আক্কাস নাকি একটা ইস্কুল বসাবার চেষ্টা করছে। সে-কথা কি সত্যি?

আক্কাস অম্লান বদনে উত্তর দেয়,

—আপনি যা হুনছেন তা সত্য।

মজিদ দাড়িতে হাত বুলাতে শুরু করে। তারপর সভার দিকে দৃষ্টি রেখে বলে,

—তা এই বদ মতলব কেন হইল?

—বদ মতলব আর কী? দিনকাল আপনারা দেখবেন না? আইজকাইল ইংরাজি না পড়লে চলব ক্যামনে?

শুনে মজিদ হঠাৎ হাসে। হেসে এধার-ওধার তাকায়। দেখে আক্কাস ছাড়া সভার সকলে হেসে ওঠে। এমন বেকুবির কথা কেউ কি কখনো শুনেছে? শোনো শোনো, ছেলের কথা শোনো একবার—এইরকম একটা ভাব নিয়ে ওরা হো-হো করে হাসে।

হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইল তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতিগতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে—।

সকলে একবাক্যে সে-কথা স্বীকার করে। মানুষের আজ যথেষ্ট চেতনা হয়েছে বৈকি। সাধারণ চাষাভুষা পর্যন্ত আজ কলমা জানে। তাছাড়া লোকেরা নামাজ পড়ে পাঁচ ওক্ত, রোজার দিনে রোজা রাখে। আগে শিলাবৃষ্টির ভয়ে শিরালিকে ডাকত আর শিরালি যপতপ পড়ে নগ্ন হয়ে নাচত; কিন্তু আজ তারা একত্র হয়ে খোদার কাছে দোয়া করে,—মাজারে শিরনি দেয়, মজিদকে দিয়ে খতম পড়ায়। আগে ধান ভানতে-ভানতে মেয়েরা সুর করে গান গাইত, বিয়ের আসরে সমস্বরে গীত ধরত—আজকাল তাদের মধ্যে নারীসুলভ লজ্জাশরম দেখা দিয়েছে। আগে ঘরে ঢোকা নিত্যকার ব্যাপার ছিল, কিন্তু মজিদের এক শ দররার ভয়ে তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে মজিদ হাঁক ছাড়ে,—ভাই সকল। পোলা মাইন্‌ষের মাথায় একটা বদ খেয়াল ঢুকছে—তা নিয়া আর কী কমু। দোয়া করি তার হেদায়ত হোক। কিন্তু একটা বড় জরুরি ব্যাপারে আপনাদের আমি আইজ ডাকছি। খোদার ফজলে বড় সমৃদ্ধিশালী গেরাম আমাগো। বড় আফসোসের কথা, এমন গেরামে একটা পাকা মসজিদ নাই। খোদার মর্জি এইবার আমাগো ভালো ধান-চাইল হইছে, সকলের হাতেই দুইচারটা পয়সা হইছে। এমন শুভ কাম আর ফেলাইয়া রাখা ঠিক না।

সভার সকলে প্রথমে বিস্মিত হয়। আক্কাসের বিচার হবে, তার একটা শাস্তিবিধান হবে—এই আশা নিয়েই তো তারা এসেছে। কিন্তু তবু তারা মজিদের নোতুন কথায় মুহূর্তে চমৎকৃত হয়ে গেল। ব্যাপারির নেতৃত্বে কয়েকজন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বলে,

—বাহবা, বড় ঠিক কথা কইছেন !

মজিদ খুশিতে গদগদ। দাড়িতে হাত বুলায় পরম পুলকে। আর বলে, আমার খেয়াল, দশ গেরামের মধ্যে নাম হয় এমন একটা মসজিদ করা চাই। আর সে-মসজিদে নামাজ পইড়া মুসল্লিদের বুক যানি শীতল হয়।

শুনে সভার সকলে চেঁচিয়ে ওঠে, বড় ঠিক কথা কইছেন—আমাগো মনের কথাডাই কইছেন।

এক সময়ে আক্কাস ক্ষীণ গলায় বলে,

—তয় ইস্কুলের কথাডা?

শুনে সকলে এমন চমকে উঠে তার দিকে তাকায় যে, এ-কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, সভায় তার উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। তার বাপ তো রেগে ওঠে। রাগলে লোকটি কেমন তোতলায়। ধমকে তো তো করে বলে,

—চুপ কর ছ্যামড়া, বেত্তমিজের মতো কথা কইস না। মনে মনে সে খুশি হয় এই ভেবে যে, মসজিদের প্রস্তাবের তলে তার অপরাধের কথাটা যাহোক ঢাকা পড়ে গেছে।

মসজিদের আকৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হচ্ছে এমন সময়ে আক্কাস আস্তে উঠে ঘর

থেকে বেরিয়ে যায়। কেউ দেখে কেউ দেখে না, কিন্তু তার চলে যাওয়াটা কারো মনে প্রশ্ন জাগায় না। যে-গুরুতর বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তাতে আক্কাসের মতো খামখেয়ালি বুদ্ধিহীন যুবকের উপস্থিতি একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়।

মসজিদের কথা চলতে থাকে। এক সময়ে খরচের কথা ওঠে। মজিদ প্রস্তাব করে, গ্রামবাসী সকলেরই মসজিদটিতে কিছু যেন দান থাকে, প্রতিটি ইট বড়গা হুড়কায় কারো না কারো যেন যৎকিঞ্চিৎ হাত থাকে। সেটা অবশ্য বাস্তবে সম্ভব নয়। কারণ একটা কানাকড়িও নেই এমন গ্রামবাসীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য না করলেও গতর খাটিয়ে সাহায্য করতে পারে। তারা এই ভেবে তৃপ্তি পাবে যে, পয়সা দিয়ে না হলেও শ্রম দিয়ে খোদার ঘরটা নির্মাণ করেছে।

এমন সময় খালেক ব্যাপারি তার এক সকাতর আর্জি পেশ করে। বলে যে, সকলেরই কিছু না কিছু দান থাক মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে, কিন্তু খরচের বার আনা তাকে যেন বহন করতে দেওয়া হয়। তার জীবন আর ক-দিন। আর খায়েশ-খোয়াব বা আশা-ভরসা নাই, এবার দুনিয়ার পাট গুটাতে পারলেই হয়। যা সামান্য টাকা-পয়সা আছে তা ধর্মের কাজে ব্যয় করতে পারলে দিলে কিছু শান্তি আসবে।

দিলের শান্তির কথা কেমন যেন শোনায়। আমেনা বিবির ঘটনাটা সেদিন মাত্র ঘটল। কানাঘুষায় কথাটা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে। শুধু জীবন্ত হয়ে নেই, ডালপালা শাখা-প্রশাখায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই থেকে মানুষের মনে যেন একটা নোতুন চেতনাও এসেছে। যাদের ঘরে বাঁজা মেয়ে তাদের আর শান্তি নেই। অবশ্য ধর্মের ঘরে গিয়ে কষ্টিপাথরে ঘষলে জানা যায় আসল কথা, কিন্তু সে তো সব সময়ে করা সম্ভব নয়। তাই একটা হিড়িক এসেছে, সংসার থেকে বাঁজা বউদের দূর করার, আর গণ্ডায় গণ্ডায় তারা চালান যাচ্ছে বাপের বাড়ি।

তবু যাহোক, মানুষের দিল বলে একটা বস্তু আছে। দীর্ঘ বসবাসের ফলে মানুষে-মানুষে মায়া হয়। তাই পরমাত্মীয়ের কোনো অন্যায়ে বুকে কঠিনতম আঘাত লাগে। ব্যাপারি আঘাত পেয়েছে। সে-আঘাত এখনো শুকায় নি। তাই হয়তো দিলে শান্তি চায়।

মজিদ সভাকে প্রশ্ন করে,

—ভাই সকল, আপনাদের কী মত ?

ব্যাপারিকে নিরাশ করবে—এমন কথা কেউ ভাবতে পারে না। কাজেই তার আবেদন মঞ্জুর হয়।

মজিদ সুবিচারক। অতএব স্থির হল, এমনভাবে চাঁদা তোলা হবে যে, আধখানা আর আস্তই হোক—একজন লোক অন্তত একটা খরচ যেন বহন করে।

সভা ক্ষান্ত হবার আগে একবার আক্কাসের বদখেয়ালের কথা ওঠে। কিন্তু মোদাব্বের মিঞার তখন জোশ এসে গেছে। রেগে উঠে সে বলে যে, ছেলে যদি অমন কথা ফের তোলে তবে সে নিজেই তাকে কেটে দু-টুকরো করে দরিয়ায় ভাসিয়ে দেবে।

যতটা সুদৃশ্য করা হবে বলে কল্পনা করা হয়েছিল ততটা সুদৃশ্য না হলেও একটা পাকা গম্বুজওয়ালা মসজিদ তৈরি হতে থাকে। শহর থেকে মিস্ত্রি কারিগর এসেছে, আর গতর খাটবার জন্য তৈরি গ্রামের যত দুস্থ লোক। মজিদ সকাল-বিকাল তদারক করে, আর দিন গোনে কবে শেষ হবে।

একদিন সকালে সে মসজিদের দিকে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মাঠের ধারে ফাল্গুনের পাগলা হাওয়া ছোটে। এত আকস্মিক তার আবির্ভাব যে, ঝকঝকে রোদভাসা আকাশের তলে সে-দমকা হাওয়া কেমন বিচিত্র ঠেকে। তাছাড়া শীতের হাওয়াশূন্য জমজমাট ভাবের পর আচমকা এই দমকা হাওয়া হঠাৎ মনের কোনো এক অতল অঞ্চলকে মথিত করে জাগিয়ে তোলে। ধুলো-ওড়ানো মাঠের দিকে তাকিয়ে মজিদের স্মরণ হয় তার জীবনের অতিক্রান্ত

দিনগুলোর কথা। কত বছর ধরে সে বসবাস করছে এ-দেশে। দশ, বারো? ঠিক হিসাব নাই, কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট মনে আছে যে, এক নিরাকপড়া শ্রাবণের দুপুরে সে এসে প্রবেশ করেছিল এই মহব্বতনগর গ্রামে। সেদিন ছিল ভাগ্যান্বেষী দুস্থ মানুষ, কিন্তু আজ সে জোতজমি সম্মান-প্রতিপত্তির মালিক। বছরগুলো ভালোই কেটেছে, এবং হয়তো ভবিষ্যতেও এমনি কাটবে। এখন সে ঝড়ের মুখে উড়ে চলা পাতা নয়, সচ্ছলতায় শিকড়গাড়া বৃক্ষ।

আজ দমকা হাওয়ার আকস্মিক আগমনে তার মনে ভবিষ্যতের কথাই জাগে। এবং তাই সারাদিন মনটা কেমন-কেমন করে। লোকদের সঙ্গে আলাপ করে ভাসা-ভাসা ভাবে, কইতে-কইতে সে সহসা কেমন আনমনা হয়ে যায়।

সারাদিন হাওয়া ছোটে। সন্ধ্যার পরে সে-হাওয়া থামে। যেমনি আচমকা তার আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি আচমকা থেমে যায়। দোয়া-দরুদ পড়ছিল মজিদ, এবার নিস্তব্ধতার মধ্যে গলাটা চড়া ও কেমন বিসদৃশ শোনাতে থাকে। একবার কেশে নিয়ে গলা নাবিয়ে এধার-ওধার দেখে অকারণে, তারপর মাছের পিঠের মতো মাজারটার দিকে তাকায়। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে চমকে ওঠে। রূপালি ঝালরওয়ালা সালুকাপড়টা এক কোণে উলটে আছে।

সত্যিই সে চমকে ওঠে। ভেতরটা কিসে ঠক্কর খেয়ে নড়ে ওঠে, স্রোতে ভাসমান নৌকার চরে ধাক্কা খাওয়ার মতো ভীষণভাবে ঝাঁকুনি খায়। কারণ, ঘরের ম্লান আলোয় কবরের সে অনাবৃত অংশটা মৃত মানুষের খোলা চোখের মতো দেখায়।

কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির, যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরই, কিন্তু সে জানে না কে চিরশায়িত এর তলে। যে-কবরের পাশে আজ তার এক যুগ ধরে বসবাস এবং যে-কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে-কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে। কবরের কাপড় উলটানো নগ্ন অংশই হঠাৎ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৃত লোকটিকে সে চেনে না। এবং চেনে না বলে আজ তার পাশে নিজেকে বিস্ময়করভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করে। এ-নিঃসঙ্গতা কালের মতো আদিঅন্তহীন—যার কাছে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ অর্থহীন অপলাপ মাত্র।

সে-রাতে রহিমা স্বামীর পা টিপতে-টিপতে মজিদের দীর্ঘশ্বাস শোনে। চিরকালের স্বল্পভাষিণী রহিমা কোনো প্রশ্ন করে না, কিন্তু মনে-মনে ভাবে।

একসময়ে মজিদই বলে,

—বিবি, আমাগো যদি পোলাপাইন থাকত!

এমন কথা মজিদ কখনো বলে না। তাই সহসা রহিমা কথাটার উত্তর খুঁজে পায় না। তারপর পা টেপা ক্ষণকালের জন্য থামিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘোমটাটা কানের ওপর চড়িয়ে সে আস্তে বলে,—আমার বড় শখ হাসুনিরে পুষ্যি রাখি। কেমন মোটাতাজা পোলা।

প্রথমে মজিদ কিছুই বলে না। তারপর বলে,

—নিজের রক্তের না হইলে কি মন ভরে? কথাটা বলে আর মনে মনে অন্য একটা কথার মহড়া দেয়। মহড়া দেয়া কথাটা শেষে বলেই ফেলে। বলে, তাছাড়া তার মায়ের জন্মের নাই ঠিক!

তারপর তারা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে। মজিদের নীরবতা পাথরের মতো ভারি। যে-নিঃশব্দতা আজ তার মনে ঘন হয়ে উঠেছে সে-নিঃশব্দতা সত্যিকার, জীবনের মতো তা নিছক বাস্তব। এবং কথা হচ্ছে, পুষ্যি ছেলে তো দূরের কথা, রহিমাও সে-নিঃশব্দতাকে দূর করতে পারে না। দূর হবে যদি নেশা ধরে। মজিদের নেশার প্রয়োজন।

ব্যথাবিদীর্ণ কণ্ঠে মজিদ আবার হাহাকার করে ওঠে,

—আহা, খোদা যদি আমাগো পোলাপাইন দিত!

মজিদের মনে কিন্তু অন্য কথা ঘোরে। তখন মাজারের অনাবৃত কোণটা মৃত মানুষের চোখের মতো দেখাচ্ছিল। তা দেখে হয়তো তার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে

এ কথাও স্মরণ হয়েছিল যে, জীবনকে সে উপভোগ করে নি। জীবন উপভোগ না করতে পারলে কিসের ছাই মান-যশ-সম্পত্তি? কার জন্য শরীরের রক্ত পানি করা আয়েশ-আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা?

পরদিন সকালে মজিদ যখন কোরান শরিফ পড়ে তখন তার অশান্ত আত্মা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে মিহি চিকন কণ্ঠের ঢালা সুরে। পড়তে পড়তে তার ঠোঁট পিচ্ছিল ও পাতলা হয়ে ওঠে, চোখে আসে এলোমেলো হাওয়ার মতো অস্থিরতা।

বেলা চড়লে তার কোরানপাঠ খতম হয়। উঠানে সে যখন বেরিয়ে আসে তখনো কিন্তু তার ঠোঁট বিড়বিড় করে—তাতে যেন কোরানপাঠের রেশ লেগে আছে।

উঠানের কোণে আওলাঘরের নিচু চালের ওপর রহিমা কদুর বিচি শুকাবার জন্য বিছিয়ে দিচ্ছিল। সে পেছন ফিরে আছে বলে মজিদ আড়-চোখে চেয়ে-চেয়ে তাকে দেখে কতক্ষণ। যেন অপরিচিতা কাউকে দেখে লুকিয়ে লুকিয়ে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলে না।

রাতে মজিদ রহিমাকে বলে,

—বিবি, একটা কথা।

শুনবার জন্য রহিমা পা টেপা বন্ধ করে। তারপর মুখটা তেরছাভাবে ঘুরিয়ে তাকায় স্বামীর পানে।

—বিবি, আমাগো বাড়িটা বড়ই নিরানন্দ। তোমার একটা সাথী আনুম?

সাথী মানে সতীন। সে-কথা বুঝতে রহিমার এক মুহূর্ত দেরি হয় না। এবং পলকের মধ্যে কথাটা বোঝে বলেই সহসা কোনো উত্তর আসে না মুখে।

রহিমাকে নিরুত্তর দেখে মজিদ প্রশ্ন করে,

—কী কও?

—আপনে যেমুন বোঝেন।

তারপর আর কথা হয় না। রহিমা আবার পা টিপতে থাকে বটে কিন্তু থেকে-থেকে তার হাত থেমে যায়। সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা ও অন্তঃসারশূন্যতা এই মুহূর্তে তার কাছে হঠাৎ মস্ত বড় হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবার তার কিছু নেই।

জ্যৈষ্ঠের কড়া রোদে মাঠ ফাটছে আর লোকদের দেহ দানা-দানা হয়ে গেছে ঘামাচিতে, এমন সময় মসজিদের কাজ শেষ হয়। এবং তার কিছুদিনের মধ্যেই মজিদের দ্বিতীয় বিয়েও সম্পন্ন হয় অনাড়ম্বর দ্রুততায়। ঢাকঢোল বাজে না, খানাপিনা মেহমান অতিথ-এর হৈহুল্লুস্থুল হয় না, অত্যন্ত সহজে ব্যাপারটা চুকে যায়।

বউ হয়ে যে মেয়েটি ঘরে আসে সে যেন ঠিক বেড়ালছানা। বিয়ের আগে মজিদ ব্যাপারিকে সংগোপনে বলেছিল যে, ঘরে এমন একটি বউ আনবে যে খোদাকে ভয় করবে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয়, সে খোদাকে কেন সবকিছুকেই ভয় করবে, মানুষ হাসিমুখে আদর করতে গেলেও ভয়ে কেঁপে সারা হয়ে যাবে।

নোতুন বউয়ের নাম জমিলা। জমিলাকে পেয়ে রহিমার মনে শাশুড়ির ভাব জাগে। স্নেহ-কোমল চোখে সারাক্ষণ তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, আর যত দেখে তত ভালো লাগে তাকে। আদর-যত্ন করে খাওয়ায়-দাওয়ায় তাকে। ওদিকে মজিদ ঘন ঘন দাড়িতে হাত বুলায়, আর তার আশপাশ আতরের গন্ধে ভুরভুর করে।

একসময় গলায় পুলক জাগিয়ে মজিদ প্রশ্ন করে,

—হে নামাজ জানে নি?

রহিমা জমিলার সঙ্গে একবার গোপনে আলাপ করে নেয়। তারপর গলা চড়িয়ে বলে,

—জানে।

—জানলে পড়ে না ক্যান?

জমিলার সঙ্গে আলাপ না করেই রহিমা সরাসরি উত্তর দেয়,

—পড়ব আর কি ধীরে-সুস্থে।

আড়ালে রহিমাকে মজিদ প্রশ্ন করে,

—তোমার হে মানসম্মান করে নি?

—করে না? খুব করে। একরত্তি মাইয়া, কিন্তু বড় ভালা। চোখ পর্যন্ত তোলে না।

তারা দু-জনেই কিন্তু ভুল করে। কারণ দিন কয়েকের মধ্যে জমিলার আসল চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে সে ঘোমটা খোলে, তারপর মুখ আড়াল করে হাসতে শুরু করে। অবশেষে ধীরে-ধীরে তার মুখে কথা ফুটতে থাকে। এবং একবার যখন ফোটে তখন দেখা যায় যে, অনেক কথাই সে জানে ও বলতে পারে—এতদিন কেবল তা ঘোমটার তলে ঢেকে রেখেছিল।

একদিন বাইরের ঘর থেকে মজিদ হঠাৎ শোনে সোনালি মিহিসুন্দর হাসির ঝঙ্কার। শুনে মজিদ চমকিত হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে এমন হাসি সে কখনো শোনে নি। রহিমা জোরে হাসে না। সালুআবৃত মাজারের আশেপাশে যারা আসে তারাও কোনোদিন হাসে না। অনেক সময় কান্নার রোল ওঠে, কত জীবনের দুঃখবেদনা বরফ-গলা নদীর মতো হু-হু করে ভেসে আসে আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের দমকা হাওয়া জাগে, কিন্তু এখানে হাসির ঝঙ্কার ওঠে না কখনো। এখানকার কথা ছেড়ে দিলেও, আগেই-বা কবে মজিদ এমন হাসি শুনেছে! জীর্ণ গোয়ালঘরের মতো মক্তবে খিটখিটে মেজাজের মৌলবীর সামনে প্রাণভয়ে তারস্বরে আমসিপারা-পড়া হতে শুরু করে অন্নসংস্থানের জন্য তিক্ততম সংগ্রামের দিনগুলির মধ্যে কোথাও হাসির লেশমাত্র আভাস নাই। তাই কয়েক মুহূর্ত বিমুগ্ধ মানুষের মতো মজিদ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর সামনের লোকটির পানে তাকিয়ে হঠাৎ সে শক্ত হয়ে যায়। মুখের পেশি টান হয়ে ওঠে, আর কুঁচকে যায় ভ্রূ।

পরে ভেতরে এসে মজিদ বলে,

—কে হাসে অমন কইরা?

জমিলা আসার পর আজ প্রথম মজিদের কণ্ঠে রুষ্টতা শোনা যায়। তাই যে-জমিলা মজিদকে ভেতরে আসতে দেখে ওধারে মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছিল লজ্জায়, সে আড়ষ্ট হয়ে যায় ভয়ে। কেউ উত্তর দেয় না।

মজিদ আবার বলে,

—মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।

রহিমা এবার ফিসফিস করে বলে, হুনলা নি? আওয়াজ কইরা হাসন নাই।

জমিলা আস্তে মাথা নাড়ে। সে শুনেছে।

একদিন দুপুরে জমিলাকে নিয়ে রহিমা পাটি বুনতে বসে। বাইরে আকাশে শঙ্খচিল ওড়ে, আর অদূরে বেড়ার ওপর বসে দুটো কাক ডাকাডাকি করে অবিশ্রান্তভাবে।

বুনতে-বুনতে জমিলা হঠাৎ হাসতে শুরু করে। মজিদ বাড়িতে নাই, পাশের গ্রামে গেছে এক মরণাপন্ন গৃহস্থকে ঝাড়তে। তবু সভয়ে চমকে উঠে রহিমা বলে,

—জোরে হাইস না বইন, মাইনষে হুনব।

ওর হাসি কিন্তু থামে না। বরঞ্চ হাসতে-হাসতে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বিচিত্রভাবে জীবন্ত সে-হাসি, ঝরনার অনাবিল গতির মতো ছন্দময় দীর্ঘ সমাপ্তিহীন ধারা।

আপনা থেকে হাসি যখন থামে তখন জমিলা বলে,

—একটা মজার কথা মনে পড়ল বইলাই হাসলাম বুবু।

হাসি থেমেছে দেখে রহিমা নিশ্চিন্ত হয়। তাই এবার সহজ গলায় প্রশ্ন করে,

—কী কথা বইন?

—কমু? বলে চোখ তুলে তাকায় জমিলা। সে-চোখ কৌতুকে নাচে।

—কও না!

বলবার আগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে সে কী যেন ভাবে। তারপর বলে,

—তানি যখন আমারে বিয়া করবার যায় তখন খোদেজা বুবু বেড়ার ফাঁক দিয়া তানারে দেখাইছিল।

—কারে দেখাইছিল?

—আমারে। তয় দেইখা আমি কই, দ্যুত, তুমি আমার লগে মশকরা কর খোদেজা বুবু। কারণ কী আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ। আর—হঠাৎ আবার হাসির একটা দমক আসে, তবু নিজেকে সংযত করে সে বলে—আর, এইখানে তোমারে দেইখা ভাবলাম তুমি বুঝি শাশুড়ি।

কথা শেষ করেছে কি অমনি জমিলা আবার হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু সে হাসি থামতে দেরি হল না। রহিমার হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচমকা থেমে গেল।

সারা দুপুর পাটি বোনে, কেউ কোনো কথা কয় না। নীরবতার মধ্যে একসময়ে জমিলার চোখ ছলছল করে ওঠে, কিসের একটা নিদারুণ অভিমান গলা পর্যন্ত উঠে ভারি হয়ে থাকে। রহিমার অলক্ষ্যে ছাপিয়ে ওঠা অশ্রুর সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করে জমিলা, তারপর কেঁদে ফেলে।

হাসি শুনে রহিমা যেমন চমকে উঠেছিল তেমনি চমকে ওঠে তার কান্না শুনে। বিস্মিত হয়ে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে জমিলার পানে। জমিলা কাঁদে আর বোনে, থেকে-থেকে মাথা ঝেঁকে চোখ-নাক মোছে।

রহিমা আস্তে বলে,

—কাঁদো ক্যান বইন?

জমিলা কিছুই বলে না। পসলাটি কেটে গেলে সে চোখ তুলে তাকায় রহিমার পানে, তারপর হাসে। হেসে সে একটি মিথ্যা কথা বলে।

বলে যে, বাড়ির জন্য তার প্রাণ জ্বলে। সেখানে একটা নুলা ভাইকে ফেলে এসেছে, তার জন্য মনটা কাঁদে। বলে না যে, রহিমাকে হঠাৎ গম্ভীর হতে দেখে বুকে অভিমান ঠেলে এসেছিল এবং একবার অভিমান ঠেলে এলে কান্নাটা কী করে আসে সবসময়ে বোঝা যায় না। রহিমা উত্তরে হঠাৎ তাকে বুকে টেনে নেয়, কপালে আস্তে চুমো খায়।

জমিলাই কিন্তু দু-দিনের মধ্যে ভাবিয়ে তোলে মজিদকে। মেয়েটি যেন কেমন! তার মনের হদিস পাওয়া যায় না। কখন তাতে মেঘ আসে কখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে—পূর্বাহ্ণে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া দুষ্কর। তার মুখ খুলেছে বটে কিন্তু তা রহিমার কাছেই। মজিদের সঙ্গে এখনো সে দুটি কথা মুখে তুলে কয় না। কাজেই তাকে ভালোভাবে জানবারও উপায় নেই।

একদিন সকালে কোত্থেকে মাথায় শণের মতো চুলওয়ালা খ্যাংটা বুড়ি মাজারে এসে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুরু করে দিল। কী তার বিলাপ, কী ধারালো তার অভিযোগ। তার সাতকুলে কেউ নেই, এখন নাকি তার চোখের মণি একমাত্র ছেলে যাদুও মরেছে। তাই সে মাজারে এসেছে খোদার অন্যায়ের বিরুদ্ধে নালিশ করতে।

তার তীক্ষ্ণ বিলাপে সকালটা যেন কাচের মতো ভেঙে খান-খান হয়ে গেল। মজিদ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ওর বিলাপ শেষ হয় না, গলার তীক্ষ্ণতা কিছুমাত্র কোমল হয় না। উত্তরে এবার সে কোমরে গোঁজা আনা পাঁচেক পয়সা বের করে মজিদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে,—সব দিলাম আমি, সব দিলাম। পোলাটার এইবার জান ফিরাইয়া দেন।

মজিদ আরো বোঝায় তাকে।—ছেলে মরেছে, তার জন্য শোক করা উচিত নয়। খোদার যে বেশি পেয়ারের হয় সে আরো জলদি দুনিয়া থেকে প্রস্থান করে। এবার তার উচিত মৃত

ছেলের রুহের জন্য দোয়া করা; সে যেন বেহেশ্‌তে স্থান পায়, তার গুনাহ যেন মাফ হয়ে যায়—তার জন্য দোয়া করা।

কিন্তু এসব ভালো নছিহতে কান নেই বুড়ির; শোক আগুন হয়ে জড়িয়ে ধরেছে তাকে, তাতে দাউ-দাউ করে পুড়ে মরছে। মজিদ আর কী করে। পয়সাটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসে। অন্দরে আসতে দেখে বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে জমিলা, পাথরের মতো মুখ-চোখ। মজিদ থমকে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ তার পানে চেয়ে থাকে, কিন্তু তার হুঁশ নাই।

সেই থেকে মেয়েটির কী যেন হয়ে গেল। দুপুরের আগে মজিদকে নিকটে কোনো এক স্থানে যেতে হয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে গালে হাত চেপে জমিলা মূর্তির মতো বসে আছে, ঝুরে আসা চোখে আশপাশের দিশ নাই।

রহিমা বদনা করে পানি আনে, খড়ম জোড়া রাখে পায়ের কাছে। মুখ ধুতে-ধুতে সজোরে গলা সাফ করে মজিদ, তারপর আবার আড়-চোখে চেয়ে দেখে জমিলাকে। জমিলার নড়চড় নেই। তার চোখ যেন পৃথিবীর দুঃখ-বেদনার অর্থহীনতায় হারিয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে মজিদ দরজার কাছাকাছি একটা পিঁড়িতে এসে বসে। রহিমার হাত থেকে হুঁকাটা নিয়ে প্রশ্ন করে,

—ওইটার হইছে কী?

রহিমা একবার তাকায় জমিলার পানে। তারপর আঁচল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে আস্তে বলে,

—মন খারাপ করছে।

ঘন ঘন বার কয়েক হুঁকায় টান দিয়ে মজিদ আবার প্রশ্ন করে,

—কিন্তু ... ক্যান খারাপ করছে?

রহিমা সে-কথার জবাব দেয় না। হঠাৎ জমিলার দিকে তাকিয়ে ধম্‌কে ওঠে,

—ওঠ ছেমড়ি, চৌকাঠে ওইরকম কইরা বসে না।

মজিদ হুঁকা টানে আর নীলাভ ধোঁয়ার হাল্কা পর্দা ভেদ করে তাকায় জমিলার পানে। জমিলা যখন নড়বার কোনো লক্ষণ দেখায় না তখন মজিদের মাথায় ধীরে-ধীরে একটা চিনচিনে রাগ চড়তে থাকে। মন খারাপ হয়েছে? সে যদি হত নানারকম দায়িত্ব ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দিন কাটানো মস্ত সংসারের কর্ত্রী—তবে না হয় বুঝত মন খারাপের অর্থ। কিন্তু সদ্য বিবাহিতা একরত্তি মেয়ের আবার ওটা কী ঢং? তাছাড়া মানুষের মন খারাপ হয় এবং তাই নিয়ে ঘর-সংসারের কাজ করে, কথা কয়, হাঁটে চলে। জমিলা যেন ঠাটাপড়া মানুষের মতো হয়ে গেছে।

হঠাৎ মজিদ গর্জন করে ওঠে। বলে, আমার দরজা থিকা উঠবার কও তারে। ও কি ঘরে বলা আনবার চায় নাকি? চায় নাকি আমার সংসার উচ্ছন্নে যাক, মড়ক লাগুক ঘরে?

গর্জন শুনে রহিমার বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। জমিলাও এবার নড়ে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে কেমন অবসন্ন দৃষ্টিতে তাকায় এদিকে, তারপর হঠাৎ উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গোয়ালঘরের দিকে চলে যায়।

সে-রাতে দূরে ডোমপাড়ায় কিসের উৎসব। সেই সন্ধ্যা থেকে একটানা ভোঁতা উত্তেজনায় ঢোলক বেজে চলেছে। বিছানায় শুয়ে জমিলা এমন আলগোছে নিঃশব্দ হয়ে থাকে যেন সে-বিচিত্র ঢোলকের আওয়াজ শোনে কান পেতে। মজিদও অনেকক্ষণ নিঃশব্দ হয়ে পড়ে থাকে। একবার ভাবে, তাকে জিজ্ঞাসা করে কী হয়েছে তার, কিন্তু একটা কূল-কিনারহীন অথই প্রশ্নের মধ্যে নিমজ্জিত মনের আভাস পেয়ে মজিদের ভেতরটা এখনো খিটখিটে হয়ে আছে। প্রশ্ন করলে কী একটা অতলতার প্রমাণ পাবে—এই ভয় মনে। মাজারের সান্নিধ্যে বসবাস করার ফলে মজিদ এই দীর্ঘ এক যুগকাল সময়ের মধ্যে বহু ভগ্ন, নির্মমভাবে আঘাত পাওয়া হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে। তাই আজ সকালে ঐ সাতকুল খাওয়া শণের মতো চুল মাথায় বুড়িটার ছুরির মতো ধারালো তীক্ষ্ণ বিলাপ মজিদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে নি।

কিন্তু সে-বিলাপ শোনার পর থেকেই জমিলা যেন কেমন হয়ে গেছে। কেন?

মনে-মনে ক্রোধে বিড়বিড় করে মজিদ বলে, যেন তার ভাতার মরছে!

ডোমপাড়ায় অবিশ্রান্ত ঢোলক বেজে চলে; পৃথিবীর মাটিতে অন্ধকারের তলানি গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়। মজিদের ঘুম আসে না। ঘুমের আগে জমিলার গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে খানিক আদর করা প্রায় তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়ালেও আজ তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। হয়তো এই মুহূর্তে দুনিয়ার নির্মমতার মধ্যে হঠাৎ নিঃসঙ্গ হয়ে-ওঠা জমিলার অন্তর একটু আদরের জন্য, একটু স্নেহ-কোমল সান্ত্বনার জন্য বা মিষ্টিমধুর আশার কথার জন্য খাঁ-খাঁ করে, কিন্তু মজিদের আজ আদর শুকিয়ে আছে। তার সে শুষ্ক হৃদয় ঢোলকের একটানা আওয়াজের নিরন্তর খোঁচায় ধিকিধিকি করে জ্বলে, মনের অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের ছটা জাগে। সে ভাবে, নেশার লোভে কাকে সে ঘরে আনল? যার কচি-কোমল লতার মতো হাল্কা দেহ দেখে আর এক ফালি চাঁদের মতো ছোট মুখ দেখে তার এত ভালো লেগেছিল—তার এ কী পরিচয় পাচ্ছে ধীরে-ধীরে?

তারপর কখন মজিদ ঘুমিয়ে পড়েছিল। মধ্যরাতে ঢোলকের আওয়াজ থামলে হঠাৎ যে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা ভারি হয়ে এল তারই ভারিত্বে হয়তো চিন্তাক্ষত মজিদের অস্পষ্ট ঘুম ছুটে গেল। ঘুম ভাঙলেই তার একবার আল্লাহু আকবর বলার অভ্যাস। তাই অভ্যাসবশত সে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে পাশে ফিরে তাকিয়ে দেখে জমিলা নেই। কয়েক মুহূর্ত সে কিছু বুঝল না, তারপর ধাঁ করে উঠে বসল। তারপর নিজেকে অপেক্ষাকৃত সংযত করে অকম্পিত হাতে দেশলাই জ্বালিয়ে কুপিটা ধরাল।

পাশের বারান্দার মতো ঘরটায় রহিমা শোয়। সেখানেই রহিমার প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে জমিলা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কুপিটার লালচে আলো মুখে পড়তেই তার ঠোঁটটা একটু নড়ে উঠল—যেন মাই খেতে-খেতে ভুলে থেমে গিয়েছিল, আলো দেখে হঠাৎ স্মরণ হল সে-কথা।

পরদিন জমিলার মুখের অন্ধকারটা কেটে যায়। কিন্তু মজিদের কাটে না। সে সারাদিন ভাবে। রাতে রহিমা যখন গোয়ালঘরে গামলাতে হাত ডুবিয়ে নুনপানি মেশানো ভুষি গোলায় তখন বাইরের ঘর থেকে ফিরবার মুখে মজিদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। রহিমার মুখ ঘামে চকচক করে আর ভনভন করে মশায় কাটে তার সারা দেহ। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠে রহিমা দেখে, মজিদ। তারপর আবার মুখ নিচু করে ভুষি গোলায়।

মজিদ একবার কাশে। তারপর বলে,

—জমিলা কই?

—ঘুমাইছে বোধহয়।

জমিলার সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমোবার অভ্যাস। মজিদ বলা-কওয়াতে সে নামাজ পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু প্রায়ই এশার নামাজ পড়া তার হয়ে ওঠে না, এই নিদারুণ ঘুমের জন্য। নামাজ তো দূরের কথা, খাওয়াই হয়ে ওঠে না। যে-রাতে অভুক্ত থাকে তার পরদিন অতি ভোরে উঠে ঢাকাঢুকা যা বাসি খাবার পায় তাই খায় গবগব করে।

মজিদ এবার চাপা গলায় গর্জে ওঠে,

—ঘুমাইছে? তুমি কাম করবা, হে লালবিবির মতো খাটে চইড়া ঘুমাইব বুঝি? ক্যান, এত ক্যান? থেমে আবার বলে, নামাজ পড়ছে নি?

নামাজ সে আজ পড়েছে। মগরেবের নামাজের পরেই ঢুলতে শুরু করেছিল, তবু টান হয়ে বসেছিল আধঘণ্টার মতো। তারপর কোনোপ্রকারে এশার নামাজ সেরেই সোজা বিছানায় গিয়ে ঘুম দিয়েছে। কিন্তু রহিমা পেছনে ছাপড়া দেওয়া ঘরটিতে বসে রান্না করছিল বলে সে-কথা সে জানে না।

—কী জানি, বোধহয় পড়েছে।

—বোধহয় বুধহয় জানি না। খোদার কামে ওইসব ফাইজলামি চলে না। যাও, গিয়া

তারে ঘুম থিকা তোলো, তারপর নামাজ পড়বার কও।

রহিমা নিরুত্তরে ভুষি গোলানো শেষ করে। গাইটা নাসারন্ধ্র ডুবিয়ে সোঁ সোঁ আওয়াজ করে ভুষি খেতে শুরু করে, কুপির আলোয় চকচক করে তার মস্ত কালো চোখজোড়া। সে-চোখের পানে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে রহিমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, পেছনে-পেছনে যায় মজিদ।

হাত ধুয়ে এসে ঠাণ্ডা সে-হাত দিয়ে জমিলার দেহ স্পর্শ করে রহিমা যখন ধীরে-ধীরে ডাকে তখনো মজিদ পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা অধীরতায় তার চোখ চকচক করে। কিন্তু সে অধীর হলে কী হবে, জমিলার ঘুম কাঠের মতো। সে-ঘুম ভাঙে না। রহিমার গলা চড়ে, ধাক্কানি জোরালো হয়, কিন্তু সে যেন মরে আছে। এই সময়ে এক কাণ্ড করে মজিদ। হঠাৎ এগিয়ে এসে একহাত দিয়ে রহিমাকে সরিয়ে একটানে জমিলাকে উঠিয়ে বসিয়ে দেয়। তার শক্ত মুঠির পেষণে মেয়েটির কব্জার কচি হাড় হয়তো মড়মড় করে ওঠে।

আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে ঘরে ডাকাত পড়েছে ভেবে জমিলার চোখ ভীতবিহ্বল হয়ে ওঠে প্রথমে। কিন্তু ক্রমশ শ্রবণশক্তি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে মজিদের রুষ্ট কথাগুলোর অর্থও পরিষ্কার হতে থাকে। কেন তাকে উঠিয়েছে সে-কথা এখন বুঝলেও জমিলা বসেই থাকে, ওঠার নামটি করে না।

সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোনো কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।

ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করে নি কোনো দিন। আজ তার ঘরের একরত্তি বউ—যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিল বলে—সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।

সত্যিই সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। অন্তরে যে-ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে সে-ক্রোধ ফেটে পড়বার পথ না পেয়ে অন্ধ সাপের মতো ঘুরতে থাকে, ফুঁসতে থাকে। তার চেহারা দেখে রহিমার বুক কেঁপে ওঠে ভয়ে। দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে স্বামীকে সে অনেকবার রাগতে দেখেছে, কিন্তু তার এমন চেহারা সে কখনো দেখে নি। কারণ সচরাচর সে যখন রাগে তখন রাগান্বিত মুখে কেমন একটা সমবেদনার, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের সদিচ্ছার কোমল আভা ছড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে নির্ভেজাল নিষ্ঠুর হিংস্রতা।

ভীতকণ্ঠে রহিমা বলে,

—ওঠ বইন ওঠ, বহুত হইছে। নামাজ লইয়া কি রাগ করা যায়?

—রাগ? কিসের রাগ? মজিদ আবার গর্জে ওঠে। এই বাড়িতে আহ্লাদের জায়গা নেই। এই বাড়ি তার বাপের বাড়ি না।

তবু জমিলা ঠায় বসে থাকে। সে যেন মূর্তি।

অবশেষে আগ্নেয়গিরির মুখে ছিপি দিয়ে মজিদ সরে যায়। আসলে সে বুঝতে পারে না এরপর কী করবে। হঠাৎ এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝে উঠতে পারে না তাকে কীভাবে দমন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, দীর্ঘকাল অন্দরে-বাইরে রাজত্ব করেও যে-সতর্কতার গুণটা হারায় নি, সে-সতর্কতাও সে অবলম্বন করে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত সে ভেবে দেখতে চায়।

যাবার সময় একটি কথা বলে মজিদ,

—ওর দিলে খোদার ভয় নাই। এইটা বড়ই আফসোসের কথা।

অর্থাৎ তার মনে পর্বতপ্রমাণ খোদার ভীতি জাগাতে হবে। ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত ভেবে দেখবার সময় সে-লাইনেই মজিদ ভাববে।

পরদিন সকালে কোরানপাঠ খতম করে মজিদ অন্দরে এসে দেখে, দরজার চৌকাঠের ওপর ক্ষুদ্র ঘোলাটে আয়নাটি বসিয়ে জমিলা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে সিঁথি কাটছে।

তেল জবজবে পাট করা মাথাটি বাইরের কড়া রোদের ঝলক লেগে জ্বলজ্বল করে। মজিদ যখন পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকে তখন জমিলা পিঠটা কেবল টান করে যাবার পথ করে দেয়, তাকায় না তার দিকে।

এ সময়ে মজিদ নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মেছোয়াক করে। মেছোয়াক করতে-করতে ঘরময় ঘোরে, উঠানে পায়চারি করে, পেছনে গাছ-গাছলার দিকে চেয়ে কী দেখে। দীর্ঘ সময় নিয়ে সযত্নে মেছোয়াক করে—দাঁতের আশেপাশে, ওপরে-নিচে। ঘষতে-ঘষতে ঠোঁটের পাশে ফেনার মতো থুতু জমে ওঠে। মেছোয়াকের পালা শেষ হলে গামছাটা নিয়ে পুকুরে গিয়ে দেহ রগড়ে গোসল করে আসে।

একটু পরে একটা নিমের ডাল দাঁতে কামড়ে ধরে জমিলার দেহ ঘেঁষে আবার বেরিয়ে আসে মজিদ। আড়-চোখে একবার তাকায় বউয়ের পানে। মনে হয়, ঘোলাটে আয়নায় নিজেরই প্রতিচ্ছবি দেখে চকচক করে মেয়েটির চোখ। সে-চোখে বিন্দুমাত্র খোদার ভয় নেই—মানুষের ভয় তো দূরের কথা।

মেছোয়াক করতে-করতে উঠানে চক্কর খায় মজিদ। এক সময়ে সশব্দে থুতু ফেলে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। দরজায় পাকা সিঁড়ি নেই। পুকুর ঘাটে যেমন থাক থাক করে কাটা নারকেল গাছের গুঁড়ি থাকে, তেমনি একটা গুঁড়ি বসানো। তারই নিচের ধাপে পা রেখে মজিদ আবার থুতু ফেলে, তারপর বলে,

—রূপ দিয়া কী হইব? মাইনষের রূপ ক-দিনের? ক-দিনেরই বা জীবন তার?

ক্ষিপ্রগতিতে জমিলা স্বামীর পানে তাকায়। শত্রুর আভাস পাওয়া হরিণের চোখের মতোই সতর্ক হয়ে ওঠে তার চোখ।

মজিদ বলে চলে,

—তোমার বাপ-মা দেখি বড় জাহেল কিছিমের মানুষ। তোমারে কিছু শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য তার জন্য হাশরের দিনে তারাই জবাবদিহি দিব। তোমার দোষ কী?

জমিলা শোনে, কিছু বলে না। মজিদ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে, কাইল যে কামটি করছ, তা কী শক্ত গুনার কাম জান নি, ক্যামনে করলা কামটা? খোদারে কি ডরাও না, দোজখের আঁগরে কি ডরাও না?

জমিলা পূর্ববৎ নীরব। কেবল ধীরে-ধীরে কাঠের মতো শক্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা।

—তাছাড়া, এই কথা সর্বদা খেয়াল রাখিও যে, যার-তার ঘরে আস নাই তুমি! এই ঘর মাজারপাকের ছায়ায় শীতল, এইখানে তাঁনার রুহের দোয়া মানুষরে শান্তি দেয়, সুখ দেয়। তাঁনার দিলে গোস্বা আসে এমন কাম কোনো দিন করিও না।

তারপর আরেকবার সশব্দে থুতু ফেলে মজিদ পুকুরঘাটের দিকে রওনা হয়।

জমিলা তেমনি বসে থাকে। ভঙ্গিটা তেমনি সতর্ক কান খাড়া করে রাখা সশঙ্কিত হরিণের মতো। তারপর হঠাৎ একটা কথা সে বোঝে। কাঁচা গোশতে মুখ দিতে গিয়ে খট্ করে একটা আওয়াজ শুনে ইঁদুর যা বোঝে, হয়তো তেমনি কিছু একটা বোঝে সে। সে যেন খাঁচায় ধরা পড়েছে।

তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। দপ করে জমিলার চোখ জ্বলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট কেঁপে ওঠে, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হয়, দাউ-দাউ করা শিখার মতো সে দীর্ঘ হয়ে ওঠে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই শান্ত হয়ে অধিকতর মনোযোগসহকারে জমিলা সিঁথি কাটতে থাকে।

সেদিন বাদ-মগরেব শিরনি চড়ানো হবে। যেদিন শিরনি চড়ানো হবে বলে মজিদ ঘোষণা করে সেদিন সকাল থেকে লোকেরা চাল-ডাল-মশলা পাঠাতে শুরু করে। সে চাল-ডাল মজিদ ছুঁয়ে দিলে রহিমা তা দিয়ে খিচুড়ি রাঁধে। অন্দরের উঠানে সেদিন কাটা চুলায় ব্যাপারির বড় বড় ডেকচিতে রান্না হতে থাকে। ওদিকে বাইরে জিকির হয়। জিকিরের পর

খাওয়াদাওয়া।

মজিদ পুকুরঘাট থেকে ফিরে এলে প্রথম চাল-ডাল-মশলা এল ব্যাপারির বাড়ি থেকে। সেই শুরু। তারপর একসের আধসের করে নানা বাড়ি থেকে তেমনি চাল-ডাল-মশলা আসতে থাকে। অপরাহ্ণের দিকে অন্দরের উঠানে চুলা কাটা হল। শীঘ্র সে-চুলা গনগন করে উঠবে আগুনে।

মগরেবের পর লোকেরা এসে বাইরের ঘরে জমতে লাগল। কে একজন মোমবাতি এনেছে ক-টা, তাছাড়া আগরবাতিও এনেছে এক গোছা। বিছানো সাদা চাদরের ওপর মজিদ বসলে তার দুপাশে রাখা হল দুটো দীর্ঘ মোমবাতি, আর সামনে একগোছা আগরবাতির জ্বলন্ত কাঠি। কাঠিগুলো একভাণ্ড চালের মধ্যে বসানো।

মজিদ আজ লম্বা সাদা আলখেল্লা পরেছে। পিঠ টান করে হাঁটু গেড়ে বসে সেটা গুঁজে দিয়েছে পায়ের নিচে পর্যন্ত। আর মাথায় পরেছে আধা পাগড়ি, পেছন দিকটায় তার বিঘতখানেক লেজ।

যথেষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের পর জিকির শুরু হয়। প্রথমে ধীরে-ধীরে, প্রশান্ত সমুদ্রের বিলম্বিত ঢেউয়ের মতো। কারণ লোকেরা তখন পরস্পরের নিকট হতে দূরে-দূরে ছড়িয়ে আছে যোগশূন্য হয়ে। কিন্তু এই যোগশূন্যতার মধ্যে এ-কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই তারা ভাসতে শুরু করেছে, উঠতে-নাবতে শুরু করেছে।

ঢিমেতেতালা ঢেউয়ের মতো ভাসতে-ভাসতে তারা ক্রমশ এগিয়ে আসতে থাকে পরস্পরের সন্নিকটে। এ-ধীরগতিশীল অগ্রসর হবার মধ্যে চাঞ্চল্য নেই এখনো, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বও নেই। খোদার অস্তিত্বের মতো তাদের লক্ষ্যের অবস্থান সম্পর্কে একটা নিরুদ্বিগ্ন বিশ্বাস।

সন্ধ্যাটি হাওয়াশূন্য। মোমবাতির শিখা স্থির ও নিষ্কম্প। অদূরে সালুকাপড়ে আবৃত মাছের পিঠের মতো মাজারটি মহাসত্যের প্রতীকস্বরূপ অটুট জমাট পাথরের মতো নীরব, নিশ্চল।

কিন্তু ধীরে-ধীরে এদের গলা চড়তে থাকে। ক্রমে-ক্রমে দুনে চড়ে জিকির। প্রত্যেকে পরস্পরের সন্নিকটে আসতে থাকে, এবং যে-মহাঅগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হবে শীঘ্র তারই ছিটেফোঁটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে ঘনিষ্ঠতার সংঘর্ষণে।

মজিদের চোখ ঝিমিয়ে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে বারবার দেহ ঝুঁকে আসে। মুখের কথা আধা বুকে বিঁধে যায় আর তার অন্তরখনন গভীরতর হতে থাকে। ভেতর থেকে ক্রমশ বলকে-বলকে একটা অস্পষ্ট, বিচিত্র আওয়াজ বেরোয় শুধু। আর কতক্ষণ? পরস্পরের দাহ্য-চেতনা এবার মিলিত হবে-হচ্ছে করছে। একবার হলে মুহূর্তে সমস্ত কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দুনিয়ার মোহ আর ঘরবসতির মায়া-মমতা জ্বলে ছারখার হয়ে যাবে।

আওয়াজ বিচিত্রতর হতে থাকে। হু হু হু । আবার : হু হু হু। আবার—

অন্দরে উঠানে মজিদ নিজের হাতে যে-শিরনি চড়িয়ে এসেছে, তার তদারক করার ভার রহিমা-জমিলার ওপর। চাঁদহীন রাতে ঘন অন্ধকারের গায়ে বিরাট চুলা গনগন করে, আর কালো হাওয়া ভালো চালের মিহি-মিষ্টি গন্ধে ভুরভুর করে।

কাজের মধ্যে জমিলা উবু হয়ে বসে হাঁটুতে থুতনি রেখে বড় ডেকচিটাতে বলক-ওঠা চেয়ে-চেয়ে দেখে। সাহায্য করতে পাড়ার মেয়েরা যারা এসেছে তারা অশরীরীর মতো নিঃশব্দে ঘুরে-ঘুরে কাজ করে। ধোয়া-পাকলা করে, লাকড়ি ফাড়ে, কিন্তু কথা কয় না কেউ।

বাইরে থেকে ঢেউ আসে জিকিরের। ডেকচিতে বলক-আসা দেখে জমিলা, আর সে-ঢেউয়ের গর্জন কান পেতে শোনে। সে-ঢেউ যখন ক্রমশ একটা অবক্তব্য উত্তাল ঝড়ে পরিণত হয় তখন একসময়ে হঠাৎ কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে জমিলা। সে-ঢেউ তাকে আচম্বিতে এবং অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে। তারপর আঘাতের পর আঘাত আসতে থাকে। একটা সামলিয়ে উঠতে না উঠতে আরেকটা। সে আর কত সহ্য করবে! বালুতীরে যুগযুগ আঘাত পাওয়া শক্ত-কঠিন পাথর তো সে নয়। হঠাৎ দিশেহারা হয়ে সে পিঠ সোজা করে বসে,

তারপর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এধার-ওধার চেয়ে শেষে রহিমার পানে তাকায়। গনগনে আগুনের পাশে কেমন চওড়া দেখায় তাকে, কিন্তু কানের পাশে গোঁজা ঘোমটায় আবৃত মাথাটি নিশ্চল : চোখ তার বাষ্পের মতো ভাসে।

পানিতে ডুবতে থাকা মানুষের মতো মুখ তুলে আবার শরীর দীর্ঘ করে জমিলা, থই পায় না কোথাও। শেষে সে রহিমাকে ডাকে,

—বুবু!

রহিমা শোনে কি শোনে না। সে ফিরে তাকায়ও না, উত্তরও দেয় না। এদিকে ঢেউয়ের পর আরো ঢেউ আসে, উত্তাল উত্তুঙ্গ ঢেউ। হু হু হু। আবার : হু হু হু। দুনিয়া যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করে আছে, আকাশে যেন তারা নেই।

তারপর একটু পরে চিৎকার ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়কর দ্রুততায় আসতে থাকা পর্বতপ্রমাণ অজস্র ঢেউ ভেঙে ছত্রখান হয়ে যায়। মুহূর্তে কী যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, মারাত্মক বন্যাকে যেন অবশেষে কারা রুখতে পারে না। এবার ভেসে যাবে জনমানব-ঘরবসতি, মানুষের আশা-ভরসা।

বিদ্যুদ্গতিতে জমিলা উঠে দাঁড়ায়। ক্ষীণদেহে বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো কঠিনভাবে দাঁড়িয়ে সে স্পষ্টকণ্ঠে আবার ডাকে,

—বুবু!

এবার রহিমা মুখ তুলে তাকায়। তার চওড়া দেহটি শান্ত দিনের নদীর মতো বিস্তৃত আর নিস্তরঙ্গ। উজ্জ্বল চোখ ঝলমল করছে বটে কিন্তু তাও শান্ত, স্পষ্ট। সে-চোখের দিকে জমিলা তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু অবশেষে কিছুই বলে না। তারপর সে দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। উঠান পেরিয়ে বাইরের দিকে।

জিকির করতে-করতে মজিদ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। এ হয়েই থাকে। তবু লোকেরা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ হাওয়া করে, কেউ বুকফাটা আওয়াজে হা-হা করে, আফসোস করে, কেউ-বা এ হট্টগোলের সুযোগে মজিদের অবশ পদযুগল মত্ত চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়। কেবল ক্ষয়ে আসা মোমবাতি দুটো তখনো নিষ্কম্প স্থিরতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে।

হঠাৎ একটা লোকের নজর বাইরের দিকে যায়। কেন যায় কে জানে, কিন্তু বাইরে গাছতলার দিকে তাকিয়ে সে মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়। কে ওখানে? আলিঝালি দেখা যায়, পাতলা একটি মেয়ে, মাথায় ঘোমটা নেই। সে আর দৃষ্টি ফেরায় না। তারপর একে একে অনেকেই দেখে। তবু মেয়েটি নড়ে না। অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘোমটাশূন্য তার মুখটা ঢাকা চাঁদের মতো রহস্যময় মনে হয়।

শীঘ্র মজিদের জ্ঞান হয়। ধীরে-ধীরে সে উঠে বসে, তারপর চোখে অর্থহীন অবসাদ নিয়ে ঘুরে-ঘুরে সবার দিকে তাকায়। একসময়ে সেও দেখে মেয়েটিকে। সে তাকায়, তারপর বিমূঢ় হয়ে যায়। বিমূঢ়তা কাটলে দপ্ করে জ্বলে ওঠে চোখ।

অবশেষে কী করে যেন মজিদ সরল কণ্ঠে হাসে। সকল দিকে চেয়ে বলে,

—পাগলি ঝিটা। একটু থেমে আবার বলে, নোতুন বিবির বাড়ির লোক, তার সঙ্গে আসছে।

তারপর হাততালি দিয়ে উঁচু গলায় মজিদ হাঁকে, এই বিটি ভাগ! ঠোঁটে তখনো হাসির রেখা, কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে চোখ তার দপদপ করে জ্বলে।

হয়তো তার চোখের আগুনের হল্কা লেগেই ঘোর ভাঙে জমিলার। হঠাৎ সে ভেতরের দিকে চলতে থাকে, তারপর শীঘ্র বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আবার জিকির শুরু হয়। কিন্তু কোথায় যেন ভাঙন ধরেছে, জিকির আর জমে না। লোকেরা মাথা দোলায় বটে কিন্তু থেকে-থেকে তাদের দৃষ্টি বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্রতায় নিক্ষিপ্ত হয়

গাছতলার দিকে। কাঙালের মতো তাদের দৃষ্টি কী যেন হাতড়ায়। মহাসমুদ্রের ডাককে অবহেলা করে বালুতীরে কী যেন খোঁজে।

অবশেষে মজিদ মুখ তুলে তাকায়। জিকিরের ধ্বনিও সেই সঙ্গে থামে। ক্ষয়িষ্ণু মোমবাতি দুটো নিষ্কম্পভাবে জ্বলে, কিন্তু আগরবাতির কাঠিগুলো চালের মধ্যে কখন গুঁড়িয়ে ভস্ম হয়ে আছে।

কিছু বলার আগে মজিদ একবার কাশে। কেশে একে-একে সকলের পানে তাকায়। তারপর বলে,

—ভাই সকল, আমার মালুম হইতেছে কোনো কারণে আপনারা বেচইন আছেন। কী তার কারণ?

কেউ উত্তর দেয় না। কেবল উত্তর শোনার জন্য তারা পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে, কতক্ষণ অপেক্ষা করে মজিদ, তারপর বলে,—আইজ জিকির ক্ষান্ত হইল।

খাওয়াদাওয়া শুরু হয়। অন্যান্য দিন জিকিরের পর লোকেরা প্রচণ্ড ক্ষিধা নিয়ে গোগ্রাসে খিচুড়ি গেলে, আজ কিন্তু তেমন হাত চলে না তাদের। কিসের লজ্জায় সবাই মাথা নিচু করে রেখেছে, আর কেমন বিসদৃশভাবে চুপচাপ।

নিবন্ত চুলার পাশে রহিমা তখনো বসে আছে, পাশে নাবিয়ে রাখা খিচুড়ির ডেকচি। বুড়ো আওলাদ অন্দরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। এবার খালি বর্তন নিয়ে আসে ভেতরে।

একটু পরে মজিদও আসে। রহিমা আলগোছে ঘোমটা টেনে সিধা হয়ে বসে। ভাবে, রান্না ভালো হল কি খারাপ হল এইবার মতামত জানাবে মজিদ। কাছে এসে মজিদ কিন্তু রান্না সম্পর্কে কোনো কথাই বলে না। কেমন চাপা কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে,

—হে কই?

রহিমা চারধারে তাকায়। কোথাও জমিলা নেই। মনে পড়ে, তখন সে যে হঠাৎ উঠে চলে গেল তারপর আর সে এদিকে আসে নি। আস্তে রহিমা বলে,—বোধহয় ঘুমাইছে।

দাঁত কিড়মিড় করে এবার মজিদ বলে,

—ও যে একদম বাইরে চইলা গেল, দেখলা না তুমি?

মুহূর্তে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমা। জমিলা বাইরে গিয়েছিল? কতক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে গালে হাত দিয়ে প্রশ্ন করে,

—হে বাইরে গেছিল?

তখনো দাঁত কিড়মিড় করে মজিদের। উত্তরে শুধু বলে,

—হ!

তারপর হনহনিয়ে ভেতরে চলে যায়।

রহিমা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে বসে থাকে। তার হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পরে সেদিনকার মতো জমিলাকে ডাকতে সাহস হয় না। নিবন্ত হুঁকাটা পাশে নামিয়ে রেখে সিঁড়ির কাছাকাছি গুম হয়ে বসে ছিল মজিদ। তার দিকে চেয়ে ভয় হয় যে, ডাকার আওয়াজে সহসা সে জেগে উঠবে, চাপা ক্রোধ হঠাৎ ফেটে পড়বে, নিশ্বাস রুদ্ধ-করা আশঙ্কার মধ্যে তবু যে-নীরবতা এখনো অক্ষুণ্ন আছে তা ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে। তাই উঠানটা পেরুতে গিয়ে সতর্কভাবে হাঁটে রহিমা, নিঃশব্দে আর আলগোছে। কিন্তু এদিকে তার মাথা ঝিমঝিম করে। জমিলার বাইরে যাওয়ার কথা যখনই ভাবে তখনই তার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। মনে-মনে কেমন ভীতিও বোধ করে। লতার মতো মেয়েটি যেন এ-সংসারে ফাটল ধরিয়ে দিতে এসেছে। ঘরে সে যেন বলা ডেকে আনবে আর মাজারপাকের দোয়ায় যে-সংসার গড়ে উঠেছে সে-সংসার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

ওদিক থেকে ফিরে রহিমা সিঁড়ির দিকে এলে মজিদ হঠাৎ ডাকে—বিবি, শোন। তোমার লগে কথা আছে।

সে নিরুত্তরে পাশে এসে দাঁড়ালে মজিদ মুখ তুলে তাকায় তার পানে। সংকীর্ণ দাওয়ার ওপর একটি কুপি বসানো। তার আবছা আলো কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা রহিমার মুখকে অস্পষ্ট করে তোলে। সেদিকে তাকিয়ে মজিদের ঠোঁট যেন কেমন থর থর করে কেঁপে ওঠে।

—বিবি, কারে বিয়া করলাম? তুমি কি বদদোয়া দিছিলা নি?

শেষোক্ত কথাটা তড়িৎবেগে আহত করে রহিমাকে। তৎক্ষণাৎ সে ক্ষুণ্নকণ্ঠে উত্তর দেয়,

—তওবা-তওবা, কী যে কন। কিন্তু তারপর তার কথা গুলিয়ে যায়। মুখ তুলে তাকিয়েই থাকে মজিদ। অস্পষ্ট আলোর মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহিমা। মুখের একপাশে গাঢ় ছায়া, চোখদুটো ভেজা মাটির মতো নরম। মুহূর্তের মধ্যে মজিদ উপলব্ধি করে যে, চওড়া ও রঙশূন্য নিস্পৃহ মানুষ রহিমা মনে নেশা না জাগালেও তারই ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, তার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল। সে তার ঘরের খুঁটি।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো নিশ্বাস ফেলে জীবনে প্রথম হয়তো কোমল হয়ে এবং নিজের সত্তার কথা ভুলে গিয়ে সে রহিমাকে বলে,

—কও বিবি কী করলাম? আমার বুদ্ধিতে যানি কুলায় না। তোমারে জিগাই, তুমি কও।

রাতের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কখনো এমন সহজ সরল পরমাত্মীয়ের কথা মজিদ বলে না। তাই ঝট করে রহিমা তার অর্থ বোঝে না। অকারণে মাথায় ঘোমটা টানে, তারপর ঈষৎ চমকে উঠে তাকায় স্বামীর পানে। তাকিয়ে নোতুন এক মজিদকে দেখে। তার শীর্ণ মুখের একটি পেশিও এখন সচেতনভাবে টান হয়ে নেই। এতদিনের সহবাসের ফলেও যে-চোখের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে নি সে-চোখ এই মুহূর্তে কেমন অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে নির্ভেজাল হৃদয় নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে। দেখে একটা অভূতপূর্ব ব্যথাবিদীর্ণ আনন্দভাব ছেয়ে আসে রহিমার মনে, তারপর পুলক শিহরণে পরিণত হয়ে ধীরে-ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। সে-পুলক শিহরণের অজস্র ঢেউয়ের মধ্যে জমিলার মুখ তলিয়ে যায়, তারপর ডুবে যায় চোখের আড়ালে।

হঠাৎ ঝাপটা দিয়ে রহিমা বলে,

—কী কমু? মাইয়াডা যানি কেমুন। পাগলি। তা আপনে এলেমদার মানুষ। দোয়াপানি দিলে ঠিক হইয়া যাইবনি সব।

পরদিন থেকে শিক্ষা শুরু হয় জমিলার। ঘুম থেকে উঠে বাসি খিচুড়ি গোগ্রাসে গিলে খেয়ে সে উঠানে নেবেছে এমন সময় মজিদ ফিরে আসে বাইরে থেকে। এ-সময়ে সে বাইরেই থাকে। ফজরের নামাজ পড়ে সারা সকাল কোরান শরিফ পাঠ করে। আজ নামাজ পড়েই সোজা ভেতরে চলে এসেছে।

মজিদের মুখ গম্ভীর। ততোধিক গম্ভীরকণ্ঠে জমিলাকে ডেকে বলে, কাইল তুমি আমারে বে-ইজ্জত করছ। খালি তা না, তুমি তাঁনারে নারাজ করছ। আমার দিলে বড় ডর উপস্থিত হইছে। আমার উপর তাঁনার এৎবার না থাকলে আমার সর্বনাশ হইব। একটু থেমে মজিদ আবার বলে,—আমার দয়ার শরীল। অন্য কেউ হইলে তোমারে দুই লাথি দিয়া বাপের বাড়িত পাঠাইয়া দিত। আমি দেখলাম, তোমার শিক্ষা হয় নাই, তোমারে শিক্ষা দেওন দরকার। তুমি আমার বিবি হইলে কী হইব, তুমি নাজুক শিশু।

জমিলা আগাগোড়া মাথা নিচু করে শোনে। তার চোখের পাতাটি পর্যন্ত একবার নড়ে না। তার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মজিদ একটু রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করে,

—হুনছ নি কী কইলাম?

কোনো উত্তর আসে না জমিলার কাছ থেকে। তাঁর নির্বাক মুখের পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে মজিদের মাথায় সেই চিনচিনে রাগটা চড়তে থাকে। কণ্ঠস্বর আরো রুক্ষ করে সে বলে,

—দেখ বিবি, আমারে রাগাইও না। কাইল যে কামটা করছ তার পরেও আমি চুপচাপ আছি এই কারণে যে, আমার শরীলটা বড়ই দয়ার। কিন্তু বাড়াবাড়ি করিও না কইয়া দিলাম।

কোনো উত্তর পাবে না জেনেও আবার কতক্ষণ চুপ করে থাকে মজিদ। তারপর ক্রোধ সংযত করে বলে,

—তুমি আইজ রাইতে তারাবি নামাজ পড়বা। তারপর মাজারে গিয়া তানার কাছে মাফ চাইবা। তানার নাম মোদাচ্ছের। কাপড়ে ঢাকা মানুষরে কোরানের ভাষায় কয় মোদাচ্ছের। সালুকাপড়ে ঢাকা মাজারের তলে কিন্তু তানি ঘুমাইয়া নাই। তিনি সব জানেন, সব দেখেন।

তারপর মজিদ একটা গল্প বলে। বলে যে, একবার রাতে এশার নামাজের পর সে গেছে মাজার ঘরে। কখন তার ওজু ভেঙে গিয়েছিল খেয়াল করে নি। মাজার ঘরে পা দিতেই হঠাৎ কেমন একটি আওয়াজ কানে এল তার, যেন দূর জঙ্গলে শত-সহস্র সিংহ একযোগে গর্জন করছে। বাইরে কী একটা আওয়াজ হচ্ছে ভেবে সে ঘর ছেড়ে বেরুতেই মুহূর্তে সে আওয়াজ থেমে গেল। বড় বিস্মিত হল সে, ব্যাপারটার আগামাথা না বুঝে কতক্ষণ হতভম্বের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল। একটু পরে সে যখন ফের প্রবেশ করল মাজার ঘরে তখন শোনে আবার সেই শত-সহস্র সিংহের ভয়াবহ গর্জন। কী গর্জন, শুনে রক্ত তার পানি হয়ে গেল ভয়ে। আবার বাইরে গেল, আবার এল ভেতরে। প্রত্যেকবারই একই ব্যাপার। শেষে কী করে খেয়াল হল যে, ওজু নেই তার, নাপাক শরীরে পাক মাজার ঘরে সে ঢুকেছে। ছুটে গিয়ে মজিদ তালাবে ওজু বানিয়ে এল। এবার যখন সে মাজার ঘরে এল তখন আর কোনো আওয়াজ নেই। সে-রাতে দরগার কোলে বসে অনেক অশ্রু-বিসর্জন করল মজিদ।

গল্পটা মিথ্যে। এবং সজ্ঞানে ও সুস্থদেহে মিথ্যা কথা বলেছে বলে মনে-মনে তওবা কাটে মজিদ। যাহোক, জমিলার মুখের দিকে চেয়ে মজিদের মনের আফসোস ঘোচে। যে অত কথাতেও একবার মুখ তুলে তাকায় নি সে মাজারপাকের গল্পটা শুনে চোখ তুলে তাকিয়ে আছে তার পানে। চোখে কেমন ভীতির ছায়া। বাইরে অটুট গাম্ভীর্য বজায় রাখলেও মনে-মনে মজিদ কিছু খুশি না হয়ে পারে না। সে বোঝে, তার শ্রম সার্থক হবে, তার শিক্ষা ব্যর্থ হবে না।

—তয় তুমি আইজ রাইতে নামাজ পড়বা তারাবির, আর পরে তানার কাছে মাফ চাইবা।

জমিলা ততক্ষণে চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কথার কোনো উত্তর দেয় না।

তারাবিই হোক আর যাই হোক, সে-রাতে দীর্ঘকাল সময় জমিলা জায়নামাজে ওঠাবসা করে। ঘরসংসারের কাজ শেষ করে রহিমা যখন ভেতরে আসে তখনো তার নামাজ শেষ হয় নি। দেখে মন তার খুশিতে ভরে ওঠে। ওঘরে মজিদ হুঁকায় দম দেয়। আওয়াজ শুনে মনে হয় তার ভেতরটাও কেমন তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। রহিমা ওজু বানিয়ে এসেছে, সেও এবার নামাজটা সেরে নেয়। তারপর পা টিপতে হবে কিনা এ-কথা জানার অজুহাতে মজিদের কাছে গিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে মনের খুশির কথা প্রকাশ করে। উত্তরে মজিদ ঘন-ঘন হুঁকায় টান মারে, আর চোখটা পিটপিট করে আত্মসচেতনতায়।

রহিমা কিছুক্ষণের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর পা টেপে। হাড়সম্বল কালো কঠিন পা, মৃতের মতো শীতল শুষ্ক তার চামড়া। কিন্তু গভীর ভক্তিভরে সে-পা টেপে রহিমা, ঘুণধরা হাড়ের মধ্যে যে-ব্যথার রস টনটন করে তার আরাম করে।

সুখভোগ নীরবেই করে মজিদ। হুঁকায় তেজ কমে এসেছে, তবু টেনে চলে। কানটা ওধারে। নীরবতার মধ্যে ওঘর হতে থেকে-থেকে কাচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার ভেসে আসে। সে কান পেতে শোনে সে-ঝঙ্কার।

সময় কাটে। রাত গভীর হয়ে ওঠে বাঁশঝাড়ে, গাছের পাতায় আর মাঠে-ঘাটে। একসময়ে রহিমা আস্তে উঠে চলে যায়। মজিদের চোখেও একটু তন্দ্রার মতো ভাব নামে। একটু পরে সহসা চমকে জেগে উঠে সে কান খাড়া করে। ওধারে পরিপূর্ণ নীরবতা : সে-নীরবতার গায়ে আর চুড়ির চিকন আওয়াজ নেই।

ধীরে-ধীরে মজিদ ওঠে। ওঘরে গিয়ে দেখে, জায়নামাজের ওপর জমিলা সেজদা দিয়ে আছে। এখুনি উঠবে—এই অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ। জমিলা কিন্তু ওঠে না।

ব্যাপারটা বুঝতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না মজিদের। নামাজ পড়তে-পড়তে সেজদায় গিয়ে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দস্যুর মতো আচমকা এসেছে সে-ঘুম, এক পলকের মধ্যে কাবু করে ফেলেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মজিদ, বোঝে না কী করবে। তারপর সহসা আবার সে-চিনচিনে ক্রোধ তার মাথাকে উত্তপ্ত করতে থাকে। নামাজ পড়তে-পড়তে যার ঘুম এসেছে তার মনে ভয় নাই এ-কথা স্পষ্ট। মনে নিদারুণ ভয় থাকলে মানুষের ঘুম আসতে পারে না কখনো। এবং এত করেও যার মনে ভয় হয় নি, তাকেই এবার ভয় হয় মজিদের।

হঠাৎ দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে সেদিনকার মতো এক হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বসিয়ে দেয় জমিলাকে। জমিলা চমকে উঠে তাকায় মজিদের পানে, প্রথমে চোখে জাগে ভীতি, তারপর সে-চোখ কালো হয়ে আসে।

মজিদ গোঁ গোঁ করে ক্রোধে। রাতের নীরবতা এত ভারি যে, গলা ছেড়ে চিৎকার করতে সাহস হয় না, কিন্তু একটা চাপা গর্জন নিঃসৃত হয় তার মুখ দিয়ে। যেন দূর আকাশে মেঘ গর্জন করে গড়ায়, গড়ায়।

—তোমার এত দুঃসাহস? তুমি জায়নামাজেই ঘুমাইছ? তোমার দিলে একটু ভয়ডর হইব না?

জমিলা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। ভয়ে নয়, ক্রোধে। গোলমাল শুনে রহিমা পাশের বিছানা থেকে উঠে এসেছিল, সে জমিলার কাঁপুনি দেখে ভাবলে দুরন্ত ভয় বুঝি পেয়েছে মেয়েটার। কিন্তু গর্জন করছে মজিদ, গর্জন করছে খোদাতা'লার ন্যায়বাণী, তাঁর নাখোশ দিল। মজিদের ক্রোধ তো তাঁরই বিদ্যুচ্ছটা, তাঁরই ক্রোধের ইঙ্গিত। কী আর বলবে রহিমা! নিদারুণ ভয়ে সেও অসাড় হয়ে যায়। তবে জমিলার মতো কাঁপে না।

বাক্যবাণ নিষ্ফল দেখে আরেকটা হ্যাঁচকা টান দেয় মজিদ। শোয়া থেকে আচমকা একটা টানে যে উঠে বসেছিল, তাকে তেমনি একটা টান দিয়ে দাঁড় করাতে বেগ পেতে হয় না। বরঞ্চ কিছু বুঝে উঠবার আগেই জমিলা দেখে যে, সে দাঁড়িয়ে আছে, যদিও খুব শক্তভাবে নয়। তারপর সে আপন শক্তিতে সুস্থির হয়ে দাঁড়াল, এবং কাঁপতে থাকা ঠোঁটকে উপেক্ষা করে শান্তদৃষ্টিতে একবার নিজের ডান হাতের কব্জির পানে তাকাল। হয়তো ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ব্যথার স্থান শুধু দেখল। তাতে হাত বুলাল না। বুলোবার ইচ্ছে থাকলেও অবসর পেল না। কারণ আরেকটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মজিদ তাকে নিয়ে চলল বাইরের দিকে।

উঠানটা তখনো পেরোয়নি, বিভ্রান্ত জমিলা হঠাৎ বুঝল কোথায় সে যাচ্ছে। মজিদ তাকে মাজারে নিয়ে যাচ্ছে। তারাবির নামাজ পড়ে মাজারে গিয়ে মাফ চাইতে হবে সে-কথা মজিদ আগেই বলেছিল, এবং সেই থেকে একটা ভয়ও উঠেছিল জমিলার মনে। মাজারের ত্রিসীমানায় আজ পর্যন্ত ঘেঁষে নি সে। সকালে আজ মজিদ যে-গল্পটা বলেছিল, তারপর থেকে মাজারের প্রতি ভয়টা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসল জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিল, এখন সে সমস্ত শক্তিসংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারল না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুতু নিক্ষেপ করল।

পেছনে-পেছনে রহিমা আসছিল কম্পিত বুক নিয়ে। আবছা অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারল না; এও বুঝল না মজিদ অমন বজ্রাহত মানুষের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন। কিছু না বুঝে সে বুকের কাছে আঁচল শক্ত করে ধরে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মজিদ যেন সত্যি বজ্রাহত হয়েছে। জমিলা এমন একটি কাজ করেছে যা কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি কেউ করতে পারে। যার কথায় গ্রাম ওঠে-বসে, যার নির্দেশে খালেক

ব্যাপারির মতো প্রতিপত্তিশালী লোকও বউ তালাক দেয় দ্বিরুক্তি মাত্র না করে, যার পা খোদাভাবমত্ত লোকেরা চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়, তার প্রতি এমন চরম অশ্রদ্ধা কেউ দেখাতে পারে সে-কথা ভাবতে না পারাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে মজিদ রহিমার পানে তাকাল, তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল,

—হে আমার মুখে থুতু দিল।

একটু পরে অন্ধকার থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল রহিমা,

—কী করলা বইন তুমি, কী করলা!

তার আর্তনাদে কী ছিল কে জানে, কিন্তু ক্রোধে থরথর করে কাঁপতে থাকা জমিলা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মনে-প্রাণে। কী একটা গভীর অন্যায়ের তীব্রতায় খোদার আরশ পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে।

মজিদ রহিমার চিৎকার শুনল কি শুনল না, কিন্তু ওধারে তাকাল না, কোনো কথাও বলল না। আরো কিছুক্ষণ সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ হাত-কাটা ফতুয়ার নিম্নাংশ দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল। ইতিমধ্যে তার ডান হাতের বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে জমিলার হাতটি ঢিলা হয়ে গেছে; সে-হাত ছাড়িয়ে নেবার আর চেষ্টা নেই, বন্দি হয়ে আছে বলে প্রতিবাদ নেই। তার হাতের লইট্টা মাছের মতো হাড়গোড়হীন তুলতুলে নরম ভাব দেখে মজিদ অসতর্ক হবার কোনো কারণ দেখল না; সে নিজের বজ্রমুষ্টিকে আরো কঠিনতর করে তুলল। তারপর হঠাৎ দু-পা এগিয়ে এসে এক নিমেষে তাকে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে আবার দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল বাইরের দিকে। ভেবেছিল, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে জমিলা, কিন্তু তার ক্ষুদ্র অপরিণত দেহটা নেতিয়ে পড়ে থাকল মজিদের অর্ধচক্রাকারে প্রসারিত দুই বাহুতে। এত নরম তার দেহের ঘনিষ্ঠতা যে তারার ঝলকানির মতো এক মুহূর্তের জন্য মজিদের মনে ঝলকে ওঠে একটা আকুলতা; তা তাকে তার বুকের মধ্যে ফুলের মতো নিষ্পেষিত করে ফেলবার। কিন্তু সে-ক্ষুদ্র লতার মতো মেয়েটির প্রতিই ভয়টা দুর্দান্ত হয়ে উঠল। এবারেও সে অসতর্ক হল না। এখন গা-ঢেলে নিস্তেজ হয়ে থাকলে কী হবে বিষাক্ত সাপকে দিয়ে কিছু বিশ্বাস নেই।

জমিলাকে সোজা মাজার ঘরে নিয়ে ধপাস করে তার পাদপ্রান্তে বসিয়ে দিল মজিদ। ঘর অন্ধকার। বাইরে থেকে আকাশের যে অতি ম্লান আলো আসে তা মাজার ঘরের দরজাটিকেই কেবল রেখায়িত করে রাখে, এখানে সে আলো পৌঁছায় না। এখানে যেন মৃত্যুর আর ভিন্ন অপরিচিত দুনিয়ার অন্ধকার; সে-অন্ধকারে সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই, মানুষের কুপিলণ্ঠন বা চকমকির পাথর নেই। খুন হওয়া মানুষের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে অন্ধের চোখে দৃষ্টির জন্য যে-তীব্র ব্যাকুলতা জাগে তেমনি একটা ব্যাকুলতা জাগে অন্ধকারের গ্রাসে জ্যোতিহীন জমিলার চোখে। কিন্তু সে দেখে না কিছু। কেবল মনে হয় চোখের সামনে অন্ধকারই যেন অধিকতর গাঢ় হয়ে রয়েছে।

তারপর হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ও দুরন্ত বাতাসের মতো বিভিন্ন সুরে মজিদ দোয়াদরুদ পড়তে শুরু করে। বাইরে আকাশ নীরব, কিন্তু ওর কণ্ঠে জেগে ওঠে দুনিয়ার যত অশান্তি আর মরণভীতি, সর্বনাশা ধ্বংস থেকে বাঁচবার তীব্র ব্যাকুলতা।

মজিদের কণ্ঠের ঝড় থামে না। জমিলা স্তব্ধ হয়ে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের দিকে, মাছের পিঠের মতো একটা ঘনবর্ণ স্তূপ রেখায়িত হয়ে ওঠে সামনে। মাজারের অস্পষ্ট চেহারার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জমিলার ভীত-চঞ্চল মনটা কিছু স্থির হয়ে এসেছে এমনি সময়ে বুক-ফাটা কণ্ঠে মজিদ হো হো করে উঠল। তার দুঃখের তীক্ষ্ণতায় সে কী ধার। অন্ধকারকে যেন চিড়চিড় করে দু-ফাঁক করে দিল। সভয়ে চমকে উঠে জমিলা তাকাল স্বামীর পানে। মজিদের কণ্ঠে তখন আবার দোয়া-দরুদের ঝড় জেগেছে, আর ঝড়ের মুখে পড়া ক্ষুদ্রপল্লবের মতো ঘূর্ণ্যমান তার অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত চোখ।

একটু পরে হঠাৎ জমিলা আর্তনাদ করে উঠল। আওয়াজটা জোরালো নয়, কারণ একটা

প্রচণ্ড ভীতি তার গলা দিয়ে যেন আস্ত হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারপর সে চুপ করে গেল। কিন্তু ঝড়ের শেষ নেই। ওঠা-নামা আছে, দিক পরিবর্তন আছে, শেষ নেই। এবং শেষ নেই বলে মানুষের আশ্বাসের ভরসা নেই।

ধাঁ করে জমিলা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু মজিদও ক্ষিপ্রভাবে উঠে দাঁড়াল। জমিলা দেখল পথ বন্ধ। যে-ঝড়ের উদ্দামতার জন্য নিশ্বাস ফেলবার যো নাই, সে-ঝড়ের আঘাতেই ডালপালা ভেঙে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। একটু দূরে খোলা দরজা, তারপর অন্ধকার আর তারাময় আকাশের অসীমতা। এইটুকুন পথ পেরোবার উপায় নাই।

জমিলাকে বসিয়ে কিছুক্ষণের জন্য দোয়া-দরুদ পড়া বন্ধ করে মজিদ। এই সময় সে বলে,

—দেখ, আমি যেইভাবে বলি সেইভাবে কর। আমার হাত হইতে দুষ্ট আত্মা, ভূত-প্রেতও রক্ষা পায় নাই। এই দুনিয়ার মানুষরা যেমন আমারে ভয় করে শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় করে, শ্রদ্ধা করে অন্য দুনিয়ার জিন-পরীরা। আমার মনে হইতেছে, তোমার ওপর কারো আছর আছে। না হইলে মাজারপাকের কোলে বইসাও তোমার চোখে এখনো পানি আইল না কেন, কেন তোমার দিলে একটু পাশেমানির ভাব জাগল না? কেনই-বা মাজারপাক তোমার কাছে আগুনের মতো অসহ্য লাগতাছে?

এই বলে সে একটা দড়ি দিয়ে কাছাকাছি একটা খুঁটির সঙ্গে জমিলার কোমর বাঁধল। মাঝখানের দড়িটা ঢিলা রাখল, যাতে সে মাজারের পাশেই বসে থাকতে পারে। তারপর ভয়ে অসাড় হয়ে যাওয়া জমিলার দিকে শান্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,

—তোমার জন্য আমার মায়া হয়। তোমারে কষ্ট দিতেছি তার জন্য দিলে কষ্ট হইতেছে। কিন্তু মানুষের ফোড়া হইলে সে-ফোড়া ধারালো ছুরি দিয়া কাটতে হয়, জিনের আছর হইলে বেত দিয়া চাবকাইতে হয়, চোখে মরিচ দিতে হয়। কিন্তু তোমারে আমি এইসব করুম না। কারণ মাজারপাকের কাছে রাতের এক পহর থাকলে যতই নাছোড়বান্দা দুষ্ট আত্মা হোক না কেন, বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব। কাইল তুমি দেখবা দিলে তোমার খোদার ভয় আইছে, স্বামীর প্রতি ভক্তি আইছে, মনে আর শয়তানি নাই।

মনে-মনে মজিদ আশঙ্কা করেছিল, জমিলা হঠাৎ তারস্বরে কাঁদতে শুরু করবে। কিন্তু আশ্চর্য, জমিলা কাঁদলও না, কিছু বললও না, দরজার পানে তাকিয়ে মূর্তির মতো বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে গলা উঁচিয়ে বলল,

—ঝাপটা দিয়া গেলাম। কিন্তু তুমি চুপ কইরা থাইক না। দোয়া-দরুদ পড়, খোদার কাছে আর তানার কাছে মাফ চাও।

তারপর সে ঝাপ দিয়ে চলে গেল।

ভেতরে বেড়ার কাছে তখনো দাঁড়িয়ে রহিমা। মজিদকে দেখে সে অস্ফুটকণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

—হে কই?

—মাজারে। ওর ওপর আছর আছে। মাজারে কিছুক্ষণ থাকলে বাপ-বাপ ডাক ছাড়ি পলাইব হে-জিন।

—ও ভয় পাইব না?

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মজিদ। বিস্মিত হয়ে বললে,

—কী যে কও তুমি বিবি? মাজারপাকের কাছে থাকলে কিসের ভয়? ভয় যদি কেউ পায় তায় তা ওই দুষ্ট জিনটাই পাইব, যে আমার মুখে পর্যন্ত থুতু দিছে।

কথাটা মনে হতেই দাঁত কড়মড় করে উঠল মজিদের। দম খিঁচে ক্রোধ সংবরণ করে সে আবার বললে,

—তুমি ঘরে গিয়া শোও বিবি।

রহিমা ঘরে চলে গেল। গিয়ে ঘুমাল কি জেগে রইল তার সন্ধান নেবার প্রয়োজন বোধ করল না মজিদ। মধ্যরাতের স্তব্ধতার মধ্যে সে ভেতরের ঘরের দাওয়ার ওপর চুপচাপ বসে রইল। যে-কোনো মুহূর্তে বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা যাবে—এই আশায় সে নিজের শ্বসনকে নিঃশব্দ-প্রায় করে তুলল। কিন্তু ওধারে কোনো আওয়াজ নাই। থেকে-থেকে দূরে প্যাঁচা ডেকে উঠছে, আরো দূরে কোথাও একটা দীর্ঘ গাছের আশ্রয়ে শকুনের বাচ্চা নবজাত মানবশিশুর মতো অবিশ্রান্ত কেঁদে চলেছে, অন্ধকারের মধ্যে একটা বাদুড় থেকে-থেকে পাক খেয়ে যাচ্ছে। রাতটা গুমোট মেরে আছে, গাছের পাতার নড়চড় নেই। বাইরে বসেও মজিদের কপালে ঘাম জমছে বিন্দু-বিন্দু।

সময় কাটে, ওধারে তবু কোনো আওয়াজ নেই। মুমূর্ষু রোগীর পাশে শেষ-নিশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় অনাত্মীয় সুহৃদ লোক যেমন নিশ্চল হয়ে বসে থাকে, তেমনি বসে থাকে মজিদ, গাছের পাতার মতো তারও নড়চড় নেই।

আরো সময় কাটে। এক সময় মজিদ বয়সের দোষে বসে থেকেই একটু আলগোছে ঝিমিয়ে নেয়, তারপর দূর আকাশে মেঘগর্জন শুনে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় দিগন্তের দিকে। যে-রাত সেখানে এখন অপেক্ষাকৃত তরল হয়ে আসার কথা সেখানে ঘনীভূত মেঘস্তূপ। থেকে-থেকে বিজলি চমকায়, আর শীঘ্র ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বয়ে আসতে থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। দেহের আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসে মজিদ, মুখে পালকস্পর্শের মতো সে শিরশিরে শীতল হাওয়া বেশ লাগে, এবং সেই আরামে কয়েক মুহূর্ত চোখও বোজে সে। কিন্তু কান খাড়া হয়ে ওঠার সাথে-সাথে চোখটাও তার খুলে যায়। সে দেখে না কিছু, শোনেও না কিছু। মেঘ-দেখা সারা, এবার সে শুনতে চায়। কিন্তু ওধারে এখনো প্রগাঢ় নীরবতা।

আর কতক্ষণ! নড়েচড়ে ভাবে মজিদ, তারপর নিরলস দৃষ্টি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসতে থাকা ঘনকালো মেঘের পানে তাকিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে রহিমা একবার ছায়ার মতো এসে ঘুরে যায়। ওর দিকে মজিদ তাকায়ও না একবার, না ঘুমিয়ে অত রাতে সে কেন ঘুরছে-ফিরছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করবারও কোনো তাগিদ বোধ করে না। তার মনে যেন কোনো প্রশ্ন নেই, নেই অস্থিরতা, অপেক্ষা থাকলেও এবং সে-অপেক্ষা যুগযুগ ব্যাপী দীর্ঘ হলেও কোনো উদ্বেগ আসবে না। কিছু দেখবার নেই বলেই যেন সে বসে-বসে মেঘ দেখে।

মেঘগর্জন নিকটতর হয়। এবার যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন সারা দুনিয়া ঝলসে উঠে সাদা হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত অত্যুজ্জ্বল আলোর মধ্যে নিজেকে উলঙ্গ বোধ হলেও মজিদ চিরে দু-ফাঁক হয়ে যাওয়া আকাশ দেখে এ-মাথা থেকে সে-মাথা, তারপর প্যাঁচার মতো মুখ গোমড়া করে তাকিয়ে থাকে অন্ধকারের পানে। সে-অন্ধকারে তবু চোখ পিটপিট করে, আশায় আর আকাঙ্ক্ষায়। সে-আশা-আকাঙ্ক্ষা অবসর উপভোগীর অলস বিলাস মাত্র। চোখ তার পিটপিট করে আর পুনর্বার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় থাকে। খোদার কুদরত প্রকৃতির লীলা দেখবার জন্যই যেন সে বসে আছে ঘুম না গিয়ে, আরাম না করে। হয়তো-বা সে এবাদত করে। এবাদতের রকমের শেষ নাই। প্রকৃতির লীলা চেয়ে-চেয়ে দেখাও একরকম এবাদত।

আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আকাশ অনেকক্ষণ থমথম করে। রাতও কাটি-কাটি করে কাটে না, পাড়াগাঁয়ের থিয়েটারের যবনিকার মতো সময় পেরিয়ে গেলেও রাত্রির যবনিকা ওঠে না। প্রকৃতি-অবলোকনের এবাদতই যদি করে থাকে মজিদ তবে তার মনে ঈষৎ বিরক্তি ধরে যেন, কারণ ভ্রূর কাছটা একটু কুঁচকে যায়।

তারপর হঠাৎ ঝড় আসে। দেখতে না দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে যায় ঘন কালো মেঘে, তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় গাছপালা গোঙায়, থরথর করে কাঁপে মানুষের বাড়িঘর। মজিদ উঠে

আসে ভেতরে। ভাবে, ঝড় থামুক। কারণ আর দেরি নয়, ওধারে মেঘের আড়ালে প্রভাত হয়েছে। সুবেহ্ সাদেক। নির্মল, অতি পবিত্র তার বিকাশ। যে-রাতে অসংখ্য দুষ্ট আত্মারা ঘুরে বেড়ায় সে-রাতের শেষ; নোতুন দিনের শুরু। মজিদের কণ্ঠে গানের মতো গুনগুনিয়ে ওঠে পাঁচ পদের ছুরা আল-ফালাখ। সন্ধ্যার আকাশে অস্তগামী সূর্য দ্বারা ছড়ানো লাল আভাকে যে কুৎসিত ভয়াবহ অন্ধকার মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, সে-অন্ধকারের শয়তানি থেকে আমি আশ্রয় চাই, চাই তোমারই কাছে হে খোদা, হে প্রভাতের মালিক। আমি বাঁচতে চাই যত অন্যায় থেকে, শয়তানের মায়াজাল থেকে আর যত দুর্বলতা থেকে, হে দিনাদির অধিকারী।

এদিকে প্রভাতের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। ঝড়ের পরে আসে জোরালো বৃষ্টি। অসংখ্য তীরের ফলার মতো সে-বৃষ্টি বিদ্ধ করে মাটিকে। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আসে শিলাবৃষ্টি। মজিদের ঢেউ-তোলা টিনের ছাদে যখন পথভ্রষ্ট উল্কার মতো প্রথম শিলাটি এসে পড়ে তখন হঠাৎ মজিদ সোজা হয়ে উঠে বসে, কান তার খাড়া হয়ে ওঠে বিপদসঙ্কেত শুনে। শীঘ্র অজস্র শিলাবৃষ্টি পড়তে শুরু করে।

তড়িৎবেগে মজিদ উঠে দাঁড়ায়। ভয়ে তার মুখটা কেমন কালো হয়ে গেছে। দু-পা এগিয়ে ওধারে তাকিয়ে সে বলে, বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে !

পরিষ্কার প্রভাতের অপেক্ষায় রহিমা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। সে কোনো উত্তর দেয় না। মজিদ আরেকটু এগিয়ে যায়, তারপর আবার উৎকণ্ঠিত গলায় বলে,

—বিবি, শিলাবৃষ্টি শুরু হইছে !

রহিমা এবারও উত্তর দেয় না। তার আবছা চোখের পানে চেয়ে মনে হয়, সে-চোখ যেন জমিলার সেদিনকার চোখের মতো হয়ে উঠেছে—যেদিন সাতকুলখাওয়া খ্যাংটা বুড়ি এসে আর্তনাদ করেছিল।

এদিকে আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মতো খণ্ডখণ্ড বরফের অজস্র টুকরো, হয় জমাট বৃষ্টিপাত। দিনের বেলা হলে বাছুরগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটত, এক-আধটা হয়তো আঘাত খেয়ে শুয়েও পড়ত, কাদের মিঞার পেটওয়ালা ছাগলটা ডাকতে ডাকতে হয়রান হত। বউরা আসত বেরিয়ে, ছেলেরা ছুটত বাইরে, লুফে-লুফে খেত খোদার ঢিল। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।

ছেলে-ছোকরারা আনন্দ করলেও বয়স্ক মানুষের মুখ কালো হয়ে আসে—তা দিনরাতের যখনই শিলাবৃষ্টি হোক না কেন। কারণ মাঠে-মাঠে নধর কচি ধান ধ্বংস হয়ে যায়, শিলার আঘাতে তার শীষ ঝরে-ঝরে পড়ে মাটিতে। যারা দোয়া-দরুদ জানে তারা তখন ঝড়ের মুখে পড়া নৌকার যাত্রীদের মতো আকুলকণ্ঠে খোদাকে ডাকে, যারা জানে না তারা পাথর হয়ে বসে থাকে।

রহিমার কাছে উত্তর না পেয়ে এলেমদার মানুষ মজিদ খোদাকে ডাকতে শুরু করে। একবার ছুটে দরজার কাছে যায়, সর্ষের মতো উঠানে ছেয়ে যাওয়া শিলা দেখে, তারপর আবার দোয়া-দরুদ পড়ে পায়চারি করে দ্রুতপদে। একসময়ে রহিমার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বলে,

—কী হইল তোমার? দেখ না শিলাবৃষ্টি পড়ে!

একবার নড়বার ভঙ্গি করে রহিমা, কিন্তু তবু কিছু বলে না। পোষা জীবজন্তু একদিন আহার মুখে না দিলে যে-রহিমা অস্থির হয়ে ওঠে দুশ্চিন্তায়, দুটো ভাত অযথা নষ্ট হলে যে আফসোস করে বাঁচে না, সে-ই মাঠে-মাঠে কচি নধর ধান নষ্ট হচ্ছে জেনেও চুপ করে থাকে। এবং যে-রহিমার বিশ্বাস পর্বতের মতো অটল, যার আনুগত্য ধ্রুবতারার মতো অনড়, সে-ই যেন হঠাৎ মজিদের আড়ালে চলে যায়, তার কথা বোঝে না।

মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,

—কী হইল তোমার বিবি?

রহিমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,

—ধান দিয়া কী হইব মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।

কী একটা কথা বলতে গিয়েও মজিদ বলে না। তারপর শিলাবৃষ্টি থামলে সে বেরিয়ে যায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে তখনো, আকাশ এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত মেঘাবৃত। তবু তা ভেদ করে একটা ধূসর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে।

ঝাপটা খুলে মজিদ দেখল, লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নাই। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বলে সে-বুকটা বালকের বুকের মতো সমান মনে হয়। আর মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। পায়ের দুঃসাহস দেখে মজিদ মোটেই ক্রুদ্ধ হয় না; এমনকি তার মুখের একটি পেশিও স্থানান্তরিত হয় না। সে নত হয়ে ধীরে-ধীরে দড়িটা খোলে, তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়ে আসে। বিছানায় শুইয়ে দিতেই রহিমা স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

—মরছে নাকি?

প্রশ্নটি এই রকম যে মজিদের ইচ্ছা হয় একটা হুঙ্কার ছাড়ে। কিন্তু কেন কে জানে সে কোনো উত্তর দিতে পারে না। শেষে কেবল সংক্ষিপ্তভাবে বলে,

—না। একটু থেমে আস্তে বলে, ওর ঘোর এখনো কাটে নাই। আছর ছাড়লে এই রকমটা হয়।

সে-কথায় কান না দিয়ে জমিলার কাছে দাঁড়িয়ে রহিমা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে। তারপর কী একটা প্রবল আবেগের বশে সে তার দেহে ঘন-ঘন হাত বুলাতে শুরু করে। মায়া যেন ছলছল করে জেগে উঠে হঠাৎ বন্যার মতো দুর্বার হয়ে ওঠে, তার কম্প্রমান আঙ্গুলে সে-বন্যার উচ্ছ্বাস জাগে; তারই আবেগে বার-বার বুজে আসে চোখ।

মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলটপালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণযন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—দুনিয়াটা বিবি বড় কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র। দয়া-মায়া সকলেরই আছে। কিন্তু তা যেন তোমারে আঁধা না করে।

তারপর সে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে মাঠের দিকে হাঁটতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ক্ষেতের প্রান্তে লোক জমা হয়েছে অনেক। কারো মুখে কথা নেই। মজিদকে দেখে কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে—সব তো গেল! এইবার নিজেই-বা খামু কী, পোলাপানদেরই-বা দিমু কী?

মজিদের বিনিদ্র মুখটা বৃষ্টিঝরা প্রভাতের ম্লান আলোয় বিবর্ণ কাঠের মতো শক্ত দেখায়। সে কঠিনভাবে বলে,

—নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো।

এরপর আর কারো মুখে কথা যোগায় না। সামনে ক্ষেতে-ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে-পড়া ধানের ধ্বংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে-চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে-চোখ।

চাঁদের অমাবস্যা

এই উপন্যাসটির বেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপ্‌স্‌ পর্বত অঞ্চলে পাইন-ফার-এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লেখা হয়। মঁসিয় পিয়ের তিবো এবং মাদাম ঈভন তিবোকে তাঁদের সহৃদয় আতিথ্যের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এক

শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারাত, তখনো কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো-অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরি লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। চোখটা খোলা মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ সুতীব্র হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।

কিন্তু কখন সে মৃতদেহটি প্রথম দেখে? এক-ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা আগে? হয়তো ইতিমধ্যে এক প্রহর কেটে গেছে, কিন্তু যুবক শিক্ষক সে কথা বলতে পারবে না। মনে আছে সে বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চতুর্দিকে ঝলমলে জ্যোৎস্নালোক, চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। তখন সে দৌড়তে শুরু করে নাই। বাঁশঝাড়ের সামনেই পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সে তাকে দেখতে পায়। ধীরপদে হেঁটেই যেন সে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, নিরাকার বর্ণহীন মানুষ। হয়তো তার দিকে কয়েক মুহূর্ত সে তাকিয়ে ছিলও। তারপর সে দৌড়তে শুরু করে।

তখন থেকে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি করছে। হয়তো এক প্রহর হল ছুটাছুটি করছে। চরকির মতো, লেজে কেরোসিনের টিন বেঁধে দিলে কুকুর যেমন ঘোরে তেমনি। কেন তা সে বলতে পারবে না। কেবল একটা দুর্বোধ্য নির্দয় তাড়না বোধ করে বলে দিশেহারা হয়ে অবিশ্রান্তভাবে মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করে, অফুরন্ত জ্যোৎস্নালোকে কোথাও গা-ঢাকা দেবার স্থান পায় না, আবার ছায়াচ্ছন্ন স্থানে নিরাপদও বোধ করে না। গভীর রাতে এমন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চাদ্ধাবিত অসহায় পশুর মতো সে জীবনে কখনো ছুটাছুটি করে নাই। অবশ্য গ্রামবাসী অনভিজ্ঞ যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহও কখনো দেখে নাই।

তারপর একটি অদ্ভুত কারণেই সে হঠাৎ থেমে একটা আইলের পাশে উবু হয়ে বসে নিঃশব্দ রাতে সশব্দে হাঁপাতে থাকে। ওপরে ঝলমলে জ্যোৎস্না, কিন্তু সামনে নদী থেকে কুয়াশা উঠে আসছে। কুয়াশা না আর কিছু, হয়তো সে ঠিক বোঝে না। হয়তো একদল সাদা বকরি দেখে, যার শিং-দাঁত-চোখ কিছুই নাই। হয়তো মনে হয় রাত্রি গা মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে বসেছে, চোখ-ধাঁধানো অন্তহীন জ্যোৎস্নালোকে জীবনের আভাস দেখা দিয়েছে। হঠাৎ আশ্রয় লাভের আশায় তার চোখ জ্বলজ্বল করতে শুরু করে।

অবশেষে মাঠ-ঘাট কুয়াশায় ঢেকে যায়, ওপরে চাঁদের গোলাকার অস্তিত্বের অবসান ঘটে। কুয়াশায় আবৃত হয়ে যুবক শিক্ষক গুটি মেরে বসে থাকে। হাঁপানি তখন কিছু কমেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ভয়টাও যেন পড়েছে কিছু। যেখানে বসেছিল সেখানে বসেই কেবল লুঙ্গি

তুলে সরলচিত্তে লাঙ্গল-দেয়া মাঠে সে প্রস্রাব করে। মনে হয় মাথাটা যেন সাফ হয়ে আসছে। বুক থেকে ভারি কিছু নাবতে শুরু করেছে দেখে সহসা মুক্তির ভাব এলে সে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে, মনে হয় সে কাঁদবে। কিন্তু সে কাঁদে না। চারধারে গভীর নীরবতা। সে নিশ্চল হয়ে মাথা গুঁজে বসে যেন কারো অপেক্ষা করে।

শ্লথগতি হলেও কুয়াশা সদাচঞ্চল। নড়ে-চড়ে, ঘন হয়, হাল্কা হয়। সুতরাং এক সময়ে হঠাৎ চমকে উঠে উপরের দিকে তাকালে যুবক শিক্ষকের শীর্ণ মুখে এক ঝলক রূপালি আলো পড়ে। স্বচ্ছ-পরিষ্কার আকাশে কুয়াশামুক্ত চাঁদ আবার ঝলমল করে। স্নিগ্ধ প্রশান্ত চাঁদের মুখ দেখে অকারণে সভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে আবার ছুটতে শুরু করে। ওপরে চাঁদ হেলে-দোলে, হয়তো হাসেও। নির্দয় চাঁদের চোখ মস্ত। যুবক শিক্ষক প্রাণভয়ে ছোটে। যত ছোটে, ততই তার ভয় বাড়ে। সামনে কিছু নাই, তবু দেখে লোকটি দাঁড়িয়ে। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডাকতে শুরু করে। তার মনে হয় একটি হিংস্র কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। তারপর সে দেখে, বাঁশঝাড়ের সে মৃতদেহটি তার পথ বন্ধ করে লাঙ্গল-দেয়া মাটিতে বাঁকা হয়ে শুয়ে আছে। অর্ধ-উলঙ্গ দেহে প্রাণ নাই তবু একেবারে নিশ্চল নয়। কোথায় যাবে যুবক শিক্ষক? তার হিমশীতল শরীর নিশ্চল, শীর্ণমুখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

আবার যখন সে দৌড়তে শুরু করে তখন কিছু দূরে গিয়ে মাটির দলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মুখ থেকে একটা ক্ষুদ্র কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বের হয়। তারপর মাটিতে মুখ গুঁজে সে নিস্তেজভাবে পড়ে থাকে। শীঘ্র তার পিঠ শিরশির করে ওঠে। পিঠে সাপ চড়েছে যেন। বুকে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়, অবাধে ঘাম ছোটে। সে বুঝতে পারে লোকটি দাঁড়িয়ে তারই পিঠের উপর। মুখ না তুলেই দেখতে পায় তাকে : বিশালকায় দেহ, তার ছায়াও বিশালাকার। যুবক শিক্ষক এবার নিতান্ত নিঃসহায় বোধ করতে শুরু করে। জীবনের শেষ মুহূর্তে দেহ গলে যায়, সর্বশক্তির অবসান ঘটে। আর কিছু করবার নাই বলে সে অপেক্ষা করে। সময় কাটে। আরো সময় কাটে, কিন্তু কিছুই ঘটে না। অবশেষে এক সময়ে পিঠ থেকে সাপ নাবে, বিশালাকার ছায়াও সরে যায় এবং যুবক শিক্ষকের নাকে মাটির গন্ধ লাগে। মাথা তুলে সে ধীরে-ধীরে এধার-ওধার তাকায়, বাঁ-দিকে, ডান-দিকে। কুয়াশা নাই। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত ধবধবে মাঠে কেউ নাই। দূরে একটা কুকুর বেদনার্তকণ্ঠে আর্তনাদ করে। তাছাড়া চারধার নিঃশব্দ। একচোখা চাঁদ সহস্র চোখে জনশূন্য পথপ্রান্তর পর্যবেক্ষণ করে। চাঁদ নয়, যেন সূর্য।

হাঁটুতে ভর করে যুবক শিক্ষক উঠে বসে, মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। আলোয়ান দিয়ে মুখের ঘাম মোছে, চোখের উদ্‌ভ্রান্তি কাটে। কেবল থেকে-থেকে নিচের ঠোঁটটা থরথর করে কাঁপে। অনেকক্ষণ সে বসে থাকে নতমুখে। আবার যখন সে মুখ তোলে তখন কুয়াশার পুনরাগমন হয়েছে। সে-কুয়াশা ভেদ করে কেমন অহেতুক, উদ্দেশ্যহীনভাবে সে তাকাবার চেষ্টা করে। চোখে এখন নিস্তেজ ভাব, মনের ভয়টাও যেন দূর হয়েছে। তারপর আবার সে তাকে দেখতে পায়। একটু দূরে বটগাছ, আবছা-আবছা চোখে পড়ে। শিকড়ে-শিকড়ে দৃঢ়বদ্ধ গাছটি অস্পষ্ট আলোয় ভাসে, যেন পানিতে আমজ্জ হয়ে আছে গাছটি। যুবক শিক্ষক বারকয়েক মাথা নাড়ে। বটগাছের পাশেই ছায়ার মতো সে দাঁড়িয়ে। জট নয় শাখা নয়, সে-ই দাঁড়িয়ে। এখন আবছা দেখালেও সে আর নিরাকার বর্ণহীন মানুষ নয়।

আবার কী ভেবে যুবক শিক্ষক মাথা নাড়ে। তার মনে গভীর অবসাদ, কিন্তু আর ভয় নেই যেন। যে-মানুষ নিদারুণ ভয়ে বিকৃতমস্তিষ্কের মতো দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে এতক্ষণ ছুটাছুটি করেছিল, সে-মানুষ এখন ভয়মুক্ত। বটগাছের পাশে ছায়াটিকে তার আর ভয় নাই।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘরাভিমুখে হাঁটতে শুরু করে। সবুজ আলোয়ানে আবৃত তার শীর্ণ শরীর দীর্ঘ মনে হয়, পদক্ষেপে অসীম দুর্বলতার আভাস দেখা গেলেও তাতে সঙ্কোচ-দ্বিধা নাই। তার অনভিজ্ঞ মনে নিদারুণ আঘাতের ফলে যে-প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, সে-বিক্ষুব্ধতা বিদূরিত হয়েছে।

কোনোদিকে না তাকিয়েই সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। সে আর ভাবে না। ভাবতে চেষ্টা করলেও তার ভাবনা ধরবার কিছু পায় না। বৃহৎ গহ্বরে ধরবার কিছু নাই।

ঘরে ফিরে পাথরের মতো প্রাণহীন শরীরের উপর কাঁথা টেনে সে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকে। গভীর রাতে কোথাও কোনো শব্দ নাই। শব্দ হলেও তা তার কানে পৌঁছায় না। অন্ধকারের মধ্যে তার দৃষ্টি খুলে থাকলেও নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষীণতম শব্দও পাওয়া যায় না। তাছাড়া মনে হয়, সে যেন কারো অপেক্ষা করে।

কীভাবে রাত্রির অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি শুরু হয়?

তখন বেশ রাত হয়েছে। শারীরিক প্রয়োজনে ঘুম ভাঙলে যুবক শিক্ষক আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। শীতের গভীর রাত, কেউ কোথাও নাই। ঘরের পেছনে জামগাছ। তারই তলে শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে সে ঘরে ফিরবে কিন্তু আলোয়ানটা ভালো করে জড়িয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল। তখন চোখের ঘুমটা কেটে গেছে। যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ছায়া, কিন্তু চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার অপরূপ লীলাখেলা।

তখনো কাদের বড়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে নাই। অন্য এক কারণে যুবক শিক্ষক জামগাছের তলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সে-কারণটি হয়তো নেহাতই বালসুলভ। কিন্তু শিক্ষকতা করে বলে তার বাহ্যিক আচরণ-ব্যবহার বয়স্থব্যক্তির মতো হলেও তার মনের তরুণতা এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। বরঞ্চ স্বল্পভাষী যুবক শিক্ষকের মনের অন্তরালে নানারকম স্বপ্ন-বিশ্বাস এখনো জীবিত। সুযোগ-সুবিধা পেলে তার পক্ষে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য নয়। তবে এ-সব সে গোপনই রাখে। তাছাড়া, মনের কথা ঠাট্টা করেও বলবে এমন কোনো লোক সে চেনে না।

জামগাছের তলে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার অদমনীয় আকর্ষণ। শুধু তার রূপেই যে সে মোহিত হয়, তা নয়। তার ধারণা, চন্দ্রালোকে যে-অপরূপ সৌন্দর্য বিকাশ পায় তা উদ্দেশ্যহীন নয়, মূক মনে হলেও মূক নয়। হয়তো সে-সময়ে, যখন মানুষ-পশুপক্ষী নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন বিশ্বভূমণ্ডল রহস্যময় ভাষায় কথালাপ করে। সে-কথালাপের মর্মার্থ উদ্ধার করা মানুষের পক্ষে হয়তো অসম্ভব, কিন্তু তা শ্রবণাতীত নয় : কান পেতে শুনলে তা শোনা যায়। বালকবয়সে পরপর তিন বছর লায়লাতুলকদরের রাতে যুবক শিক্ষক সমস্ত রাত জেগেছিল এই আশায় যে, গাছপালাকে ছেজ্‌দা দিতে দেখবে। গাছপালার এমন ভক্তিমূলক আচরণে আজ তার বিশ্বাস নাই, কিন্তু রাত্রি জাগরণের ফলে তার মনে যে-নতুন ধারণার সৃষ্টি হয় সে-ধারণা এখনো সে যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। এত সৌন্দর্য কি আদ্যোপান্ত অর্থহীন হতে পারে? এমন বিস্ময়কর রূপব্যঞ্জনার পশ্চাতে মহারহস্যের কিছুই কি ইঙ্গিত নাই? তাতে মানুষের মনে যে-ভাবের উদয় হয়, সে-ভাব কি সৃষ্টির মহানদীর তরঙ্গশীকরজাত নয়? মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিঃশব্দ করে শুনলেই নিঃসন্দেহে অশ্রোতব্য শ্রোতব্য হবে।

চন্দ্রালোকের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক হয়তো বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ নির্জন রাতে চলনশীল কিছু দেখতে পেলে প্রথমে সে চমকে ওঠে। তারপর সে তাকে দেখতে পায়। বড়বাড়ির কাদেরকে চিনতে পারলে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত এ-মায়াময় রাতে কাদেরের আকস্মিক আবির্ভাব তার কাছে হয়তো অজাগতিক এবং রহস্যময়ও মনে হয়। এত রাতে এমন দ্রুতগতিতে কোথায় যাচ্ছে সে?

তখন যুবক শিক্ষকের চোখ জ্যোৎস্নায় জলসে গেছে, তাতে ঘুমের নেশা পর্যন্ত নাই। দ্রুতগামী কাদেরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটি ঝোঁক চাপে তার মাথায়। সে ঠিক করে, তাকে অনুসরণ করবে।

মনে মনে ভাবে, দেখি কোথায় যায় কাদের। বড়বাড়ির দাদা সাহেব বলেন, কাদের দরবেশ। দেখি রাতবিরাতে কোথায় যায় দরবেশ।

তখন কাদের বেশ দূরে চলে গেছে। জামগাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে যুবক শিক্ষক তাকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাউকে অনুসরণ করা সহজ নয়। যুবক শিক্ষককে দূরে-দূরে গা-ঢাকা দিয়ে চলতে হয়। ধরা পড়বার ভয় ছাড়া একটা লজ্জাবোধও তার চলায় বাধা সৃষ্টি করে। ফলে শীঘ্র দ্রুতগামী কাদেরকে সে হারিয়ে ফেলে। খাদেম মিঞার ক্ষেত পার হয়ে গাঁয়ে আবার প্রবেশ করে দেখে, কোথাও কাদেরের কোনো চিহ্ন নাই। একটু পরে চৌমাথার মতো স্থানে এসে সে হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে পড়ে। কোন দিকে যাবে? চারপথের একটি যায় নদীর দিকে, আরেকটি গ্রামের ভেতরে। তৃতীয় পথ সদ্যতৈরি মসজিদের পাশ দিয়ে গিয়ে বাইরে সরকারি রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়। শেষটা যায় তারই ইস্কুল পর্যন্ত। যুবক শিক্ষক পথনির্দেশ পাবার আশায় কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো পদধ্বনি শুনতে পায় না। কাদের যেন চন্দ্রালোকে এক মুঠো ধুঁয়ার মতো মিলিয়ে গেছে।

চৌমাথায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে স্থির করে, ঘরে ফিরে যাবে। ভাবে, লোকটা যে কাদেরই সে-কথা সঠিকভাবে সে বলতে পারে না, চোখের ভুল হয়ে থাকতে পারে। তাকে মুখামুখি দেখে নাই, কেবল তার পেছনটাই দেখেছে। ভুল হতে পারে বৈকি।

কিন্তু যুবক শিক্ষক ফিরে যায় না। কাদেরকে সে সামনাসামনি দেখে নাই বটে কিন্তু তার হাঁটার বিশেষ ভঙ্গি, ঘাড়ের কেমন উঁচু-নিচু ভাব, মাথার গঠন ইত্যাদি দেখেছে। ভুল অবশ্য হতে পারে, কিন্তু আরেকটু দেখে গেলে ক্ষতি কী? মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেলে তার সম্বন্ধে কৌতূহলটা আরো বাড়ে যেন। কিন্তু কোন দিকে যাবে? চারটা পথের কোনটা ধরবে? কাদেরের রাত্রিভ্রমণের উদ্দেশ্য যখন সে জানে না তখন কোনো একটি পথ ধরার বিশেষ কারণ নাই। তাই অনির্দিষ্টভাবে চারটি পথের একটি পছন্দ করে সে আবার হাঁটতে শুরু করে। কিছুক্ষণ সে কান খাড়া করে রাখে, ঘন-ঘন তাকায় এধার-ওধার। কিন্তু তার সন্ধানকার্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। শীঘ্র সে ভুলে যায় তার চলার উদ্দেশ্য। তার ঘরের পেছনে যে-অপরূপ চন্দ্রালোক তাকে বিমুগ্ধ করেছিল, সে-চন্দ্রালোক এখনো মাঠে-ঘাটে গাছপালা-ঝোপঝাড়ে মানুষের বাসগৃহে মোহ বিস্তার করে আছে। পরিচিত দুনিয়ায় অজানা জগতের মায়াময় স্পর্শ। চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত গভীর রাতে যুবক শিক্ষক একাকী ঘুরে বেড়ায় নাই অনেকদিন। কাদেরের কথা তার মনে থাকলেও তাকে অনুসরণ করার প্রয়োজন সে আর বোধ করে না।

তারপর একসময়ে একটি গৃহস্থবাড়ির কাছে দেখে, পোঁতা খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে কাদের। তার দেহে সহসা কেমন চঞ্চলতা আসে। মনে হয় সে হাসছে। তারই দিকে তাকিয়ে সে হাসছে এবং গা-ঢাকা দেবার কোনোই চেষ্টা নাই।

হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা হলে যুবক শিক্ষক সজোরে বলে ওঠে,

'কী ব্যাপার?'

কোনো উত্তর দেয় না।

তারপর কেমন সন্দেহ হলে এগিয়ে দেখে, ভিটেবাড়ির পাশে মূর্তিটি কলাপাতা মাত্র, চাঁদের আলোয় মানুষের রূপ ধারণ করেছে। চাঁদের আলো যাদুকরী, মোহিনী।

যুবক শিক্ষকের বুক সামান্য কাঁপতে শুরু করেছিল। এবার কিছুক্ষণ অনির্দিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সে স্থির করে ঘরে ফিরে যাবে। মুখে তখনো লজ্জার ঝাঁঝ। সে ঘরাভিমুখে রওনা হয়। তবে সোজাপথ না ধরে একটু বাঁকাপথ ধরে। সোজাপথ ধরলে অসাধারণ দৃশ্যটি তাকে দেখতে হত না।

গ্রামের ভেতরের পথটা এড়িয়ে সে নদীর দিকে চলতে শুরু করে। কাদেরকে সে আর অনুসরণ করছে না, সে-বিশ্বাসে তার কথা ভুলতে তার দেরি হয় না। তাকে কলাগাছে রূপান্তরিত করে সে আবার চন্দ্রালোকে-উদ্ভাসিত বিস্ময়কর জগতের নেশায় আত্মভোলা হয়ে

উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে থাকে : পদক্ষেপে কোনো তাড়া নাই, তার শীর্ণমুখ আবেশাচ্ছন্ন।

গ্রামের প্রান্তে নদীর ধারে একটু বাদাড়-ঝোপঝাড় পাঁচমেশালী গাছপালা, একটা প্রশস্ত বাঁশবন। তারপর ঢালা ক্ষেত। শস্যকাটা শেষ, স্থানে-স্থানে লাঙ্গল দেয়া হয়েছে।

সে-জঙ্গলের পাশে পৌঁছে খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক একটু দাঁড়িয়েছে, এমন সময় একটা আওয়াজ তার কানে পৌঁছায়। আওয়াজটা যেন বাঁশবন থেকে আসে। সেখানে কে যেন চাপা ভারিকণ্ঠে কথা বলছে।

আশপাশে বাসাবাড়ি নাই। অকারণে যুবক শিক্ষক এধার-ওধার তাকায়, এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয় নদীর বুক থেকে জেলেদের কণ্ঠস্বরই শুনতে পাচ্ছে সে। কিন্তু অবশেষে তার সন্দেহ থাকে না, বাঁশঝাড়ের মধ্যেই কেউ কথা বলছে। শ্রোতা থাকলেও তার গলার আওয়াজ শোনা যায় না : বক্তার শ্রোতা যেন বাঁশঝাড়ই। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সে-কণ্ঠ অশরীরী মনে হয় যুবক শিক্ষকের কাছে। তারপর কাদেরের কথা তার স্মরণ হয়।

এবার অদম্য কৌতূহল হলে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে যায়। অল্পক্ষণের জন্যে কণ্ঠস্বর থামে বলে সে সামান্য নিরাশ বোধ করে। শীঘ্র কণ্ঠস্বরটি সে আবার শুনতে পায়। ঈষৎ হেসে এবার সে সজোরে বলে ওঠে, "কাদের মিঞা! বাঁশঝাড়ে কাদের মিঞা!"

কথাটা সজোরে বলেছে কি বলে নাই, অবশ্য সে-বিষয়ে এখন সে হলফ করে কিছু বলতে পারে না। নিঃশব্দ গভীর রাতে এ-সব ব্যাপারে কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে? তখন মনে-বলা কথাই সশব্দে বলা কথার মতো শোনায়। কিন্তু বাঁশবনের আকস্মিক নীরবতার কারণ শুধু তা নয়। কাদেরের কথা শোনবার জন্যে কৌতূহলী হয়ে যুবক শিক্ষক আবার যখন এগিয়ে যায়, তখন একরাশ শুকনো পাতায় তার পা পড়লে নীরবতার মধ্যে সহসা অকথ্য আওয়াজ হয়। সে-আওয়াজে চমকে উঠে সে নিজেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয় কাটলে কান পেতে শোনে, কিন্তু বাঁশঝাড়ের নীরবতা এবার অখণ্ডিত থাকে।

সে-নীরবতার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যুবক শিক্ষক ভাবে, হয়তো সবটাই মনের খেয়াল। একবার হেসে মনে মনে বলে, কলাপাতা যদি মানুষ হতে পারে, বাঁশঝাড়ের সঙ্গীত মানুষের কণ্ঠ হতে পারে না কেন?

তবে কথাটা নিজেরই কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। হাওয়া ছাড়া বাঁশবনে সঙ্গীত কী করে জাগে?

কিছুটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর হয়তো মনে ভয় এলে হঠাৎ সে অকারণে হাততালি দিয়ে রাখালের মতো গরু-ডাকা আওয়াজ করে ওঠে। পরক্ষণেই বাঁশবনে একটা আওয়াজ জাগে : সেখান থেকে তার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি আসে যেন। না, আওয়াজটা অন্য ধরনের। একটি মেয়েমানুষ যেন সভয়ে চিৎকার করে ওঠে।

আওয়াজটা কিন্তু জেগে উঠেই আবার নীরব হয়ে যায়। কেউ যেন তা পাথর-চাপা দেয়। সাপের মুখগহ্বরে ঢুকে ব্যাঙের আওয়াজ যেন হঠাৎ থামে, বা মস্তক দেহচ্যুত হলে মুখের আওয়াজ যেন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়। দেহচ্যুত মাথা এখনো হয়তো আর্তনাদ করছে কিন্তু তাতে আর শব্দ নাই। চারধারে আবার অখণ্ড নীরবতা।

রুদ্ধনিশ্বাসে যুবক শিক্ষক দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি নিশ্চল-নিঃশব্দ বাঁশঝাড়ের উপর নিবদ্ধ। তারপর তার বুক কাঁপতে শুরু করে, ক্রমশ হাতে-পায়ে সারা শরীরেও কাঁপন ধরে। অবশেষে পায়ের তলে মাটি কাঁপতে শুরু করে, জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত আকাশও স্থির থাকে না। শুধু বাঁশঝাড় নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পর পৃথিবীব্যাপী কম্পন থামলে ডুবতে-ডুবতে বেঁচে-যাওয়া মানুষের মতো ঝোড়ো-বেগে নিশ্বাস নেয় যুবক শিক্ষক। তারপর হয়তো সাহসের জন্যে উপরের দিকে তাকায় কিন্তু চাঁদের মায়াময় হাস্যমুখ দেখতে পায় না। সে কিছুই বুঝতে পারে না বলে অবশ

দেহে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

অবশেষে যুবক শিক্ষকের মনে ভয় কাটে। এবার সে নির্ভয়ে চারধারে তাকিয়ে দেখে। না, জ্যোৎস্নারাতে কোনো তারতম্য ঘটে নাই। স্বচ্ছ আকাশে নীলাভা, চাঁদ তাতে রানীসম। তার হাস্যোজ্জ্বল মুখ ঝকঝক করে। অপরিসীম তৃপ্তির সঙ্গে সে ভাবে, না, জ্যোৎস্নারাতের যাদুমন্ত্রের শেষ নাই। চাঁদ মোহিনীময়। আওয়াজটি কানেরই ভুল হবে। এমন ঝকঝকে চন্দ্রালোকিত রাতে কিছুই বিশ্বাস হয় না। যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে পরিষ্কার গলায় ডাকে, 'কে?' অবশ্য কোনো উত্তর আসে না। হাওয়ায় বাঁশঝাড়ে সঙ্গীতের ঝঙ্কার জাগে, কিন্তু মানুষের কণ্ঠ জাগে না। শীতের জমজমাট রাতে একটু স্পন্দনও নাই।

এক মুহূর্ত আগে যা সত্য মনে হয়েছিল, তা যে সত্যই সে-কথা কে বলতে পারে? সত্য চোখ-কানের ভুল হতে পারে, সত্য আবার চোখে-কানে ধরা না-ও দিতে পারে। এবার নির্ভয়ে এবং কিছুটা কৌতূহলশূন্যভাবে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয় সেখানে আবার একটু আওয়াজ হয়, অস্পষ্ট পদধ্বনির মতো : কে যেন সেখান থেকে সরে যাচ্ছে। কিসের আওয়াজ? সঠিক করে বলা শক্ত। সামান্য হাওয়ায় বাঁশবনে শব্দ হয়। কিন্তু হাওয়া নাই। তাহলে জন্তু-জানোয়ারই হবে। শেয়াল কিংবা মাঠালী ইঁদুর। জঙ্গলে সর্বত্র শুষ্ক পাতা ছড়িয়ে আছে। একটুতেই শব্দ হয়। নির্ভয়ে যুবক শিক্ষক এগিয়ে যায়। অনভিজ্ঞ সরলচিত্ত যুবকের মনের আকাশে কোনো বিপদাশঙ্কার আভাস নাই, ভয়-দ্বিধা নাই। উপরে, স্বচ্ছ আকাশে সুন্দর উজ্জ্বল মায়াময়ী চাঁদ নির্ভয়ে একাকী বিরাজ করে। একটু ঝুঁকে সে একটা পড়ন্ত শাখা তুলে নেয়। তার তরুণ মুখে একটু কৃত্রিম আশঙ্কা, কৌতুকে মেশানো আশঙ্কা। ভাবে, সাপখোপও হতে পারে, এমন দুঃশীল সাপ যে দারুণ শীতেও গর্তে আশ্রয় নেয় নাই। হাতে গাছের শাখাটি শক্ত করে ধরে যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়, সাপ না হোক অন্ততপক্ষে দুষ্ট ছাত্রকে শাসন করতে যায় যেন।

জন্তু-জানোয়ার নয়, সাপখোপ বা মাঠালী ইঁদুর নয়, কোনো পলাতক দুষ্ট ছাত্রও নয়। বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলো-আঁধার। সে আলো-আঁধারের মধ্যে একটি যুবতী নারীর মৃতদেহ। অর্ধ-উলঙ্গ দেহ, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো।

গভীর রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আলুথালু বেশে মৃতের মতো পড়ে থাকলেই মানুষ মৃত হয় না। জীবন্ত মানুষের পক্ষে অন্যের জীবন সম্পর্কে নিরাশ হওয়াও সহজ নয়। যুবক শিক্ষক কয়েক মুহূর্ত মৃত নারীর দিকে চেয়ে থাকে। তারপর একটা বেগময় আওয়াজ বুকের অসহনীয় চাপে আরো বেগময় হয়ে অবশেষে নীরবতা বিদীর্ণ করে নিষ্ক্রান্ত হয়। হয়তো সে প্রশ্ন করে কিছু, হয়তো কেবল একটা দুর্বোধ্য আওয়াজই করে : তার স্মরণ নাই। তবে এ-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ যে সে কোনো উত্তর পায় নাই। মৃত মানুষ উত্তর দেয় না।

যুবক শিক্ষক বাঁশঝাড় থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন তার দৃষ্টিতে ইতিমধ্যে বিভ্রান্তির ছাপ দেখা দিয়েছে, শরীরেও কাঁপন ধরেছে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। কিছুদূর গিয়ে সচকিত হয়ে দেখে, সামনে কাদের। সে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। দেহ নিশ্চল, মুখে চাঁদের আলো। তাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সে স্বস্তিই বোধ করে। কাছে গিয়ে সে কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিছু একটা বলবেও মনে হয়। কাদের পূর্ববৎ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখে চাঁদের আলো তবু তার চোখ দেখা যায় না।

তারপর হঠাৎ যুবক শিক্ষকের মাথায় বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারে না কী করবে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করে। তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন হঠাৎ বিচিত্র গোলকধাঁধায় ঢুকেছে এবং সে-গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে দৌড়তে শুরু করে। কিন্তু কোথাও মুক্তিপথের নির্দেশ দেখতে পায় না। সে দৌড়তেই থাকে। যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হাল্কা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট মহামারী-হাহাকার

দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই। সে ছুটতেই থাকে।

বাইরে চাঁদ ডুবে গেছে, পাখির রব শুরু হতে দেরি নাই। টিনের ছাদ থেকে প্রায় নিঃশব্দে শিশির পড়ে। বড়বাড়িতে কে একবার কেশে ওঠে। না-শুনেও যুবক শিক্ষক সে-আওয়াজ শোনে, তার পাথরের মতো শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। তারপর আরেকটি আওয়াজ সে শুনতে পায়। এবার অন্ধকারের মধ্যেই ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সে দরজার দিকে তাকায়। মনে হয় তার অপেক্ষার শেষ হয়েছে।

দরজায় আবার করাঘাত হয়। তারপর খিল-দেয়া দরজার ওপাশে কাদেরের গলাও শোনা যায়। যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, তার শরীরে অবশিষ্ট শক্তিও নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাদেরকে কোনো উত্তর দেবার বা দরজা খুলবারও কোনো প্রয়োজন সে বোধ করে না। তবু যন্ত্রচালিতের মতো উঠে সে দরজা খুলে একটু সরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কাদের ঘরে প্রবেশ করলে তার দিকে তাকায় না। শুধু গভীর নীরবতার মধ্যে সে শুনতে পায় কাদেরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

অবশেষে কাদেরের কণ্ঠ শোনা যায়। তার স্বাভাবিক কণ্ঠ রুক্ষ। এখন সে নিম্নকণ্ঠে কথা বললেও সে-রুক্ষতা ঢাকা পড়ে না। কাদের প্রশ্ন করে, সে দৌড়ে পালিয়েছিল কেন।

তার গলা শুনতে পেয়ে যুবক শিক্ষক হয়তো একটু আশ্বস্ত বোধ করে, কিন্তু প্রশ্নটির কোনো অর্থ বোঝে না। সে কোনো উত্তর দেয় না।

কাদের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর তার গলা ঝনঝন করে ওঠে। সে কেবল তার প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তিই করে। কিন্তু যুবক শিক্ষক এবারও কোনো উত্তর দেয় না। তার জিহ্বায় যেন কুলুপ পড়েছে। কাদেরের ডাকে দরজা না খোলার যেন উপায় থাকে নাই, কিন্তু তার প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বাধ্য নয়। বা মুখে কোনো কথাই সরে না।

উত্তরের জন্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা কাদেরের স্বভাব নয়। তা ছাড়া, কাদের বড়বাড়ির মানুষ। যুবক শিক্ষক সে-বাড়িরই পরাপেক্ষী, তাদেরই আশ্রিত।

"কী হল?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেবার কোনো চেষ্টা করলেও অন্ধকারের মধ্যে তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

অবশেষে কাদের কেমন এক কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে, 'বাঁশবনে কী করছিলেন?'

যুবক শিক্ষক, পাথরের মতোই সে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বাইরে কোথাও পাখির কলতান শুরু হয়।

একটু পরে কাদের সহসা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দুই

দাদাসাহেব বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি। দীর্ঘ প্রশস্ত মানুষ, প্রৌঢ়-বয়সেও মুখভরা একরাশ কালো দাড়ি। তবে চুল-গোঁফ সুন্নত অনুযায়ী ছোট করে ছাঁটা।

বছরপাঁচেক হল দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তার পূর্বে তিনি সরকারি চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন বলে কেবল ছুটি-ছাটাতেই দেশে আসতেন। সারা জীবন চাকুরি করেছেন বটে কিন্তু চাকুরিতে কখনো মন ছিল না! মাজ্‌হাব-শরিয়ত ব্যাপারে সর্বদা মশগুল থাকতেন বলে কর্মজীবনেও বিশেষ কৃতকার্য হন নাই। উপাধি-ইনাম তো দূরের কথা, পদোন্নতিও বিশেষ হয় নাই। অবশ্য সে-জন্য সেদিনও তাঁর কোনো আফসোস ছিল না, আজও নাই। বরঞ্চ চাকুরিজীবন শেষ হলে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন : অবশেষে তিনি নিজের সময়ের ষোল আনা মালিক হলেন, তাতে কারো হিস্‌সা-দাবি থাকল

না। তাছাড়া, এবাদতে এবং মাজ্‌হাবি কাজে সম্পূর্ণভাবে মনঃপ্রাণ দেবার পথে আর কোনো বাধা থাকল না।

অন্য একটি কারণেও চাকুরিজীবনে তিনি সুখী ছিলেন না। সে-জীবন পরাধীন যুগে কেটেছে। পরাধীনতার অবমাননা যতটা তাঁকে কষ্ট দেয় নাই ততটা দিয়েছে মনিবের বিধর্মীয়তা। বিধর্মীয় মনিব তাঁর প্রিয় ধর্মের প্রতি প্রকাশ্যে কোনো বিরোধিতা বা অবজ্ঞা প্রকাশ না করলেও তার সে-বিরোধিতা-অবজ্ঞা অহরহ অনুভব করেছেন। এমন মনিবের অধীনে গোলামি করা নিতান্তই পীড়াদায়ক। অবসরপ্রাপ্তিতে তাই তাঁর আনন্দের সীমা থাকে নাই।

দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি অবিলম্বে এ-কথা বুঝতে পারেন যে, অবসর গ্রহণ সময়োচিতই হয়েছে। বাড়িতে সংখ্যায় দশাধিক বালক-বালিকা। তাঁর গ্রামবাসী বড় ছেলের ছয়টি ছেলেমেয়ে। বিধবা মেয়েরও পাঁচটি সন্তানসন্ততি। তাদের শিক্ষাদীক্ষার একান্ত প্রয়োজন। সে-শিক্ষাদীক্ষা হেলা করা যায় না। তবে ভাগ্য ভালো, এখনো তাদের মন সার-দেয়া জমির মতো। তাতে যে-বীজ রোপণ করা যাবে সে-বীজই ফলবতী হবে।

প্রথম সপ্তাহে তিনি নির্দেশ দিলেন, বিস্‌মিল্লাহ্ না বলে কেউ যেন লোকমা না তোলে। শীঘ্র আরেক হুকুম হল, কারো একটি নামাজ যেন কাজা না হয়। (অবশ্য একেবারে নামাজ না পড়া কল্পনাতীত।) তারপর ঈমানের অর্থ, কোরান-পাঠ ও হাদিস-সুন্নার প্রয়োজনীয়তা, তস্‌বি-পড়ার উপকারিতা, নফল নামাজের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যান দিতে লাগলেন। মাসখানেকের মধ্যে বাড়িময় এমন ঘোরতর পরিবর্তন ঘটল যে ঝানু মোল্লামৌলবীদেরও তাক লেগে গেল। মাথা নেড়ে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, দাদাসাহেব অসাধ্য সাধন করেছেন।

সকলের বিস্ময়ের পাত্র দাদাসাহেবের মেয়েপক্ষের নাতি, আমজাদ। ঘুমে অতি সহজে কাবু হয়ে পড়ে যে ছেলে সেও একটি নামাজ কামাই করে না। একবার নিদ্রার কবলে পড়লে যার শূন্য পেটে রসজবজবে মিঠাই-মণ্ডাও একটু আলোড়ন জাগাতে পারে না সে-ই গভীর নিদ্রা থেকে উঠে ওজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়, একবার ডাকতে হয় না। স্বাভাবিক কথা, আমজাদ দাদাসাহেবের বড়ই প্রিয়পাত্র।

দাদাসাহেব ওয়াজ-নছিহত করেন, কিন্তু সহজে কাউকে ভর্ৎসনা করেন না। তাঁর নিষ্পলক দৃষ্টিই যথেষ্ট। তাঁর স্তব্ধতায় ছেলেমেয়েদের বুকে এক নিমেষে হিমশীতলতা আসে। যেমন সেদিন রাতের ঘটনা। সকলে খেতে বসেছে। দস্তরখানায় স্তূপাকার খাদ্য। ডালভাত, মাছতরকারি, দু-তিন রকমের ভাজি, একটু কাসুন্দি ও গরম পাতের ঘি, ঘন লাল সুরুয়ায় বড় বড় করে কাটা গোরুগোস্ত। ছোটপাতে মুখরোচক আচার-চাটনিও কয়েক পদের। সকলেই পাতে খাবার তুলে নিয়েছে। দাদাসাহেব শ্যেনদৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকান। তারপর হঠাৎ তিনি বলেন, বিস্‌মিল্লাহ। সঙ্গে সঙ্গে চারধারে গুঞ্জন ওঠে, বিস্‌মিল্লাহ। কেবল একজন সে-গুঞ্জনে যোগ দিতে ভুলে যায়। আমজাদের বড় ভাই, কুদ্দুস। হয়তো সেদিন তার পেটে ক্ষুধার দাউ-দাউ আগুন, অথবা কোনো কারণে অন্যমনস্ক।

থমথমে নিস্তব্ধতা নামে। দেখা যায় দাদাসাহেব গুরুগম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কুদ্দুসের দিকে। তার মুখে তখন ঠাসা ভাত। না গিলে সে ভয়ে পাথর হয়ে তাকিয়ে থাকে বাসনের দিকে, চোখ তুলতে সাহস হয় না। প্রথমে কানপাটা, তারপর গোটা কান, অবশেষে সমস্ত মুখ লাল হয়ে ওঠে। দাদাসাহেবের মুখে কিন্তু একটি কথা নাই।

পরে দাদাসাহেব শান্তকণ্ঠে বুঝিয়ে বলেন। খোদাকে কখনো ভুলতে নাই, বিশেষ করে যখন কেউ তাঁর অসীম দানদয়াশীলতায় শরিক্‌লাভ করে। নিঃস্বার্থতা, ত্যাগশীলতা এবং আত্মসংযম ধর্মের গোড়াঘাট। সে-সব গুণ ছাড়া দুনিয়ার কোনো সংগ্রামে তো জয়ী হওয়া যায়ই না, ক্ষমাশীল অসীম দয়াবান খোদারও প্রিয়পাত্র হওয়া মুশকিল। এ-উপদেশ দেন খেতে খেতেই। নীরব-ভোজনের পক্ষপাতী তিনি নন। সুন্নার নির্দেশ হল, সদালাপের সঙ্গেই

ক্ষুধানিবৃত্তি করা উচিত। সদালাপের জন্যে ধর্মতত্ত্বের চেয়ে আর কোন বিষয় বেশি উপযুক্ত? ঠোঁটে মধুর হাসির আভাস, কণ্ঠ শান্ত স্নিগ্ধ, দাদাসাহেব একাকী কথা বলে যান। খাবার শেষে তখন হয়তো কুদ্দুসের সামান্য ভুলটার কথা কারো মনে নাই। কিন্তু খাদ্যই যে জীবনের সবচেয়ে প্রধান বস্তু নয় সে-কথা প্রমাণ করবার জন্যে সে পরদিন স্বইচ্ছায় নফল রোজা রাখে।

দাদাসাহেবের স্বাভাবিক স্থৈর্য-গাম্ভীর্যে সহজে তারতম্য ঘটে না। কিন্তু একটি ব্যাপারে তিনি কখনো-কখনো অসংযত হয়ে পড়েন। সে-ব্যাপার ধর্ম। যে-মানুষকে দূর থেকে লম্বা-লম্বা পা ফেলে আসতে দেখলে অনেক ছেলের মনে তাঁর দৃশ্যপথ থেকে অদৃশ্য হবার প্রবল বাসনা জাগে, যাঁকে বয়স্থব্যক্তিরা সমীহ-সম্মান না করে পারে না, ধর্মের ব্যাপারে তিনিই শিশুর মতো সরল বা প্রাণবন্ত বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন।

আরেকদিনের ঘটনা। ঘটনাটির উৎপত্তি জেলা-শহরের খবর-কাগজে প্রকাশিত একটি সংবাদে। অজস্র ছাপাভুলসমেত মেটে কাগজে প্রকাশিত খবর-কাগজটি দেশের খবর ছাড়া বিদেশী খবরও সরবরাহ করে থাকে। অধর্মীয় পাঠ্যবস্তুর মধ্যে সে-সংবাদপত্রই সময় পেলে দাদাসাহেব একনজর চেয়ে দেখেন। সেদিন সকালে তাতে একটি খবর পড়ে তিনি বেসামাল ধরনে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে পড়েন। তাঁর হাঁকডাক শুনে সবাই ছুটে আসে। অবশ্য এত হৈ-হুলুস্থুলের কারণ প্রথমে কেউ বুঝতে না পারলেও তাঁর উত্তেজিত উজ্জ্বল মুখ দেখে কারো সন্দেহ থাকে না যে, একটি গুরুতর কিন্তু অতিশয় প্রীতিকর এবং শুভময় ঘটনাই ঘটেছে।

ব্যাপারটা খোলাসা হলে জানা যায়, জেলা-শহরের সংবাদপত্রটিতে খবর বেরিয়েছে যে আমেরিকায় একজন বিশেষ গুণী এবং ধর্মসিক্ত ব্যক্তি তাঁর দেশবাসীদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে বিষম তোড়জোড় শুরু করেছেন। হাজার হাজার নারী-পুরুষ শুনতে আসে তাঁর ওয়াজ। তাঁর যুক্তিপূর্ণ আবেদন-হুজ্জাতে এবং তাঁর উদ্দীপনা-ভরা বক্তৃতায় লোকেরা এত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যে রিভল্‌ভারধারী শতশত তাগড়া-তাগড়া পুলিশও তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারে না।

নাকের ডগায় চশমা বসিয়ে দাদাসাহেব এবার সংযত তবু গর্বিতকণ্ঠে সংবাদটি আবার পড়ে শোনান। ততক্ষণে গোলযোগ শুনে তাঁর বিধবা মেয়ে আনোয়ারাও রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে এসে উপস্থিত হয়েছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে সংবাদটি বুঝবার চেষ্টা করে। কোথায় আমেরিকা, কী তার বাসিন্দাদের ধর্ম সে-সব পরিষ্কারভাবে তার জানা নাই। কিন্তু এ-কথা সে বুঝতে পারে যে, সেখানে ইসলাম ধর্মের গর্বিত পতাকা উঠবার বেশি দেরি নাই। আনোয়ারার রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখেও আকস্মিকভাবে বৃষ্টির ঝাপটার মতো পানি আসে।

আনন্দোচ্ছ্বসিত ব্যক্তি নিরস্ত্র। দাদাসাহেবের নিরস্ত্রভাবের সুযোগ নিয়ে তবারক হঠাৎ একটি উক্তি করে। ছেলেদের মধ্যে সে বয়োজ্যেষ্ঠ, ইস্কুলে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ে।

'লোকটা যে হাবসী।'

চশমার ওপর দিয়ে দাদাসাহেব পরমবিস্ময়ে তার দিকে তাকান।

'দোষ কী তাতে? আমাদের মাজ্‌হাবে জাতবিচার বর্ণবিচার নাই। সকলেই খোদার বান্দা। সবাই তাঁর চোখে সমান।'

ছেলের বেয়াদবিতে আশঙ্কিত হয়ে তার মা আনোয়ারা ভর্ৎসনা করে,

'তুই চুপ কর, ফজুল কথা বলিস্ না।'

দাদাসাহেব তখনো অস্ত্রগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং মায়ের কথা উপেক্ষা করে তবারক আবার বলে, 'সে শুধু হাবসীদেরই মুসলমান করছে।'

এবার দাদাসাহেব কিছু দমিত হন, তাঁর উৎসাহে একটু ভাটা লাগে। হয়তো মনে একটু সন্দেহও জাগে। জানালার বাইরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবিতভাবে নীরব থাকেন। তারপর আস্তে বলেন, 'সবকিছুরই আরম্ভ আছে। আরম্ভ হয়েছে। বাকি খোদার মর্জি।'

তাঁর মুখভাব লক্ষ করে সমাকুল আনোয়ারা আবার তার ছেলেকে ভর্ৎসনা করে।

'চুপ কর। কেন আবার ফজুল কথা বল্‌ছিস?'

'না, কোনো ফজুল কথা বলছে না।' দাদাসাহেব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলেন। ছেলেদের ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। 'তবারকের আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। একটুতে সে খুশি হয় না।'

তবারক প্রতিবাদ করে না। এবার নিশ্চিন্ত হলে তার মায়ের মুখ সন্তানগৌরবে রক্তিমাভা লাভ করে। সংযত-আনন্দের সঙ্গে সে দাদাসাহেবকে প্রশ্ন করে, 'বড় সুসংবাদ। ফকির-মিসকিন খাওয়ালে কেমন হয়?'

দাদাসাহেবের উৎসাহ নিচের খাদে নেবে সেখানেই আছে, মনের সন্দেহটাও কাটে নাই। কিন্তু এমন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সে রাতে এক অজানা মার্কিন নিগ্রোর বদৌলতে তিন গ্রামের ফকির-মিসকিন জেয়াফত পেল।

এশার নামাজের পর, ঘরে অনুজ্জ্বল লণ্ঠনের আলো, পায়ের ওপর ছক-কাটা লাল কম্বল, দাদাসাহেব কখনো কখনো ইতিহাসের গল্প বলেন। দেয়ালে দীর্ঘ ছায়া, আলো-অন্ধকারে দাদার মুখমণ্ডলে একটা অস্পষ্ট শ্রান্তির ভাব। দিনশেষে হয়তো বার্ধক্যের জন্য শ্রান্তি বোধ করেন, অথবা রাত্রির সন্নিধানে নিজের জীবনসন্ধ্যার বিষয়ে অজ্ঞাতে সচেতন হয়ে ওঠেন।

তিনি বলেন : 'কোথায় না খোদাভক্ত খোদাভীত খোদাপ্রেমিক দীনদয়াময় বীর্যবান মুসলমান ধর্মের পতাকা উত্তোলন করে নাই, কোথায় না সভ্যতার উজ্জ্বল মশাল বহন করে নিয়ে যায় নাই? তাদের জয়-বিজয় ও কৃতিত্বের কাহিনী ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে মণিমুক্তার মতো ঝলমল করে। ইরান-তুরান-খোরাসান, সামারা-সিকিলিয়েহ-বালারাম; দূর দূর দেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারিত হয়েছে। তারা বাগদাদ-দামাস্কাস কুর্তুবা-গ্রানাদার মতো মনোরম শহর সৃষ্টি করেছে, নির্মাণ করেছে বৃহৎ-মহৎ সুদৃশ্য প্রাসাদ-দুর্গ-তোরণ-মিনার। কত নাম বলি? খুন্দ প্রাসাদ, বাবউজ্‌জাহাবের সোনালি তোরণ, বিশাল দুর্গ-প্রাসাদ, মেদিনাত্-উল-হামরা, নাইল নদীতীরে কাছর্-উল-খাবরি। তারপর শত শত মনোরম উদ্যান, শত শত শিক্ষাকেন্দ্র, বাণিজ্যবন্দর।'

কিন্তু ইতিহাসের কথা দাদাসাহেব কখনো কখনোই বলেন। ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি। তাঁর মতে, মানুষের সৃষ্টির কথা তুললে ভালো-খারাপের কথা ওঠে। দয়াবান নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র মহৎ খলিফা উমর বা রশীদ-মামুনের কথা তুললে ইয়াজিদ-হাজ্জাজ বিন ইউসুফ-মুতাওয়াক্কিলের নৃশংসতা হীনতা বিশ্বাসঘাতকতার কথা ঢেকে রাখা যায় না। কখনো কখনো দাদাসাহেব গভীর দুঃখের সঙ্গে ভাবেন, দ্বিতীয় দলই যেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কী করে তাদের কথা ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায়? তাদের কথা ভাবলে কোনো-কোনো সময়ে তাঁর হৃৎকম্পনের মতো ভাব হয়। শুষ্ক হৃদয়ে ভাবেন, নির্দয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নাকি নিজেই পনের হাজার মানুষের মস্তকচ্যুত করে। একটি দুটি নয়, পনের হাজার মানুষ! ওবাইদুল্লাহ্ বিন জিয়াদ কসাই নাম অর্জন করেছিল তার নিষ্ঠুরতা হিংস্রতার জন্যে। ইতিহাসের কথা তুললে তাদের নাম কি এড়ানো যায়?

দাদাসাহেব এ কথা বোঝেন যে পাপ-মন্দের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম চিরন্তন। খোদা সত্যপথ দেখিয়েছেন মানুষকে, কিন্তু ক-জন মানুষ সে পথে চলতে পারে? তবু একটা কথা থাকে। মানুষ কুপথে কেন যায়?

একটি বিষয়ে দাদাসাহেব নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। মানুষের পঙ্কিলতা, তার চারিত্রিক দোষঘাট হিংস্রতা অমানুষিকতা কিশোর মনের জানার প্রয়োজন আছে কি? জীবনের শুরুতেই মানুষের ভুলভ্রান্তি অপচার-ব্যভিচারের কথা তাদের জানা উচিত কি? তরুণমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আর বিশ্বাস নবজাত বলেই সুন্দর ও পবিত্র। তা ধ্বংস করা কি ঠিক? দাদাসাহেব আপন মনে প্রশ্ন করেন কিন্তু সঠিক কোনো উত্তর পান না। এবং উত্তর পান না বলেই ইতিহাসের কথা কদাচিৎই বলেন।

অবশ্য প্রশ্নের উত্তর পান না বলে দাদাসাহেব বিচলিত হন না। তিনি পরমসত্যে বিশ্বাসী। তাঁর মতে সে সত্য কেবল আসল কিতাবেই পাওয়া যায় এবং সে-সত্য মানুষের বিগতদিনের বা বর্তমানকালের কার্যকলাপে ধ্বংস হয় না : চিরন্তন সত্যকে কখনো ধ্বংস করা যায় না। তাঁর গূঢ়বিশ্বাস, সে-কিতাবের আদেশ-নির্দেশ বাধা-নিষেধ অনুসরণ করে জীবনযাপন করলেই মানুষের মুক্তিলাভ হয়।

কখনো-সখনো তিনি ছেলেদের বংশের কথাও বলেন। বিনীতিশালীনতায় ঢাকা থাকে বলে সহজে তা পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু দাদাসাহেবের মনে বংশগৌরব কম নয়। আজ সে ধনসম্পদ বা মান-ইজ্জত নাই, কিন্তু এককালে চারধারে তাদের বড় নাম-ডাক ছিল। তখন তাঁরা বিশাল জমিদারির মালিক ছিলেন। তাঁদের ঘোড়াশালে তখন ঘোড়া ছিল, হাতিশালে হাতি। খিল্লাত পরিধান করে রেশমের খরিতায় পত্রাদি বাঁধতেন, খাশমহল আতর-বাইদ্‌মস্কের সুগন্ধিতে ফুরফুর করত এবং বিশেষ উৎসবের দিনে বাদশাহি কায়দায় পথে-ঘাটে মোহর ছড়াতেন। তখন আবদার-চোবদার রাখতেন গণ্ডায় গণ্ডায়, সাবর-সেবন্দিও পুষতেন। আজ সেদিন আর নাই। তবে সে সমারোহ জাঁকজমক আজ নাই বলে দাদাসাহেবের মনে কোনো সময়ে দুঃখ এলেও বংশগৌরবের মতোই সে দুঃখ তিনি ঢেকে রাখেন, প্রকাশ করেন না। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস, জাঁকজমক হল বাইরের খোলস, অর্থ থাকলেই সে-খোলস আসে। বংশের আসল দাম ধন-দৌলতের ওপর নির্ভর করে না। গরিব হলেও আসল খানদানিবংশের দাম পড়ে না। শুধু সোনারূপা, হাতিঘোড়া, পাইক-বরকন্দাজের শানশওকাত থাকলেই একটি বংশ খানদান হয় না। খানদানির মূলভিত্তি হল নেক-চরিত্র, ধর্মের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠা, সাধুতা-দয়াশীলতা, বিনয়-নিরভিমান ব্যবহার ইত্যাদি গুণাগুণ। দাদাসাহেবের বিশ্বাস, এ সব গুণাগুণ বংশপরম্পরাক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রবহমাণ আছে। একটি তুলনায় তিনি তাঁর যুক্তির পূর্ণ সমর্থন পান। মুসলমানদের শানশওকাত আজ নাই, কিন্তু তাই তাদের অন্তস্থিত মূল্য কি কিছু কমেছে? অবশ্য এ-যুক্তি তাঁরই।

আজ সন্ধ্যায় ছক-কাটা লাল কম্বল গায়ে জড়িয়ে দাদাসাহেব প্রথমে চোখ নিমীলিত করে তস্‌বি পড়তে শুরু করেন। পায়ের কাছে কুদ্দুস, তবারক এবং আমজাদ বসে। তারা কতক্ষণ তাঁর নিমীলিত চোখের পানে তাকিয়ে থাকে, তারপর লক্ষ করে, তাঁর মুখ ভাবনাচ্ছন্ন। কিচ্ছা-কাহিনীর আশা কিছুটা ছেড়ে দিয়ে তারা শোনে বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি। থেকে থেকে পশলা বৃষ্টি নাবে কিন্তু দুরন্ত হাওয়ায় সে-বৃষ্টি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। থেকে থেকে সে-হাওয়া ভীতিবিহ্বল অন্ধ পশুর মতো জানালা-দরজায় ঝাপটা দিয়ে যায়। শীতের সন্ধ্যায় এ-অসময়ী ঝড় ছেলেদের মনে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে তোলে।

দাদাসাহেব তাঁর নিয়মিত বৈঠক শুরু না করে আপন ভাবনায় কেমন নিঝুম হয়ে থাকেন। মাথা নত করে তস্‌বি টেপেন, অস্পষ্টভাবে তাঁর ঠোঁট নড়ে, দেহ নিস্পন্দ। আমজাদ একবার ঝুঁকে তাঁর চোখ দেখবার চেষ্টা করে কিন্তু তা ছায়াচ্ছন্ন বলে দেখতে পায় না। তারপর একটু ক্ষুণ্ন হয়ে সে জানালার দিকে তাকায়। ঝড়ের লেজের বাড়ি খেয়ে জানালাটি তখন থরথর করে কাঁপছে।

একটু পরে কিছু সচকিত হয়ে ছেলেরা শোনে দাদাসাহেব অনুচ্চস্বরে কোরানের একটি সুরা আবৃত্তি করতে শুরু করেছেন। চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত কিন্তু তাঁর কণ্ঠে মিষ্টি-মধুর শব্দলহরি জেগেছে। এবার কিছুটা আশান্বিত হয়ে তারা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে, ঝড়ে আর কান দেয় না।

আবৃত্তি শেষ করে দাদাসাহেব আবার নীরব হন। তারপর যেন অপেক্ষমাণ ছেলেদের কথা স্মরণ করে আচম্বিতে ঘোষণা করেন, 'কম লোকেই বোঝে, কিন্তু তোমাদের কাদের দাদা দরবেশ মানুষ।'

ছেলেরা এবার অনুমান করে যে, দাদাসাহেব তাঁর ভাই কাদেরের কথা ভাবছেন। কেন জানতে ইচ্ছা করলেও তাঁর ভাবনাগ্রস্ত মুখ দেখে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে একটু অপেক্ষা করে। দাদাসাহেব আবার চোখ বুজে নীরবাচ্ছন্ন হলে তারা নিরাশ হয়ে ঝড়ের বিচিত্র আর্তনাদে কান ফেরায়।

কাদের দাদাসাহেবের কনিষ্ঠতম ভাই হলেও দু-জনের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বছরের ব্যবধান। দুনিয়ায় কাদেরের যখন আবির্ভাব হয় তখন দাদাসাহেবের ওয়ালেদ বয়োবৃদ্ধ। তখন তাঁর চোখে ছানি পড়েছে, হয়তো চরিত্রে ভীমরতির আভাসও দেখা দিয়েছে। জন্মের প্রথম দিন থেকেই অপ্রত্যাশিত শিশুসন্তান তার বাপের চোখের মণি হল। তাতে দোষ নাই। সবাই মেনে নিল তাঁর শেষ-সন্তানের প্রতি অপরিমিত স্নেহ : বৃদ্ধ বয়সে নোতুন প্রাণের সংস্পর্শে জীবনের প্রতি পুনরুদ্ভূত তীব্র অভীপ্সা কৌতূহলজনক হলেও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু চেতনাবোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের যে চরিত্র প্রকাশ পেল তাতে সবাই শীঘ্র সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল : তাদের আদর্শের সঙ্গে সে চরিত্র যেন ঠিক খাপ খায় না। তার অদম্য খামখেয়ালি ভাব, উগ্র মেজাজ এবং সৃষ্টিছাড়া দুরন্তপনা তাদের কাছে নেহাতই বেখাপ্পা ঠেকে। কেবল বৃদ্ধ বাপ অবিচলিত থাকেন। তার বিসদৃশ চরিত্র হয়তো তাঁর নজরে পড়ে না। পড়লেও এবং সংগোপনে তার চারিত্রিক রুক্ষতা স্নেহের মলমে মোলায়েম করবার চেষ্টা করে থাকলেও সে চেষ্টায় তিনি কৃতকার্য হন না।

কাদেরের উগ্র-দুর্দান্ত স্বভাব বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা না হয়ে আরো তেজী হতে থাকে। কিছুদিন সে ইস্কুল করে, কিন্তু ইস্কুলের চার দেয়ালের শক্তি কি তাকে দু-মিনিটের জন্যেও কয়েদ করে রাখে! সে যে বিদ্রোহী ছেলে তাতে সন্দেহ রইল না। কেবল কিসের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ সে-কথা কেউ বুঝল না।

চোখ না খুলেই হঠাৎ দাদাসাহেব অনুচ্চকণ্ঠে আপন মনে বলেন, 'দরবেশের বিদ্রোহ সাধারণ লোকে কী করে বোঝে?'

হঠাৎ একদিন সে-দুরন্ত ছেলের মধ্যে ঘোরতর পরিবর্তন এল। যেন অকস্মাৎ ঝড় থামল। বয়স তখন আঠার-উনিশ। মুখে আর কথা নাই, চলনে তেজ নাই, চোখে চোখে কারো দিকে তাকায় না। একা একা থাকে, কারো সঙ্গ পছন্দ হয় না। এই সময়ে দাদাসাহেব তাকে তাঁর কার্যস্থলে নিয়ে যান। ধর্মের ব্যাপারে কিছু শিক্ষাদীক্ষা দেবার চেষ্টা করেন, নানারকম উপদেশ-নছিহত দেন যাতে এতদিন যা বাদ পড়েছে তার কিছুটা পূরণ হয়, তার জ্ঞানবোধ আর চারিত্রিক অভাব কিছুটা কাটে। এই সময়ে কাদেরের প্রতি তাঁর পিতার অন্ধস্নেহের কিছুটা যেন তার মনেও দেখা দেয়। ইস্কুলের লেখাপড়া তার বিশেষ হল না, কারণ গোড়া থেকে শুরু করার বয়স তখন পেরিয়ে গেছে। তবে পার্থিব জ্ঞানার্জন না হলেও তার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে দাদাসাহেবের মনে কোনো সন্দেহ রইল না। তারপর একদিন সে হঠাৎ দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।

'আমিই তাকে শিখিয়েছি। আমার হাতেই সব শিখেছে, তোমাদের কাদের দাদা', দাদাসাহেব আবার বলেন। কথাটায় আত্মদম্ভ লক্ষ করে একটু লজ্জিত হয়ে যোগ দেন, 'অবশ্য দরবেশকে কে কী শেখাতে পারে?'

দাদাসাহেবের বাপ-মা দুজনেরই ততদিনে ইন্তেকাল হয়েছে। কাদেরের স্বভাব পরিবর্তনের পরে আশা হল, সেই জমিজমা ঘরসংসার দেখবে। ভরসা হল চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা কেটেছে, এবার একটু কেমন বিহ্বলতা যে দেখা দিয়েছে তাও কাটবে এবং ঘরসংসারের জটিলতা বুঝতে তার দেরি হবে না। সে আশা পূর্ণ হয় নাই।

'সংসারে দরবেশের মন কখনো পড়ে না।' দাদাসাহেব আবার আপন মনে উক্তি করেন। তারপর ছেলেদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে তাদের দিকে একবার তাকান। সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, 'তোমাদের কাদের দাদার কথা বলছি।'

অবশেষে সংসারের ভার নিল দাদাসাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র হামিদ। সিধেসাধা গোবেচারা মানুষ, সদাসর্বদা আদেশাধীন, নম্র-বাধ্য। অশেষ শ্রমসহিষ্ণুতার সঙ্গে এবং বারংবার চেষ্টার ফলে কলেজের শেষ পরীক্ষা কোনো প্রকারে পাস করলেও সকলের আশা হয় সে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করবে। যোগদান করেওছিল, কিন্তু ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো তার প্রাণ শীঘ্রই আইঢাই করতে শুরু করে। চাকুরি অসহ্য হয়ে উঠলে তাতে ইস্তফা দিয়ে দেশের বাড়িতে ফিরে আসে। নামে শুধু কাদের সংসারের দায়িত্ব নিয়েছিল। হামিদের প্রত্যাবর্তনের পর সে-দায়িত্বও থাকল না।

আজ কাদের সম্পূর্ণভাবে নিষ্কর্মা। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এবং অসামাজিক বলে তার মনের পরিচয় পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু তার বাইরের চেহারা স্বভাবত নিদ্রালস। নিদ্রালস ভাব কাটলে চরম উদাসীনতা নাবে তার মুখে। দাদাসাহেব বলেন, তা তার মুখাচ্ছাদন মাত্র। বিছানায় যখন লম্বা হয়ে পড়ে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তখন খাটের খুরোতে আর তাতে তফাৎ থাকে না! মাছ ধরার বাতিক জাগলে ছিপ-বঁড়শি নিয়ে পুকুরধারে গিয়ে যখন বসে তখন প্রাতঃকাল মধ্যদিনের উত্তাপ পেরিয়ে নিষ্প্রভ অপরাহ্ণে গড়িয়ে যায়, সে নড়েচড়ে না, নিস্পৃহমুখ দেখে মনে হয় তার যেন কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাই নাই। বার দুয়েক তাকে তর্ক করতে দেখা গেছে। পরিবারের কারো সঙ্গে নয়, মসজিদের এক চোখ-কানা ইমামের সঙ্গে। যুক্তিতর্কের সূত্র বেশিক্ষণ ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মতবিরোধ ঘটলে হঠাৎ তার মেজাজ রুক্ষ হয়ে ওঠে, কিশোর বয়সে যেমন হত। তবে শীঘ্র নিজেকে সংযত করে অপ্রস্তুত ইমামকে রেহাই দেয়। দ্বিতীয়বারও তার বক্তব্যের মূলকথা উত্তপ্ত ভাষায় বাষ্পীভূত হতে দেরি লাগে নাই। তার সাধারণ মানুষসুলভ কর্মের মধ্যে আকস্মিক বিয়েই হয়তো একমাত্র উল্লেখযোগ্য। তিন বছর আগে চির বিবাহ-বিরোধী কাদের মত বদলিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আজ তার সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ। অনেক সময় দীর্ঘকাল তাদের মধ্যে কথালাপ হয় না।

দরবেশ বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, সেটাই মস্ত কথা। আর দশজন জামাইর মতো ব্যবহার কীভাবে করে? একবার দাদাসাহেব তার স্ত্রী-উদাসীনতা সমর্থন করে বলেছিলেন, 'কেবল কথা বলে না। মারপিট করে কি? না, তা করে না। তবে নালিশের কারণ কী?'

কাদেরের দরবেশীলাভের ইতিহাস একদিন কিছুটা সংগোপনে দাদাসাহেব ছেলেদের বলেছিলেন। তখন সে অবিবাহিত। একদিন মধ্যরাতে সে জেগেই শুয়েছিল, হঠাৎ বাড়ির দেউড়ির কাছে থেকে কে যেন তাকে ডাকল। অপরিচিত কণ্ঠস্বর, তবু কোন বন্ধু যেন ডাকল তাকে। ধড়মড়িয়ে উঠে দরজার খিল খুলে সে বেরিয়ে গেল। কাউকে দেখতে পেল না, কিন্তু তাতে নিরুৎসাহ হল না, বিস্মিত হল না, ভীতও হল না। তারপর সে হাঁটতে থাকল। অনির্দিষ্টভাবে নয়, কারণ কণ্ঠস্বরটি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সে-রাতে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রথমবার সাক্ষাৎ হয়। পরদিন সকালে যখন সে ঘরে ফেরে, তার মুখ ফ্যাকাসে, রক্তহীন, কিন্তু চোখে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি, অলৌকিক তৃপ্তি-সন্তোষ ভাব। সেই থেকে বুজুর্গের সঙ্গে তার প্রায় সাক্ষাৎ হয়।

দাদাসাহেব বলেন, 'অবশ্য মুখ খুলে এসব কথা সে কখনো বলে নাই। এসব কথা কেউ মুখ খুলে বলে না।' কী করে কথাটা তিনি জানতে পেরেছেন তা তিনি পরিষ্কার করে বলেন না।

আজ ঝোড়ো সন্ধ্যায় দাদাসাহেব ধর্মোপদেশ না দিয়ে, নীতিমূলক কিচ্ছা-কাহিনী না বলে কাদেরের কথাই কেন ভাবছেন, তার কারণ আছে। সকালবেলায় তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকালে তিনি লক্ষ্য করে দেখেন, তার মুখ ফ্যাকাসে ও রক্তহীন। তাঁর বুঝতে দেরি হয় না কেন। তবে তার চোখ দেখে তিনি অতিশয় বিস্মিত হন। তাতে কেমন তীক্ষ্ণ খরধার। শুধু তাই নয়। এক পলকের জন্যে সে এক বিশেষ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায়, যার অর্থ তিনি বোঝেন না। ইশারায় সে যেন তাঁকে কিছু জানাতে চায়।

সে-দৃষ্টি সারাদিন দাদাসাহেবকে নিপীড়িত করেছে, তার সঙ্গে নির্জনে একটু আলাপের জন্যে, তাকে দু-একটা প্রশ্ন করবার জন্যে একটি প্রবল বাসনা থেকে থেকে তিনি বোধ করেছেন।

বিষাদাচ্ছন্নকণ্ঠে দাদাসাহেব উচ্চস্বরে বলেন, 'বলবার হলে সে-ই বলবে। আমার পক্ষে জিজ্ঞাসা করাটা সমীচীন হবে না।'

বাইরে ঝড় থেমেছে। রুদ্ধ জানালার দিকে একবার তাকিয়ে দাদাসাহেব পিঠ সোজা করে বসেন। বড়ঘরে দেয়ালঘড়িতে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজে। ছেলেদের দিকে তাকাবার আগে আরেকবার ভাবেন কাদেরের কথা। ভাবেন, অবশ্য এ কথা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না, কিন্তু বুজুর্গ মানুষ সহজে দেখা দেন না। দরবেশ না হলে কাদের কি বুজুর্গের দেখা পেত? না, কাদের যে দরবেশ তাতে সন্দেহ নাই।

তারপর চোখ খুলে তিনি ছেলেদের দিকে তাকান। একটু কেশে গম্ভীরভাবে ঘোষণা করেন, 'আজ তোমাদের প্রিয় পয়গম্বরের ইন্তেকালের কথা বলব।'

তিন

শীতের মিষ্টিরোদ ইস্কুলের নেড়ে প্রাঙ্গণেও স্নিগ্ধ সোনালি আলো ফেলেছে। এক কোণে পাতাবাহারের গাছে সে আলো ঝলমল করে।

চুনবালিতে লেপা বাঁশের দেয়াল, কাঠের ঠাট, ওপরে তরঙ্গায়িত টিনের ছাদ। ছাত্রদের সামনের বার্নিশশূন্য বেঞ্চিতে কালির দাগ, অনেক গ্রীষ্মের ঘামের ছাপ, এখানে-সেখানে ছুরির নির্দয় আঁচড়। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার টেবিলের পেছনে বসে যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। গায়ে নিত্যকার মতো সামান্য ছাতাপড়া, জীর্ণ সবুজ আলোয়ান, পরনে আধা-ময়লা সাদা পায়জামা, পায়ে ধুলায় আবৃত অপেক্ষাকৃত নোতুন পাম্প-সু। অভ্যাসমতো টেবিলের তলে সে অবিরাম ডান পা নাড়ে। পা-টি যেন কলযন্ত্রে চালিত হয়।

আরেফ আলীর বয়স বাইশ-তেইশ। কিন্তু তার শীর্ণ মুখে, অনুজ্জ্বল চোয়ালে বয়োতীতভাব : যৌবনভার সে যেন বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি। সে-মুখে হয়তো যৌবনকণ্টক জন্মেছিল, কখনো যৌবনসুলভ পুষ্পোদগম হয় নাই। কয়েক বছর আগে মাদ্রাসা-হাদিসের প্রভাবে দাড়ি রেখেছিল, আজ সে-দাড়ি নাই। কিন্তু এখনো মনে হয় থুতনির নিচে কেমন উলঙ্গতার ভাব। খাড়া নাক চিকন, কপাল ঈষৎ সমুন্নত, চোখে একটু কাঠিন্যভাব। তবে রসশূন্যস্বাস্থ্যের জন্যেই তার চোখ কঠিন মনে হয়। লক্ষ্য করে দেখলে সে-চোখের সরলতা, সময়ে-সময়ে অসহায়তাও নজরে পড়ে। কখনো-কখনো তার মধ্যে উদ্ধতভাব ও দম্ভ দেখা যায়, কিন্তু সেটা শিক্ষকতা করে বলে চড়ানো ব্যাপার। তবু একটু অহঙ্কার নাই যে তা নয়। দম্ভ-ঔদ্ধত্য না হোক, শিক্ষক হলে অহঙ্কার না হয়ে পারে না। তবে সেটা কৃত্রিম নয় বলে সযত্নে ঢেকে রাখে, শুধু ক্বচিৎ-কখনোই তার আভাস পাওয়া যায়।

আরেফ আলী অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। এক সময়ে হঠাৎ সচেতন হয়ে সে লক্ষ্য করে, ছাত্রদের কোলাহল ঝড়ের বেগ ধারণ করেছে। শিক্ষকের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে তারা সংযমের লাগাম ছেড়ে শোরগোল শুরু করেছে এবং সে-শোরগোল এমন এক উচ্চ খাদে উঠেছে যে সেখানে ব্যক্তিগত কণ্ঠের কোনো চিহ্ন নাই। সে-জন্যেই মনে হয় ঝড় বইছে।

অন্যদিন তীক্ষ্ণগলায় তবু হৃদ্যতার সঙ্গে শিক্ষক আরেফ আলী আঙ্গুল নেড়ে শাসন করত। আজ কেমন শ্রান্তগলায় বলে, 'না না, গোলমাল করো না।'

ছাত্রদের কোলাহল দু-এক খাদ নিচে নেমে একটু অপেক্ষা করে, তারপর আবার সে উচ্চপদে আরোহণ করে। কিছুক্ষণ সময় কাটে। অবশেষে আরেফ আলী এধার-ওধার তাকায়। আওয়াজটা কোত্থেকে যে আসছে তা যেন বুঝতে পারে না। পূর্ববৎ শ্রান্তগলায় বলে, 'কী? বললাম না গোলমাল করো না?'

শিক্ষকের দৃষ্টি ছাত্রদের উপর নিবদ্ধ থাকে বলে এবং তার মন অন্যত্র ফিরে যায় না দেখে কোলাহল হঠাৎ থামে। যেন ঝড় থামে। একটু দম নিয়ে যুবক শিক্ষক আবার এধার-ওধার তাকায়। কেন তাকায়, নিজেই তা বোঝে না। তারপর অভ্যাসবশত অন্যদিনের মতো আমজাদকেই প্রশ্ন করে, 'বলো, তিনটি পর্বতমালার নাম বলো।'

শান্তচিত্ত হয়ে যেন যুবক শিক্ষক শিক্ষকতার কাজ শুরু করে, ছাত্ররাও হঠাৎ পাঠানুরাগী হয়ে ওঠে। আমজাদ দ্বিধা না করে বলে,

"হিমালয়।"

"তারপর?"

"আরাবল্লী।"

"তারপর?"

"বিন্ধ্যাচল।"

"বেশ। মনে রেখো, হিমালয় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পর্বতমালা। দৈর্ঘ্যে, উচ্চতায়, ঘনত্বে তার সেরা নাই।"

সামনের বেঞ্চি থেকে একটি ছেলে ডাকে "স্যার?"

"বলো।"

"হিমালয় দেখেছেন?"

দরিদ্র যুবক শিক্ষক, কোপন নদীর ধারে ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামে তার জন্ম। কষ্টেসৃষ্টে নিকটে জেলা শহরে গিয়ে আই.এ. পাস করেছে, সুপরিচিত নদী-খাল-বিল ডোবা-মাঠ-ঘাট সুদূরপ্রসারী ধান ফসলের ক্ষেতের বাইরে কখনো যায় নাই। সমতল বাংলাদেশের অধিবাসী, পর্বতমালা কখনো দেখে নাই। বই-পুস্তকে, সাময়িক পত্রিকা-সংবাদপত্রে কোনো কোনো পর্বতের ছবি দেখেছে, কিন্তু অনেক পর্বতের শুধু নামই শুনেছে। এণ্ডিজ, উরাল, ককেসিয়ান আলতাই পর্বতমালা। কত নাম। সব স্বপ্নের মতো শোনায়।

'না। হিমালয় দেখি নাই। হিমালয় দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।' কিছুটা ক্ষুণ্ন কিন্তু পরিষ্কারকণ্ঠে যুবক শিক্ষক জবাব দেয়।

যুবক শিক্ষকের মনে ইস্কুল ঘরের পারিপার্শ্বিকতা এবং শিক্ষকতার কাজ সাধারণ রূপ ধারণ করেছিল। হয়তো দেখা না-দেখার কথাতেই হঠাৎ নিমেষের মধ্যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো একটি ভয়াবহ দৃশ্য আবার তার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়। তারপর কেউ যেন তার শরীরের রক্তপানি শুষে নেয়, শূন্য শরীর অপরিসীম শ্রান্তিতে অবশ হয়ে আসে। দমক্‌টা কাটলে সে আপন মনে বলে, হিমালয় সে দেখে নাই। বস্তুত, সে কিছুই দেখে নাই। দরিদ্র শিক্ষক, কিছুই তার দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।

সজোরে নিশ্বাস নিয়ে যুবক শিক্ষক তারপর জানালা দিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যালোকের দিকে তাকায় কিন্তু সে-আলো সে দেখতে পায় না। একটি দৃশ্যই কেবল তার চোখে ভাসে। সে-দৃশ্য থেকে তার নিস্তার নাই, তার মনে-প্রাণে ও দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার বিভীষিকাময় ছায়া।

কিছুক্ষণ পর যুবক শিক্ষক অস্পষ্টভাবে শুনতে পায়, ক্লাসঘরে আবার কলরব জেগেছে। কিন্তু তাদের শাসন না করে সে সর্বাঙ্গে নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। সে যে কেবল দৃশ্যটিই দেখে তা নয়, একটি মানুষের মুখও বার বার দেখতে পায়। আসলে সে-মুখই যেন ভয়াবহ দৃশ্যটিকে ঢেকে দেয়, এবং সে-মুখ ভয়াবহ মনে না হলেও প্রতিবার তার জন্যেই তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, শরীরেও কাঁপুনি ধরে। তবু বারেবারে মনশ্চক্ষুতে মুখটিকে সে চেয়ে-চেয়ে দেখে।

তারপর হয়তো ছাত্রদের কোলাহল অসহনীয় হয়ে ওঠে। অথবা অতি বিচিত্র মানসিক অবস্থার মধ্যেও কর্তব্যের কথা তার স্মরণ হয়। আবার সজোরে নিশ্বাস নিয়ে সে ছাত্রদের দিকে তাকায়। তাদের মুখ কেমন অস্পষ্ট মনে হয়। দুর্বলকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, 'কে বলবে

এবার?'

সে শাসন না করলেও গোলযোগ সহসা শান্ত হয়। যুবক শিক্ষক অবশেষে মতিনকে দেখতে পায়। ঘোর-কালো ছেলে, কিন্তু বড় বড় চোখ টলটল করে।

'তুমি বলো। তিনটে উপদ্বীপের নাম বলো।'

যুবক শিক্ষক মতিনের দিকে তাকিয়ে থাকে বটে কিন্তু তার উত্তর তার কানে পৌঁছায় না। কেবল শোনবার ভঙ্গি করে ঘন ঘন মাথা নাড়ে। তার ডান পাও আবার অভ্যাসমতো নড়তে শুরু করেছে।

মতিনের গলার স্বর থামলে অজান্তেই সাধুতার পরিচয় দিয়ে যুবক শিক্ষক প্রশ্ন করে, 'বলেছ তিনটি উপদ্বীপের নাম?'

'বললাম তো।'

'বেশ বেশ।' যুবক শিক্ষক আবার সজোরে নিশ্বাস নেয়। ছেলেদের মুখ যেন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এবার তাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অকারণে কেমন বেদনা বোধ করে। 'বেশ। তাহলে এবার তিনটে দীর্ঘতম নদীর নাম বলো।' এধার-ওধার চেয়ে আবার আমজাদের ওপরই আঙ্গুল নিবদ্ধ করে।

'তুমিই বলো।'

দু-বছর আগে আরেফ আলী শিক্ষক হয়ে এ গ্রামে আসে। থাকার আশ্রয় পায় বড়বাড়িতে। খাওয়াদাওয়াও সেখানেই হয়। তার বদলে বড়বাড়ির ছেলেদের দুই বেলা ঘরে পড়ায়। তার বিশ্বাস এই যে, যত নেয় তত সে দেয় না, কিন্তু সেটা দয়াশীল দাদাসাহেবেরই ব্যবস্থা। দাদাসাহেবের প্রতি তাই তার ভক্তিশ্রদ্ধার অন্ত নাই।

দক্ষিণে তিন মাইল দূরে তার নিজের গ্রাম। দরিদ্র সংসার, হাতের তালুর মতো এক টুকরো জমিতে জীবনধারণ চলে না। টেনে-হিঁচড়ে আই.এ. পাস করে সে দেশে ফিরে আসে। পড়তে পারলে আরো পাস করত, কিন্তু কলেজের ফি, বইখাতা কেনার পয়সা আর যোগাড় হয় না। তাছাড়া, জেলাশহরে ঘুপ্‌সি-আস্তানায় থাকলেও খরচ হয়। এক রত্তি শাকসবজির জমিটাও বিক্রি করে উচ্চশিক্ষার পশ্চাতে ছোটার অর্থ হয় না।

বর্তমান চাকুরিতে আরেফ আলীর অসন্তোষের কারণ নাই। বরঞ্চ তার বিশ্বাস, ভাগ্য দয়াবান না হলে এমন চাকুরি সহজে মিলত না। ইস্কুলটি এখনো উচ্চ ইস্কুলে পরিণত হয় নাই বটে তবু নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ-অধ্যয়নের দরজা খোলা হয়েছে। আশা এই যে, দু-এক বছরের মধ্যে সর্বশেষ শ্রেণীও খোলা সম্ভব হবে। সরকারি অর্থ-সাহায্যের জন্যে যথাযথ আর্জি পেশ করা হয়েছে। শীঘ্র সে সাহায্যও পাওয়া যাবে সকলের ভরসা। বড়বাড়ির উদ্যম ও আর্থিক সাহায্যে এ-ইস্কুলের পত্তন পড়ে। কিন্তু এখন সেদিনের ক্ষুদ্র ইস্কুলটি আর নাই; এ-কে পোষা বড়বাড়ির সামর্থ্যের বাইরে। সরকারি সাহায্য ছাড়া ইস্কুলটির উন্নতি সম্ভব নয়। অবশ্য নিরাশাবাদীদের মতে সরকারি অর্থ সাহায্য পাওয়ার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে। নিকটবর্তী জেলাশহরের দুটি উচ্চ ইস্কুলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবলই বাগাড়ম্বর নয়। এ-ইস্কুল ক্রমশ তাদের আয়ে হস্তক্ষেপ করছে সেটা সহনীয় ব্যাপার নয়। সুতরাং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থামাবার জন্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আরেফ আলী কিন্তু নিরাশ বোধ করে না। ইস্কুলের এবং সাথে সাথে নিজেরও আর্থিক এবং পদোন্নতির বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তাছাড়া, বর্তমান অবস্থাই-বা তেমন বিশেষ খারাপ কী? দাদাসাহেবের অভিভাবকত্ব শুধু যে লাভজনক তা নয়, পিতৃহীন যুবকের জন্যে একটা নিরাপদ স্নেহশীল ছাতার মতো।

হাতে যে-সামান্য টাকা আসে মায়না বাবদ, তা প্রায় না ছুঁয়ে বৃদ্ধা মায়ের হাতে দিয়ে আসে। মাকে টাকা দেবার সময় প্রতিবার তার অন্তরে কী একটা ভাব উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, চোখে প্রায় পানি আসে। কিন্তু সে-আবেগ অপ্রীতিকর ঠেকে না। অন্তর শান্ত হলে একটা

সুখবোধ আসে। তখন তার মনে হয়, জীবনে যেন এই সর্বপ্রথম সে সুখবোধ অনুভব করছে। তবে নবজাত এই সুখবোধকে সরাসরি আলিঙ্গন করতে সাহস হয় না, লাজুক মানুষের মতো অজ্ঞাত আগন্তুকটিকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলে। তবু তার সহবাস ভালোই লাগে। একটি হাসিখুশি প্রফুল্লচিত্ত সঙ্গী জুটেছে যেন।

হঠাৎ সচেতন হয়ে যুবক শিক্ষক লক্ষ করে, ক্লাসঘরে অখণ্ড নীরবতা। কপালে হাত রগড়ে ভ্রূ উঠিয়ে সে নির্বাক ছাত্রদের পানে তাকায়। দেখে, সবাই নিষ্পলকদৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে আছে। অপ্রস্তুত হয়ে সে ছাত্রদের শাসন করতে গিয়ে থেমে যায়। ছাত্ররা গোলমাল করছে না, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বাঁদরনাচও দেখছে না। এধার-ওধার তাকিয়ে অবশেষে আমজাদকে জিজ্ঞাসা করে, "কী? বলেছ উপদ্বীপের নাম?" আমজাদ প্রতিবাদ করার আগেই সজোরে মাথা নেড়ে বলে, "কী বলছি! উপদ্বীপ নয়, নদীর নাম।"

আমজাদ নিরুত্তর হয়ে থাকলে পেন্সিল দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করে কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে আরেফ আলী বলে, "কী? ভুলে গেছ সব?"

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর আমজাদ শিক্ষকের দিকে সোজা তাকিয়ে গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে, "স্যার, আপনার আজ শরীর ভালো নয়?"

হঠাৎ এমন প্রশ্নের জবাবটা ঝট্ করে আসে না। যুবক শিক্ষক কোনো উত্তর খুঁজে পায় না। নিদ্রাহীন রাত্রি বিচরণের ছাপ নিশ্চয় তার চোখে-মুখে স্পষ্টভাবে লেখা। তার আচরণও কি ছাত্রদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে?

অবশেষে নিরাশমুখে পেটে হাত বুলিয়ে সে বলে, "বোধহয় একটু বদহজম হয়েছে।" পরমুহূর্তেই সে-কথা উড়িয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে আদেশ দেয়, "উপদ্বীপের নাম বলেছ, এবার তিনটি দীর্ঘতম নদীর নাম বলো, আমজাদ।"

আমজাদ বলে না যে ইতিপূর্বে সে তিনটি নদীর নাম একবার বলেছে। নত মাথায় শুষ্ককণ্ঠে সে পুনর্বার বলে। অন্য ছাত্ররা একটি কথা বলে না।

দাহজ্বরাগ্রস্ত মানুষ যেমন স্নেহস্পর্শ অনুভব করে কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি যুবক ছাত্রদের স্নেহজাত উদ্বেগ সে নীরবেই গ্রহণ করে। সে বোঝে তার মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা বিভাজ্য নয়, কারো সাথে তার ভাগাভাগি সম্ভব নয়। কারণ তার জন্মকথা প্রকাশ করা যায় না।

অপরিসীম দুঃখের সঙ্গে সে ভাবে, এ কী হল তার? কিন্তু কী যে তার হয়েছে তা সে পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারে না। সে একটি গোলকধাঁধায় ঢুকেছে, যার আকৃতি-পরিধি কিছুই জানে না, যার অর্থ সে বোঝে না। সে-গোলকধাঁধায় পরিচিত জগতের কোনো চিহ্নও নাই।

ঘণ্টা বাজার একটু আগে হঠাৎ যেন তার জ্বর ছাড়ে। চিন্তাধারা সংযত হলে সে এবার সামান্য লজ্জাও বোধ করতে শুরু করে, কারণ তার মানসিক অবস্থার কোনো যুক্তিসঙ্গত হেতু সে খুঁজে পায় না। গোলকধাঁধায় যেন সূর্যরশ্মি প্রবেশ করেছে। সে বুঝতে পারে, বাঁশঝাড়ের দৃশ্যটির সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ নাই। দৃশ্যটি অতি বীভৎস তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু সে শুধু তার ক্ষণকালের দর্শকমাত্র। একবার দেখেছে, আর দেখবে না। দেখে মনে যে আঘাত পেয়েছে, সে-আঘাতও স্থায়ী হবে না। তাছাড়া, সে-দৃশ্যটির সঙ্গে কোনো পাপ-নৃশংসতা জড়িত, সে-পাপ-নৃশংসতা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

মনে সামান্য শক্তির সঞ্চার হলে যুবক শিক্ষক ছাত্রদের বলে, "বলো, কে আমাজন আবিষ্কার করেছিল?" তারপর হঠাৎ একটি কথা স্মরণ হলে বলে, "না, তোমাদের বইতে তার নাম নাই। পনের শ শতাব্দীতে ভিনসেণ্ট পিনজোন সর্বপ্রথম আমাজন নদীটি আবিষ্কার করে। তবু বহুদিন সে-নদী রহস্যময় ছিল। কিন্তু আজ সে-নদী সম্বন্ধে কিছুই মানুষের অজানা নাই।" একটু থেমে যুবক শিক্ষক আবার বলে, "সে-রহস্যও নাই, নদীটির সম্বন্ধে

সে-রূপকথাও নাই। অজ্ঞানতায় রহস্য-রূপকথার জন্ম হয়।"

হঠাৎ শিক্ষকের কানে ঝাঁঝ ধরে। মনে হয় কান দুটি জ্বলে যাচ্ছে। সজোরে সে প্রশ্ন করে, "আমাজন নদীর আবিষ্কারকের নামটি বল।"

ছাত্ররা চুপ করে থাকে। নতুন বিদেশী নামটি তারা ধরতে পারে নাই। কোনো উত্তর না পেলে যুবক শিক্ষক কিন্তু আবিষ্কারকের নামটি দ্বিতীয় বার বলে না। তার মনে হয়, কানের ঝাঁঝটা আরো বেড়েছে যেন। সে ভাবে : তাই, কেন সে পালিয়ে গিয়েছিল? কেমন করে সে এ-কথা ভাবতে পেরেছিল যে বীভৎস দৃশ্যটির সঙ্গে কাদের জড়িত থাকতে পারে?

অবশেষে ক্লাস বদলের ঘণ্টা বেজে ওঠে। ভূগোলের বই বন্ধ করে যুবক শিক্ষক উঠে দাঁড়ায়। পায়ে অসীম দুর্বলতা, তবে মাথাটা পরিষ্কার মনে হয়। লজ্জাভাবের রেশটা এখনো কাটে নাই, কিন্তু সে একটা গভীর স্বস্তি বোধ করে।

চার

দু'বছর ধরে বড়বাড়ির বাইরের ঘরে বসবাস, তবু কাদেরের সঙ্গে মুখামুখি হবার সুযোগ কমই হয়েছে। মুখামুখি হলেও কথালাপ হয় নাই। তবু তার সম্বন্ধে যুবক শিক্ষক কখনো কখনো গভীর কৌতূহল বোধ করেছে। হয়তো তার সম্বন্ধে দাদাসাহেবের খেয়ালটির কোনো ভিত্তি নাই, তবু দরবেশী ব্যাপারে কে নিশ্চিত হতে পারে?

আজ রাতে যুবক শিক্ষক শান্তচিত্তে তাকে ভালো করে চেয়ে দেখে। খাটো মানুষ, কিন্তু বংশজাত চওড়া হাড়। কালো রং, চেহারার গঠন ধারালো। তবে তার চেহারায় দুটি জিনিস শীঘ্র চোখে পড়ে। প্রথমত, তার অর্ধ-নিমীলিত চোখ। সে যেন নিদ্রা-জাগরণের মধ্যে কোথাও সর্বদা বিরাজ করে। নিদ্রাবিষ্ট চোখের প্রভাব তার সারা মুখেও বিস্তারিত। দ্বিতীয়ত, তার মাথায় চুলের বাহার। তেল-চকচকে মাথায় সযত্নে সিঁথি কাটা, একটি চুলও অস্থানে নাই। তার অর্ধঘুমন্ত মুখে সে চুলের বাহার কেমন বেমানান মনে হয়।

কাদের মশারি সরিয়ে যুবক শিক্ষকের বিছানার একপ্রান্তে বসে। তার অর্ধ-নিমীলিত দৃষ্টি ছোট টেবিলে স্থাপিত লণ্ঠনের ওপর নিবদ্ধ। কেমন মনে হয়, যুবক শিক্ষকের এ-সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্বন্ধে সে সচেতন এবং এ-পরীক্ষায় তার আপত্তি নাই। বরঞ্চ স্ব-ইচ্ছায়ই যেন সে তার পরীক্ষাধীন হয়েছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে যুবক শিক্ষকের ভয় হয়, কানে আবার ঝাঁঝ ধরবে বুঝি। ভাগ্যবশত, কাদের এমন সময় একটু নড়ে ওঠে। হয়তো সে বুঝতে পারে, পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আলগোছে সে এধার-ওধার তাকায়। টেবিলের ওপর দু-একটা বইয়ের ওপর তার নজর পড়ে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য। অবশেষে লণ্ঠনের ওপরই তার দৃষ্টি ফিরে আসে।

শীঘ্র যুবক শিক্ষক অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। একই বাড়িতে দু-বছর বসবাস করে যার সঙ্গে কখনো কথালাপ হয় নাই এবং যার সঙ্গে গত রাতে অতি বিচিত্র অবস্থার মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, গভীর রাতে তার এ আগমন এবং আগমনের পরেও তার গভীর নির্বাকতা বেশিক্ষণ স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করা মুশকিল। কী জন্যে সে এসেছে? তার সম্বন্ধে যুবক শিক্ষকের মনে যে একটি অদ্ভুত সন্দেহ জেগেছিল, সে সন্দেহটি দূর করতে এসেছে কি? তার সন্দেহটি কাদেরকে হয়তো সারাদিন পীড়া দিয়েছে।

একটা অস্পষ্ট সহানুভূতিতে যুবক শিক্ষকের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু নীরব লোকটিকে কী বলবে বুঝে পায় না। মনে সন্দেহটা কেটেছে বলে কথাটা ভাবতেই মনে লজ্জা আসে। তার পক্ষে সে কথা তোলা সহজ নয়।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করে কাদের কিছু বলে ওঠে। যুবক শিক্ষক তার কথাটা ঠিক ধরতে পারে না। কেবল কাদের কথা বলেছে বলে একটা স্বস্তির ভাব বোধ করে। নম্রকণ্ঠে সে প্রশ্ন করে, "কী বললেন?"

কাদেরের দৃষ্টি পূর্ববৎ লণ্ঠনের ওপর নিবদ্ধ। একটু চুপ থেকে সে কেমন খনখনে গলায় বলে, "তোস্‌তারী কিংখাবের কথা বলছিলাম।"

আরেকটি বিসদৃশ জিনিস : খনখনে গলা। মুখের সঙ্গে মানায় না!

"তোস্‌তারী কিংখাব?"

"শোনেন নাই?"

গলা আরো নম্র করে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়, "না।"

"পুরোনো আমলের জিনিস। সিন্দুকে তালাবন্ধ থাকে।"

যুবক শিক্ষক বোঝে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো মূল্যবান বস্তুর কথা কাদের বলছে, কিন্তু সে কথার আকস্মিক উত্থাপনের অর্থ সে বোঝে না। হঠাৎ তার সন্দেহ হয়, গত রাতের ঘটনা বা তার প্রতি যুবক শিক্ষকের যে সন্দেহ জেগেছিল, সে-ঘটনা বা সে-সন্দেহ তার আগমনের কারণ নয়। তাদের বংশের তোস্‌তারী কিংখাবের কথাও যে তাকে বলতে এসেছে, তা নয়। কাদের নিঃসঙ্গ মানুষ। গত রাতে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে তাদের সাক্ষাৎ হলে হঠাৎ সে কি তার প্রতি একটা বন্ধুত্ব-ভাব বোধ করতে শুরু করেছে?

"দামি জিনিস হবে।" অবশেষে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়। সে যে তোস্‌তারী কিংখাবের মূল্য বুঝতে পেরেছে সে-কথা কাদের উপলব্ধি করেছে কিনা তাই দেখবার জন্যে তার দিকে একবার তাকায়। কাদের তার দৃষ্টি লক্ষ করে না। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থাকার পর যুবক শিক্ষক ভাবে তাকে প্রশ্ন করবে তোস্‌তারী কিংখাব আসলে কী জিনিস, এমন সময় কাদের হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। একটু ইতস্তত করে অবশেষে খনখনে গলায় বলে, "চলেন যাই।"

যুবক শিক্ষক সহসা কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। শেষে শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করে, "কোথায়?"

"এখনো বাঁশঝাড়ে পড়ে আছে। কেউ খবর পায় নাই।"

কথাটি এমন সাধারণ শোনায় যেন তা যুবক শিক্ষকের মনে তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। তারপর হঠাৎ কাদেরের কথার মর্মোদ্ধার করার আগেই যেন একটা দুর্বোধ স্রোত প্রবলবেগে এসে তাকে স্থানচ্যুত করে। দুপুরবেলা থেকে তার মনে দুনিয়াটা স্বাভাবিক রূপ ধারণ করেছিল। মধ্যরাতে তার ঘরে কাদেরের উপস্থিতিও সে যে শুধু স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছিল তা নয়, তাদের কেমন বন্ধুত্বের আভাস পেয়ে তার মন উষ্ণ হয়ে উঠেছিল। কাদেরের প্রস্তাবে এবার সব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। না, সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

যুবক শিক্ষকের উত্তর দিতে দেরি হচ্ছে দেখে কাদের আবার বলে, "বাঁশঝাড়ে জন্তু-জানোয়ার আসে।"

যুবক শিক্ষক তখন লণ্ঠনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে। এবারও সে কোনো উত্তর দিতে সক্ষম হয় না। সে কী উত্তর দেবে? মনটা তার কেমন ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। কী একটা কথা ধরবার চেষ্টা করে বলে সারা মনে প্রচণ্ড আলোড়ন হয় কিন্তু কথাটি শুধু কাদায় নয় লতাপাতা-আগাছায়ও জড়িয়ে আছে।

"চলেন।" আরেকটু অপেক্ষা করে কাদের আবার বলে। চলার ভঙ্গি করে বলে তার জুতায় একটু শব্দ হয়।

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, তার পক্ষে চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। কাদেরের প্রস্তাবটি বুঝতে না পারলেও সেটিকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা তার নাই। সত্যাসত্য, সাধারণ-অসাধারণ উচিত-অনুচিত বিচার করাও যেন আর সম্ভব নয়। মনের কথাটি উদ্ধার করবার চেষ্টায় শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শরীরে কোথাও কাঁপনও ধরেছে।

তবু সাহসের জন্যেই যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে কাদেরের দিকে তাকায়। তার মুখের পাশটা কেবল দেখতে পায়। কপালটা খাড়া, কিন্তু অর্ধ-নিমীলিত চোখে বেদনার আভাস। তার মুখে ভীতিজনক কোনো ছায়া তো নাই-ই বরঞ্চ তাতে অতি নিরীহ, এমনকি একটু অসহায় ভাবও

বিস্মিত হয়ে সে কতক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

অকস্মাৎ যুবক শিক্ষক যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ায়। ঘরের কোণে খড়ম ছেড়ে পাম্প-সু পরে, টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেয়। কাদের তখন খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বাইরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের জন্যে চৌকাঠের মধ্যে তার শরীরের ছায়া জেগে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে যেন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। যুবক শিক্ষক কিন্তু তার দিকে আর স্পষ্টভাবে তাকায় না।

সন্ধ্যার পর ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু এখন চাঁদ আর ছিটেফোঁটা কয়েকটা তারা ছাড়া সম্পূর্ণ আকাশ শূন্য। স্থানে স্থানে মাটি ভেজা, গাছের সিক্ত পাতায় আলোর ঝলকানি। যুবক শিক্ষক কোনো দিকে তাকাবার প্রয়োজনও বোধ করে না। চতুর্দিকে অন্ধকার দেয়াল, যে-দেয়ালের জন্যে বাস্তব জগতের সঙ্গে হঠাৎ তার সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অন্যান্য দিনের মতো সে আজও সুপরিচিত পথে চলেছে কিন্তু যে-অবাস্তব জগতে সে প্রবেশ করেছে সে-জগতের সঙ্গে সত্যিকার পারিপার্শ্বিকতার কোনো সম্বন্ধ নাই। তার পরিচিত জগৎ সে যে আর দেখতে পায় না তাতে তার দুঃখ হয় না, বরঞ্চ তাতে সে স্বস্তিই পায়। তবে এমন স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে সে-জগৎ পরিত্যাগ করতে পেরেছে বলে মনে একটু বিস্ময় হয়। যে-দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবেষ্টিত জগতের মধ্যে মানুষ আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তার আলিঙ্গন থেকে এত সহজেই যে মুক্তিলাভ করা সম্ভব সে-কথা সে জানত না। চোখের পলকেই সে তার সীমানা অতিক্রম করেছে। এ-নূতন জ্ঞান শীঘ্র তার মনে একটা বিচিত্র নেশার সৃষ্টি করে। ক্ষণকালের জন্যে তার হৃদয়ে কম্পন উপস্থিত হয়। ভয়ে নয়, কেমন একটা উত্তেজনায়। বাঁশঝাড়ে মৃতদেহের কাছে নয়, সে যেন অভিসারে চলেছে।

খানিকটা পথ গিয়ে তারা লাঙ্গল-দেয়া ক্ষেতের পাশে আইল পথ ধরে। পাশে ছোট সেচনী-নালা। একটু দূরে রাতে-পরিত্যক্ত সেঁউতি নজরে পড়ে। মনে হয়, একটি মানুষ হাত বাড়িয়ে উবু হয়ে বসে আছে। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে কাদের আস্তে বলে, "সেকালে তোস্‌তারী কিংখাব বড় মশ্‌হুর ছিল।"

পাশে ক্ষুদ্র নালায় স্বচ্ছ আকাশের প্রতিবিম্ব। নিঃশব্দ রাতে তাদের দু-জনের পায়ের শব্দ। তারা দ্রুতপায়ে চলে। একটু পরে কাদেরের উক্তিটা যুবক শিক্ষকের কানে পৌঁছায়। উক্তিটি অর্থহীন মনে হয়, তবু তাতে সে বিস্ময় বোধ না করে বরঞ্চ স্বস্তিই বোধ করে। অবাস্তব জগতে প্রবেশ করেও বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ যে একেবারে ছিন্ন হয় নাই, কোথাও যে দুটির মধ্যে একটি অদৃশ্য বন্ধন আছে, উক্তিটি সে-কথাটাই যেন ঘোষণা করে। তাই মনে স্বস্তি আসে। অবাস্তব জগৎও নেহাত স্বাভাবিক। তাতে কিছু অসাধারণত্ব নাই। দুটি যেন একই মুদ্রার এপাশ-ওপাশ।

সে-বিষয়ে আশ্বস্ত হলে একটু আগে যে-নেশা এসেছিল সে-নেশা কাটে। পরক্ষণেই তার মনে একটি প্রশ্ন আসে, কোথায় যাচ্ছে সে? উত্তরের জন্যে সে কাদেরের দিকে চোরা-দৃষ্টিতে একবার তাকায়। অভ্যাসবশত বাঁ-হাত স্থির রেখে ডান-হাত সজোরে দুলিয়ে তার সঙ্গী পূর্ববৎ দ্রুতপায়ে হাঁটে, দৃষ্টি সামনের পথে নিবদ্ধ। সে জানে কোথায় সে যাচ্ছে।

শীঘ্র যুবক শিক্ষক নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করে। একটা নিদারুণ বেদনায় বার-বার ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। অকারণেই যেন কতগুলি অর্থহীন ঘরোয়া চিত্র তার মনের পর্দার ওপর দিয়ে ভেসে যায়। তার গ্রামের মুদির দোকানের ফেনি বাতাসা, ঘরের পেছনে শেওলাপড়া ছায়াচ্ছন্ন পুকুর, পড়শীর নূতন বেড়া। তার বর্তমান যাত্রার পরিণাম তার কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয় না বলে হয়তো তার ভীত মন পশ্চাতের পরিচিত স্থানে খুঁটি গাড়তে চায়। অথবা যা সে পেছনে ফেলে যাচ্ছে তার মূল্য নিরূপণ করবার চেষ্টা করে। হয়তো এখনো ফিরবার সময় আছে। যা সে ফেলে যাচ্ছে তার সে মূল্য জানে না কিন্তু সেখানেই তার প্রত্যাবর্তন করা উচিত। জীবনের মূল্য কি কেউ কখনো সঠিকভাবে বুঝতে পারে? মানুষ সর্বদা, জ্ঞাতসারে বা

অজ্ঞাতসারে, জীবনের মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা করে কিন্তু সক্ষম হয় কি? কী দিয়ে ওজন করে তুলনা করে? স্বর্ণকারের নিক্তিতেও তার মূল্য যাচাই করা যায় না। তার মূল্য নিরূপণের কোনো মানদণ্ড নাই।

যুবক শিক্ষক কাদেরের দ্রুতগতিতে তাল দিয়ে চলে কিন্তু তার সঙ্গীর সাবলীলতা নাই তার পদক্ষেপে। কাদের জানে যাত্রার কারণ, সে জানে না। অর্ধ-নিমীলিত চোখেও কাদের সবকিছু দেখে, যা সে সম্পূর্ণ খোলা দৃষ্টিতেও দেখতে পায় না। কিন্তু দেখার কী আছে? না দেখাতেই নিরাপত্তা। শীঘ্র কল্পনায় সে শত-শত চোখ দেখে : হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, ক্ষেত-খামারে। তার বিশ্বাস হয়, সবারই চোখ আছে কিন্তু কেউ কিছু দেখে না। সবাই তাই অতল গহ্বরের প্রান্তে দাঁড়িয়েও নিরাপদ বোধ করে।

একটু পরে যুবক শিক্ষকের মনটা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। চারধারে চাঁদের আলো ঝকঝক করে। না, সে দেখতে না পেলেও সামনে অতল গহ্বর নাই। পাশে কাদেরের নিঃশঙ্কচিত্তও সে যেন স্পর্শ করতে পারে।

তবু শীতের রাতেও তার কপালে ঘামের আভাস দেখা দেয়।

বাঁশঝাড়ে প্রবেশ করার আগে কাদের একবার থমকে দাঁড়ায়। শান্তভাবে এদিক-ওদিক তাকায়, পাশে যুবক শিক্ষক সম্বন্ধে সজ্ঞান বলে মনে হয় না। তারপর সে দৃঢ়পদে বাঁশঝাড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। অপ্রশস্ত পথ, পাশাপাশি দুজন মানুষের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। একটি মানুষের গায়েও আঁচড়-খোঁচা লাগে। যুবক শিক্ষকও কাদেরের মতো এধার-ওধার তাকায়, কিন্তু কেন তাকায় তা সে নিজেই জানে না। তারপর পায়ে কেমন জড়তা বোধ করলে সে দাঁড়িয়েই থাকে। অনতিদূরে নদী দেখা যায়। নদীর বুকে কুয়াশা। বাঁশঝাড়ে কাদেরের আওয়াজ শোনা যায় কিন্তু সেদিকে কান দেয় না। সে যে নদীর বুকে কুয়াশা দেখতে পায় তাতেই সে সন্তুষ্ট। উদ্দেশ্যহীনভাবে সে ঊরুর কাছে চুলকাতে শুরু করে এবং মনে হয় একবার হাই তুলবে।

বাঁশঝাড় থেকে কাদেরের অনুচ্চকণ্ঠ শোনা যায়।

"কোথায় আপনি?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না। উত্তর দেবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু ভেতর থেকে উঠে এসেও উত্তরটা মাঝপথে কোথাও হারিয়ে যায়। তারপর কাদের আবার তাকে ডাকে। যুবক শিক্ষক কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকে? এবারও সে উত্তর দেয় না বটে কিন্তু ঝট্ করে বাঁশঝাড়ে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে শরীরটা অবশ হয়ে ওঠে, চোখের সামনে নিবিড় অন্ধকারটিও আবার নাবে। আজও বাঁশঝাড়ে হাল্কা অন্ধকার, দেখতে চাইলে সব দেখা যায়, কিন্তু সে আর কিছুই দেখতে পায় না। একটি দুর্বোধ্য কিন্তু দুর্লঙ্ঘ্য আদেশে অন্ধের মতো সে এগিয়ে যায়।

তারপর বাঁশঝাড়ে সে কাদেরকে সাহায্য করে, কিন্তু কিছু না দেখে কিছু না অনুভব করে। সময় দীর্ঘ ঢেউয়ের মতো ধীরে-ধীরে বয়ে যায়, চোখের অন্ধকার আরো নিবিড় কালো হয়, তার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় শিল-পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে থাকে। সাবধানতা সত্ত্বেও বাঁশঝাড়ে নানাবিধ শব্দ হয়, প্রভূত বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। যুবক শিক্ষক সে-সব শব্দের বা বাধাবিপত্তির কারণ বোঝে না, বোঝার তাগিদও বোধ করে না।

একবার কাদেরের কণ্ঠস্বর তার কর্ণগোচর হয়। অনুচ্চ কণ্ঠ, তবু সন্দেহ থাকে না যে যুবক শিক্ষককে সে তিরস্কার করে।

"শক্ত করে ধরেন না কেন?" সে বলে।

কী সে শক্ত করে ধরবে? তার হাতে দুই খণ্ড হিমশীতল কাঠ। কিন্তু নিজের হাত দুটিও কাঠের মতো প্রাণহীন মনে হয় তার কাছে। তবু যতটা পারে ততটা শক্ত করে ধরে।

আবার কাদেরের গলা কোত্থেকে ভেসে ওঠে। তখন কালোস্রোতে যুবক শিক্ষক ভাসছে।

কাদেরের কণ্ঠ অনেক দূরে অজানা কোনো পানির জন্তুর মতো লাফিয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষক হিমশীতল কাঠ দুটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে।

"কোথায় যাচ্ছেন?" আবার কাদেরের গলা। কাছাকাছি কোথাও সে-গলা ঝনঝন করে ওঠে।

উত্তরে যুবক শিক্ষক ব্যথার অস্ফুট আওয়াজ করে, কারণ তার পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্মাগ্র কিছু বিদ্ধ হয় যেন। ত্রস্তগতিতে অন্যদিকে মোড় নিলে বাঁশঝাড় তাকে সহস্র হস্ত দিয়ে আলিঙ্গন করে। ফলে বিদ্যুদ্বেগে একটি নিদারুণ ভয় তাকে এবার আঁকড়ে ধরে। তারপর সে-ভীতির জন্যেই হয়তো সে ক্ষণকালের জন্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বাঁশে আলোয়ান আটকে গেছে। একহাতে মৃত নারীর পা-দুটি ধরে সে বিষম বেগে আলোয়ানটা ছাড়িয়ে নেয়। হিংস্র জন্তুর মুখগ্রাস থেকে সে যেন হাত ছিনিয়ে নেয়। সারা বাঁশঝাড় কেঁপে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত পরে অত্যাশ্চর্য একটি ঘটনা ঘটে। হঠাৎ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে যুবক শিক্ষকের মুখ ভেসে যায়। সে অবশেষে দীর্ঘ গুহা অতিক্রম করে আলোতে পৌঁছেছে। কিছুটা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে কাদের তৎক্ষণাৎ ভর্ৎসনা করে ওঠে। কাতরকণ্ঠে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়, "কোন্ দিকে যাব?"

তারা নদীর দিকে চলতে শুরু করে। কাদের নির্বাক। দূরে গ্রামে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে, কোথাও একটা রাত-জাগা-পাখি নিঃসঙ্গ কণ্ঠে ডেকে ওঠে। যুবক শিক্ষকের মুখ দিয়ে দরদর করে ঘাম ঝরে। অতি নিকটে পরিচিত আওয়াজ শুনতে পেলে প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হয়, তারপর বোঝে সে-আওয়াজ তাদের উচ্চ শ্বাস-প্রশ্বাসের। তার মনে হয়, তারা যেন বিক্রয়সামগ্রী নিয়ে হাট-বাজার অভিমুখে ধাবমান দুটি মানুষ, দিগন্তে সকালের তির্যক সূর্যালোক। তারা হাঁপাচ্ছে। পথে অশেষ ধুলা।

নদীর খাড়া পাড় দিয়ে নাবতে শুরু করে যুবক শিক্ষক ভয়ে নিথর হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, সে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। নিচে আবার অতল গহ্বর।

"কী হল?" কাদের অনুচ্চকণ্ঠে হুমকি দিয়ে ওঠে।

যুবক শিক্ষক চোখ খুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাতর-স্বরে বলে, "কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

কিন্তু অতল গহ্বরের প্রান্তে চোখ আপনা থেকেই খোলে। অবশেষে অসীম শক্তি প্রয়োগ করে যুবক শিক্ষক তার দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে। খাড়া পাড় অত খাড়া নয়। অদূরে একটু সমতল স্থানের পর পানি অস্ফুট শব্দে ছলছল করে। তারপর সে মুখটি দেখে। কাদের তার মুখ ঢেকে দিয়েছিল কিন্তু এক সময়ে আঁচলটি সরে গেছে! তার উন্মুক্ত মুখে চাঁদের পূর্ণ আলো।

নিচে নেবে যুবক শিক্ষক এবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চাপাস্বরে কাদের আবার ভর্ৎসনা করলে সে উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। দেহে একবিন্দু শক্তি আর নাই। হাড়-মাংস গলে নিঃশেষ হয়ে গেছে! যুবক শিক্ষক আর ওঠে না। কাদেরের ভর্ৎসনায় কানও দেয় না।

কিছুক্ষণ পরে একাকী কাজ শেষ করে কাদের যখন নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়ায়, তখন তার কিছু সম্বিত ফিরেছে। সে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থেকে তার কণ্ঠস্বরের জন্যে অপেক্ষা করে। কাদের কিছু না বললে সে ধীরে-ধীরে উঠে বসে। তারপর একবার এক পলকের জন্যে মুখ তুলে তাকায় তার দিকে। কোমর পর্যন্ত তার কাপড় ভিজে জবজব করছে। সে তার দিকে তাকিয়ে আছে বলে তার মুখটা অন্ধকারে ঢাকা। তারপর অস্পষ্টভাবে তার চোখ সে দেখতে পায়। সে-চোখে যেন পরম ঘৃণার ভাব। কাদেরের পায়ের তলে সে যেন ঘৃণ্য বস্তু, শিরদাঁড়াহীন নপুংশক কীটপতঙ্গ কিছু।

যুবক শিক্ষক মন্থরগতিতে প্রবাহিত শীতের শীর্ণ নদীর দিকে তাকায়। জ্যোৎস্না তার বুকে রূপালি আলোয় ঝলমল করে। এখন তাতে কুয়াশার কোনো চিহ্ন নাই। সত্যিই সে কি কুয়াশা দেখেছিল? নদীর বুকে কিছুই নাই। একবার দূরে একটা শিশুক মাছ ভেসে উঠে পরক্ষণেই

আবার ডুবে যায়। ওপারে শুভ্র কাশবন স্বপ্নের মতো বিস্তারিত হয়ে ধবধব করে। পানির অস্ফুট কলতান ছাড়া চারধারে প্রগাঢ় নীরবতা।

একটু পরে কাদের নিঃশব্দে সরে গিয়ে পাড় বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। যুবক শিক্ষক মুখ ফিরিয়ে দেখে, কাদের নাই। কোনো কথা না বলে সে চলে গেছে। কোনো কথা, কোনো ব্যাখ্যার যেন প্রয়োজন ছিল না। শূন্য পাড়ের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ হতবাক হয়ে বসে থাকে। তারপর কোত্থেকে একটা ক্রোধ এসে তার সারা মন ভরে দেয়। সে-ক্রোধের কারণ না বুঝলেও তার সন্দেহ থাকে না যে, ক্রোধটা ন্যায্য। তারপর এক সময় সে-ক্রোধ নিঃশেষ হয়ে গেলে সে অতিশয় নিঃসঙ্গ বোধ করে।

পাড় বেয়ে ওঠার আগে যুবক শিক্ষক শেষবারের মতো নদীর বুকে দেহটাকে খুঁজে দেখে : কিন্তু কোথাও তার চিহ্ন নাই। তারপর একটি অপ্রীতিকর কথা স্মরণ হলে সে পানির ধারে গিয়ে কাদা মেখে প্রবলভাবে হাত সাফ করে। সে-কাজ সম্পন্ন হলে সে আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে তীরে উঠে বাড়ি অভিমুখে রওনা হয়।

নদীর শূন্য বুকের মতো তার বুকও শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে।

পাঁচ

একচোখ-কানা মুয়াজ্জিনের তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন, প্রতিবার একটু চমকে উঠতেই হয়। দাদাসাহেব অবশ্য তাতে অনেক ফায়দা দেখেন। কেউ একবার নালিশ করলে তার লম্বা ফর্দ দিয়েছিলেন। লোকটির জাঁদরেল কণ্ঠ আজানের আসল উদ্দেশ্য তো জোরদারভাবে হাসিল করেই, তাছাড়া শয়তান বিতাড়িত করে, অলস মনকে ধর্মতত্ত্বে সক্রিয় করে। কণ্ঠে মাধুর্যের অভাব আছে বৈকি কিন্তু কর্তব্যের আহ্বানে মাধুর্যের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। হৃৎপিণ্ডদুর্বল মানুষের ক্ষতি হতে পারে? অতিশয় গম্ভীর হয়ে দাদাসাহেব উত্তর দেন, অন্তিম-মুহূর্তে খোদার নাম কানে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। অবশ্য মুয়াজ্জিনটি যে তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র সে-কথা তিনি বলেন না। সে-কথা মুখে বলা যায় না। কারো নিঃস্ব দারিদ্র্য স্নেহের কারণ সে-কথা বলতে মুখে বাধে। তবে তাঁর একটা বিশ্বাস একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়। এ-দরিদ্র দেশেও দারিদ্র্যের ব্যাপারে তার সমকক্ষ কেউ নাকি নাই। কথাটা মনে পড়তেই যুবক শিক্ষকের একটু হাসি পায়। তারপর খোলা দরজা দিয়ে সূর্যাস্তের কত বাকি তা একবার লক্ষ্য করে দেখে সে স্থির হয়ে বসে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বরের জন্যে অপেক্ষা করে। আজানের জন্যে মনে অধীরতা বোধ করলেও সবকিছু তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। পৃথিবী আবার স্বরূপ ধারণ করেছে।

সমস্ত দিন যুবক শিক্ষকের গতানুগতিক জীবনযাত্রার কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই, সকালে বড়বাড়িতে বা ইস্কুলে শিক্ষকতার কাজেও কোথাও ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু অভ্যাসবশতই সে যে নিত্যকার কর্তব্যপালন করেছে তা নয়। বরঞ্চ তার গতানুগতিক জীবনযাত্রা সে রক্ষাবরণ হিসাবেই ব্যবহার করেছে। বিপদ আশঙ্কা করলে শামুক যেমন খোসার মধ্যে নিরাপদ বোধ করে তেমনি সে তার জীবনযাত্রার মধ্যেই নিরাপদ বোধ করেছে। কর্তব্যপালন কষ্টসাধ্য মনে হয়েছে কিন্তু তাতে কোথাও যাতে স্খলন না হয় তার জন্যে তার সাবধানতার শেষ থাকে নাই। প্রথম রাতে অতিশয় ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়লেও সে চিন্তাশক্তি হারায় নাই। কিন্তু গতরাতে নদী থেকে ফিরবার সময় তার মনে হয়, তার চিন্তাশক্তি সত্যিই যেন লোপ পেয়েছে। কেবল সে বোঝে, তার কিছুই করার নাই, শুধু অপেক্ষাই করতে পারে। হয়তো কোথাও কিছু ঘটবে, কোথাও একটা আলো দেখতে পাবে, তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার মর্মার্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু কিছুই ঘটে নাই।

তারপর এক সময়ে ক্ষুধার্ত শামুকের মতো পরিণামভয়শূন্য হয়ে খোসা ছেড়ে সে

ধীরে-ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন অপরাহ্ণ। ইস্কুল থেকে ফিরে সে বড়বাড়ির ছাতাপড়া বিবর্ণ সম্মুখভাগের দিকে তাকিয়ে দেখে, কোথাও কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। দাদাসাহেবকে দেখতে না পেলেও সে যেন তাঁর শান্ত-সৌম্য চেহারা দেখতে পায়। তাঁর চেহারা মনে পড়তে সে কেমন সাহস পায়। বড়বাড়ির সামনে সুপরিচিত উঠানটি শীতের শুষ্কতায় খটখট করে। সে-উঠানও তাকে আশ্বস্ত করে।

হঠাৎ সে বুঝতে পারে, তার ভয়ের কারণ নাই। যে-বিচিত্র অভিজ্ঞতার অর্থ সে জানে না, সে-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে জড়িত বোধ হলেও আসলে সে জড়িত নয়। শুধু সে নয়, কাদেরও তার সঙ্গে জড়িত নয়। তারপর অকস্মাৎ তার মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। খই ফোটার মতো, একটির পর একটি। সারাদিন যে-মন স্তব্ধ হয়েছিল, সে-মনে প্রশ্নের এ-বিস্ফোরণে সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। তবে নৈর্ব্যক্তিক দর্শকের যে-পরম স্বস্তিভাব সে বোধ করে, সে-স্বস্তিভাব আরো গাঢ় হতে থাকে।

মনে আর ভয় নাই কিন্তু অন্ধকার আছে। সে-অন্ধকার কাটাবার জন্যে যুবক শিক্ষক তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করে। সে বুঝতে পারে, কাদেরই সে-অন্ধকার দূর করতে পারবে।

মনে ভয় নাই কিন্তু অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলতা। সে-অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলতাও কাদের দূর করতে পারে। কাদেরের সঙ্গে শীঘ্র দেখা করা তার অতি প্রয়োজন।

বড়বাড়ির লম্বা বারান্দায় প্রতিদিন পারিবারিক জমায়েতে মগরেবের নামাজ হয়। তাতে যুবক শিক্ষক নিত্য যোগদান করে। মতিগতি ভালো হলে কাদেরও আসে। যুবক শিক্ষকের মনে আশা হয়, আজ হয়তো কাদের সান্ধ্যনামাজে আসবে। সূর্যাস্তের সন্নিধানে তার সঙ্গে দেখা করার বাসনাটি কেমন সহ্যাতীতভাবে তীব্র হয়ে ওঠে।

কী সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে? মনে প্রশ্নের যেন শেষ নাই। তার কোনটা সে জিজ্ঞাসা করবে, কোনটার উত্তর পেলে সে শান্তি পাবে? অস্থিরভাবে সে প্রশ্নগুলি ছাঁটাই-বাছাই করে, যে-গুলো অতি প্রয়োজনীয় মনে হয় সে-গুলো পরিপাটিভাবে সাজাবার চেষ্টা করে।

যুবক শিক্ষকের মনে সন্দেহ থাকে না যে, প্রথম রাতে কাদের কেন মাঠে-ঘাটে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে-কথাই তাকে প্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে। প্রত্যুত্তরে কাদেরও তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, সে-ই বা কেন শীতের গভীর রাতে বাইরে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্ত প্রশ্নটির উত্তর দিতে সে প্রস্তুত। সে দ্বিধা না করে স্বীকার করবে, কাদেরকেই সে অনুসরণ করছিল। তাকে হারিয়ে ফেলার পর সে ঘরে ফিরে যায় নাই কেন সে-কথা কাদের জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে সত্য কথা, কাদের বিশ্বাস না করলেও বলবে কী কারণে সে ঘরে ফিরে যায় নাই। জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত রাতের প্রতি তার গোপন নেশার কথা বলতে হয়তো কিছু লজ্জা হবে, কিন্তু সে-কথা ঢেকে রাখা সম্ভব হবে না। সে যদি নিজেই সত্য কথা না বলে তবে কাদেরকে কোনো প্রশ্ন করার বা তার কাছ থেকে সত্য উত্তর দাবি করার অধিকার তার থাকবে না। তাছাড়া, সত্যই সত্যকে আকর্ষণ করে।

একটা কথায় যুবক শিক্ষকের মনে শীঘ্র খটকা লাগে। কেন সে কাদেরকে তার ভ্রমণের কথাটি প্রথম জিজ্ঞাসা করতে চায়? একটি বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ : যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে কাদেরের কোনো সম্বন্ধ নাই। সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনো প্রয়োজনীয়তা সে বোধ করত না, তার মনে হঠাৎ মেঘ কেটে আলোও প্রকাশ পেত না। বস্তুত, তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও সে দেখত না। তবে কেন সে প্রশ্নটি তার প্রশ্নতালিকার শীর্ষে বসিয়েছে? অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে কি বিশ্বাস করে কাদের দরবেশ? সে-কথাই কি সে প্রথম যাচাই করে নিতে চায়?

খট্‌কাটা যায় না। সে যে কাদেরকে তার বাল-সুলভ বাতিকটির কথা বলতে প্রস্তুত তাতেও সে নিজেই নিজের মনে একটা গূঢ় অভিসন্ধি দেখতে পায়। হয়তো তার গোপন বাসনা

এই যে, হোক তাদের রাতভ্রমণের উদ্দেশ্য ভিন্ন, তবু সে তার মনের গোপন বাতিকটির কথা প্রকাশ করলে পরস্পরের মধ্যে একটি মানসিক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সে যেন তার অভিজ্ঞতার অর্থ বোঝার চেয়ে কাদেরের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক ভেবেও যুবক শিক্ষকের মনের খটকা যায় না। কেবল এ-কথা সে বোঝে, প্রশ্নটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেন তার উত্তরের ওপরেই অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে। যেন সে-প্রশ্নের উত্তরের পরেই সে বুঝতে পারবে কাদের তার মনের অশান্তি-বিশৃঙ্খলতা এবং তার মনের অন্ধকার দূর করতে পারবে কি পারবে না। শুধু অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর নয়, সে-প্রশ্নের উত্তর কাদেরের মনের পরিচয়ও দেবে। কাদেরকে না বুঝতে পারলে বিচিত্র অভিজ্ঞতাটির রহস্য মোচন হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : কাদের কি যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছিল?

ঘটনাটি সে কাদেরের দৃষ্টিতে ভেবে দেখে। প্রথম রাতে কাদের তাকে বাঁশঝাড় থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে। দু-জনে মুখামুখি হলে যুবক শিক্ষক হঠাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়। তখন কৌতূহলী হয়ে কাদের বাঁশঝাড়ে প্রবেশ করলে মৃতদেহটি দেখতে পায়। তারপর যুবক শিক্ষককে হত্যাকারী বলে সন্দেহ করাই তার জন্যে স্বাভাবিক নয় কি?

এখানে যুবক শিক্ষক একটু ইতস্তত করে। সে বুঝতে পারে না, ভূমিকা না দিয়েই প্রশ্নটি করা সমীচীন হবে কিনা। একটি সন্দেহের কথা বলে অন্য একটি সন্দেহের কথা চাপা দিয়ে রাখলে হয়তো প্রশ্নটি কাদেরের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হবে। হয়তো তখন তার মনে এই সন্দেহের সৃষ্টি হবে যে, যুবক শিক্ষকের মনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে বলেই সব কথা সে খুলে বলছে না। তখন কাদেরও মন খুলে সব কথা বলবে না বা তাকে সাহায্য করতে চাইবে না।

একটু ভেবে যুবক শিক্ষক স্থির করে, ভূমিকাটি না বলে প্রশ্নটি সে করতে পারবে না। এক হাতে সত্য দিয়ে অন্য হাতে সত্য নেবে।

কাদের সম্বন্ধে তার সন্দেহই সে-ভূমিকার বিষয়বস্তু। বাঁশঝাড়ে বীভৎস দৃশ্যটি দেখে বেরিয়ে আসার পর কাদেরের সঙ্গে মুখামুখি হলে হঠাৎ তার মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটে : তার চোখে কাদেরই নিষ্ঠুর-নির্মম হত্যাকারীর রূপে আবির্ভূত হয়। তাই সে হঠাৎ একটি নিদারুণ ভয়ে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। কাদেরই যে হত্যাকারী, সে-ধারণা পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে।

এখানে যে-একটা প্রশ্ন উঠতে পারে সে-কথা যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে। তেমন ধারণাই যদি থাকে তবে পুলিশকে সে খবর দেয় নাই কেন, কাউকে কিছু বলে নাই কেন? প্রশ্নটি মনে জাগতেই যুবক শিক্ষক অবিলম্বে তার যথার্থতা স্বীকার করে। সে-প্রশ্ন কাদের না করলে অন্য কেউ করবে।

একটা উত্তর ঝট্ করে মাথায় আসে। কী করে সে পুলিশকে খবর দেয়? সে বড়বাড়ির আশ্রিত মানুষ, এবং কাদের বড়বাড়িরই লোক। তার পক্ষে কথাটা প্রকাশ করা কি সহজ? উত্তরটা কিন্তু তার পছন্দ হয় না। তাতে কেমন দুর্বলচিত্ত স্বার্থপরতার ছাপ। না, বড়বাড়ির আশ্রয়টি অত্যন্ত লোভজনক বটে কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। আসল কারণ বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি দাদাসাহেবের প্রতি তার গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা। কাদের যে তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র সে-কথা সে জানে। দাদাসাহেবের প্রতি তার যখন এত ভক্তিশ্রদ্ধা তখন কী করে তাঁরই প্রিয়পাত্রের ক্ষতি করতে সে ছুটে যায়?

এ-উত্তরেও যুবক শিক্ষক সন্তুষ্ট হয় না। তারপর হঠাৎ একটি কথা উপলব্ধি করে সে সামান্য বিহ্বল হয়েই পড়ে। প্রশ্নকার যেন উত্তরদাতায় পরিণত হয়েছে। আকস্মিক স্থান পরিবর্তনের ফলে মনে গোলযোগ দেখা দিয়েছে এবং তার ফলে সে ঘটনার অনুক্রম মিশিয়ে ফেলছে, যে-কথা ভাবে নাই সে-কথা ভেবেছে বলে কল্পনা করছে, সম্ভাব্য কিন্তু ঘটে নাই এমন সব কথা তুলছে। আসল সত্য কী? আসল সত্য এই যে, মস্তিষ্কবিভ্রান্তির জন্যে কথাটা

কাউকে বলার খেয়াল তার মাথায় আসে নাই।

সেটাই কি সত্য, সম্পূর্ণ সত্য?

না, আরেকটি কথা আছে যা হয়তো সে কাদেরকে কেন, কাউকে বলতে পারবে না। তার মনে হয়েছিল, বাঁশঝাড়ের কথাটি প্রকাশ করা যায় না। সে-টি কাদের আর তার মনের গোপন কথা। শরীরের গোপন স্থানে গুপ্তক্ষতের মতো। এমন কথা কাউকে বলা যায় না।

ক্ষণকালের জন্যে একটি অজানা অন্তর্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যুবক শিক্ষক। সে-ভাবাবেগ কাটলে সে গভীর নিঃসহায়তার সঙ্গে ভাবে, সে অল্পবয়সী দরিদ্র শিক্ষক, বাঁশঝাড়ে নিহত মানুষের মৃতদেহ কখনো দেখে নাই। তার যে মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটবে তাতে বিস্ময় কী? সে কিছুই বোঝে না, কিছুই জানে না। চতুর্দিকে যে-অন্তহীন রহস্য সে অনুভব করে তার কতটা সে বোঝে? সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, উদ্ভিদ-তরুলতা, নদীপ্রবাহ, মানুষের হাসিকান্না-দুঃখকষ্ট, তার জন্মমৃত্যু : এ-সবের অর্থ কি সে বোঝে? সে-জন্যেই সে একটি মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন এমন তীব্রভাবে বোধ করছে।

কাদের যে হত্যাকারী সে-ধারণা কী করে যায়? যে-ধারণা পরদিন দুপুরবেলা পর্যন্ত তাকে ভীত-নিপীড়িত করেছে, সে-ধারণা থেকে কোন যুক্তি-সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে সে মুক্তিলাভ করে?

এ-প্রশ্নেও যুবক শিক্ষক ঠক্কর খায়। কিন্তু এ-প্রশ্নের কি কোনো বোধগম্য উত্তর আছে? সবই বিশ্বাস। দোষী, সেটাও বিশ্বাস; নির্দোষ, সেটাও বিশ্বাস। বিশ্বাসের ওপরই কি সমগ্র মানবজীবন নির্ভর করে নাই? বিশ্বাস যে, কাল সূর্যোদয় হবে, পাখিরা আবার গান করবে। বিশ্বাস যে আজকার পাড়-অবরুদ্ধ নদী কাল প্লাবিত হবে না। বিশ্বাস যে এবার ফসল হল না, বৃক্ষে ফল ধরল না, আগামী বছর ফসল হবে ফল ধরবে। বিশ্বাস যে অলব্ধ সুখও কোথাও সীমাহীন এবং নিশ্চিত, অনলবর্ষী দুঃখ-যন্ত্রণার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে একদিন, এ-জীবনে না হলেও পরবর্তী জীবনে। বিশ্বাস যে, মনের গভীর অস্থিরতার উত্তর না পেলেও ভাবনা কী, কারণ কেউ কোথাও সে-মনের রক্ষক-অভিভাবক। সবই বিশ্বাস, জীবনের একমাত্র সম্বল। কাদেরের ক্ষেত্রে তার মনে কেবল এক বিশ্বাস ভাঙে, অন্য বিশ্বাস গড়ে।

এ-উত্তরই কি যথেষ্ট? সব বিশ্বাসেরই কোনো-না-কোনো হেতু থাকে। জীবনের একমাত্র অবলম্বন হোক, তবু তার মধ্যে একটা যুক্তির কাঠামো থাকে।

না, তার এ-বিশ্বাসের কোনোই যুক্তি নাই। সে কেবল জানে, এমন কথা কিছুতেই সত্য হতে পারে না। পরদিন দুপুরে অন্ধ ভয় কাটলে সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, তা অসম্ভব। দুনিয়াতে নিষ্ঠুরতা পাপ-কলুষতা আছে সে জানে এবং তার প্রমাণ বাঁশঝাড়ের মৃতদেহটি। কিন্তু তা সর্বত্র ছড়িয়ে নাই, আগাছার মতো সর্বত্র জন্মায়ও না তা। তা যদি হত তবে মানুষে-মানুষে বিশ্বাস সম্ভব হত না, জীবন দুর্বিষহ হত। বস্তুতপক্ষে, তাহলে জীবনের কোনোই অর্থ থাকত না।

তারপর তৃতীয় প্রশ্ন : সে-রাতে কাদের তার ঘরে কেন এসেছিল? যুবক শিক্ষকই হত্যাকারী কিনা সে-কথা নিশ্চয় করে দেখার উদ্দেশ্যে কি? বা গভীর রাতে একটি অসহায় মৃতদেহ দেখে মনে পরম নিঃসঙ্গতা বোধ করলে সঙ্গলিপ্সা সান্ত্বনা-আশ্বাসের জন্যে?

যুবক শিক্ষকের বিশ্বাস, সে হত্যাকারী কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে কাদের আসে নাই। যুবক শিক্ষকের মতোই তারও মনে মানুষের উপর আস্থা না থাকার কারণ নাই। তাছাড়া সে যে যুবক শিক্ষককে সন্দেহ করে নাই তার প্রমাণ সে-ও পুলিশকে বা কাউকে কিছু বলে নাই।

দ্বিতীয় রাতের ঘটনার বিষয়ে একটি প্রশ্ন যুবক শিক্ষকের কাছে জরুরি মনে হয়। যুবতী নারীর মৃতদেহটিকে গুম করে দেবার অত্যাশ্চর্য সিদ্ধান্তের কারণ কী?

উত্তরটি যুবক শিক্ষক ভাসা-ভাসা দেখতে পায়।

বাঁশঝাড়ে মৃতদেহটি আবিষ্কার করার পরদিন নির্বাক-নিদ্রালস কাদেরও সমস্তক্ষণ কান খাড়া করে রাখে। রাত হলে সে বোঝে, বাঁশঝাড়ের গুপ্তকথা কেউ জানতে পারে নাই। হয়তো তার অন্তর্ধানে তার আত্মীয়-স্বজনের বিস্ময়ের অবধি থাকে নাই। হয়তো নানাবিধ কারণ তাদের মাথায় আসে। কিন্তু সে যে গ্রামের প্রান্তেই বাঁশঝাড়ের মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত সে-কথা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না।

কাদের সাব্যস্ত করে, যুবতী নারীর মৃতদেহটি গুম করে দেবে। কেন? হয়তো সে ভাবে, হতভাগা নারীর পক্ষে বাঁশঝাড়ে অর্ধনগ্ন অবস্থায় আবিষ্কৃত হবার চেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই শ্রেয় হবে। হয়তো তার জীবনে সুখশান্তি অর্থ-সম্পদ স্নেহ-ভালোবাসার মান-মর্যাদার সৌভাগ্য হয় নাই। তার মৃত্যুও কি এমন কুৎসিতভাবে ঘটবে? সে যদি তাকে এই গভীর অপমান থেকে বাঁচাতে পারে তবে অন্ততপক্ষে প্রাণান্তের পর তার একটু সাহায্য হবে। তাতে তার আত্মীয়-স্বজনের কোনো ক্ষতি হবে না। যাকে তারা হারিয়েছে তাকে আর ফিরে পাবে না। বরঞ্চ তার অন্তর্ধানে তাদের মনে রহস্যের সৃষ্টি হবে। সে-রহস্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা হয়তো তার মৃত্যু সম্বন্ধে সুন্দর রূপকথা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হবে। হতভাগা যুবতী নারী অবশেষে স্বপ্নাকাশের অম্লানকুসুমে পরিণত হবে।

এখানে একটি কথা যুবক শিক্ষক ভালো করে বোঝে না। যুবতী নারীর যে প্রাণ নিয়েছে তার শাস্তির কথা কি কাদের ভাবে নাই? দেহ গুম করে দিয়ে সে খুনীর অপরাধও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। তার শাস্তির চেয়ে যুবতী নারীর মান-মর্যাদাই কি তার কাছে বড় ঠেকেছে? অথবা তার মত এই কি যে, মানুষের অপরাধ মানুষের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়, তাই তার অপরাধের প্রমাণ—যা কেবল অর্থহীন আবর্জনা মাত্র—তা অদৃশ্য হয়ে গেলে ক্ষতি কী? যুবক শিক্ষক ঠিক করে, এ-বিষয়েও কাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে।

একা মানুষের পক্ষে একটি মৃতদেহ নদীতে বহন করে নিয়ে যাওয়া শুধু যে বিপজ্জনক তা নয়, অতি কষ্টসাধ্যও। কাদের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে। কার সাহায্য চাইবে সে?

অতএব পঞ্চম প্রশ্ন : সাহায্যের জন্যে কাদের তারই কাছে কেন আসে? প্রথম রাতে সে কি তার দুর্বল নির্বোধ চরিত্রের যথেষ্ট প্রমাণ স্বচক্ষে দেখে নাই? তারপর মানুষের ওপর নির্ভর করার কথা কী করে সে ভাবতে পারে?

হয়তো ওসব কিছু নয়। কাদেরের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে যুবক শিক্ষকই হত্যাকারী। অতএব সে স্থির করে যে, যে মানুষ যুবতী নারীকে হত্যা করেছে তাকে বাধ্য করবে যুবতী নারীকে শেষ অপমান থেকে রক্ষা করার জন্যে।

অথবা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দু-জনের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে কাদেরের মনে যুবক শিক্ষকের প্রতি কেমন একটা বন্ধুত্বের ভাব জাগে। তাই দ্বিতীয় রাতে স্বাভাবিকভাবে সে তারই দরজায় এসে হাজির হয়।

শ্রান্তভাবে যুবক শিক্ষক আপন মনে স্বীকার করে, তার চারধারে ঘোর অন্ধকার, যে-অন্ধকারের মধ্যে অন্ধের মতোই সে প্রশ্নগুলি তৈরি করেছে। তবে তার সন্দেহ থাকে না যে, একবার কাদেরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলবার সুযোগ পেলে সব অন্ধকার দূর হবে। এমন অন্ধকার জীবনে কখনো সে দেখে নাই, অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের জন্যে এমন তীব্র ব্যাকুলতাও কখনো বোধ করে নাই।

অবশেষে মুয়াজ্জিনের তীক্ষ্ণ-কর্কশ কণ্ঠ সন্ধ্যাকাশ খণ্ডবিখণ্ড করে ফেটে পড়ে। একটু পরে যুবক শিক্ষক ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। নিত্যকার মতো তার শীর্ণমুখ গম্ভীর। তবে আজ তার পদক্ষেপে লঘু চঞ্চলতা।

নামাজের সময় কাদের দেখা দেয় নাই। বারান্দার কোণে ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ শ্বসনক্রিয়ারহিত অবস্থায় থেকে হঠাৎ সজোরে নিশ্বাস নেয়। তারপর এক সময়ে তার মনে হয় অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠে আনিশা কিছু বলছে।

"কী?"

কিন্তু সে ভাবে, কাদেরের বিবেকে দোষ-জ্ঞান নাই। হয়তো ইতিমধ্যে দুই রাতের বিচিত্র নাটকের কথা সে ভুলে গেছে। যুবক শিক্ষকের বিবেকও পরিচ্ছন্ন। সে ভোলে না কেন?

বইতে এক জায়গায় আনিশা আঙ্গুল দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট উল্টায়। যুবক শিক্ষক আবার বলে, "কী?"

তারপর নীরব বারান্দায় মত্ত দেয়ালঘড়ির টক্‌টক্ আওয়াজ শোনা যায়। ওপর থেকে দাদাসাহেবের খড়মের আওয়াজ আসে। অবশেষে যুবক শিক্ষক বলে, "শক্ত কেন হবে? পশ্চাদাভিমুখে।"

আনিশা ঠোঁট উল্টায় আবার। অকারণে যুবক শিক্ষক এধারে-ওধারে তাকায়। বড়বাড়িতে এখন গভীর নীরবতা। বাইরে শীতের রাত ঝিম্ ধরে আছে। কেশে যুবক শিক্ষক আবার বলে, "পশ্চাদাভিমুখে।"

হয়তো কাদেরের মতে কর্তব্য শেষ হয়েছে। নদীর বুকে যে আশ্রয় নিয়েছে সে আর দেখা দেবে না। তার আর কিছুই করবার নাই।

কাদেরের সঙ্গে তার যদি আর দেখা না-ই হয়? দু-বছর একই বাড়িতে বাস করেও যার সঙ্গে কথার আদান-প্রদান হয় নাই, তার সঙ্গে আবার কথা বলার সুযোগ না হওয়াই স্বাভাবিক।

শীঘ্র আনিশা বসে-বসে ঝিমুতে শুরু করে। পাশে আমজাদ লাইনকাটা খাতায় সযত্নে কতগুলি অঙ্কের সংখ্যা সাজায়। যুবক শিক্ষক তাদের আর দেখে না। একনাগাড়ে একই ভঙ্গিতে বসে থাকার ফলে তার পায়ের গাঁটে কেমন কাঠ-কাঠ ভাব জাগে বলে সে নড়ে বসে। তারপর কুদ্দুসের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করে, "তোমাদের কাদের দাদা কোথায়?"

তিনটি ছেলে মুখ তুলে তাকায়। তাদের চোখে ঘুম-ঘুম ভাব। অকারণে তারা এধার-ওধার দৃষ্টি দেয়। অবশেষে ভারি গলায় কুদ্দুস উত্তর দেয়, "কী জানি।"

"ঘরে হবে।" আরেকজন বলে।

এই সুযোগে তৃতীয় ছেলেটি অদূরে আধা-খোলা জানলার দিকে তাকায়। এখনো চাঁদ ওঠে নাই বলে বাইরে অন্ধকার। অন্ধকারকে তার ভয়।

আবার নীরবতা নাবলে যুবক শিক্ষকের কাছে এবার হঠাৎ সবকিছু এমন অসত্য এবং অবাস্তব মনে হতে শুরু করে। সে ভাবটি কাটাবার জন্যেই হয়তো সে সজোরে নিশ্বাস নেয়, তার নাসারন্ধ্র কেঁপে ওঠে। তারপর তার ভয় হয়, দিনের মানসিক অবস্থাটি ফিরে আসছে যেন। সে আবার এমন একটি গুহায় প্রবেশ করছে যেখানে জন-মানব পশু-পক্ষীর আওয়াজ পৌঁছায় না। তখন বাইরে যেন জীবনের অবসান ঘটে, সারা পৃথিবী নির্জনতায় খাঁখাঁ করে।

অবশেষে সেদিন শেষবারের মতো একচোখ-কানা মুয়াজ্জিনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চমকিত হয়ে যুবক শিক্ষক সামনের বইখাতা বন্ধ করে, কর্কশ কণ্ঠস্বরে কেমন আশ্বস্ত বোধ করে। মানুষের কর্কশ কণ্ঠও সান্ত্বনাদায়ক। তাছাড়া, যা সে শোনে তা যেন মানুষের আদিম সতর্কবাণী। অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে প্রহরী জেগে আছে জানলে ভীতির উপশম হয়।

উঠবার আগে যুবক শিক্ষক কুদ্দুসের দিকে একবার তাকায়। কাদেরকে ডেকে পাঠাবে কি?

কিন্তু কিচ্ছু না বলে সে নীরবে বারান্দা ত্যাগ করে।

ছয়

প্রধান শিক্ষকের কামরার পাশে শিক্ষকদের বিশ্রামঘর। অসমতল মেঝের মধ্যখানে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল। তার চারপাশে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটা কুর্সি। তবে একটি কুর্সির ওপর সর্বদা সকলের নজর। বুনটের ফাঁকে-ফাঁকে সংখ্যাতীত পুষ্টাঙ্গ ছারপোকা, তবু সেটি বেতের তৈরি বলে আরামদায়ক। পিঠটা একটু হেলানো, দু-পাশে হাতলও আছে। আরামের

বিনিময়ে রক্ত দিতে কেউ দ্বিধা করে না। আজ সে-কুর্সিতে আরবির শিক্ষক মোহাম্মদ আল্‌ফাজউদ্দীন এক হাঁটু তুলে আসনাধীন। মুখে সচেতন আয়েশী ভাব।

টিফিনের সময় শিক্ষকরা গাম্ভীর্য-কর্তৃত্বের মুখোশ খুলে প্রায় ছাত্রদের মতোই হট্টগোল করে। খবরাখবরের আদান-প্রদান করে, নানা বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামতের ঢাকঢোল বাজায়, শ্রোতা না পেলেও কেউ-না-কেউ শুনবে এ-আশায় একতরফা বকে যায়। না শুনলেও পরওয়া নাই যেন। বিশ্রামঘরে শ্রোতারা সব সময়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ।

অভ্যাসমতো যুবক শিক্ষক এককোণে নির্বাক হয়ে বসে। সামনে একটি পুরোনো মাসিক পত্রিকা। সেটি পড়ার ভান করে। সহযোগীদের কথা কখনো-কখনো কানে লাগে, কিন্তু তাও ভাসা-ভাসা ভাবে। তার কানের সীমানায় ধরবার কিছু না পেয়ে তাদের কথা পিছলে খসে যায়। কিছুক্ষণ সময় কাটে। যুবক শিক্ষক পাতা ওল্টায় না।

এক সময়ে কোলাহলের মধ্য থেকে একটি শব্দ ছিটকে বেরিয়ে আসে। তারপর, অব্যর্থলক্ষ্য শব্দটি সরাসরি চাঁদমারি বিদ্ধ করে। নিমেষে সমস্ত কোলাহল, তাল-বেতাল দুর্বোধ্যপ্রায় বাক্যস্রোত স্তব্ধ হয়। সচকিত হয়ে যুবক শিক্ষক কান খাড়া করে।

"শুনেছেন?"

প্রশ্নকারের উচ্চকণ্ঠে গুরুত্বভাব। একটি শব্দের প্রশ্নই বিশেষ জরুরি ঘোষণার ভূমিকার মতো শোনায়।

"শুনেছেন?"

দ্বিতীয় বার কথাটি জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নকার তৃপ্ত না হয়ে পারে না। তারই কণ্ঠ বিশৃঙ্খল কোলাহলের মধ্যে জয়লাভ করেছে। কারো মুখে টুঁ শব্দ নাই। সে মনস্থ করে, তার জয় সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করবে সে।

"বলতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে।"

আকস্মিক বিনয়ের সঙ্গে এমন অসম্ভব বিস্মৃতিশীলতার দোষ স্বীকার করে প্রশ্নকার সাড়ম্বরে নিশীথরাতে নদীপথ-স্টিমারের পটভূমিকায় তার বক্তব্য শুরু করে। অবনতমুখে যুবক শিক্ষক তার কথা শোনে। যা শোনে তার চেয়ে বেশি মনশ্চক্ষুতে দেখে, কারণ তার মনে হয় ঘটনাটি তার অজানা নয়। সে দেখে শীতকালের নিস্তেজ শান্ত নদী, তার বুকে স্টিমারের অত্যুজ্জ্বল সাদা সন্ধানী-আলো। জনমানবশূন্য নদীপাড়, গাছপালাঘেরা ঘুমন্ত গ্রাম। নদী কোথাও চওড়া, কোথাও সরু; কোথাও তার বুকে উলঙ্গ চর চাঁদের আলোয় ধবধব করে। কোথাও প্রাচীন দুর্গ-দেয়ালের মতো পাড় খাড়া, কোথাও স্থলের সঙ্গে প্রায় সমতল। বাঁক কোথাও ক্রমিক, কোথাও আকস্মিক। রাতের গভীর নীরবতায় জলযানের যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড উচ্চস্বরে আওয়াজ করে। ওপরে, লম্বা সাদা কোর্তার ওপর আলোয়ান জড়িয়ে সারেঙ্গ দূরগামী-চোখে, সন্ধানী-আলোর মতোই অহরহ এধার-ওধার তাকায়। মাথায় কিস্তি টুপি, মুখে ধার্মিক ব্যক্তির সৌম্যশুদ্ধভাব। সেখানে তাকে বড়ই একা এবং কিছুটা বেমানানও মনে হয়। যেন তারই পরিচালিত যান্ত্রিক জলযানের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নাই। তার দৃষ্টি যেন নদীতে নয়, দূরদিগন্তে, তারাতে বা ছায়াপথে নিবদ্ধ।

নদীপথ-স্টিমারের এ-নিরীহ বিবরণেই যুবক শিক্ষকের বুক কাঁপতে শুরু করে। সে বোঝে, বক্তা এখনো আসল কথা পাড়ে নাই। সে নদীরই মতো এঁকে-বেঁকে সর্পিল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে কেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে, কিন্তু উপযুক্ত মুহূর্তে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবে। তার গন্তব্যস্থল যুবক শিক্ষক জানে। তবু তা শোনবার বাসনা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে সে শীঘ্র শ্রান্তিবোধ করতে শুরু করে।

নিঃসন্দেহে ভণিতায় বক্তা মাত্রাতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। একজন শ্রোতা বলে ওঠে, "ঠিকই বলেছেন। সারেঙ্গ নয়, মোল্লা যেন। ভুল করে মসজিদের মিম্বর ছেড়ে জাহাজের পুলে দাঁড়িয়েছে।" হঠাৎ সে গলা উঁচু করে এধার-ওধার তাকায়। বলে, "ভালো কথা। এক-চোখ

কানা মুয়াজ্জিন কী করেছে শুনেছেন?" তার বিবেচনায়, বক্তার সময় পেরিয়ে গেছে। আশান্বিতভাবে উৎসাহের জন্যে আবার এধার-ওধার তাকায় সে। উৎসাহ পেলে নিঃসন্দেহে কথার স্রোত অন্যপথে চালু করে দেবে। বলা বাহুল্য, দাঁড়ে থাকবে সে-ই। আলোচনার গতি-পরিবর্তনের ব্যাপারে সবারই মতো সে বিশারদ।

দুঃখের বিষয়, এ-সময়ে আরামদায়ক কুর্সিটির পাশে দু-একজন শিক্ষক হঠাৎ সজোরে নাকে শব্দ করে ওঠে, মুখে তাদের বিষম বিরক্তির ভাব। একটা বদগন্ধ উঠেছে। খোলাখুলিভাবে তারা আরবির মৌলবীর দিকে তাকায়। মৌলবীর চোখ নিমীলিত। মুখে আয়েশী ভাবের ওপর এবার একটা আধ্যাত্মিক ভাবের অস্পষ্ট আভাস যেন।

বক্তার বুঝতে দেরি হয় না, বিজয়ের উল্লাসে সে অসাবধান হয়ে পড়েছে, হাতের লাগাম ঢিলে করে দিয়েছে, প্রধান নদীপথ ছেড়ে খালে-বিলে কালক্ষেপ করেছে। শীঘ্র সে স্টিমারের সারেঙ্গের মতোই দক্ষতার সঙ্গে তার বক্তব্য সঠিকপথে চালিত করে।

হঠাৎ মোল্লাসদৃশ সারেঙ্গ দেখতে পায়, নদীতে কিছু একটা ভাসছে। যুবক শিক্ষকও দেখতে পায় এবং বিবরণ শোনবার আগেই ভাসমান বস্তুটিকে চিনতে পারে। নিশ্বাস বন্ধ করে তবু সে শোনে।

স্টিমার তখন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির মতো থরথর করে কেঁপে পূর্ণবেগে চলছে। সারেঙ্গের নির্দেশে এখানে-সেখানে নানারকম ঘণ্টা বাজে, স্টিমারের পার্শ্বদেশ থেকে প্রভূত বাষ্প নির্গত হয়, রাত্রির নীরবতার মধ্যে লস্করদের গলার আওয়াজ জেগে ওঠে। বিশাল তেলেপোকা যেন পথে-পড়ে-থাকা একটি বিন্দুবৎ ক্ষুদ্র দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে থামে।

নদীর বুকে ভেসে-যাওয়া বস্তুটি একটি নারীর মৃতদেহ। ফেঁপে-ফুলে কলাগাছ। দেহটি যে একটি যুবতী নারীর তা কেবল ডাক্তারই বলতে পারে। গলায় একটি রূপার হার আঁট হয়ে আছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ বিবস্ত্র।

"বিবস্ত্র?" একটি শিক্ষক সশঙ্ক নীতিবিদের কণ্ঠে উক্তি করে। কলাগাছের মতো ফাঁপা-ফোলা ভাসমান প্রাণহীন নারীদেহের পক্ষেও বিবস্ত্র হওয়া যেন দূষণীয়।

তখন যুবক শিক্ষকের হাতও কাঁপতে শুরু করেছে। সে-বিষয়ে সচেতন হয়ে মাসিক পত্রিকাটি আস্তে টেবিলের ওপর রেখে সে কম্পমান হাত লুকিয়ে ফেলে।

"একেবারে বিবস্ত্র। রূপার হারটা ছাড়া গায়ে কিছুই নাই।"

সে-বিষয়ে যুবক শিক্ষকও যেন চিন্তিত হয়। মনে-মনে বলে, পাছাপেড়ে সাদা শাড়িটার কী হল? পরক্ষণে সে স্বীকার করে, শাড়ির রঙ সে জানে না।

"বয়স বেশি না। বড়জোর, বিশ একুশ। ডাক্তার তাই বলে। ফেঁপে-ফুলে কলাগাছ হলেও ডাক্তাররা ঠিক ধরতে পারে।"

"পানির কলাগাছ না স্থলের কলাগাছ?" কেমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি শিক্ষক রসিকতা করার চেষ্টা করে। তার কাছে কলাগাছের সঠিক বিবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

নীতিবিদের মুখ লাল হয়ে ওঠে। হয়তো তার কল্পনায় বাধা পড়েছে। সে হয়তো দেখছিল, একটি বিবস্ত্র সুন্দরী নারী কলাগাছের ভেলায় চড়ে নদীতে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় স্টিমারের অত্যুজ্জ্বল আলো তার ওপর পড়ে। হীরার ওপর যেন আলো পড়ে, কারণ সে-আলোতে তার রূপ বিচ্ছুরিত হয়। তার দেহ যদি কিছু স্ফীত হয়ে থাকে, তার কারণ দুর্দমনীয় যৌবনভার।

তারই কল্পনা-অগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়ে বক্তা আবার বলে, "এমন অবস্থা, তবু বোঝা যায়, জীবিতকালে দেখতে-শুনতে মন্দ ছিল না।"

আরবির মৌলবী নিমীলিত চোখে এতক্ষণ নীরব হয়ে ছিল। এবার উচ্চস্বরে মন্তব্য করে, "তওবা তওবা! নীচজাতীয় মেয়েমানুষ হবে।"

এ-সব মন্তব্য যুবক শিক্ষকের কানে প্রবেশ করে না। সে অনুভব করে, একটি গভীর বিষাদে তার মন ভরে উঠেছে। দুঃখের সঙ্গে সে ভাবে,—যুবতী নারী অদৃশ্য হয়ে স্বপ্নাকাশের অম্লানকুসুমে পরিণত হতে পারল না। তবে কিছু বিস্ময়ের সঙ্গে এ-কথাও উপলব্ধি করে, তার দুঃখটা যুবতী নারীর জন্যে নয়, কাদেরের জন্যেই যেন। কাদেরের পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হল না, তার সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হল। খবরটা জানতে পেলে হয়তো তার দুঃখের সীমা থাকবে না।

"আরো শুনুন।" বক্তা উচ্চ নাটকীয় স্বরে বলে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে তার দিকে তাকায়।

"মেয়েলোকটি আমাদেরই গ্রামের মানুষ।"

না, বিবস্ত্র হয়েও দেহ বিপুলাকার এবং মুখমণ্ডল কদাকার করেও যুবতী নারী তার পরিচয় ঢাকতে পারে নাই। শনাক্তকারের দৃষ্টির সামনে কোনো ছদ্মবেশই নিখুঁত নয়।

"মাঝির বউ!" গ্রাম থেকে নিরুদ্দিষ্ট যুবতী নারীর কথা স্মরণ করে একজন শিক্ষক আবিষ্কারকের উল্লাসে ঘোষণা করে।

গ্রামের করিম মাঝির বউ। স্বামীর নাম কী? নামটা ছমিরুদ্দীন, ছলিমউদ্দীন না করিমউদ্দীন, সে-বিষয়ে কিছু তর্ক হয়।

নাম যা-ই হোক, সে লম্বা পাড়িতে ঘরছাড়া। ঘরে বিধবা মা, চোখে কম দেখে, বাতের ব্যথায় সব সময়ে গোঙায়। তার অবিবাহিতা মেয়েও ঘরে। কানা, বিয়ে হবে না। বাড়ির পেছনে পুকুর, নদীটাও কাছে। দুটি গরু, একটি ছাগল, উঠানের কোণে মোরগ-মুরগির খাঁচা। মাঝি বড় গতর খেটে কাজ করে।

"নদীতে পড়ল কী করে?"

প্রশ্নটি সকলকে বুদ্ধির যুদ্ধে যোগদান দিতে আহ্বান করে। অবিলম্বে নানারকম মতামতে বিশ্রামঘরটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

নীতিবিদ অবশেষে নিশ্চিত কণ্ঠে রায় দেয়, "এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো কথা আছে। বলে দিলাম, মেয়েলোকটির ক্ষেতখামারে যাবার অভ্যাস ছিল।"

"নিশ্চয়ই কথা আছে। এমনি পানিতে ডুবে কেউ মরে না।"

"বললেন না বাজা মেয়েলোক? সে-ই হচ্ছে আসল কথা। বিয়ে-থার পর মেয়েমানুষের ছেলেপুলে না হলে পুরুষ-মরদের জন্যে মন খামখাম করে। জানা কথা।"

"না, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কথা আছে।"

যুবক শিক্ষক কোলাহলে সচেতন হয়ে বিহ্বলভাবে এধার-ওধার তাকায়। এত হট্টগোল কেন? তারপর সে লক্ষ করে, ভয়ানকভাবে তার হাত কাঁপছে। সভয়ে সে হাতদুটি টেবিলের তলে ঢাকে। তারপর কখন বিশ্রামঘরে একটি অস্বাভাবিক নিঃশব্দতা নেবে ক্রমশ তা গাঢ় হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষকের শিরদাঁড়া টনটন করতে শুরু করে। এ-নিঃশব্দতা তার পছন্দ হয় না। ইচ্ছা করে চোখ তুলে তাকায় একবার কিন্তু সাহস হয় না।

অবশেষে দূর থেকে একটি গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে ওঠে।

"আরেফ মিঞা?"

এবার যুবক শিক্ষক চমকিত হয়ে চোখ তোলে কিন্তু কারো চেহারা স্পষ্টভাবে দেখতে পায় না। আবার কয়েক মুহূর্তব্যাপী অপ্রীতিকর নিঃশব্দতা।

'শরীর ভালো নয়?"

সাপের মতো ক্ষিপ্রভঙ্গিতে জিহ্বাগ্র দিয়ে সে ঠোঁট ভেজায়, কিন্তু শুষ্ক জিহ্বার তালু কাঠ-কাঠ মনে হয়। শরীরে অসীম দুর্বলতা। অসুস্থতারই লক্ষণ। অস্পষ্টকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "শরীরটি ভালো বোধ হচ্ছে না।" তারপর পেটে হাত বুলিয়ে বলে, "হয়তো হজমটা ঠিক হয় নাই।"

তার একজন সহযোগী তাগ্‌ড়াকণ্ঠে হেসে ওঠে।

"বড়বাড়ির উত্তম খাবার হজম হয় নাই? তাজ্জব কথা!" শিক্ষকদের মধ্যে যুবক শিক্ষকই বিনাখরচে বড়বাড়িতে থাকে-খায়দায় বলে তার প্রতি সকলের মনে একটু লুকানো ঈর্ষা। সুযোগ পেলেই সে-ঈর্ষা প্রকাশ পায়।

"ঠিক জানি না। জ্বরটর আসছে বোধহয়।"

অন্য এক সহযোগী চোখ টিপে বলে, "অবিবাহিত যুবক মানুষ। জ্বর-ব্যাধি ছাড়াও নানা রোগ ঘাড়ে চাপে।"

যুবক শিক্ষকের রক্তহীন মুখে এক ঝলক রক্ত দেখা দেয় তা লক্ষ্য করে উক্তিটি যথাস্থানে বিদ্ধ হয়েছে ভেবে সহযোগীটি ইঙ্গিতে অন্যান্য শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেদিকে।

রক্তঝলকের কারণ লজ্জা নয়, সহযোগীদের প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ। সে-ঘৃণা ক্রমশ এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে যে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। সে-পীড়াদায়ক ভাব থেকে রেহাই পাবার জন্যেই হয়তো সে বিপরীত চরিত্রের সন্ধান করে—এমন চরিত্র যার দয়ামায়া উদারতার শেষ নাই। বেশি সন্ধান করতে হয় না। তার মনশ্চক্ষুতে কাদের এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে-সঙ্গে সারা অন্তর অতি স্নিগ্ধ মধুর শীতল-হাওয়ায় জুড়িয়ে যায়, চারপাশে দেয়াল ধসে পড়ে বলে উন্মুক্ত দিগন্তের দিকে তাকাতে আর বাধা থাকে না। তার মনে হয়, উন্নতচরিত্র দয়াশীল স্নেহশীল কাদেরের তুলনায় তার সহযোগীরা সব অতি নীচমনা কলুষজর্জরিত মানুষ! এখন এই ভেবে তার পরম দুঃখ হয়, কাদের যাকে গভীর অপমান হতে বাঁচাতে চেয়েছিল, সে তাদেরই হাতে ধরা পড়েছে। এবার তারা তাকে নির্দয়ভাবে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।

যুবক শিক্ষকের আর সন্দেহ থাকে না, কাদেরের অভিপ্রায় সে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে-কথা তাদের মধ্যেই লুকানো থাকবে, কারণ অন্যেরা তার মর্ম বুঝবে না। তাদের দয়ামায়াশূন্য কুণ্ডলিত বিকৃত মনে যুবতী নারীর দেহটি নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টাই অতি বিচিত্র ঠেকবে। প্রতিশোধ নেবার শক্তি যার নাই, এমন দুর্বল অসহায় মানুষের মৃত্যুর মধ্যে যে-চরম অপমান সে-অপমানের তাৎপর্য কি তাদের কূপের মতো অন্ধকার বায়ুহীন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে? পরিত্যক্ত হতভাগিনী যুবতী নারীর প্রতি যে-গভীর স্নেহ-মমতা জেগেছিল কাদেরের মনে, তার মূল্য কি তারা বুঝবে? দীপ্ত উজ্জ্বল সূর্যের সঙ্কেত, কনকপ্রভা চন্দ্রালোকের আহ্বান, ঘূর্ণাবর্তের অস্থিরতার অর্থ তারা যেমন বুঝবে না, তেমনি এ-সব কথাও বুঝবে না। বোঝানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। কুণ্ডলীকৃত মনের পক্ষে সরল হওয়া বা দূরগামী হওয়া দুষ্কর।

যুবক শিক্ষকের মনে কাদেরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আরো গাঢ় হয়। একটু অবাক হয়ে সে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করে। সে যেন স্বচ্ছ, শঙ্কাভীতিশূন্যদৃষ্টিতে যুবতী নারীর দিকে তাকাতে পারছে। শুধু তাই নয়। যাকে সে জীবিতকালে কখনো দেখে নাই, মৃত্যুর পরও যার দিকে চোখ খুলে তাকাতে পারে নাই, তারই প্রতি কেমন একটু মমতাও বোধ করতে শুরু করেছে। অবশ্য সে বোঝে, কাদেরের মনের মমতার তুলনায় তা নগণ্য অংশ মাত্র। তবু তা দু-জনের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে যেন।

"যান, ছুটি নিয়ে নেন আজ। হেডমাস্টারকে বলুন গিয়ে।"

এ-উপদেশটা আসে আরবির মৌলবীর কাছ থেকে। যুবক শিক্ষক দেখে, উপদেশদাতা তারই দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যান্য শিক্ষকের দৃষ্টিও তার ওপর।

"পেটের ব্যথাটা একটু কমেছে যেন।" গলায় সুস্থতার আভাস জাগাবার চেষ্টা করে সে উত্তর দেয়।

সে-বিষয়ে তর্কের কোনো অবকাশ থাকে না। ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে ওঠে। টিফিনের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে।

সাত

সে-রাতে পড়ানোর অধিবেশন শেষ হলে যুবক শিক্ষক কুদ্দুসকে বলে, "কাদের মিঞাকে ডেকে দেবে?"

তারপর বারান্দার কালো-সাদা বরফি-ছককাটা মার্বেলের মেঝের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চলভাবে দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারে, ছেলেমেয়েরা কৌতূহলভরে তার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু তার শীর্ণমুখে কোনো ভাবান্তর ঘটে না। তার আচরণ-ব্যবহার আর তার ক্ষমতাধীন নয় যেন। কেবল কুদ্দুসের যেতে দেরি হচ্ছে দেখে তার চোখে অস্থিরতার ঈষৎ আভাস জাগে।

বারান্দা অবশেষে খালি হলে সে পূর্ববৎ নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। দরজার ওপর দেয়ালঘড়িটা সশব্দে বাজে, ওপরতলা থেকে দাদাসাহেবের খড়মের আওয়াজ আসে। তারপর সে পদধ্বনিও থামে। প্রগাঢ় নীরবতায় তার বুকের স্পন্দন ঘড়ির আওয়াজের মতো জোরালো হয়ে ওঠে।

গতরাতেই সে বুঝতে পারে, দেখার চেষ্টা না করলে হয়তো কাদেরের সঙ্গে বহুদিন দেখা হবে না। এমনিতে দেখা হবার সুযোগ-সুবিধা কম। যুবক শিক্ষক নিজে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শিক্ষকতার কাজে ব্যস্ত থাকে। দীর্ঘ দিনব্যাপী ইস্কুল আছে, দু-বেলা ছেলেমেয়েদের পড়াতেও হয়। অতএব সে স্ব-ইচ্ছায় দর্শন না দিলে তার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা দৈবাৎ ঘটনার মতোই অনিশ্চিত। এ ক-দিন সে অপেক্ষায় থেকেছে, কিন্তু তার দেখা পায় নাই। স্পষ্ট বোঝা যায়, কাদেরের মনে তার সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছা নাই। থাকলে সে আসত। কাদেরের এ-নিস্পৃহতার কোনো অর্থ সে বোঝে না। তার রহস্যময় ব্যবহারের ফলে যুবক শিক্ষকের মনে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে যে-তীব্র ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে সযত্নে সাজানো নানা প্রশ্ন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। প্রশ্নগুলি আর দরকারিও মনে হয় না। তার সঙ্গে একবার দেখা হলেই সে যেন তার উত্তর পাবে, মনেরও নিদারুণ বিহ্বলতা কাটবে।

আজ মগরেবের নামাজের সময় দাদাসাহেবের দিকে তাকিয়েই সাক্ষাতের আশায় বসে থাকার নিষ্ফলতা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে সে। বড়বাড়িতে কেবল দাদাসাহেবই কাদের সম্বন্ধে সচেতন। নামাজের আগে তাঁর ঈষৎ অনুসন্ধানী দৃষ্টি চোখে পড়লে যুবক শিক্ষক বোঝে, তিনি তারই সন্ধান করছেন। প্রায় দু-সপ্তাহ সে নামাজে যোগদান করে নাই। তার অনিশ্চিত মতিগতি তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন বটে তবু সে এলে তিনি খুশিই হন। আজ সে আসে নি দেখে তিনি ক্ষুণ্ন হন। সে-ক্ষুণ্নতা লক্ষ করে যুবক শিক্ষক তাঁর সঙ্গে একটা আন্তরিক যোগাযোগ বোধ করে। ফলে, মনে কেমন সবলতা আসে। সে-মুহূর্তেই সে স্থির করে, আজ রাতেই কাদেরকে ডেকে পাঠাবে। দাদাসাহেব নীরবে দিনের পর দিন তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু সে পারে না। আকণ্ঠ নিমজ্জিত মানুষের পক্ষে কারো জন্যে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরেছে, কাদেরের সঙ্গে দেখা না হলে সে ভাঙন জোড়া লাগবে না। তারই নির্দেশে একটি অতিশয় অস্বাভাবিক কাজে সে তাকে সাহায্য করেছে, গভীর রাতে একটি নারীর মৃতদেহ বহন করেছে। বাক্স-পেটরা নয়, মেজ-কুর্সি নয় : মানুষের মৃতদেহ। তাকে কি কাদেরের কিছুই বলার নাই? সে হয়তো ব্যাপারটির অর্থ জানে, কিন্তু যুবক শিক্ষক জানে না। হয়তো তার পক্ষে সে-ব্যাপারে বিস্মৃত হয়ে আবার গতানুগতিক জীবনযাত্রায় নির্বিঘ্নে মনোনিবেশ করা সম্ভব, যুবক শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশেষে কুদ্দুসের চটির আওয়াজ কানে আসে। এবারও যুবক শিক্ষকের মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটে না; কিন্তু উত্তরের তীব্র প্রত্যাশায় তার সমস্ত দেহ পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। তারপর সে-শক্ত আবরণের মধ্যে একটি দুর্বল হৃৎপিণ্ড থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। কুদ্দুস

যখন সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন সে তার দিকে তাকায় না। কেবল প্রশ্ন করে, "কী?"

"কিছু বললেন না।"

যুবক শিক্ষক উত্তরটির অর্থ যেন বোঝে না। ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে কুদ্দুসের দিকে তাকায়। সেখানে কোনো ব্যাখ্যা দেখতে না পেলে অকারণে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। বারান্দায় অখণ্ড নীরবতা।

"শুধু বললেন, কেন। বললাম, জানি না।" একটু ইতস্তত করে কুদ্দুস বলে। একটু থেমে সে আবার বলে, "যাই ?"

যুবক শিক্ষক কোনো উত্তর দেয় না। প্রশ্নটি হয়তো শোনে না। তারপর সে নিজেই বারান্দা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যুবক শিক্ষকের মনে এ-বিশ্বাস জন্মায় যে, কিছু না বলার অর্থ সে আসবে না তা নয়। সাক্ষাতের জন্যে অনুরোধটি তার কানে পৌঁছেছে, এবার সময় করে সে আসবে। হয়তো একটু রাত হলে আসবে। লণ্ঠনের আলোটা কিছু কমিয়ে দরজাটি সামান্য খোলা রেখে চৌকির ওপর বসে যুবক শিক্ষক অপেক্ষা করতে শুরু করে। রাত তখন ইতিমধ্যে গভীর হয়ে উঠেছে।

মধ্যরাত গড়িয়ে গেলেও কাদেরের কোনো চিহ্ন দেখতে না পেলে সে দরজা খুলে একবার বড়বাড়ির দিকে তাকায়। চাঁদ তখন উঠেছে, তবে আজ তার আলো নিস্তেজ। সে-আলোয় অন্ধকারাচ্ছন্ন বড়বাড়ি ফ্যাকাসে দেখায়। সেখানে কেউ জেগে নেই। কতক্ষণ সে বড়বাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জানে না, অকস্মাৎ এক সময় সামনের দৃশ্য মুছে গিয়ে তার চোখের সামনে আগুনের নৃত্য শুরু হয়েছে। সে বুঝতে পারে, হঠাৎ একটি দুর্দান্ত ক্রোধ তাকে গ্রাস করেছে। যে-মানুষের প্রতি দু-বছরব্যাপী অস্পষ্ট কৌতূহল, অবিশ্রাম উদাসীনতার পর হঠাৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি, এমনকি কেমন একটা বন্ধুত্বের ভাব জেগেছে, সে-ই এ-ক্রোধের কারণ। কিছুক্ষণ পর দরজায় খিল দিয়ে সে বিছানায় ফিরে আসে। ক্রোধ তখনো পড়ে নাই। নিষ্ফল ক্রোধ সহজে মিটতে চায় না।

এক সময়ে সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ে। যখন আবার জেগে ওঠে, তখন সে কান পেতে কিছু শোনবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাত্রির গভীরতায় কোনো আওয়াজ শুনতে পায় না। নীরবতা শূন্যতার মতো অন্তহীন মনে হয়। এ-নীরবতা কখনো যেন ভাঙে নাই, ভাঙবেও না। ক্রমশ একটি অবাস্তব ভাব এসে তার সময়-কালের চেতনাবোধ লুপ্ত করে দেয়। সে না ঘুমিয়ে অন্ধকারে চোখ খুলে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকে।

অবশেষে সে-চেতনাহীনতা থেকে ক্ষীণভাবে তার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। সমস্ত ঘটনাটি কি একটি বিচিত্র দুঃস্বপ্ন? চমকিত হয়ে প্রশ্নটি সে ভেবে দেখে। যত ভাবে ততই তার সত্যাসত্য সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। তাই ঘটনাটি আগাগোড়া একটি অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন। কাদেরকে ডেকে পাঠালে সে কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন সে দেখা করতে চায়। তার প্রশ্নের অর্থ এবার সে বুঝতে পারে।

এ নোতুন জ্ঞান লাভে প্রথমে সে অস্থির হয়ে উঠে বসে। তার কি মস্তিষ্ক সুস্থ নয়? ঘরের কোণে সুরাহি থেকে পানি ঢেলে সে গলা সিক্ত করে, দু-চারবার পায়চারি করে, তারপর আবার চৌকিতে ফিরে এসে বসে। না, ঘটনাটি দুঃস্বপ্ন, দু-রাতব্যাপী দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। সে-দুঃস্বপ্নের কথা সে ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না। জানা সম্ভব নয়। সে জন্যেই কাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন।

দুঃস্বপ্ন বাস্তবরূপ ধারণ করলেও তাতে কিছু অবাস্তবতা, কিছু যুক্তিহীনতার ছাপ না থেকে পারে না। ঘটনাটিতে এবার সে যে শুধু অবাস্তবতার সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পারে তা নয়, স্থানে স্থানে অযৌক্তিকতা তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, হত্যাকারীর আচরণ। হত্যাকারী বাঁশঝাড়ে বসে যুবক শিক্ষকের জন্যই অপেক্ষা

করে। সে যখন জানতে পারে, বাঁশঝাড়ের বাইরে সে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে যুবতী নারীর জীবনাবসান করে। তারপর সে চাঁদের আলোয় হাওয়ার মতো মিলিয়ে যায়। বাইরে কে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে? বড়বাড়ির আত্মভোলা দরবেশ ধরনের মানুষ, কাদের। সে-ও তারই জন্যে অপেক্ষা করে যেন। স্বপ্নে ছাড়া এমন ঘটনা কি সম্ভব? স্বপ্নে কাদেরের আবির্ভাবের কারণও সে বুঝতে পারে! কাদের নাকি দরবেশ। বিস্ময় কী, সে-ই সে-স্বপ্নের একটি বিশিষ্ট চরিত্র হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে?

"সবটাই দুঃস্বপ্ন। অত্যাশ্চর্য দুঃস্বপ্ন।" যুবক শিক্ষক আপন মনে ঘোষণা করে। স্বপ্নে যে সে প্রায় সারারাত ছুটোছুটি করেছে পাগলের মতো, সে কথা স্মরণ হলে তার একটু হাসিও পায়। না, সে নয়, যুক্তি-বিচার-বুদ্ধি থেকে স্বপ্নই পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

"আষাঢ়ের গল্পের মতো স্বপ্ন।" এবার সে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে। তারপর সে কৌতুকভরে স্বপ্নটির বিশ্লেষণকার্য নিয়ে অগ্রসর হয়।

দুঃস্বপ্নের সেখানেই কি শেষ! আষাঢ়ে গল্পের শেষ নাই : যার যুক্তি নাই, তার সমাপ্তিও নাই।

বড়বাড়ির কাদের যে নিষ্কর্মা হলেও কারো সাতে-পাঁচে নাই, দরবেশ না হোক তব আপন খেয়ালেই থাকে—সে-ই পরদিন রাতে তার ঘরে এসে হাজির হয়। সামাজিকতা বা প্রতিবেশীর সঙ্গে একটু গল্পগুজবের তাগিদে নয়, একটি ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করে বলে। নিষ্কর্মা হলেও যে-মানুষ সম্ভ্রান্ত বংশজাত এবং ভদ্রলোক, সে বলে, দয়া করে চলুন, বাঁশঝাড়ের মৃতদেহটি নদীতে ফেলে দিয়ে আসি। দু-বছরে তার সঙ্গে কখনো আলাপ-সালাপ হয় নাই, প্রস্তাবটাও অতি বিস্ময়কর, তবু বড়বাড়ির মানুষ তারই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছে, কী করে না করে? দ্বিরুক্তি না করে গায়ে আলোয়ান জড়িয়ে সে কাদেরের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য কার্যান্তে কাদের চন্দ্রালোকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। স্বপ্নটি হয়তো তাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখা সমীচীন মনে করে না। ধরে রাখলে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, সে ভয় আছে।

"অদ্ভুত স্বপ্ন।" যুবক শিক্ষকের বিস্ময় কাটে না।

সেখানেই স্বপ্নের জের শেষ হয় না। স্বপ্নের ফেনিয়ে গল্প-বলার আত্যন্তিক নেশা কাটে না। যুবক শিক্ষকের মতো উর্বরমস্তিষ্ক কল্পনাপ্রবণ খদ্দের পেয়ে সহজে কি তাকে হাতছাড়া করে?

নদীতে দেহটি নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সাহায্য-সহায়তার আদর্শ উদাহরণের পর দিন-দুপুরে ইস্কুল পর্যন্ত ছুটে যেতে স্বপ্নটি দ্বিধা করে না। যখন তার সহযোগীর টিফিনের সময় গল্পগুজব করে, তখন বিশ্রাম ঘরের এক কোণে বসে নিদ্রাভিভূত হয়ে সে স্বপ্নে দেখে নদীপথ, স্টিমারের সন্ধানী-আলো, পুলের ওপর দাঁড়িয়ে সারেঙ্গ মোল্লার মতো সারেঙ্গ, এক সহযোগী যার দীর্ঘ বিবরণ দেয়। কিন্তু স্বপ্নের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া অতি স্বাভাবিক। একটু ঘুরে-ফিরে আসল কথায় ফিরে আসে নদীবক্ষে যুবতী নারীর দেহটির আবিষ্কার।

একটি কথা ভেবে যুবক শিক্ষক কিছু ভাবিত হয়। তার মনে পড়ে, স্বপ্নের শেষভাগে সহযোগীদের প্রতি সে নিদারুণ ঘৃণা বোধ করেছিল। সে জানত না, তার মনের অন্তরালে মানুষের প্রতি এমন ঘৃণা লুক্কায়িত। এ-গোপন ঘৃণার পরিচয় পেয়ে সে ক্ষণকালের জন্যে শঙ্কাই বোধ করে। এ-ঘৃণার উৎপত্তি কোথায় ?

প্রশ্নটির উত্তর না পেলে সে স্বপ্ন-বিশ্লেষণকার্যে প্রত্যাবর্তন করে। যুবক শিক্ষক স্বীকার করে, এখানে-সেখানে অযৌক্তিকতা থাকলেও ঘটনার অনুক্রম-বিন্যাসের ব্যাপারে এবং বিষয়বস্তুর কাঠামোতে আপাতদৃষ্টিতে স্বপ্নটির মধ্যে কোনো দোষঘাট নজরে পড়ে না। সে জন্যে তার কালোস্রোতে সে ভেসে যেতে পেরেছে, তাকে বাস্তব ঘটনা বলে গ্রহণ করতে তার দ্বিধা হয় নাই। না, সে-সব অযৌক্তিকতা স্বপ্নটির প্রধান দুর্বলতা নয়; তার প্রধান দুর্বলতা

অন্যত্র। সে-দুর্বলতাটি এখন সে বুঝতে পারে বলেই স্বপ্নটির অসত্যতা তার চোখে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

স্বপ্নটির সে-চরম দুর্বলতা তার আসল উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত। একটি অপঘাত মৃত্যুর কথা বলে দর্শকের মনের ভীতি-আঘাত জাগানোই তার আসল উদ্দেশ্য নয়, কারণ অপরিচিতা একটি নারীর এমন দুর্ভাগ্যের কথায় মনে যতই ভীতি-আঘাতের সঞ্চার হোক না কেন, তা তেমন গভীর বা স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। অপঘাত-মৃত্যুটি উদাহরণ মাত্র, একটি সাংঘাতিক উপসংহারে পৌঁছাবার উপাদান। উপসংহারটি হল, মানুষের জীবনের প্রতি মানুষের নির্দয় নিষ্ঠুর উদাসীনতা। সেটাই স্বপ্নের মর্মকথা। স্বপ্নটির আসল উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ যুবক শিক্ষকের বিপর্যস্ত মন। যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে যে-নৃশংসতা জড়িত সে-নৃশংসতা নয়, মনুষ্যত্বহীন ভয়াবহ সে-মর্মকথাই তাকে এমন গভীরভাবে বিচলিত করেছে।

যুবক শিক্ষক এখন বুঝতে পারে, সে-মর্মকথাই স্বপ্নটির প্রধান দোষ, প্রধান দুর্বলতা। নানাবিধ গাল্পিক কারুকার্যের মধ্যে কৌশলে লুকানো যে-অসত্যের ওপর স্বপ্নটি স্থাপিত, সেদিকে একবার দৃষ্টি পড়লে স্বপ্নটি স্বপ্নেরই মতো ধূলিসাৎ হয়, যে-বৃক্ষটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে সত্যরূপ ধারণ করেছিল, মূল নেই বলে সে-বৃক্ষটি নিমেষেই ধরাশায়ী হয়। বাস্তব জীবনে মানুষ মানুষের প্রতি এমন নির্দয়-নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন নয়।

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে না কী করে স্বপ্নটি তাকে এমনভাবে সম্মোহিত করতে পেরেছিল যে সে প্রশ্ন না করে তার হাতে বন্দি হয়ে থেকেছে, দিনের আলোতেও তার হাত কবল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে নাই। এর অর্থ কি এই যে, তার মন অতিশয় দুর্বল? অথবা, মনের অদৃশ্য কোনো অংশে অতি গোপনে সে কি নিজেই এমন অদ্ভুত বিশ্বাস পোষণ করে? তীব্র ঘৃণার পরিচয় পেয়ে সে সামান্য শঙ্কিত হয়েছিল : এবার তার শঙ্কার অবধি থাকে না।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন অবশেষে দূর হয়েছে এ-জ্ঞানে তার মনে যে-গভীর স্বস্তির ভাব দেখা দেয়, তাতে সব শঙ্কা ভেসে যায়। একটি কুৎসিত সর্বধ্বংসী জন্তুর শ্বাসরোধ-করা-আলিঙ্গন থেকে অবশেষে সে মুক্তিলাভ করেছে। সে আর কিছু ভাবতে চায় না। সব উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ কেটেছে বলে সারা দেহমন কেমন অপরিসীম ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়, তবু সে-ক্লান্তি অতি মধুর, অতি সুখদায়ক মনে হয়। না, সে আর কিছুই ভাবতে চায় না। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে সে অনুভব করে, একটি আরামদায়ক ক্লান্তি স্রোতের মতো বইছে এবং তাতে তার চিন্তাশক্তি তলিয়ে যাচ্ছে। কেবল তাতে বাষ্পের মতো হাল্কা উষ্ণ একটি কৃতজ্ঞতার ভাব ভেসে থাকে। সে-কৃতজ্ঞতা এই জন্যে যে, মানুষের ভাগ্য খামখেয়ালি এবং নির্মম হলেও মানুষ মায়ামমতাশূন্য নয়, অতি নিস্পৃহের নিকটও অন্যের জীবন মূল্যহীন নয়।

যুবক শিক্ষকের শীর্ণ-শুষ্ক দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আবার মোহময় জীবিতাশা প্রবাহিত হয়। অন্ধকার ঘরে বাঁশের দেয়ালের ছিদ্রে-ছিদ্রে বাইরের চন্দ্রালোক চিকন কারুকার্য বিস্তার করেছে। সে-দিকে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তার মনে প্রার্থনার মতো ভাব আসে, সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ একটু সজল হয়ে ওঠে। মনে-মনে ভাবে, স্নিগ্ধ-সুন্দর চাঁদের পৃষ্ঠদেশ মানুষ দেখতে পায় না। তার অন্ধকার অংশে যদি কদর্যতা-নিষ্ঠুরতা থাকে, তা যেন কেউ কখনো না দেখতে পায়।

তার মাথার তলে তুলায়-ঠাসা ছোট বালিশের এক কোণে রঙিন রঙের সুতায় তৈরি একটি গোলাপ ফুল। তারই পাশে এবার দু-এক ফোঁটা চোখের পানি নিঃশব্দে ঝরে পড়ে। মনে-মনে সে আবার বলে, কোনো দুঃস্বপ্নও যেন কখনো সত্য না হয়।

অবশেষে শ্রান্ত যুবক শিক্ষক ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘরের কোণে দড়িতে একটি লুঙ্গি ঝোলে। তার কোণটা একটু ছেঁড়া। গতকাল লুঙ্গিটি সে ধুয়েছে কিন্তু ছেঁড়া অংশটি সেলাই করবার সময় পায় নাই।

দ্বিতীয় রাতে বাঁশঝাড়ে অপেক্ষাকৃত নূতন লুঙ্গিটির সে-দশা ঘটে।

আট

এক সময়ে দরজায় করাঘাত শুরু হয়। প্রথমে আস্তে, সন্তর্পণে; তারপর হঠাৎ সে-করাঘাত কেমন দ্রুত এবং জোরালো হয়ে ওঠে। নিঃসন্দেহে বাইরে-দাঁড়ানো মানুষটি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছে।

যুবক শিক্ষকের ঘুমটা আলগোছে ভাঙে বলে তার মনে হয় সে জেগেই ছিল। করাঘাতে সে বিচলিত হয় না : সে-করাঘাত বিরক্তিকর কিন্তু তার দরজায় নয় যেন। অন্ধকারের মধ্যে চোখ খুলে পাশের দেয়ালের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। সেখানে সূক্ষ্ম কারুকার্যের নক্‌শা কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর কাদেরের কণ্ঠস্বর এবং করাঘাত যুগপৎ শোনা যায়। এবার যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কোনটা সত্য কোনটা অসত্য, কোনটা বাস্তব কোনটা অবাস্তব সে-বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগেই তার দেহ একটি গভীর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মনে একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার উপস্থিতি সম্বন্ধেও সে সচেতন হয়।

দরজা খুললে বাইরে কাদেরের ছোটখাটো কিন্তু প্রশস্ত দেহটির ছায়া জেগে ওঠে। তাকে উপেক্ষা করেই যেন যুবক শিক্ষক একবার আকাশের দিকে তাকায়। রঙটা ঠিক ধরতে পারে না। না কালো না ধূসর; না আলো না অন্ধকার। সময় নির্ধারণ করা যেন সম্ভব নয়। তারপর শীতটা লাগে বলে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়।

ঘরের অন্ধকারের মধ্যে কাদের অনুচ্চ কিন্তু কেমন হুকুমের কণ্ঠে বলে ওঠে, "বাতি জ্বালান।"

যুবক শিক্ষক নীরবে বাতি জ্বালানোর কাজে মনোনিবেশ করে। প্রথমে দেশলাই খুঁজে পায় না; এখানে-সেখানে হাতড়ায়। অবশেষে দেশলাইটি যখন খুঁজে পায় তখন সে বুঝতে পারে, তার হাত একটু কাঁপতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন? সে নিজেই বিস্মিত হয়। এতক্ষণে তার মনে আর কোনো সন্দেহ নাই যে, সে ডাকিয়ে পাঠিয়েছে বলেই কাদের এসেছে। সময়টা হয়তো একটু বেখাপ্পা, কিন্তু তার এ-আবির্ভাবের আর কোনো কারণ নাই।

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় ঘরের অন্ধকারটা অবশেষে কাটে। মশারি সরিয়ে কাদের বিছানার কোণে বসে। একবার তাদের চোখাচোখি হয়। তারপর কাদের কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থেকে অকস্মাৎ আঙ্গুল মট্‌কাতে শুরু করে। দশ আঙ্গুল থেকে দশাধিক আওয়াজ বের করে সে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে একটি সিগারেট ধরায়। মুহূর্তের মধ্যে তার গন্ধে ছোট ঘরটি ভরে ওঠে।

যুবক শিক্ষকের মুখে এখনো কথা সরে না। একবার সে ভাবে কাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, কত রাত হয়েছে, কিন্তু কথাটি জানা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়। তবু তার কেমন সন্দেহ হয়, কাদের অন্য কোনো সময়ে এলেই ভালো হত। তাকে ডেকে পাঠাবার কারণটি সে যেন নিজেই এখন বুঝতে পারে না। তাই হয়তো মনে কেমন ভয়। তার হাত দুটিতে ঈষৎ কম্পন এখনো থামে নাই।

অসংযত মনকে সংযত করবার চেষ্টা করে সে ভাবে, ভয়ের কিছু নাই। কাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিল, সে এসেছে। সেটাই বড় কথা। যার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এ-ক'দিন সে এমন ব্যাকুল হয়ে ছিল, সে এখন দু-হাত দূরে বসে। ভয়ের কারণ কী?

যে-বিশ্বাসটি নিয়ে সে শুয়ে পড়েছিল, তার কথা একবারও মনে হয় না। সেটি যেন

সব-ভুলানো রূপকথা, যার মধ্যে তার বিহ্বল মন একটু শান্তির জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন যে-কঠিন সত্যের সামনে সে দাঁড়িয়ে, সেখানে তার স্থান নাই।

তবু সত্য কী? যাকে সে ডেকে পাঠিয়েছে সে তাকে ডেকে পাঠানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে কী উত্তর দেবে? ক-দিনব্যাপী মনের গভীর বিপর্যস্ততা সত্যে পরিণত করা কি সম্ভব?

কাদের কোনো কথা না বললে যুবক শিক্ষক অবশেষে স্বস্তিই বোধ করে। আড়চোখে তার দিকে একবার তাকায়। অভ্যাসমতো লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে সে নিশ্চল হয়ে বসে, ভুবনভুবর্লোকে তার যেন কিছুই বলবার নাই। হয়তো কিছুক্ষণ এমনি বসে থেকে এক সময়ে হঠাৎ উঠে চলে যাবে। যুবক শিক্ষক ভাবে, সেটাই ভালো হবে। ব্যাখ্যা-কৈফিয়তের, প্রশ্ন-উত্তরের প্রয়োজন উঠবে না। না, সে কিছুই জানতে চায় না। যে-অন্ধকারাচ্ছন্ন গোলকধাঁধায় সে প্রবেশ করেছে, সে-গোলকধাঁধা হতে সে বের হতে চায় না। অন্ধকারই শ্রেয়, কারণ অন্ততপক্ষে অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পায় না।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা আওয়াজ হয়। চমকিত হয়ে যুবক শিক্ষক কাদেরের দিকে তাকায়। সে তারই দিকে তাকিয়ে। হাতে খোলা সিগারেটের বাক্স।

"সিগারেট খাবেন?"

যুবক শিক্ষকের সিগারেটের অভ্যাস নাই। একটু পরে ক্ষুদ্রকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "না।"

কাদের আরেকটি সিগারেট ধরায়। হয়তো কল্পনা, কিন্তু যুবক শিক্ষকের মনে হয়, কাদের কেমন অস্থির-অস্থির বোধ করে। কিন্তু তার অর্ধনিমীলিত চোখের দিকে তাকিয়ে অস্থিরতার কোনো আভাস দেখতে পায় না। বরঞ্চ সেখানে যেন গভীর বিষাদের ছায়া। তারপর যুবক শিক্ষক অকস্মাৎ স্বচ্ছন্দ-বোধ করতে শুরু করে। না, ভয়ের কোনোই কারণ নাই। বাস্তবজগতে যদি ভীতির কারণ থাকে তা এখন অতি দূরে, দিগন্তরালে কোথাও হবে। তবু দূরগত সে-ভীতি যদি তার মনে বন্ধুত্ব-সান্ত্বনার জন্যে ক্ষুধা সৃষ্টি করে থাকে, তবে কাদেরই তা মেটাতে পারে। হয়তো কাদেরের মনেও বন্ধুত্ব-সান্ত্বনার জন্যে তেমনি ক্ষুধা। সেও কি এ-ক'দিন মানসিক কষ্ট-যন্ত্রণা ভোগ করে নাই? দু-জনেরই বন্ধুত্বের বিশেষ প্রয়োজন। তারা একটি গুপ্তকথার মালিক। সে-গুপ্তকথা একাকী বহন করা যদি কষ্টসাধ্য হয়, তবে বন্ধুত্বের সাহায্যেই তারা তা অনায়াসে বহন করবে, মনের বিহ্বলতাও জয় করতে পারবে।

লণ্ঠনের পল্‌তেটা বাঁকা বলে কাচের একপাশ ক্রমশ কালো হয়ে ওঠে, শীঘ্র তার অনুজ্জ্বল আলো আরো অনুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তারা কি অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করছে?

না, সত্যিই সে কিছুই জানতে চায় না। কাদেরের উপস্থিতিতেই সে সন্তুষ্ট। মনে যদি কোনো ইচ্ছা বোধ করে সে-ইচ্ছা কাদেরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে, তাকে তার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত করবার জন্যে। জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস মানুষের সহানুভূতি, সহৃদয়তা, স্নেহমমতা। সে-বিষয়ে নিশ্চিত হলেই মানুষ বিভীষিকা-নিষ্ঠুরতার দিকে নির্ভয়ে তাকাতে পারে।

একটু হেসে দুঃসাহসীর কণ্ঠে যুবক শিক্ষক সজোরে বলে, "দিন্ একটা সিগারেট।"

সিগারেট হাতে নিয়ে কৌতুকভরে কিছুক্ষণ সেটি নেড়ে-চেড়ে দেখে, মুখে হাসি-মাখা দুষ্টু ছেলের কৃত্রিম ভাব।

"একবার বিড়িতে দু-একটা টান দিয়েছিলাম।"

ধূমপানের ব্যাপারে সে যে একেবারে অজ্ঞমূর্খ মানুষ নয়, সে-কথা প্রকাশ করে সে আনাড়ির মতো সিগারেটটি জ্বালায়। প্রথম টানেই তার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়, তবু সে পিছ্‌পা হয় না। মনে হয়, অন্তরটা যেন আরো স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। তাছাড়া এ-কথাও সে অনুভব করে যে, দুজনের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের পুল পড়ছে।

"মাথা ঘুরছে।" সে-টি যে অতিশয় আনন্দেরই বিষয় তা কণ্ঠভঙ্গিতে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়ে এবং তাতে বিন্দুমাত্র না দমে, সে ঘন-ঘন ফুঁকতে থাকে : দৃষ্টি সিগারেটের

জ্বলন্ত অংশ থেকে নড়ে না। কাদের নীরব হয়েই থাকে। সে-নীরবতা সম্বন্ধে সে সচেতন না হয়ে পারে না।

"ইস, সত্যিই চরকির মতো মাথাটা ঘুরছে।" আবার মহা-উল্লাসে তার মস্তিষ্কের অবস্থার কথা ঘোষণা করে সে এবার একগাল ধোঁয়া ছাড়ে। মনে-মনে ভাবে, কী করে কাদেরকে এ-কথা বলে যে সত্যিই সে কিছু জানতে চায় না? সত্য হলেও সব স্বপ্ন বলে মেনে নিতে সে রাজি। যা ঘটেছে তা ঘটেছে—তা বিস্মৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে গেলে ক্ষতি কী ? অন্ততপক্ষে আজ কোনো কথাই সে তুলতে চায় না।

"কী করে রোজ এত সিগারেট খান?" কৃত্রিম শ্রদ্ধা-বিস্ময়ে যুবক শিক্ষক মন্তব্য করে। কাদের জবাব দেয় না।

হঠাৎ যুবক শিক্ষক বোঝে, এ-ভাঁড়ামিপনা অর্থহীন, তাতে কাদের বিন্দুমাত্র আমোদ বোধ করছে না। আড়চোখে সে আবার তাকায় তার দিকে। তার চোখ প্রায় নিমীলিত। তবে তার কারণ যে নিদ্রা নয়, তা বুঝতে তার দেরি হয় না। কাদেরের মুখে একটি অস্বাভাবিক কাঠিন্য।

কাদের কি তার উৎফুল্লতা এবং ভাঁড়ামিতে বিরক্ত হয়েছে? নিঃসন্দেহে সে একটু ভাঁড়ামি করেছে বটে কিন্তু সে ভাঁড়ামির কারণ আকস্মিক সুখবোধ। তার উৎফুল্লতায় কিছুটা কৃত্রিমতা যদি দেখা দিয়ে থাকে তার কারণ উৎফুল্লতা তার চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ নয় : সে জানে না তা কী করে প্রকাশ করতে হয়। অবশ্য সে কাদেরের বিরক্তির কারণ বোঝে। তার বিষাদাচ্ছন্ন মনে এ-মাত্রাহীন ভাঁড়ামি ও উৎফুল্লতা নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিসদৃশ ঠেকেছে। উৎফুল্ল হবার কোনোই কারণ নাই। নদীর বুকে যুবতী নারীর দেহটি আবিষ্কার করে তারা কি তার সব পরিকল্পনা পণ্ড করে নাই?

সিগারেটের কথা ভুলে গিয়ে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। ঘরে প্রগাঢ় নীরবতা। সে-নীরবতার মধ্যে এবার যুবক শিক্ষকের মনে হয়, বিভীষিকাময় যে-অবাস্তব জগৎ থেকে সে মুক্তি পেয়েছে বলে কল্পনা করেছিল, সে-অবাস্তব জগৎই তার চারধারে পূর্বের মতোই তাকে ঘিরে আছে। গভীর হতাশার সঙ্গে সে ভাবে, সত্যিই সে কিছুই জানতে চায় নাই। এখনো সে জানতে চায় না। কাদের যদি তাকে তার বন্ধুত্বের সামান্য প্রমাণ দিত তবে ভাঁড়ামির কোনো প্রয়োজন বোধ সে করত না। কাদের কি বুঝতে পারে না বন্ধুত্বের জন্যে তার মনের এ তীব্র আকাঙ্ক্ষা? পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে কাদেরেরই, তবু তার সংসাধনকার্যে পরম-বিশ্বাসীর মতো দ্বিরুক্তি না করে তাকে কি সে সাহায্য করে নাই? কিন্তু শুধু বিশ্বাসেই দিন কাটানো যায় না। কিছু পরিষ্কারভাবে না জেনে একাকী সে-ভার কী করে সে বহন করে? সে-ভার ক্রমশ আরো দুর্বিষহ হয়ে উঠবে।

কেমন কঠিন গলায় কাদের হঠাৎ ডাকে, "মাস্টার!"

এ-নামে সে যুবক শিক্ষককে কখনো ডাকে নাই। বস্তুত আজ পর্যন্ত কোনো নামেই সে তাকে সম্বোধন করে নাই। চমকিত হয়ে সে কাদেরের দিকে তাকায়। তবে সেখানে বন্ধুত্বের ক্ষীণতম আভাস সে দেখতে পায় না।

তারপর এক মুহূর্তের জন্যে কাদেরের চোখ যেন ঝলকে ওঠে। পূর্ববৎকণ্ঠে সে আবার বলে, "আপনার মতলব কী?"

প্রশ্নটি যেন আকাশ থেকে পড়ে, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো। তার মতলব? বিস্ময়ের ধমকটা কাটলে সে অনুচ্চস্বরে বলে, "আমার মতলব?"

কাদের তার প্রশ্নের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করে না বলে নীরব হয়ে থাকে। কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হয়, সে যুবক শিক্ষকের কাছে এটি অর্থপূর্ণ উত্তর আশা করে।

যুবক শিক্ষক কোনো উত্তরই খুঁজে পায় না। কাদেরের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নটি তাকে যে-ব্যথা দিয়েছে, কেবল সে-ব্যথাই সে অনুভব করে। অনেক ভেবেও প্রশ্নটির যথার্থ কোনো কারণ

দেখতে পায় না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে কাদের একবার এক পলকের জন্যে চোখ খুলে যুবক শিক্ষকের দিকে তাকায়। তারপর আবার প্রশ্ন করে, "ডাকাডাকি করতে শুরু করছেন কেন?"

নুতন প্রশ্নটিও যুবক শিক্ষক নীরবে শোনে। অতি সহজবোধ্য প্রশ্ন, তবু তারও অর্থ সে বুঝতে পারে না। তবে পূর্বের প্রশ্নের মতো এ-প্রশ্নটিও তাকে আঘাত দেয়। না, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের পুল তো পড়েই নাই, বরঞ্চ তারা প্রশস্ত নদীর দু-পাড়ে দাঁড়িয়ে। পাশে বসে থাকা কাদেরের চেহারাটা হঠাৎ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। না, এ-লোকটিকে সে চেনে না।

একটু পরে দুর্বলকণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "ডেকেছি এ কারণে যে আমি কিছুই বুঝতে পারি না।"

একটু ভেবে কাদের প্রশ্ন করে, "কী বুঝতে পারেন না?"

যুবক শিক্ষকের দুর্বলকণ্ঠের ওপর দিয়ে হঠাৎ দম্‌কা হাওয়া বয়ে যায়। সজোরে মাথা নেড়ে সে উচ্চস্বরে বলে, "কিছুই বুঝতে পারি না।"

এই কথার পুনরাবৃত্তিতে কাদের সন্তুষ্ট হয় না। তার মুখে বিরক্তির ভাব দেখা দেয়। কণ্ঠেও সে বিরক্তি প্রকাশ পায়।

"কী বুঝতে পারেন না?"

যুবক শিক্ষক এবার বিহ্বল হয়ে পড়ে। সে যেন শক্ত ফাঁদে পড়েছে, যে-ফাঁদ থেকে সে অক্ষতদেহে বের হতে পারবে না। কিছুক্ষণ আগে যার সঙ্গে সে একটা বন্ধুত্বের সম্ভাবনা কল্পনা করে কেবল তার উপস্থিতিতেই সুখবোধ অনুভব করতে শুরু করেছিল, সে-ই তাকে এ-ফাঁদে ফেলেছে। সে বন্ধু না হোক, শত্রু হবে কেন? না, তাকে কিছুই বলা যায় না। যা সে বুঝতে পারে না তা যেন অতি মূল্যবান। তা ব্যক্ত করা যায় না। একটু হাওয়া লাগলেই তা ভেঙে যাবে।

"কথা বলছেন না কেন?"

আবার কাদেরের কঠিন গলা তার কর্ণগোচর হয়। এবার তার গলায় সে বিচলিত হয় না। কাদেরের প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনোই প্রয়োজন সে বোধ করে না। কাদের তার সঙ্গে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার অন্তরটা অভিমান-ক্রোধে জমে যায়।

নাকে বিরক্তি-ক্রোধের আওয়াজ করে কাদের এবার চুপ হয়ে যায়। তাকে ডেকে পাঠিয়ে যুবক শিক্ষকের এ অদ্ভুত ব্যবহার তার কাছে অর্থহীন মনে হয়।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর কাদেরের মনোভাবে হয়তো কিছু পরিবর্তন হয়। যুবক শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে সে আস্তে বলে, "শোনেন।"

যুবক শিক্ষক যে শোনবার জন্যে তৈরি তার কোনো প্রমাণ না পেলেও একটু থেমে আবার বলে, "মানুষের জীবনটা অতি ভঙ্গুর। একটুতেও মট্‌কে যায়।"

এ-গভীর দার্শনিকোচিত উক্তিটি যুবক শিক্ষকের কানে গেল কি গেল না, তা বোঝা যায় না। সে তেমনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। একটু থেমে কাদের আবার বলে, "একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, কী আর করা যায়? ডাকাডাকি করে আর লাভ কী?"

এবারও যুবক শিক্ষক নির্বাক হয়ে বসে থাকে। কিন্তু ক্রমশ তার বসে থাকার ভঙ্গিতে পূর্বের অভিমান-ক্রোধের কঠিনতা যেন মিলিয়ে যায়। মনে হয়, সে যেন গভীরভাবে ভাবছে। এমন একটা নিগূঢ় কথা যার রহস্য ভেদ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তারই রহস্য ভেদ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। না, ঠিক তা নয়। একটি কথা তার মাথায় ঢোকবার চেষ্টা করছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সে-কথাটি তার চেয়েও বেশি শক্তিবান। তাকে ঠেকাবার চেষ্টায় সে কেবল গলদঘর্ম হয়ে ওঠে।

সে-কথাকে ঠেকানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। যে-টুকু শক্তি ছিল সে-শক্তিও নির্বিবাদে অন্তর্ধান করেছে। কী দিয়ে সে তার সঙ্গে লড়াই করবে? লড়াইর ছলনা পরিত্যাগ করতেই

গভীর অবসাদে তার দেহমন ভরে ওঠে।

বাইরে উঠানে মৃদু আলোর আভাস দেখা দিয়েছে। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে সেদিকে একবার অকারণে তাকিয়ে কাদের কেমন হৃদ্যতার সঙ্গে বলে, "বুঝলেন?"

যুবক শিক্ষক সবই বোঝে। প্রথম থেকেই সে সব কথা বুঝেছিল, কিন্তু মন স্বীকার করতে চায় নাই। ঘটনার নৈকট্যে তা না বুঝে উপায় ছিল না, কিন্তু কিছু সময় পেরিয়ে গেলে কথাটা মন আর মানতে চায় নাই। তারপর থেকে সে সত্যকে এড়াবার জন্যে বাঁদরের মতো কল্পনার গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ঝুলে-ঝুলে বেড়াচ্ছে। সত্যটি গ্রহণ করা কি এত সহজ? একবার গ্রহণ করলে চিরকালের জন্যে জীবনে একটা ফাটল ধরবে না? তারপর কি পৃথিবী সে-ই পৃথিবী থাকবে?

"বুঝেছি।" অকস্মাৎ ঘন-ঘন মাথা নেড়ে যুবক শিক্ষক বলে।

বোঝা কি অতই শক্ত ব্যাপার? বোঝা-না-বোঝার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। চুলের মতো সরু সীমারেখার ওপারেই সত্য। এধারে আশা-ভরসা, ওধারে হতাশা-নিরাশা। পা বাড়ালেই ওধারে চলে যাওয়া যায়, তবু সে-সীমারেখা সে অতিক্রম করতে চায় নাই। সীমারেখাটি যাতে অতিক্রম করতে না হয় তার জন্যে সে কাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে, তাকে অশেষ গুণাগুণেও আবৃত করেছে যাতে সে-প্রয়াসে সে সফল হয়।

আবার ঘন-ঘন মাথা নেড়ে যুবক শিক্ষক আপন মনে বলে, "কেন বুঝব না? আপনি আমার আত্মীয়-কুটুম্ব বা দোস্ত মানুষও নন, বুঝতে বাধা কী?" শুধু তা-ই নয়, তার সঙ্গে যুবক শিক্ষকের পরিচয়ও ছিল না। মুখ দেখাদেখি হয়েছে বটে, কিন্তু কখনো কথার আদান-প্রদান হয় নাই। তবু কথাটা সে বিশ্বাস করতে চায় নাই। আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু মানুষ না হোক, পরিচয়ও না থাক, একটি মানুষের সম্বন্ধে এমন কথা বিশ্বাস করা কি সোজা?

যুবক শিক্ষকের আচরণে কাদেরের স্থৈর্য একটু টলে ওঠে যেন। ইতস্তত করে সে বলে, "কী বুঝেছেন!"

"বুঝেছি, বুঝেছি।" আবার যুবক শিক্ষক দ্রুতভাবে মাথা নেড়ে বলে, কণ্ঠে এবার কোনো দুর্বলতার চিহ্ন নাই। সে এ-কথা বুঝে তৃপ্তি পায় যে, বঞ্চনার আঘাতের ফলে মনে যে একটি অসহনীয় তিক্ততার ভাব এসেছিল, সে-ভাব এখন ক্রোধে চাপা পড়েছে। এখন ক্রোধ দাউ-দাউ করে জ্বলছে, এবং সে-ক্রোধে সে গভীর তৃপ্তিই পায়। বারবার একটি কথা মনে পড়ে, বারবার সে-ক্রোধ ফুঁসে ওঠে। কী দুঃসাহস! যাকে কাদের হত্যা করেছে, তার দেহ নদীতে ফেলবার জন্যে তারই সাহায্য নিতে তার একটু দ্বিধা হয় নাই? বুকে কত সাহস! শীর্ণদেহ যুবক শিক্ষক আগুনের লেলিহান শিখায় যেন দীর্ঘকায় হয়ে ওঠে, তার রক্তহীন শুষ্ক মুখ যেন অত্যুজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। না, শুধু দুঃসাহস নয়। অন্য মানুষের প্রতি কী অবজ্ঞা! যুবক শিক্ষক যেন তুচ্ছ কীটপতঙ্গ। এত ক্রোধ সত্ত্বেও যুবক শিক্ষক নিষ্কম্পকণ্ঠে বলে, "আপনার সাহসের সীমা নাই।"

কাদের কথাটি বুঝবার চেষ্টা করে। তারপর কী বুঝে উত্তর দেয়, "ভয় পেলে মানুষ কী না করে? মানুষের গলার আওয়াজ পেলে জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। বললাম না দুর্ঘটনা? দুর্বল সুতায় জীবন বাঁধা। জীবন কী?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না। মনে হয় কাদেরের কোনো কথা তার শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করতে রাজি নয়। তার কথার কি আর কোনো মূল্য আছে?

তার মানসিক অবস্থা দেখে কাদেরের মনে এবার হয়তো কিছু ভয়ের সঞ্চার হয়। তার এ বিচিত্র আচরণের কোনো অর্থই খুঁজে পায় না। কিন্তু যুবক শিক্ষককে আর কী বলবে? সে নীরব হয়ে থাকে।

ক্রোধ অবশেষে উপশমিত হলে যুবক শিক্ষক কতক্ষণ নিঃস্ব বোধ করে। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বলে, "যান, বাড়ি যান।" কাদেরের উপস্থিতিতে সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছে।

কাদের যাবার কোনো লক্ষণ দেখায় না। তাকে একটু অন্যমনস্ক মনে হয়। তারপর হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে কথা বলতে শুরু করে। অনেকটা আপন মনেই। তাছাড়া, কেমন ইশারা-ইঙ্গিতেই বলে যেন। মনের কথা খুলে বলার তীব্র ইচ্ছা বোধ করলেও সব খুলে বলতে যেন বাধে। হয়তো যা বলে তার অর্থ সে নিজেই বোঝে না। প্রথমে সে আশ্বিন মাসের কথা বলে। কেন সে মাসের কথা বলে তা প্রথমে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু একটু নীরব থেকে কথাটি বোধগম্য করে। আশ্বিন মাসেই যুবতী নারীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

যুবক শিক্ষক তার কথা শুনেও শোনে না। শুনে লাভ কী? যে-কথাটি সে জানতে পেরেছে তারপর আর কোনো কথা জানার প্রয়োজন সে বোধ করে না। যে-কলুষতা সে সমগ অন্তরে সমগ্র দেহে বোধ করে সে-কলুষতা কোনো কথায় কি কাটবে? তাছাড়া, কাদেরের কণ্ঠস্বর তাকে পীড়া দেয়।

আশ্বিন মাসের কথাটার উল্লেখ করেই চার মাস ডিঙিয়ে কাদের সেদিনের বাঁশঝাড়ের ঘটনায় এসে পৌঁছায়। হয়তো সে চার মাসে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই, ঘটলেও তার আর কোনো মূল্য নাই। বাঁশঝাড়ের কথা বলতে-বলতে তার বলার ভঙ্গিটা কিছু সাবলীল হয়ে ওঠে।

শীঘ্র তাকে বাধা দিয়ে যুবক শিক্ষক আবার বলে, "যান, বাড়ি যান।"

এবার নীরব হয়ে কাদের কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর কালো মুখে কিন্তু সহিষ্ণুকণ্ঠে বলে, "ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছি।"

এ-উক্তিটা যুবক শিক্ষকের অসহ্য মনে হয়। কী তাকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছে? যে-কথাটি জানতে চায় নাই বা বিশ্বাস করতে চায় নাই, সে কথা সে-জানতে পেরেছে। তারপর বাকি সব কি অর্থহীন নয়? কাদের যে-কথা এখনো পরিষ্কারভাবে বোঝে নাই, সে-কথাই সে এবার তাকে বলে।

মুহূর্তের মধ্যে কাদেরের মুখে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে সে কতক্ষণ যুবক শিক্ষকের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবশেষে সে প্রশ্ন করে, "আপনি জানতেন না?"

যুবক শিক্ষক উত্তর না দিলেও শীঘ্র কাদেরের মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে ওঠে, তার স্বাভাবিক গভীর স্থৈর্য ভীষণভাবে টলে ওঠে। সে যে হত্যাকারী সে-কথা যুবক শিক্ষক জানত না? এবং সে-কথা সে নিজেই তাকে বলেছে?

যুবক শিক্ষক এবার চিৎকার করে ওঠে, "যান যান।" তার মনে হয়, কাদেরের দেহ থেকে কলুষতা সমাপ্তিহীন ধারায় তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে, আর তার উপস্থিতি সহ্য করা অসম্ভব।

কাদের আপন ভাবনায় নিমজ্জিত হয়ে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। এক সময়ে আর দ্বিরুক্তি না করে সে উঠে চলে যায়। সে কোনোদিকে তাকায় না।

বাইরে উঠানে তখন সূর্যের প্রথম সোনালি রশ্মি পড়েছে, দূরে মাঠে কুয়াশাও জমতে শুরু করেছে। যুবক শিক্ষক বোধ করে তার গলা-মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। অত্যধিক তৃষ্ণায় তার ভেতরটা যেন জ্যৈষ্ঠের রোদপোড়া মাঠের মতো চড়চড় করে।

ঘরের কোণে সুরাহিতে শীতল পানি। কিন্তু সে নড়ে না।

আপন মনে সে প্রশ্ন করে, অবশেষে সে কি অবাস্তব জগৎ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে?

বাস্তব জগতে সে যদি প্রত্যাবর্তন করে থাকে, তবে সেখানেও অতৃপ্তির জ্বালার শেষ নাই যেন।

নয়

রবিবার সকাল। বেলা ন'টার দিকে যুবক শিক্ষককে আসতে বলে দাদাসাহেব নিচের তলার বারান্দায় খোলা জানালার পাশে রোদে পিঠ দিয়ে বসেন। হাতে তসবি, মুখভাব গম্ভীর। একটু পরে পায়ের মৃদু শব্দ শুনতে পেলে সেদিকে না তাকিয়ে বলেন, "বসেন।"

অদূরে হাতল-ছাড়া কাঠের চেয়ারে সঙ্কুচিত হয়ে যুবক শিক্ষক বসে, মনে অস্বচ্ছন্দতা। কেন তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন? গত ক'দিনে শিক্ষকতার ব্যাপারে তার কোনো গাফিলতি হয়েছে কি? বা তার বিসদৃশ আচরণ-ব্যবহারের খবর তাঁর কাছে পৌঁছেছে কি? এসব ব্যাপারে তিনি যদি প্রশ্ন করেন তবে সে কী বলবে? সকালবেলা কাদেরের মুখে সত্য কথাটি জানবার পর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে তার দেরি হয় নাই। কিন্তু পরে আরেকটি কথা সে বুঝতে পারে। সে-কথাটি ভেবে দেখা দরকার। না, গত ক'দিনের কথা দাদাসাহেবকে বলবার জন্যে এখনো সে তৈরি নয়।

অবশেষে দাদাসাহেব গলা সাফ করেন। তারপর অস্পষ্টকণ্ঠে যুবক শিক্ষককে তার বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করেন। শ্রদ্ধাভরে সেও একটি উপযুক্ত উত্তর দেয়।

সামান্য নীরবতার পর দাদাসাহেব পুনর্বার গলা সাফ করেন। তারপর তসবিতে তাঁর আঙ্গুল সঞ্চালন থেমে যায়।

"আমার ছোটভাই কাদের মিঞার সঙ্গে আপনার নাকি দেখাসাক্ষাৎ হয়। শুনে বড়ই খুশি হলাম।"

তিনি বলেন না যে আজ সকালে ওপরের জানালা দিয়ে কাদেরকে যুবক শিক্ষকের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে স্বচক্ষে দেখেছেন। কাদেরকে কেমন রাগান্বিত মনে হয়েছিল। দু-জনের মধ্যে অকস্মাৎ এই মেলামেশার কারণ কী, যুবক শিক্ষকের ঘর থেকে এমন রাগান্বিতভাবে সে বেরিয়ে আসবেই-বা কেন? ক'দিন আগে কাদেরের বিচিত্র দৃষ্টির কথা এখনো তিনি ভোলেন নাই।

গভীর বিশ্বাস-ভরা কণ্ঠে—যে কণ্ঠ সম্পূর্ণ খাঁটি মনে হয় না, তিনি আবার বলেন, "তার ভাবসাব সাধারণ মানুষের মতো নয়।" সামান্য ইতস্তত করে কথাটা বলেই ফেলেন। "একটু দরবেশী ভাব আছে তার মধ্যে।"

যুবক শিক্ষক নত মাথায় তাঁর কথা শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। কাদেরের বিষয়েই তিনি যে তাকে ডেকে পাঠাবেন, সে-কথা সে ভাবে নাই। হয়তো এখন সে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে প্রস্তুত নয় বলেই সে-কথাটি ভাবতে পারে নাই। না, এই মুহূর্তে কিছু বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাঁশঝাড়ের সত্যটি সে জানতে পেরেছে বটে কিন্তু সে-সত্যটি যেন অতিশয় নগ্ন। বস্তুত, তা এত নগ্ন যে তাতে না আছে সম্পূর্ণ সত্য, না আছে তার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর। সব কথা জানার আগে তার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

দাদাসাহেবকে একটু অপ্রস্তুত মনে হয়। তাঁর পক্ষেও কাদেরের কথা তোলা সহজ হয় নাই। তিনি বড়বাড়ির মুরুব্বি। বয়স বা আত্মীয়তার ধরন যাই হোক, সে-বাড়ির প্রত্যেক বাসিন্দার প্রতি তিনি যে শুধু একটি গভীর দায়িত্ব বোধ করেন তা নয়, তাদের সঙ্গে একটা আন্তরিক যোগাযোগও বোধ করেন। কোথায় কার দোষত্রুটি, কোথায় কার গুণ বা গুণের সম্ভাবনা, সে-সব তাঁর অজ্ঞাত নয়। এমনকি প্রত্যেকের হৃদয়ের কথাও তিনি জানেন বলে তাঁর বিশ্বাস। এ-বিষয়ে কেবল কাদেরের ক্ষেত্রেই একটা ব্যতিক্রম বোধ করেন। সে-জন্যে এবং তার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার শেষ নাই বলে অনাত্মীয়ের সামনে তার কথা তোলা তাঁর পক্ষে সহজ নয়।

যুবক শিক্ষক নীরব হয়ে থাকলে তিনি এবার অনিশ্চিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "আপনাদের মধ্যে কী আলাপ হয়?"

যুবক শিক্ষক ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে একবার তাকায়। বর্তমান মানসিক অবস্থার জন্যে প্রশ্নটি সরলভাবে গ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কাদের যে দরবেশ সে-বিশ্বাসটি তাঁর মনে কি এতই দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে তিনি তার প্রমাণের জন্যে এমন উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন, না তার সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?

কারণ যা-ই হোক, তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে এখন সত্যিই সম্ভব নয়। তার মনে সন্দেহ নাই, শীঘ্র তাঁকে বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি বলতে হবে, কিন্তু যে-নগ্ন সত্যটি আজ সকালে সে জানতে পেরেছে, তাতে সে তৃপ্ত নয়। যে-ঘটনাটি তার মনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, নিঃসন্দেহে সে-ঘটনাটির রহস্য ঘুচেছে : নানাপ্রকার কল্পনা-অনুমানের জটিল জাল থেকে মুক্তি পেয়ে তা একটি স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে। তবু কাদেরের মুখে যা জানতে পেরেছে, তা একটু ভেবে দেখতেই তার মনে এ-ধারণা জন্মে যে, এখনো সব কথা জানা হয় নাই। বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে জানার পূর্বে দাদাসাহেবকে এমন একটি নিদারুণ কথা কী করে বলে?

আজ সকালে কাদের স্বীকার করেছে, সে-ই যুবতী নারীর হত্যাকারী। তবে সেটি ঠিক হত্যা নয়, একটি দুর্ঘটনা। বাঁশঝাড়ের বাইরে যুবক শিক্ষকের পদধ্বনি এবং পরে তার গলার শব্দ শুনতে পেলে হঠাৎ ভয়ে দিশেহারা হয়ে সে যুবতী নারীর গলা টিপে ধরেছিল। হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, তার মুখের আওয়াজ বন্ধ করার জন্যে। মুখ না ঢেকে গলা টিপে ধরেছিল কেন সে তা বলতে পারে না : তখন তার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল না। আসল অপরাধী সে-সংজ্ঞাবুদ্ধিগ্রাসী মারাত্মক ভয়। সে-নিদারুণ ভয়ের কারণ কী? তার পরিবারের সুনাম। এককালে যে-পরিবারের এত নামডাক ছিল, সে-পরিবারের আজ আগের মতো ধন-দৌলত না থাকলেও ধার্মিকতা দান-দয়া-নিষ্ঠার জন্যে এখনো অনেক সুনাম। কাদের সে পরিবারেরই মানুষ। যে-পরিবার নিষ্কলঙ্কভাবে দীর্ঘদিন সুনামের সৌরভ ছড়িয়েছে, তার সে-সুনামে কলঙ্কের ছাপ বসাতে কার বুকে সাহস হয়? কথাটা অবিশ্বাস্য ঠেকে না।

কাদের যখন বুঝতে পারে একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, তখন সে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু অল্পদূর যাবার পর তার মনে একটা সন্দেহ জাগে : সত্যই কি কোনো মানুষের শব্দ সে শুনেছিল? শীতের এমন গভীর রাতে কে আসবে বাঁশঝাড়ে? যুবতী নারীর স্বামীর কথাই কেবল তার মনে আসে কিন্তু সে যে গ্রামে নাই সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত। সে কি ভুলবশত এমন মর্মান্তিক কাণ্ড করে বসেছে?

কথাটা পরখ করে দেখবার জন্যে নির্বোধের মতো সে বাঁশঝাড়ের সামনে এবার ফিরে আসে। পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে এধার-ওধার চেয়ে দেখে, কেউ কোথাও নাই। এমন সময় সে যুবক শিক্ষককে বাঁশঝাড় থেকে দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসতে দেখে। সে যেন তারই দিকে তাকিয়ে। শুধু তাই নয়। সে তারই দিকে আসছে। পালাবার কোনো সময় নাই, মুক্তস্থানে গা-ঢাকা দেবারও কোনো উপায় নাই। কাঠের পুতুলের মতো হতভম্ব হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে তার উপস্থিতির একটা কৈফিয়ৎ বের করার চেষ্টাও করে কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য কোনো কৈফিয়ৎ খুঁজে পায় না। তারপর যুবক শিক্ষক তার সামনে এসে দাঁড়ায় কিন্তু সে কোনো প্রশ্নই করে না। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে পালিয়ে যায়। সে যেন ভূত দেখেছে।

এবার কাদের দুটি কথা বুঝতে পারে। প্রথমত, যুবতী নারী যে এখনো বেঁচে থাকতে পারে সে-কথা আশা করা বৃথা। দ্বিতীয়ত, সে-ই যে হত্যাকারী সে কথা যুবক শিক্ষক জানে। বস্তুত, তাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মাঠে-ঘাটে ছুটাছুটি করতে দেখলে সে-বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। তবু কথাটা সামনাসামনি একবার যাচাই করে দেখবার জন্যে পরে সে তারই ঘরে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে সে একটি অতি ভীত-বিহ্বল, বাকশূন্য মানুষ দেখতে পায়। সন্দেহের কোনোই অবকাশ থাকে না।

এ-বিবৃতিতে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই : নিঃসন্দেহে তার প্রতিটি শব্দ সত্য। প্রথম রাতের

বিবরণটি এতই নিখুঁত যে তাতে কোনো ছিদ্র নাই, প্রশ্ন-জেরার স্থান নাই। অস্পষ্টতা দেখা দেয় দ্বিতীয় রাতের বিবরণে।

যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ফেলার ব্যাপারে কাদের যুবক শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল কেন? কথাটির কোনো ব্যাখ্যা কাদের দেয় নাই। তখন প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করে নাই বলে যুবক শিক্ষকও তাকে সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন বিষয়টির ব্যাখ্যা শিক্ষকের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়। চারটি সম্ভাব্য উত্তর তার দৃষ্টিগোচর হয়। এক—বাঁশঝাড়ের ঘটনার পর কাদেরের মনে নিশ্চয়ই গভীর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হয়তো একটি ঘোরতর পাপ-বোধে সে জর্জরিত হয়ে পড়ে। তখন একটি বিচিত্র যুক্তির সাহায্যে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যুবক শিক্ষক মৃতদেহটির বহনকার্যে অংশগ্রহণ করলে সে-পাপের খানিকটা তার মধ্যে স্থানান্তরিত হবে। দুই—তার এই বিশ্বাস হয় যে, যুবতী নারীর মৃত্যুর সঙ্গে যুবক শিক্ষক জড়িত, কারণ বাঁশঝাড়ে সে উপস্থিত না হলে দুর্ঘটনাটি ঘটত না। অতএব দেহ-বহনকার্যে সাহায্য করা তার কর্তব্য। তিন— যুবতী নারীর মৃত্যুর কথা যুবক শিক্ষক ছাড়া অন্য কেউ জানে না। পরদিন সে কথাটা প্রকাশ করে নাই সত্য কিন্তু ভবিষ্যতে করবে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। দেহটির বহনকার্যে তার কাছ থেকে একবার সাহায্য আদায় করতে পারলে তার মুখ বন্ধ করা সহজ হবে। দুর্বলচিত্ত লোকটি সাহায্য করতে রাজি না হতে পারে, সে-সম্ভাবনা নিশ্চয়ই কাদেরের মনে জেগেছে। হয়তো সে-ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার ফিকির-ফন্দিও সে ভেবে নিয়েছিল। হয়তো তাকে ভয় দেখাত বা কোনো প্রকারে তার হৃদয় গলাবার ব্যবস্থা করত। কিন্তু কাদেরকে কিছুই করতে হয় নাই। দু-একবার ডাকতেই সে বিনাবাক্যে তার অনুসরণ করে। চার—ভয়াবহ কাজটি একা করতে সাহস পায় নাই। কাজটি একাকী সম্পন্ন করার লাভ নিশ্চয়ই তার চোখে পড়েছে। যুবক শিক্ষকের অগোচরে দেহটি একবার অদৃশ্য হয়ে গেলে সে কোনো অভিযোগ আনলেও সাক্ষীর অভাবে তা প্রমাণ করতে পারবে না। কিন্তু নির্জন রাতে বাঁশঝাড়ে একটি যুবতী নারীর সঙ্গে মিলিত হওয়া এক কথা, গভীর রাতে তার মৃতদেহটি বহন করা অন্য কথা। সে স্বভাবজাত খুনী-ডাকাত নয়।

ভীতি, স্বার্থপরতা, দুরভিসন্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য-অনুপ্রাণিত এর কোন্‌টি সত্য?

আরেকটি কথাও কুজ্‌ঝটিকাবৃত মনে হয়। কী কারণে কাদের দেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে? আজ সকালে সে-বিষয়টি সে স্পর্শই করে নাই।

হত্যাকাণ্ডের জের টানা বিপজ্জনক। দেহটি নিশ্চিহ্ন করার প্রয়োজনটা কি তার কাছে এতই জরুরি মনে হয়েছে যে সে দ্বিতীয় রাতে বিপজ্জনক কাজটি করতে দ্বিধা করে নাই? হয়তো পাপের ফল সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য না-হয়ে-যাওয়া পর্যন্ত পাপী মনে শান্তি পায় না। এ-কথা যদি সত্যি হয় তবে কাদেরের চোখে যে-ব্যাপার একটি দুর্ঘটনা হিসেবে শুরু হয়েছিল, সেটি আর দুর্ঘটনা থাকে নাই, শীঘ্রই তা পাপে পরিণত হয়।

আজ সকালে ঘটনাটির নির্মম সত্য জানার পর যুবক শিক্ষকের মনে হয়েছিল : আর কোনো কথা জানার প্রয়োজন নাই। কিন্তু দেখতে-না-দেখতে নূতন অনেক প্রশ্ন তার মনে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাদেরের গুরুতর অপরাধের কথা প্রকাশ করা তার কর্তব্য। কিন্তু কর্তব্যটির সঙ্গে একটি গভীর দায়িত্ব জড়িত মনে হয়। অপরাধটি প্রকাশ করা অতি সহজ কিন্তু সব কথা না জেনে কী করে সে তা প্রকাশ করে? তার মনে হয়, অপরাধের গুরুত্ব অপরাধের ফলের উপরই নির্ভর করে না। একটি যুবতী নারীর খুন অতি গুরুতর ব্যাপার। তারই ওজনে অপরাধ মেপে দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু দুটির ওজন সমান না-ও হতে পারে। সব কিছু না বুঝে কথাটা প্রকাশ করলে কর্তব্যপালন হবে কিন্তু তাতে দায়িত্বহীনতাও প্রকাশ পেতে পারে।

তাছাড়া, সর্বপ্রথম তাকে ঘটনাটি পুরাপুরিভাবে বুঝতে হবে। সামাজিক কর্তব্যপালনের চেয়ে সেটাই তার কাছে বড় মনে হয়। অপরাধী কে সে কথা সে জানতে পেরেছে,

কিন্তু অপরাধের অর্থ এখনো সে বোঝে নাই।

যুবক শিক্ষককে চুপ করে থাকতে দেখে দাদাসাহেব কিছু বিস্মিত হন। তাঁর মনে হয়, দরবেশীর কথাটা তুলে তিনি ভুল করছেন। যুবক শিক্ষক হয়তো সে-কথা বিশ্বাস করে না বলে কী উত্তর দেবে তা ভেবে উঠতে পারছে না। সে-বিষয়ে তাকে নিশ্চিত করার জন্যে এবার তিনি বলেন, "কাদের একা একা থাকে। আপনার সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করেছে দেখে মনটা খুশি হয়েছে।" তাদের মধ্যে কী আলাপ-আলোচনা হয় সে-বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্যের কথা তিনি এবার উল্লেখ করেন না। একবার বলেছেন, দু-বার বলতে পারেন না। তারপর তাঁর মুখে একটি কৌতূহলশূন্যতার ভাব জাগে। সেটা কৃত্রিম মনে হয়।

হঠাৎ যুবক শিক্ষক মাথা তুলে বেদনার্ত দৃষ্টিতে দাদাসাহেবের দিকে তাকায়। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলে সে ইতস্তত করে দৃষ্টি নাবিয়ে অস্ফুট গলায় বলে, "বেআদবি মাফ করবেন কিন্তু আজ কিছু বলতে পারব না।"

দাদাসাহেব এবার তাঁর বিস্ময় ঢাকবার চেষ্টা করেন না। তার উক্তিটা বুঝবার চেষ্টা করে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "কী কথা বলতে পারেন না?"

যুবক শিক্ষক চোখ না তুলে কয়েকবার কেবল ঘন-ঘনভাবে মাথা নাড়ে। দাদাসাহেবের দিকে তাকাতে বা তাঁকে আর কিছু বলতে তার সাহস হয় না। নিজের দৃষ্টিতে এবং কণ্ঠে সে-বিশ্বাস যেন হারিয়েছে। তার মনে হয়, আজ কিছু বলতে পারবে না এ-কথা বলেই সে ইতিমধ্যে অনেক কথা বলে ফেলেছে।

দাদাসাহেব আর কিছু বলেন না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বারান্দা অতিক্রম করতে শুরু করেন। তাঁর খড়মের আওয়াজ আজ কেমন বেসুরো মনে হয়।

শঙ্কিত হয়ে যুবক শিক্ষক বোঝে, তার হাতে সময় আর বেশি নাই।

দশ

অপরাহ্ণে সামনের উঠানে ছেলেমেয়েরা শোরগোল করে খেলা করে। দাদাসাহেব বাড়িতে নেই। সম্ভবত তাঁর পীরের সঙ্গে দেখা করতে শহরে গেছেন।

চৌকিতে লম্বা হয়ে শুয়ে থেকে যুবক শিক্ষক এক সময়ে হঠাৎ উঠে বসে। শোরগোলটা যেন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠেছে। পাম্প-সু পায়ে দিয়ে সবুজ আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সে দ্রুতপদে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করে। মেঘহীন আকাশে নিরুত্তপ্ত সূর্যের মধুবর্ষী সোনালি আলো। হাওয়া নেই বলে নিশ্চলতা, তবু চতুর্দিকে আলো আর রঙের নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড়। সেদিকে যুবক শিক্ষকের দৃষ্টি নাই। তারপর নদীর তীরে পৌঁছে সে অনিশ্চিতভাবে থামে। নদীর নিস্তেজ মসৃণ ধারায় এবং ওপারে কাশবনের শুভ্র বিন্যাসেও সোনালি আভা। এ-সবও সে দেখে না। তার নিদ্রা-তৃষ্ণার্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একটি তীব্র আশায় জ্বলজ্বল করে। কোথায় সে যেন আলো দেখতে পায় : তার প্রশ্নের একটি উত্তর যেন আলিঝালি চোখে পড়ে। তার সম্পূর্ণ রূপ দেখবার জন্যে সে অধীর হয়ে ওঠে। অনিশ্চিতভাবে থেমে পড়ে সে দাঁড়িয়েই থাকে।

সারা দুপুর একটি কথাই তার মনে বারেবারে ঘোরে : কী কারণে কাদের দেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে? সে এ-কথার কোনো সন্তোষজনক উত্তর এখনো পায় নাই। আসল সত্য জেনেও যা সে জানতে পারে নাই, তা সে-উত্তরের মধ্যেই পাবে তাতে তার সন্দেহ নাই। সে-উত্তরটা হাতের নাগালে এসেছে। কেন কাদের বিপজ্জনক কাজটি করতে তৈরি হয়? হাতুড়ি দিয়ে প্রশ্নটিকে সে যেন বার বার পেটায়। তাতে যে স্ফুলিঙ্গ জাগে, সে-স্ফুলিঙ্গ তার চোখেও প্রতিফলিত হয়।

যুবক শিক্ষক অনেক কথাই নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। অকস্মাৎ অন্ধ ভয় হলে বুদ্ধি-

বিবেচনাশক্তি হারিয়ে একটি মানুষ অন্য একটি মানুষের জীবন নিতে পারে। যত বীভৎস হোক, তবু সেটা দুর্ঘটনা বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। সে-কথা যুবক শিক্ষক সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছে। এ-কথাও সে স্বীকার করে, জীবন অতি ভঙ্গুর! জীবন দুর্বল সুতায় বাঁধা। সামান্য অসাবধানতায় জীবনাবসান হতে পারে। কিন্তু কাদের কী কারণে দ্বিতীয় রাতে বাঁশঝাড়ে আবার ফিরে গিয়েছিল?

যুক্তিতে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা সে দেখতে পায়। জীবন ভঙ্গুর সে-কথা সে মানে, কিন্তু জীবনের মূল্য নাই সে-কথা সে মানে না। অন্ততপক্ষে যারা জীবনের মূল্য বোঝে, তারা যখন সে-কথা বলে তখন সে মানতে রাজি নয়। তার মনে হয়, সে-কথা মানলে জীবনের ভিত্তিই ধূলিসাৎ হবে, বেঁচে থাকার পশ্চাতে কোনো যুক্তিসঙ্গত অর্থ থাকবে না। না, জীবন মূল্যহীন নয়। অতএব কাদেরের উক্তিটি সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়; তার স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপটি ধোঁকা মাত্র।

ভয়জাত আকস্মিক দুর্বলতার কথাও গ্রহণযোগ্য। নিদারুণ ভয়ে কাদের একটি জঘন্য কাজ করেছে। কিন্তু সে-দুর্বলতা সাময়িক মানসিক অবস্থা মাত্র : বিশেষ একটি মুহূর্তে মনের একটি বিশেষ অবস্থা। কিন্তু সে সাময়িক মানসিক অবস্থা সময়-কালনিরপেক্ষ চরম সত্য বলে মেনে নিলে একটি অতীব শোচনীয় সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে হয় : মানুষ পশুর চেয়েও অধম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। সে-নিদারুণ অন্ধভীতির মুহূর্তটিই একমাত্র সত্য এবং তার পশ্চাতে বা সম্মুখে কিছু নাই, সে-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পূর্বের উক্তির মতো এ-উক্তিটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। অতএব, জীবনের ভঙ্গুরতা এবং সাময়িক মানসিক দুর্বলতা—যার অকস্মাৎ গোলযোগের ফলে একটি যুবতী নারীর জীবনাবসান ঘটে—সে-দুটির একটিও নিরালম্ব সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

যুবক শিক্ষকের চোখ ছুরির মতো ধারালো হয়ে ওঠে। তার শীর্ণ মুখেও প্রত্যাশার তীক্ষ্ণতা।

সে দৃঢ়ভাবে আপন মনে বলে, একটি মুহূর্তের কথা বলে কাদের তার চোখে ধুলা দিয়েছে। তাই সে-মুহূর্তের পেছনে সে তাকাতে পারে নাই; সে-নিদারুণ মুহূর্তে চোখ এমন ঝলসে যায় যে আর কিছু দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। পেছনে সে তাকাতে পারে নাই বলেই কাদেরের দ্বিতীয় রাতের ব্যবহারের কারণও সে বুঝতে পারে নাই।

তারপর এক সময়ে যুবক শিক্ষকের শিরা-শিরায় আঁট হয়ে থাকা মুখে হয়তো বহুদিন পরে একটা ক্ষীণ হাসির আভাস দেখা দেয়। সে বুঝতে পারে, তার সন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, সে তার উত্তর পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কাদেরের যে-চেহারা আজ প্রত্যুষে ঘৃণ্য মানুষের চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছিল, সে-চেহারাটি একটি নূতন রূপে তার মনশ্চক্ষুতে উদয় হয়। চেহারাটি একটি স্বল্পভাষী, গোপন স্বভাবের প্রেমিক মানুষের। সে-জন্যেই যুবক শিক্ষকের মুখে ঈষৎ হাসির আভাস দেখা দেয়।

কাদের তার দুষ্কীর্তির চিহ্ন ধ্বংস করবার জন্যে যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ফেলে নাই। একটি কারণেই মানুষ মানুষের অন্তিম ব্যবস্থা না করে পারে না। সে কারণ, প্রেম-ভালবাসা। যুবতী নারীর দেহটি পরিত্যক্ত জঞ্জালের মতো বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকবে সে-কথা তার অসহ্য বোধ হয়েছে। না, প্রথম রাতের সে-নিদারুণ মুহূর্তের পেছনের ইতিহাস না জানলে দ্বিতীয় রাতের ঘটনা বোঝার উপায় নাই। যে-ব্যাপারটি দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, সে-ব্যাপারটি এবার ছকে-ছকে মিলে যাচ্ছে : চিত্রটিতে আর ফাঁক নাই। এবার যুবক শিক্ষক শুধু যে দেহটি নদীতে ফেলার সিদ্ধান্তের কারণ বোঝে তা নয়, কাদের কেন তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিল সে-কথাও সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। একজন মানুষের সাহায্যের তার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল বইকি। যুবতী নারী মৃত হলেও তার দেহটি অতি প্রিয়। একাকী তা বহন করার চেষ্টা করলে তার অযত্ন-অসম্মান হত, দেহটি টানা-হ্যাঁচড়া করতে হত, প্রতি মুহূর্তে এ-কথাও স্মরণ হত যে সে আর জীবিত নাই। কাদেরকে সাহায্য করার সময় যুবক শিক্ষক যেন

দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু এখন ঘোর অন্ধকার থেকে কাদেরের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বারে বারে সে কি তাকে সাবধান হতে বলে নাই? এত সাবধানতার অর্থ কি এই নয় যে, যুবতী নারীর মৃতদেহেও একটু আঁচড় লাগবে তা তার সহ্য হয় নাই? তারপর, নদীর পাড় বেয়ে নাবতে গিয়ে যুবক শিক্ষক হুমড়ি খেয়ে পড়লে, এবং শেষ মুহূর্তে কাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম না হলে, কাদেরের মনে তার প্রতি যে তীব্র ঘৃণা জেগেছিল সে-ঘৃণাও কি যুক্তিটিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে না? না, দেহটি তার কাছে অতি প্রিয় মনে না হলে পরের সাহায্য দরকার সে বোধ করত না। শুধু দুষ্কীর্তির প্রমাণ ধ্বংস করতে চাইলে কোনোপ্রকারে নিজেই অপ্রীতিকর কাজটি সম্পন্ন করত।

একটি গভীর স্বস্তিবোধে আপ্লুত হয়ে যুবক শিক্ষক ভাবে, বাঁশঝাড়ের দুর্ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অতিশয় মর্মান্তিক কিন্তু তাতে এ-কথা প্রমাণিত হয় না যে, জীবন মায়ামমতাশূন্য নিঃসাড় প্রান্তর। দুর্ঘটনাটি অতিশয় শোচনীয়, কিন্তু সেটি মনুষ্যত্ববিবর্জিত নয়। তার বিশ্বাস প্রমাণিত হয়েছে; সে যে একটি অর্থহীন গোয়ার্তুমির জন্যেই কাদেরকে নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত বলে গ্রহণ করতে চায় নাই তা নয়। অবশ্য আজ সকালে ক্ষণকালের জন্যে কাদের সম্বন্ধে সে-অসত্য চিত্রটি সে গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু তার কারণ আকস্মিক আঘাত। আঘাতটি কাটলে কথাটি প্রত্যাখ্যান করতে তার দেরি হয় নাই।

একটি কথা ভেবে যুবক শিক্ষক কিছুটা ক্ষুণ্নই হয়। হত্যার মতো ভীষণ কথাটি কাদের দ্বিধা না করে স্বীকার করেছে, কিন্তু যুবতী নারীর প্রতি তার ভাবাবেগের কথা ইশারা-ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করে নাই। কেন? যে-ভাবাবেগের জন্যে যুবক শিক্ষক তাকে এখন ক্ষমা করতে প্রস্তুত, সে-ভাবাবেগ কি এতই লজ্জাকর যে তার ক্ষীণতম উল্লেখও তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই?

একটু ভেবে সে-বিষয়ে কাদেরের নীরবতার কারণ সে বুঝতে পারে। খাঁটি মানুষ অসঙ্কোচে দোষঘাট স্বীকার করে, কিন্তু হৃদয়ের সৌন্দর্য সহজে উন্মুক্ত করে না। তাছাড়া, সে-কথা যুবক শিক্ষককে বলবে কেন সে? ধরতে গেলে তাকে সে চেনেই না।

অপরাহ্ণ গড়িয়ে গেছে বলে সূর্যের সোনালি আভা অনুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবু এবার সেদিকে উন্মুক্তদৃষ্টিতে তাকালে যুবক শিক্ষক বিস্মিত হয়। যেন সে ভেবেছিল মেঘাচ্ছাদিত কালো আকাশ দেখবে, কিন্তু দেখে নির্মল আলোর বিচ্ছুরণ। তার মনের তমসা সত্যিই কেটেছে।

সে-আলোর দিকে তাকিয়ে শীঘ্র যুবক শিক্ষক একটি মিষ্টি-মধুর চিত্র দেখে।

কাদের বলেছিল, আশ্বিন মাস। হয়তো আশ্বিনের প্রথমাংশ, ভাপসা গরমটা তখনো কাটে নাই। নদীতে ভরা যৌবন, খাল-বিল-পুকুরও কানায়-কানায় ভরা। ছায়াশীতল পুকুরটির একটি পাড় কেমন উঁচু, যেন উদ্ধতভাবে ঘাড় তুলে দাঁড়িয়ে। সেখানে বসে কাদের। সামনে তেল-চকচকে মসৃণ ছিপ, অদূরে শান্ত পানিতে ফাত্‌নাটি স্থির হয়ে আছে। হয়তো পুকুরের অন্যধারে পানিতে ঝুলে-থাকা বৃক্ষশাখায় একটি মাছরাঙাও নিশ্চল হয়ে বসে। রৌদ্রতপ্ত আকাশে চিল ওড়ে।

ফাত্‌নার মতো আর মাছরাঙার মতো কাদেরও নিশ্চল হয়ে বসে। তার চোখ অর্ধনিমীলিত। কিন্তু তাতে কোনো নিদ্রালস ভাব নাই। থেকে থেকে কেমন একদৃষ্টিতে পুকুরের অন্যদিকে সে তাকায়। সেখানে একটি যুবতী নারী দেহ-নিমজ্জিত করে অলসভাবে পানির শীতলতা উপভোগ করে। তার সিক্ত কালো চুলে প্রখর সূর্যের প্রতিফলন, পাশে একটা লাল রঙের আঁচল ভাসে। কাদেরের দিকে সে পেছন দিয়ে থাকে বলে তার মুখটা দেখা যায় না। কিন্তু কখনো-কখনো সে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে কাদেরের দিকে তাকায়। চকিতে-দেখা তার মুখের পাশটা আর তার নীরব কটাক্ষ কাদেরকে প্রতিবার গভীরভাবে বিচলিত করে। যুবতী নারীর যৌবনদীপ্ত মুখে এখনো কৈশোরের সজীবতা, আকর্ষণময় চেহারায় নির্মল সরলতা।

তারপর যুবতী নারী অনেকক্ষণ মুখ ফেরায় না। পানির তলে ধীরে ধীরে সে চক্রাকারে

হাত নাড়ে, তাতে অতি সামান্য ঢেউ ওঠে। তাছাড়া সে স্থির হয়ে থাকে, ফাত্‌নার মতো, শাখায় মাছরাঙার মতো, কাদেরের মতো। তারপর যুবতী নারীর মুখটি দেখবার জন্যে কাদেরের মনে একটি বাসনা জাগে। সে-বাসনা ক্রমশ এত প্রবল হয়ে ওঠে যে মনে হয় উত্তপ্ত আকাশে রঙ-পরিবর্তন হয়, দিগন্তরেখায় স্বপ্নের কুয়াশা জাগে। কাদেরের অর্ধনিমীলিত চোখে ভাবাবেশ। এক সময়ে ভীষণভাবে ফাত্‌না নড়ে, কিন্তু সেদিকে তার দৃষ্টি যায় না। যুবতী নারী আর তাকায় না কেন? মাছরাঙাও নিঝুম হয়ে বসে অপেক্ষা করে।

যুবক শিক্ষক থামে। চিত্রটি তার মনঃপূত হয় না। যুবতী নারীর বাড়ির পেছনে পুকুরটা সে দেখে নাই। কিন্তু সেখানে কাদের মাছ ধরতে বসতে পারে তা সম্ভব মনে হয় না। সে-চিত্রে খুঁত।

কিন্তু তাদের প্রথম সাক্ষাতের চিত্র কল্পনা করার চেষ্টা করছে কেন সে? তাতে তার লাভ কী? আশ্বিন মাসে একদিন কোনোপ্রকারে তাদের মধ্যে দেখা হয়, তারপর তাদের মধ্যে ভাবাবেগ অনুরাগের সৃষ্টি হয় : তার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। নিজেকে সংযত করে প্লুতগতি কল্পনার রাশ ধরে।

কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়। নিজেরই অজান্তে আশ্বিনের একটি রৌদ্র-দগ্ধ অপরাহ্ণের চিত্র আবার তার মনে ভেসে ওঠে। না, কাদের পুকুরপাড়ে বসে নাই। ছিপ হাতে সে তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ পুকুরের বিপরীত অংশে স্নানরতা একটি যুবতী নারীকে দেখতে পায়। তার কালো চুলে রোদ ঝিকমিক করে, মুখটা বাষ্পাবৃত বলে তাতে বিচিত্র আকর্ষণ। থমকে দাঁড়িয়ে সে তার দিকে তাকায়। যুবতী নারীও তার দিকে তাকায়; সরল দৃষ্টিতে হয়তো একটু বিস্ময় কিন্তু কোনো নির্লজ্জতার আভাস নাই। তারপর হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে ওঠে, মুখে তার রঙ ধরে। কী বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে দু-একবার কাদেরের দিকে তাকায়, তারপর তাড়াতাড়ি পুকর থেকে উঠে সে ঘরে ফিরে যায়। চিকন শরীর, পিঠভরা কালো চুল, পরনে লাল শাড়ি। পদক্ষেপ দ্রুত হলেও জড়ানো। অদৃশ্য হবার আগে সে আরেকবার কাদেরের দিকে তাকায়। এবার দৃষ্টিতে কেমন সলজ্জিত আকাঙ্ক্ষার আভাস।

কিন্তু যুবক শিক্ষক নিজেই কি এমন একটি দৃশ্য কোথাও দেখে নাই? মনের অতল গহ্বর থেকে হঠাৎ একটি চেহারা ভেসে ওঠে। তেমনি চুল, তেমনি বাষ্পাবৃত মুখ, চোখে একটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা। তেমনি শরীর, পরনে তেমনি লালপেড়ে শাড়িও। মনে পড়ে, সেদিন যুবক শিক্ষকের অন্তরে যে-বিচিত্র ভাবাবেগের সৃষ্টি হয় তাতে সে প্রথমে অভিভূত হয়ে পড়ে। তারপর একটি অজানা ভয় এসে তাকে গ্রাস করে। মেঘশূন্য আকাশে যেন অদৃশ্য ঝড় উঠেছে : ভয়েরই কথা। কিন্তু যে-ঝড়ের নাম জানা নাই, যে-ঝড়কে দেখা যায় না, সে-ঝড়কে চেপে রাখতে হয়। সে-ঝড় তার মনে আর প্রত্যাবর্তন করে নাই।

কাদের হয়তো সে-ঝড়ে ভীত হয় নাই, তাকে থামাবার চেষ্টাও করে নাই। হয়তো যুবক শিক্ষকের মতোই তার অর্থ সে বোঝে নাই, কিন্তু তার মতো সে-ঝড় দমাবার চেষ্টা না করে বরঞ্চ তার মর্মার্থ বুঝতে চেষ্টা করে। যুবতী নারীকে কী একটা কথা বলার তীব্র ব্যাকুলতা বোধ করে যার অর্থ সে নিজেই বোঝে না। সে-কথা যেন ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

ব্যক্ত করতে পারলেও কথাটি বলা নিষেধ। যে-কথা আকাশের সূর্যচন্দ্রতারা, ধরণীর ফুললতাপাতা-দূর্বাদল বা স্রোতস্বিনী নদী নির্বিঘ্নে বলতে পারে সে-কথা বলা নিষেধ। যে-কথা হয়তো জীবন সম্বন্ধে একটি সরল কৌতূহল মাত্র, যার উৎস অজানার প্রতি মানুষের ভীতির মধ্যে, সে-কথা বলা নিষেধ। বললে ভীষণ পরিণাম নিশ্চিত : নদী নির্ধারিত ধারা পরিত্যাগ করে হয়তো মহাপ্লাবন সৃষ্টি করবে, নক্ষত্রপুঞ্জ কক্ষচ্যুত হয়ে প্রলয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলতা বিস্তার করবে, সূর্য আর উদয় হবে না। সে-ভয়াবহ সম্ভাবনায় কে না ভীত হয়? তবু ভীত না হয়ে কাদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে চেয়েছিল।

কিন্তু তার দুঃসাহসের ফল তাকে ভোগ করতে হয়েছে। সে-নিষেধাজ্ঞা খণ্ডনীয় নয়; একবার খণ্ডন করলে ক্ষমা নাই। পরিণামের কথা যখন বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো তার স্মরণ হয় তখন দিশেহারা হয়ে যাকে সে একটি দুর্বোধ্য কথা বলবার জন্যে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তাকেই আপন হাতে সে হত্যা করে। তার কঠোর শাস্তি : আমৃত্যু শোকাকুল অনুতাপ। সে-অনুতাপের অসহনীয় জ্বালা কখনো প্রশমিত হবে না।

যুবতী নারীর প্রতি তার ভাবাবেগ ন্যায়সঙ্গত নয় সে-কথা যুবক শিক্ষক উপলব্ধি করে। কিন্তু তার জন্যে সে চূড়ান্ত শাস্তি লাভ করে নাই কি? এরপর আর কোনো শাস্তির কথা উঠতে পারে না। অন্যায়ের তুলনায় শাস্তিটি অতি কঠোর বলে তার প্রতি মানুষের সমবেদনা হওয়াই স্বাভাবিক।

একটি বিষয়ে যুবক শিক্ষকের মনে কোনো সন্দেহ নাই। সে যে-উত্তর পেয়েছে সে-উত্তরে সে সন্তুষ্ট। অন্যায় হোক, তবু যুবতী নারীর প্রতি কাদেরের মনে মায়ামমতা ভাবাবেগ ছিল। বাঁশঝাড়ের দুর্ঘটনাটি তাই নির্দয় নির্মম হত্যাকাণ্ড নয়।

বাড়ি ফেরবার পথে যুবক শিক্ষকের তৃপ্ত-মনে হঠাৎ অপ্রীতিকর একটি সন্দেহের ছায়া উপস্থিত হয়। যুবতী নারীর হত্যাকারী কে, সে নিজেই নয়? সে যদি কাদেরকে অনুসরণ না করত, অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকারণে বাঁশঝাড়ের সামনে উপস্থিত না হত, তবে দুর্ঘটনাটি ঘটত না।

একটু ভেবে সে নিজেকে দোষমুক্ত করে। এ-কথা সত্য যে বাঁশঝাড়ে সে উপস্থিত না হলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটত না, কিন্তু অন্যদিন অন্যখানে অন্য কোনোপ্রকারে হয়তো এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হত। আসল হত্যাকারী সে নয়, কাদেরের মনের গভীর ভীতি। সে-ভীতির মূলে সিন্দুকে লুকানো তোস্‌তারী কিংখাব হতে শুরু করে নানাবিধ নিষেধাজ্ঞা। সে-সব নিষেধাজ্ঞার যথার্থতা বিচার করার ক্ষমতা তার নাই, তা বিচার করে দেখতেও সে চায় না। তার প্রশ্ন কাদেরের হৃদয় সম্বন্ধে। কাদের তার চোখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাড়ি পৌঁছবার আগে যুবক শিক্ষক একটি বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। তার চোখে কাদের যখন দোষমুক্ত হয়েছে তখন বাঁশঝাড়ের কথাটি আর প্রকাশ করার কথা ওঠে না। তার মুখ থেকে কথাটি কেউ জানতে পারবে না। অবশ্য দাদাসাহেবকে একটি কথা বলবে বলে সে ওয়াদা দিয়েছে। তাঁকে কী বলবে? সে কিছু ভাবিত হয়। সে বুঝতে পারে, তাঁকে আজেবাজে কোনো কথা বলে সে নিস্তার পাবে না। কী বলবে তাঁকে?

তার বর্তমান স্বস্তিভরা মনের পক্ষে বেশি চিন্তা করা সম্ভব হয় না। তাই হয়তো সহসা সে ভাবে, তাঁকে বলবে কাদের দরবেশ। তিনি খুশি হবেন, কারো কোনো ক্ষতিও হবে না।

তাছাড়া, কে দরবেশ কে দরবেশ নয়, সে-কথা কি কেউ কখনো সঠিকভাবে বলতে পারে?

এগার

কাদের তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। যুবক শিক্ষক ঘরে প্রবেশ করলে সে এক পলকের জন্যে তার দিকে চোখ তুলে তাকায়, কিন্তু কিছু বলে না। জানালাটি বন্ধ বলে ঘরে আবছা অন্ধকার। সে-জন্যে তার চেহারা ভালো করে দেখা না গেলেও যুবক শিক্ষক তাতে কেমন স্তব্ধতা অনুভব করে।

একটু ইতস্তত করে যুবক শিক্ষক টেবিলের পাশের ছোট নড়বড়ে চেয়ারটি টেনে নিঃশব্দে সোজা হয়ে বসে। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আপনা থেকেই খোশ-মেজাজে ঘোষণা করে, "একটু বেড়িয়ে এলাম।"

কাদের এবারও কিছু বলে না। একটু পরে যুবক শিক্ষক সংগোপনে তার দিকে তাকায়।

কাদেরের মুখটা সামান্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাতে নিঃসন্দেহে স্তব্ধভাব। তারপর সে তার অর্ধনিমীলিত চোখের দিকে তাকায়। সে-চোখের দিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক হঠাৎ যেন তার অর্থ বুঝতে পারে। সে-চোখ এ-দুনিয়া সে-দুনিয়া, এপার-ওপার দু-দুনিয়া দু-পারই দেখে। জেগে থেকেও কাদের ঘুমিয়ে, ঘুমিয়েও সে জেগে। তার রাতে সূর্য অস্ত যায় না, আবার প্রখর সূর্যলোকে রাতের অবসান হয় না। তার দৃষ্টি অস্তিত্বের এমনই একটি ক্ষেত্রে নিবদ্ধ যেখানে জীবনমৃত্যুর মধ্যে কোনো ব্যবধান নাই, যেখানে দুটিই যুগপৎ সত্য, দুটিই একত্রে বিরাজ করে। বিস্ময় কি যে কাদেরকে বুঝবার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেই অবাস্তব জগতে প্রবেশ করেছিল।

যুবক শিক্ষক কাদেরকে দেখে খুশিই হয়েছিল। তাকে তার শেষ প্রশ্নটি করা বাকি। কিন্তু এবার তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, আর প্রশ্নের কী দরকার? মনের অশান্তি কেটেছে। তার জীবনে যে-ফাটল ধরেছিল, সে-ফাটলে আবার জোড়া লেগেছে। কেন সে তাকে ব্যক্ত করবে?

আবার সে অনেকটা অকারণে বলে, "নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে এলাম।"

কাদের পূর্ববৎ নির্বাক থাকে। কিন্তু নদীর কথায় তার চোখে যেন ঈষৎ কম্পন দেখা যায়।

না, তবু তাকে প্রশ্নটি করতে হবে। তার শেষ প্রশ্ন। সে-প্রশ্নের পরেই কাদের খালাস পাবে। সন্তোষজনক উত্তর পাবে তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু কথাটি মুখ থেকে না শোনা পর্যন্ত সে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে না। সে কি একটা বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নেয় নাই? মায়ামমতার কারণেই সে তাকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করবে—এ-সিদ্ধান্তের অর্থ কি এই নয় যে, সে নিজেকে নিজেই বিচারকের পদে নিযুক্ত করেছে? কে সে? একজন দরিদ্র শিক্ষক মাত্র, শিক্ষকতা করলেও যার জ্ঞানবুদ্ধি-অভিজ্ঞতা নেহাৎই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, অন্যদিক থেকে কথাটা ভেবে দেখলে এই মনে হয় না কি যে, দায়িত্বটি গ্রহণ করে খোদার চেয়ে বান্দাকেই সে বড় করে দেখছে? স্রষ্টার চোখে তাঁরই সৃষ্ট মানুষের প্রাণহরণ অতীব জঘন্য অপরাধ। সে-অপরাধের গুরুত্ব তিনিই সম্যকভাবে নির্ণয় করতে পারেন, তিনিই কেবল বলতে পারেন কোনো মানুষের অন্তরে কতখানি দয়ামায়া, কতখানি নির্দয়তা। যে-কথা যুবক শিক্ষক কাদেরের বিবৃতিতে এবং আচরণে সাব্যস্ত করবে, সে-কথা তার কাছে বিনা চেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। যুবক শিক্ষক কি বিশ্বাসী নয়?

শেষোক্ত প্রশ্নটি তাকে বিচলিত করে। ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, এ-প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারবে না।

নিশ্চিত জয়ের সামনে দাঁড়াবার পর আকস্মিকভাবে এবং অপ্রত্যাশিত কোণ থেকে একটি দুর্লঙ্ঘনীয় বাধা এসে হাজির হলে মনে ক্ষোভদুঃখের সৃষ্টি হয়। সে-ক্ষোভদুঃখ সাময়িক বিহ্বলতা আনলেও পরে আবার যে-কোনো প্রকারে বাধাটি অতিক্রম করার জন্যে একটি অন্ধ জিদ চাপে, মানুষ মরিয়া হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষকের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় এই ভেবে যে, দুর্বহপ্রায় যে-দায়িত্বটি সে গ্রহণ করেছে এবং যে-দায়িত্ব সে কৃতকার্যতার সঙ্গে প্রতিপালন করতে পারবে বলে তার বিশ্বাস, সে-দায়িত্বটি যেন হাত থেকে শেষ মুহূর্তে খসে যাবে। কিন্তু এখন দায়িত্বটি ছাড়তে সে রাজি নয়।

না, সে অবিশ্বাসী নয়, কারণ বিশ্বাসী হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে সে এ-বিষয়ে সজ্ঞান যে, তার বিশ্বাসটি প্রশ্নহীন। যেখানে বিশ্বাসটি থামে তার ওধারে কী আছে সে জানে না। সে-কথা তার জানবার ক্ষমতা নাই, জানবার চেষ্টাও সে করে না। কেন করবে? অন্ধবিশ্বাস দাবি করে দৃষ্টিশক্তি আশা করা অনুচিত। কিন্তু যে-ক্ষুদ্র জগতে মানুষ বিচরণ করে সে-জগতের কোথায় ভালো কোথায় খারাপ সে-কথা বিচার করার ক্ষমতা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া উচিত নয়। সে-ক্ষমতাটুকু হারালে মানুষ অতিশয় সীমাবদ্ধ প্রাণীতে পরিণত হবে। যুবক শিক্ষক কী চায়? সে চায় একটি কথা বিচার করতে : কাদের মানুষ কি অমানুষ,

তার হৃদয়ে ভালবাসা-দয়ামায়ামমতা আছে, না তাতে কেবল নির্দয়তা। মানুষের কর্তব্য মানুষকে ভালবাসা, তার সঙ্গে স্নেহের নীড় বাঁধা, তাকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করা। সে-বিষয়ে কে সফল হয়েছে কে হয় নাই, সে-কথা মানুষই বিচার করবে, কারণ মানুষের ভালোমন্দে মানুষেরই লাভ-লোকসান। যুবক শিক্ষক এ-কথা জিজ্ঞাসা করছে না সৃষ্টিকর্তা কেন কাউকে ভালো করেন কাউকে খারাপ করেন : তাঁর গূঢ় উদ্দেশ্য সে বোঝে না। সে শুধু মানুষের ভালোমন্দ বিচারের অধিকার চায়।

হঠাৎ সভয়ে যুবক শিক্ষক ভাবে, এমন সব কথা সে কখনো ভাবে নাই। সে কি পাগল হয়েছে? বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি কি তার মস্তিষ্কবিভ্রান্তি ঘটিয়েছে?

কিন্তু অপরপক্ষকে শান্ত করবার জন্যেই যেন প্রশ্নটি তোলে। তার যুক্তির জন্যে সে মনে কোনো অনুশোচনা বোধ করে না।

আর ভাববার সময়ও পায় না। হঠাৎ কাদের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তার দিকে তাকায়। কাদেরের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। সে-দৃষ্টিতে কেমন যেন সন্দেহ। চোখাচোখি হতেই সে চাপা, খন্‌খনে গলায় প্রশ্ন করে, "কী অত চিন্তা করেন?"

উত্তর না দিয়ে যুবক শিক্ষক একটু হাসবার চেষ্টা করে, কিন্তু সামান্য মুখব্যাদান করে নিরস্ত হয়। তারপর তার দিকে না তাকিয়ে আস্তে বলে, "এসেছেন, ভালোই হয়েছে। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

সূর্যাস্তের দেরি নাই। উঠানে যে-অংশটি দৃষ্টিগত হয় সেখানে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দুটি গরু, তারপর একটি রাখালমানুষকে দেখা যায়। হঠাৎ যুবক শিক্ষকের সন্দেহ হয়, প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করার জন্যে সময়টি কি উপযুক্ত? কিন্তু তার সময় নাই। দাদাসাহেবকে একটা উত্তর দিতে হবে। তাছাড়া, উত্তরটি জানবার জন্যে তার মনেও ঔৎসুক্য কম নয়। তবু মনে দ্বিধা হয়। উত্তরটি যে সুখবর হবে তা জেনেও প্রশ্নটি করতে তার ভয় হয়। কয়েক মুহূর্ত সে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখে। তারপর সে ভাবে, তার বিশ্বাসটি যদি অসত্য প্রমাণিত হয়, তবে বাইরের পৃথিবীই ধূলিসাৎ হবে, তার কোনো ক্ষতি হবে না; সে-ধ্বংসলীলা তার চুল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না। তারপর তার চিকন নাসারন্ধ্র যেন সতর্কিতভাবে কেঁপে ওঠে। নিঃশব্দে সে নিশ্বাস নেয়, শূন্য বুক ভরে ওঠে।

"একটা কথা জানা বড় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

কাদের নীরব হয়ে থাকে। তার নীরবতায় যুবক শিক্ষক কিছুটা দমিত হয়। কাদের যদি একবার জিজ্ঞাসা করত কী সে-কথা যা যুবক শিক্ষকের জানা বড় প্রয়োজন, তবে আপনা থেকেই প্রশ্নটি বেরিয়ে আসত। জিহ্বার ডগায় সে-প্রশ্ন , সামান্য পালকস্পর্শই যথেষ্ট।

কাদেরের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করে, "আপনি কেন এসেছেন?"

কাদের অর্ধনিমীলিত চোখে প্রশ্নটা ভেবে দেখে। তারপর চোখ বন্ধ করে বলে, "আপনার কথাই বলেন।"

তার কণ্ঠের আওয়াজে কেমন প্রশ্রয়ের আভাস। কিন্তু মনে হয়, চোখ বন্ধ করেও সে যেন স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে যুবক শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে আছে, তার কথা শোনবার জন্যে কানও খাড়া করে রেখেছে। সে যেন আজ দু-জগতের বাসিন্দা আর নয়। মুহূর্তের জন্যে যুবক শিক্ষকের মনে ভয়ের আবির্ভাব হয়। সে ভাবে, তার মাথায় এ কী অদ্ভুত খেয়াল জন্মেছে? কেন সে কাদেরকে প্রশ্ন করতে চায়? অকস্মাৎ আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটিই যেন অর্থহীন মূল্যহীন মনে হয়, তার সত্যাসত্য বিচার করার কথাও নিতান্ত অহেতুক মনে হয়। তবু একটা হদিস পাবার আশায় সে কাদেরের দিকে তাকায়। তার চোখ পূর্ববৎ নিমীলিত, সারা শরীরে পাথরের মতো নিশ্চলতা। এবার যুবক শিক্ষকের মনে হয়, সে-নিশ্চলতার সামনে বেশিক্ষণ সে স্থির হয়ে থাকতে পারবে না, হঠাৎ একটা দুর্বার স্রোত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কাদের কিছু বলে না কেন? তার মনেও কি একটি নিদারুণ ভয় উপস্থিত হয়েছে? প্রশ্ন করতে

যুবক শিক্ষকের মনে যেমন ভয়, প্রশ্ন শুনতেও তার মনে কি তেমনি ভয়? দু-জনের মনেই ভয়। তবে একই ভয় : দু-ভয়ে কোনো তারতম্য নাই। তাদের পক্ষে পরস্পরকে সাহায্য করা সম্ভব নয় কি?

একটা গভীর নিঃসঙ্গতাবোধে নিঃসাড় হয়ে থেকে কাদেরের মতো সেও চোখ নিমীলিত করে। এবার চারধারে ঘন-কালো অন্ধকার জাগে, নীরবতাও যেন নিবিড় হয়ে ওঠে। সে ভাবে, তারা আক্রমণ-উদ্যত শত্রু নয়, বন্ধু। তবে দু-জনেই নিঃসঙ্গ, কী একটা প্রশ্নের জন্যে ঘনতমসার মধ্যে হাতড়িয়ে ফিরছে। যা খুঁজছে তা না পেলেও তারা যদি পরস্পরের হাত ধরতে পারে, শুধু একটু সময়ের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যে, তবে ক্ষীণতম হলেও তবু তারা একটা আলো দেখতে পেত।

যুবক শিক্ষকের ঠোঁটটা একটু কেঁপে ওঠে। কেন কথা বলছে সে-কথা বুঝতে না পারলেও ঘন অন্ধকারের মধ্যে সে এবার বলে, "আপনি সব কথাই বলেছেন কিন্তু একটা কথা বলেন নাই।"

কাদের উত্তর দেয় না। কিন্তু যুবক শিক্ষক কোনো উত্তর বা উক্তির জন্যে অপেক্ষা করে না। আবার বলে, "কথাটা কী করে বলি?" মুখটা তার সামান্য লাল হয়ে ওঠে। তারপর সে বলেই ফেলে, "যুবতী নারীর প্রতি আপনার মায়ামমতার কথা বলেন নাই।"

কথাটা সে অবশেষে বলেছে। কেমন অসংলগ্ন শোনায়, কিন্তু ঘনতমসার মধ্যে কোন কথা অসংলগ্ন শোনায় না? যুবক শিক্ষক স্থির হয়ে থাকে। তারপর সে অপেক্ষা করে। অন্ধকারটা হাল্কা হয়ে উঠেছে, শীঘ্র সে যেন আলোতে ভেসে উঠবে, আবার চাঁদ-তারা আকাশ দেখতে পাবে। কোনো উত্তর না পেলে সে এবার চোখ খুলে তাকায়। অদূরে ছায়াটি এখনো নিশ্চল হয়ে আছে।

কাদেরের চোখ উন্মুক্ত। সে তারই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে এমনভাবে তাকিয়ে আছে কেন? হয়তো তার দৃষ্টি এড়াবার জন্যেই সে এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে, "দাঁড়ান, আলো জ্বালাই।" তারপর লণ্ঠন জ্বালানোর কাজে মনোনিবেশ করে সে বলে, "বুঝলেন আমার কথাটা?" কাদেরের দিকে তাকাতে তার আর সাহস হয় না, একটা গভীর লজ্জা এসে তাকে গ্রাস করে। লণ্ঠনটি জ্বালিয়ে সেটি দরজার এক পাশে ঠেলে দেয়, কাদেরের সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে তা টেবিলে রাখতে পারে না। তারপর সে চেয়ারে ফিরে এসে কাদেরের দিকে পাশ দিয়ে বসে।

অবশেষে কাদেরের কণ্ঠ শোনা যায়। সে-কণ্ঠে গভীর বিস্ময় না সন্দেহ তা যুবক শিক্ষক ধরতে পারে না। সে আস্তে প্রশ্ন করে, "আপনার মতলব কী?"

এ-প্রশ্নটি কাদের সকালেও তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং তখন প্রশ্নটি তাকে আঘাত দিয়েছিল। এখন সে তাতে আঘাত পায় না। বরঞ্চ সে ভাবে, সকালে কাদেরের সামনে যে-ভাবে সে আচরণ করেছিল, তারপর তার মনে এ-বিশ্বাসই হওয়া স্বাভাবিক যে তার প্রতি যুবক শিক্ষকের কোনো সহৃদয়তা নাই। যুবক শিক্ষকের মনে যে একটা পরিবর্তন এসেছে তা সে কী করে বুঝবে?

"না, আমার কোনো কু-মতলব নাই।" আবার সে একবার হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। "আমার কথাটি বুঝতে পারছেন না কেন?"

"কথাটা কী?"

"একটা দুর্ঘটনার কথাই আপনি শুধু বলেছেন। আর কিছু বলেন নাই।"

কাদের তার কথা এখনো বুঝতে পারে নাই। একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, "আর কী বলব?"

"বললাম না?"

"কী বললেন?"

যুবক শিক্ষকের মনে হয় আবার সে একটি ফাঁদে পড়েছে : এ-ফাঁদ অতীব বাস্তব, অতীব সত্য। তার মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করে।

"বললাম তো! মেয়েলোকটির জন্যে আপনার মায়ামহব্বত ছিল সে-কথা একবারও বলেন নাই।"

এবার কথাটা বোধগম্য হয়েছে কিনা তাই দেখবার জন্যে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে সে একবার কাদেরের দিকে তাকায়। যা দেখে তাতে প্রথমে তার বিস্ময় হয়, তারপর ভয়। কাদেরের চোখ সম্পূর্ণভাবে খোলা : সে যেন কী একটা কথা বুঝবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তারপর সে-চোখ ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তাতে শেষে রক্তাভা দেখা দেয়।

শুষ্ককণ্ঠে যুবক শিক্ষক প্রশ্ন করে, "কী ব্যাপার?"

কাদের উত্তর দেয় না। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় কিন্তু তার চোখে রক্তাভা ক্রমশ আরো গাঢ় হয়। তিল-তিল করে তাতে যেন রক্তবিন্দু জমছে। অবশেষে তার দৃষ্টি ঘরময় ঘুরতে থাকে। সে যেন কী সন্ধান করে, কী যেন বুঝতে চায়। এখানে-সেখানে সে-দৃষ্টি থামে, কিন্তু ক্ষণকালের জন্যে, তারপর এক সময় আলগোছে যুবক শিক্ষকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। একবার, দু-বার। তাকে দেখেও দেখে না, তবু তার ওপর দিয়ে যখন বয়ে যায়, তখন তার দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যে কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষক বোধ করে, তার ভেতরটা হঠাৎ শীতল হয়ে উঠছে। অধীর হয়ে সে বলে, "সত্যি কিনা বলেন। হাঁ-না কিছু বলেন।"

কোনো উত্তরই আসে না। তারপর যুবক শিক্ষকের মনে হয়, ক্ষুদ্র ঘরটা যেন চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করেছে। সঙ্গে-সঙ্গে সেও ঘুরতে শুরু করে। তার মাথাটা শূন্য হয়ে ওঠে, তারপর দপদপ করে। একটা অকথ্য জ্বালায় সারা শরীরে যন্ত্রণাও জাগে। লোমশ বিষাক্ত বিচ্ছু গায়ে কিলবিল করে বেড়াচ্ছে; হাতে, পায়ে। তারপর সমগ্র দেহে। কিন্তু সে কিছু পরওয়া করে না। তার দৃষ্টি কাদেরের ওপর নিবদ্ধ। চতুর্দিকে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে কাদেরই যেন কেবল স্থির হয়ে আছে। না, তার রক্তাক্ত স্ফীতমস্ত চোখ দুটি ঘোরে, কেবল ঘোরে, চক্রাকারে এবং অন্তহীনভাবে।

তারপর যুবক শিক্ষকের মনে হয়, সে যেন দ্রুতভাবে কথা বলতে শুরু করেছে। গলা অনুচ্চ হলেও নিজেরই কানে তার স্বর অস্বাভাবিক ঠেকে, বিষয়বস্তুও ঠিক বোধগম্য হয় না। কেবল ক্ষিপ্রগতিতে অস্পষ্ট শব্দগুলি মুখ থেকে বেরিয়ে চতুর্দিকে ছিট্‌কে পড়ে, একটার পর একটা, কোথাও জোড়া লাগে না, কোথাও বিদ্ধ হয় না। তাতে সে দমে না। শব্দগুলি সে ছুঁড়তেই থাকে, পাগল মানুষ যেমন ঢিল-পাথরের স্তূপ পেয়ে অশ্রান্তভাবে লক্ষ্যহীনভাবে তা ছুঁড়তে থাকে চতুর্দিকে। তারপর এক সময় হয়তো তার কথার উৎস শুকিয়ে আসে। কারণ তার মনে হয় সে একটি কথাই বারবার বলছে, একটি ঢিলই ছুঁড়ছে। কিন্তু ছুঁড়তেই আবার সেটা হাতে ফিরে আসে বা হাত থেকে বেরিয়েও হাতেই থেকে যায়।

"বুঝলেন কথাটা কেন দরকারি? বুঝলেন, বুঝলেন?"

সে কোনোই উত্তর পায় না। তারপর ঘূর্ণ্যমান ঘরটি ধীর স্থির হয়, একটা নিঃস্ব তবু প্রীতিকর নীরবতা ফিরে আসে।

অবশেষে কাদেরের কণ্ঠ শোনা যায়। সে কণ্ঠে ঘৃণা, বিস্ময়। শুধু তাই নয়। সে একটি অদ্ভুত কথা বলে। প্রথমে কথাটি বুঝতে পারে না যুবক শিক্ষক। কিন্তু কাদেরের কণ্ঠ যখন নীরব হয় তখন নীরবতার মধ্যেও তার কথাটি শুনতে পায় বার-বার। অতি বিস্ময়ে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, সে পাগল? কাদের যেন তাই বলল।

তারপর কাদের তাকে ভয়-প্রদর্শন করে। যুবক শিক্ষক সুস্থমস্তিষ্ক নয় কথাটি আবিষ্কার করেছে বলেই সে যেন ভয়-প্রদর্শন করার প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু কাদেরের উক্তিটি তাকে স্পর্শ করে না। তার মন অন্যত্র। কেবল সে একাধিকবার বলা কথাটি আবার বলবার জন্যে তীব্র ইচ্ছা বোধ করে বলে সেটি শেষবারের মতো শূন্যতায় নিক্ষেপ করে, নিরাশভাবে, পূর্ববৎ

লক্ষ্যহীনভাবে।

"আমার কথাটা এখনো বুঝলেন না?"

কাদের কোনো উত্তর দেয় না। যুবক শিক্ষকের প্রশ্নটি নিস্তব্ধ ঘরে কতক্ষণ বিসদৃশভাবে ঝুলে থাকে, তারপর প্রশ্নকারীকেই তা নির্মমভাবে লজ্জা দিতে শুরু করে। সেটি যেন তার প্রশ্ন নয়, তারই উলঙ্গ দেহ। সে-দেহ কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে।

একটি কথা তার কাছে অত্যাশ্চর্য মনে হয়। অনতিদূরে হত্যাকারী সম্পূর্ণভাবে বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে সুস্থির হয়ে বসে, কোথাও একটু অসংলগ্নতা নাই।

যুবক শিক্ষক অবশেষে বোঝে, কাদেরের পক্ষে দরিদ্র মাঝির বউ-এর প্রতি কোনো ভাবাবেগ বোধ করা সম্ভব নয়।

তারপর যুবক শিক্ষকের চোখের সামনে একটি ধু-ধু প্রান্তর জেগে ওঠে। সে-প্রান্তর শুধু ধু-ধুই করে, তাতে কোনো মরীচিকা নাই। যে-মরীচিকার পেছনে সে এ-ক'দিন ছুটেছিল, সে-মরীচিকার কোনো আভাস নাই সেখানে।

একটু পরে আপন মনেই শান্তভাবে যুবক শিক্ষক বলে, 'তবে আর কী? সব শেষ হল।"

মরীচিকা যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে তবে কাকে দোষ দিতে পারে?

অবশেষে সে কাদেরের দিকে তাকিয়ে বলে, "আমার আর কোনো উপায় থাকল না।"

কাদেরের চোখটা দপ করে জ্বলে ওঠে, ঠোঁটের পাশটা বিকৃত হয়ে ওঠে। কিছু না বলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভঙ্গিতে সে চলে যায়। তার ঘাড়ের একটা দিক অতিশয় উঁচু মনে হয়।

বারো

অবশেষে যুবক শিক্ষকের পক্ষে বাঁশঝাড়ের নির্মম ঘটনাটি নিরপেক্ষ দর্শকের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হয়। চন্দ্রালোক দিবালোকে পরিণত হয়েছে। সে-দিবালোকে একটি নিহত যুবতী নারীর অর্ধ-উলঙ্গ দেহ স্পষ্টভাবে সে দেখতে পায়। শুধু তাই নয়। হত্যাকারীর পক্ষেও কোথাও গা-ঢাকা দেবার উপায় নাই।

না, ঘটনাটিতে আর কোনো জটিলতা নাই। একসময়ে ফৌজদারি আদালতে বাদীপক্ষ সেটি এ-ভাবেই পেশ করবে তাতে সন্দেহ নাই।

বড়বাড়ির প্রধান মুরুব্বি আলফাজউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠভ্রাতা কাদের চৌধুরী নিষ্কর্মা মানুষ। কয়েক মাস আগে বিবাহিত এবং ভদ্রবংশীয় সে-নিষ্কর্মা মানুষটি তাদের গ্রামেরই একটি দরিদ্র মাঝির সন্তানহীনা যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে কোনো প্রকারে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে। কার্যোপলক্ষে স্বামীটিকে প্রায়ই গ্রামছাড়া হতে হয়। তখন ঘরে থাকে তিনজন মেয়েমানুষ : মাঝির স্ত্রী, বৃদ্ধা মা এবং কানা বোন। অবস্থা অনুকূল হলেই কাদের যুবতী নারীর সঙ্গে গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ করে। মাঝির ঘরটা গ্রামের একপ্রান্তে। নিকটে একটু জঙ্গলের মতো। সেখানে একটা বৃহদাকার বাঁশঝাড়। সে-বাঁশঝাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র খোলা স্থানে তাদের গোপনমিলন হয়। ধর্মনীতিবিরুদ্ধ অবৈধ এ-মিলনের কারণ কী? যুবতী নারী আজ মৃতা। তার মনে কী ছিল তা আজ জানা সম্ভব নয়। তবে তার সঙ্গে কাদেরের সম্পর্কের কারণ নিঃসন্দেহে বলা যায়। সে-কারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা।

দিন-কয়েক পূর্বে বড়বাড়ির আশ্রিত যুবক শিক্ষক আরেফ আলী গভীর রাতে কাদেরকে বাড়ি ত্যাগ করে গ্রাম-অভিমুখে যেতে দেখে। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতার মতে সে দরবেশ। কথাটা বিশ্বাস না-হলেও কাদের সম্বন্ধে যুবক শিক্ষক কৌতূহল বোধ করে। সে ভাবে, কাদেরকে অনুসরণ করে দেখে অত রাতে কী উদ্দেশ্যে সে ঘর থেকে বেরিয়েছে। অবশ্য খারাপ কিছু সে সন্দেহ করে না।

শীঘ্র সে কাদেরকে হারিয়ে ফেলে। তারপর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে তার কথা ভুলে সে কিছুটা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে। হয়তো কাদেরকে আবার দেখতে পাবে সে-আশাটা এখনো সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে নাই। তারপর একসময়ে নদীর কাছে বাঁশঝাড়ের নিকটবর্তী হতেই একটি মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে তার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ঠিক চিনতে না পারলেও তার সন্দেহ থাকে না যে কণ্ঠস্বরটি কাদেরেরই। দ্বিতীয় কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে না পেলে তার মনে হয়, কাদের হয়তো অদৃশ্য কোনো আত্মার সঙ্গে কথালাপ করছে। সে কি সত্যই দরবেশ? তার কথা ভালো করে শুনবার জন্যে সে বাঁশঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়। তখন শুকনা পাতায় তার পা পড়লে হঠাৎ আওয়াজ হয়, হয়তো ভয় পেয়ে সে নিজেও কিছু বলে ওঠে। এবার বাঁশঝাড়ে কণ্ঠস্বরটি থেমে যায়। কিছুক্ষণ পর যুবক শিক্ষক আবার রাখালের মতো ডেকে উঠলে যুবতী নারী ভয় পেয়ে সামান্য চিৎকার করে ওঠে।

বাঁশঝাড়ের বাইরে মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলে কাদের ভেবেছিল হয়তো যুবতী নারীর স্বামীই তার স্ত্রীর সন্ধানে এসেছে। এবার যুবতী নারী চিৎকার করে উঠলে সে নিদারুণ ভয়ে দিশেহারা হয়ে যুবতী নারীকে চুপ করাবার জন্যে তার গলা টিপে ধরে। প্রাণের জন্যে যুবতী নারী যতই ধ্বস্তাধ্বস্তি করে ততই দিশেহারা কাদের তার হস্তবন্ধন শক্ত করে। শীঘ্র যুবতী নারীর জীবনাবসান ঘটে। কাদেরের মতে, সে-নিদারুণ ভীতির কারণ তার পরিবারের নামযশ। সে-পরিবারের মানুষ চরম ব্যভিচারে লিপ্ত তা প্রকাশ পেলে যে-ভয়ানক পরিণাম হবে সে-পরিণামের কথা স্মরণ হওয়াতে তার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি হঠাৎ লোপ পায়। যখন সে বুঝতে পারে যুবতী নারীর দেহে প্রাণ নাই, তখন সে বাঁশঝাড়ের পেছন দিয়ে পালিয়ে যায়।

তারপর কাদের একটু ভুল করে। কিছুদূরে গিয়ে তার সন্দেহ হয়, হয়তো সবটা কানেরই ভুল। ভুলবশত সে কি এমন গুরুতর কাণ্ড করে বসেছে? তাছাড়া, বাঁশঝাড়ের সামনে কেউ যদি এসেও থাকে, সে যে হত্যাকাণ্ডের কথা জানতে পেরেছে তার প্রমাণ কী? ভাবে, বাঁশঝাড়ের সামনের ভাগটা একবার দেখে এলে ক্ষতি কী! ফলে যুবক শিক্ষকের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে-রাতে তার বিচিত্র আচরণ দেখে তার মনে সন্দেহ থাকে না যে, সে যে শুধু মৃত নারীর কথা জানে তা নয়, হত্যাকারী কে তাও সে জানে। যুবক শিক্ষক যে কিছু দেখে নাই, কাদের যে হত্যাকারী সেটা যে কেবল তার একটি খেয়াল, সে-কথা বোঝা তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

পরদিন যুবক শিক্ষক ঘটনাটি প্রকাশ করবে সে-কথাই কাদেরের কাছে স্বাভাবিক মনে হয়। তবে সে বুঝতে পারে, সাক্ষীর অভাবে অভিযোগটা প্রমাণ করা তার পক্ষে সহজ হবে না। একটি মানুষের বিরুদ্ধে আরেকটি মানুষের কথা। অতএব যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনার জন্যে সে তৈরি হয়ে থাকে। সে বোঝে, প্রথমে যে-অভিযোগটি আনবে তারই অপেক্ষাকৃত বেশি লাভ থাকবে কিন্তু নিজে অপরাধী বলেই হয়তো তার পক্ষে আক্রমণটা শুরু করা সম্ভব হয় না। যুবক শিক্ষক কথাটি প্রকাশ করলে সে কী-পাল্টা জবাব দেবে তা সে ঠিক করে রাখে। সে বলবে, মৃতদেহটি সে স্বচক্ষে দেখেছে এবং যুবক শিক্ষককেও বাঁশঝাড়ের কাছাকাছি দেখেছে। অবশ্য যুবক শিক্ষকই যে হত্যাকারী সে কথা সে সরাসরি না বললেও তার ওপর সন্দেহ ফেলতে দেরি হবে না। তাছাড়া, তার দরবেশী সুনামের জন্যে সে রাতভ্রমণেরও একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারবে। উপরন্তু, তার পরিবারের নামযশ প্রতিপত্তিও তাকে সাহায্য করবে।

তাকে কিছুই করতে হয় নাই। পরদিন যুবক শিক্ষক নিয়মিতভাবে বড়বাড়িতে এবং ইস্কুলে শিক্ষকতা করে, রাত্রির ঘটনা কাউকে বলে না। তার ব্যবহারে কাদের বিস্মিতই হয়। তারপর তার নীরবতার একটি কারণই সে দেখতে পায়। যুবক শিক্ষকই তাদের আশ্রিত বলে চক্ষুলজ্জার জন্যেই হোক বা সাহসের অভাবেই হোক, সে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করেছে।

হত্যাকাণ্ডটি প্রকাশ পায় নাই সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলে এবার কাদেরের মন বাঁশঝাড়ে পরিত্যক্ত মৃতদেহটির প্রতি যায়। রাত্রি হলে সে বুঝতে পারে, যুবক শিক্ষক তো কথাটি বলেই নাই, মৃত দেহটিও এ-পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়েছে। সেটা তার কাছে অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার বলেই মনে হয়। তবে সে এ-কথা উপলব্ধি করে যে, প্রথম দিন যে-কোনো কারণে তার প্রতি ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন থেকেছে, দ্বিতীয় দিনেও এমন সুপ্রসন্নতা আশা করা বাড়াবাড়ি হবে। নিখোঁজ নারীর সন্ধান চলছে, দেহটি আবিষ্কার করতে দেরি হবে না। স্থিরমস্তিষ্কে ব্যাপারটি বিবেচনা করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দেহটি অদৃশ্য হয়ে গেলেই সে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বোধ করতে পারবে। যুবতী নারীর দশা না জানলে তার হত্যার কথা কেউ সন্দেহ করবে না, হত্যাকারীকেও সন্ধান করবে না।

দেহটি গোর দেবার কথাটা ভেবে দেখে নদীতে ফেলাটাই সে সমীচীন মনে করে। তবে পন্থাটি মনঃপূত হলেও তা কম অপ্রীতিকর মনে হয় না। এ-সময়ে তার মাথায় খেয়াল আসে, সে-ব্যাপারে যুবক শিক্ষকের সাহায্য সে নেয় না কেন? খেয়াল হিসেবে যে-কথাটা তার মনে আসে, ভেবে দেখার পর তা তার ভালোই লাগে। দু-জন মানুষের পক্ষে কাজটি সম্পন্ন করতে দেরি হবে না, সাথী পেলে সেটি কাদেরের কাছে ততটা ন্যাক্কারজনকও মনে হবে না। তাছাড়া, কাদের এ-কথাও বুঝতে পারে যে, যে-লোকটি সব জেনেও কথাটি এ-পর্যন্ত প্রকাশ করে নাই, তাকে দেহ বহনের ব্যাপারে একবার জড়িত করতে পারলে চিরকালের জন্যে তার মুখ বন্ধ করা সহজ হবে। অবশ্য সে সাহায্য করতে রাজি হবে কিনা সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পারে না, কিন্তু ভাবে, চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী! তাছাড়া, যুবক শিক্ষকের চোখে নিজেকে দোষমুক্ত করার একটা ক্ষীণ আশাও মনে-মনে পোষণ করে। কে জানে একটি আজগুবি কথা বলে নিরীহ-সাদাসিধে লোকটির মনকে হয়তো অন্যপথে চালু করে দিতে সক্ষম হবে। সবদিক থেকে কথাটি তার পছন্দ হয়।

যুবক শিক্ষক বিনাতর্কে তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়। প্রথমে সামান্য ভয় পায়, তার প্রস্তাবটিও হয়তো পরিষ্কারভাবে বোঝে না, কিন্তু দ্বিরুক্তি না করে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। পরে কাজটির সামনাসামনি হলে সে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কোনো প্রকারে দেহটি বহন করলেও নদীর পাড় দিয়ে নাবতে গিয়ে সে এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে আর ওঠে না। বাকি কাজটি কাদের একাকীই করে। পরে ধরাশায়ী যুবক শিক্ষকের দিকে তাকাতেই একটি ব্যাপারে সে নিঃসন্দেহ হয়। যুবক শিক্ষক মেরুদণ্ডশূন্য ব্যক্তি। প্রয়োজন হলেও তাকে বেশি ভয় দেখাতে হবে না, একটুকুতেই তাকে কাবু করা যাবে। পাড় বেয়ে উঠে কাদের নিশ্চিন্তচিত্তে বাড়ি ফিরে যায়।

দুর্ভাগ্যবশত পরে রাতের বেলায় কোম্পানির জাহাজের সারেঙ্গ যুবতী নারীর দেহটি নদীতে ভাসতে দেখে। তার পরিকল্পনাটি কার্যকরী হল না দেখে কাদের অতিশয় নিরাশ হয় কিন্তু সে আর কী করতে পারে? অবশ্য যুবক শিক্ষকের দিক থেকে কোনো বিপদ সে আশঙ্কা করে না, তাই তাকে কোনো কথা বলার প্রয়োজনও বোধ করে না। যে-মানুষ সত্যকথা জেনেও এবং মৃতদেহটি বহনকার্যে তাকে সাহায্য করেও কাউকে কিছু বলে নাই, এখন দেহটি খুঁজে পাওয়া গেছে শুনে সে হত্যাকাণ্ডের কথাটি প্রকাশ করবে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

তারপর যুবক শিক্ষক তাকে ডেকে পাঠায়। প্রথমে সে ঠিক করে যাবে না। ঘটনাটির বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার বা ষড়্‌যন্ত্রের কোনো প্রয়োজন দেখে না। না গেলে যুবক শিক্ষক এ-কথাও বুঝতে পারবে যে, ব্যাপারটি ভুলে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু পরে কেমন অস্বস্তি এবং কৌতূহল হলে সে যুবক শিক্ষকের ঘরে হাজির হয়। যুবক শিক্ষকের ব্যবহার কিন্তু তার বোধগম্য হয় না। পরিষ্কার করে সে কিছু বলে না, যেটুকু বলে তাও অসংলগ্ন মনে হয়। কাদেরের সন্দেহ হয়, যুবক শিক্ষকের মনে যেন একটা কুমতলব। এ-সময়ে একটি কথা জানতে পেরে তার অনুশোচনার শেষ থাকে না। কথাটি এই যে, কাদের যে

হত্যাকারী তা যুবক শিক্ষক নিশ্চিতভাবে জানত না। যেটুকু অনিশ্চয়তা ছিল তা কাদের নিজেই দূর করেছে।

কথাটি জানতে পেরে যুবক শিক্ষকও কেমন বিচলিত হয়ে পড়ে, তার ব্যবহারও আরো বিচিত্র হয়ে ওঠে। সে যেন একটা বিভ্রমের ঘোরে ছিল, সে-ঘোরটা কেটেছে। কিন্তু তবু তার ব্যবহার বোধগম্য না হয়ে আরো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। কাদের একটি উপসংহারেই উপনীত হতে সক্ষম হয়। সত্যকথা জানতে পেরে যুবক শিক্ষক একটি বিকৃত আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয় বার সে নিজেই যুবক শিক্ষকের কাছে হাজির হয়। মনে অশান্তি। তাছাড়া, সেদিন সকালে দাদাসাহেব যুবক শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন সে-কথা সে জানে।

যুবক শিক্ষককে এবার অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে হয়। তাছাড়া মনে হয়, তার যেন কী একটা কথা বলার আছে। তার আচরণ-ব্যবহারে কোনোপ্রকার বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় না বলে কাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। সে কোনো কথা বলতে আসে নাই, জানতেই এসেছে।

অবশেষে যুবক শিক্ষক তার মনের কথাটি কোনোপ্রকারে প্রকাশ করে। বলতে গিয়ে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, শব্দগুলিও ঠিকভাবে সরে না। যা বলে তা-ও অতিশয় বিচিত্র শোনায়। তার মর্মার্থ এই যে, যুবতী নারীর প্রতি প্রণয়ের কথাটা কাদের বলে নাই। সে-কথাটি বিশেষ জরুরি এই কারণে যে অপরাধটি ক্ষমার্হ কি ক্ষমার্হ নয় তা তার উত্তরের ওপরই নির্ভর করে। যুবক শিক্ষকের বক্তব্যটি এতই অপ্রত্যাশিত এবং অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় যে কাদের স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। এ কী ধরনের কথা? কাদের কি একটি বদ্ধপাগল মানুষের হাতে পড়েছে? বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি ভয়ানক গুরুতর কিন্তু কী করে লোকটি প্রেমের কথা ভাবতে পারছে? তাছাড়া, নারী-পুরুষের সম্পর্কের কারণ কি শুধুমাত্র প্রেম? না, লোকটি নিঃসন্দেহে উন্মাদ। তা না হলে এমন অহেতুক কথার উত্থাপন করবে কেন? কাদের হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে পড়ে। সে-ক্রোধ সামলানো তার পক্ষে সহজ হয় না। তারপর যুবক শিক্ষকও অকারণে বেসামাল হয়ে পড়ে। তার মধ্যে যেন একটা বিষম মানসিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। অবশেষে সে পরিষ্কারভাবেই ঘোষণা করে যে, তার পক্ষে কাদেরকে ক্ষমা করা আর সম্ভব নয়।

লোকটি যে উন্মাদ সে-বিষয়ে কাদেরের এবার আর কোনো সন্দেহ থাকে না। অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সে এবার সত্যিই ভয় পায়। ফলে, যুবক শিক্ষককে ভয় দেখানো অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করে। যুবক শিক্ষক একটু সুস্থির হলে সে তাকে পরিষ্কারভাবে বলে যে, কথাটা প্রকাশ করলে তার সর্বনাশই হবে। কিন্তু ভয়-প্রদর্শন বৃথা মনে হয়। কাদেরের কথা যুবক শিক্ষকের কানে পৌঁছায় না। কাদের যে প্রেমিক নয়, সে-দুঃখেই সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। লোকটির প্রতি ক্রোধে-ঘৃণায় কাদেরের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়।

সচকিত হয়ে যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কাদেরের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎটি সে কাদেরের দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নাই। অবশেষে সব দুর্বলতা-স্বপ্ন-কল্পনা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, কাদেরের কুকীর্তিটি স্বচ্ছদৃষ্টিতে দেখবার পথে আর বাধা নাই। কাদের যখন তাকে কোনোপ্রকারে আর প্রভাবিত করতে পারবে না তখন তার দৃষ্টিতে ব্যাপারটি দেখতে কোনো ভয় নাই। এখন সে তার যুক্তি-অজুহাত সম্পূর্ণভাবে বুঝতে চায়।

কাদেরের যুক্তির উপসংহার কী? শুধু এই যে, যুবক শিক্ষক একটি মতিচ্ছন্ন মানুষ। সেখানেই তার যুক্তির শেষ। অপরের বিষয়ে এ-সিদ্ধান্তের পর নিজের সম্পর্কে কী তার বলার আছে? কিছু না। সেখানে তার যুক্তি শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করে।

না, কাদের যে প্রেমিক নয় সে-কথাই তার দুঃখের কারণ নয়। আসল কারণ এই যে, একটি যুবতী নারী নিতান্ত অর্থহীনভাবেই প্রাণ হারিয়েছে। তার মৃত্যুতে কাদেরের মনে একটু দুঃখ-বেদনা জাগে নাই। শূন্য হৃদয়ে দুঃখ-বেদনা জাগে না। কাদেরের হৃদয়ের শূন্যতার জন্যেই যুবতী নারীর মৃত্যুটা একটি নির্মম হত্যা ছাড়া কিছু নয়।

হয়তো যুবক শিক্ষক মতিচ্ছন্ন মানুষ। সে-বিষয়ে নিজে সে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু তার কর্তব্য সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। কাদেরের বিচারের যে-ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল সে-ভার সে আর বহন করতে পারবে না। তাকে এবার কথাটা প্রকাশ করতে হবে। প্রথমে দাদাসাহেবকে, তারপর কর্তৃপক্ষকে।

কর্তব্যটি পালন করা যে কষ্টসাধ্য হবে তা সে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সর্বপ্রথম দাদাসাহেবের কথাই তার মনে আসে। কথাটা তাঁকে বলা সহজ হবে না। তিনি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন আঘাত পাবেন, যে-আঘাত বৃদ্ধবয়সে তাঁর পক্ষে সামলে ওঠা হয়তো দুষ্কর হবে। হয়তো হঠাৎ তিনি দেখতে পাবেন, যে আশা-ভরসা আশ্বাস-বিশ্বাসের জোরে এতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, তা সারশূন্য হয়ে উঠেছে : সমস্ত জীবনটাই এক পলকের মধ্যে নিষ্ফল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, যুবক শিক্ষক জানে তিনি অতিশয় দয়াবান মানুষ। তাঁর দয়াবান চরিত্রের ভিত্তি হল মানুষের প্রতি অটল বিশ্বাস! এমন মানুষের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়া কি সহজ? কর্তৃপক্ষকে বলাও সহজ হবে না। যে-হত্যাকাণ্ড সে নিজের চোখে দেখে নাই সে-হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে কী সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করবে সে? বলতে বিলম্বেরও কী কারণ দেবে? তার মনের নানাপ্রকার বিচিত্র বিশ্বাস-চিন্তাধারার কথা তাদেরকে বলতে হবে। কিন্তু তখন তাদের কাছে তার অভিযোগটি বিভ্রান্তমস্তিষ্কের প্রলাপ বলে মনে হবে না কি? তাছাড়া, নদীতে যুবতী নারীর দেহটি ফেলার ব্যাপারে তার সহায়তারও কী ব্যাখ্যা দেবে?

কথাটি প্রকাশ করলে তার সমূহ ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে। কাদের ইতিমধ্যে তার পরিণামের কথা বলে তাকে ভয়-প্রদর্শন করেছে। যুবক শিক্ষক শুধু যে তার অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হবে না তা নয়, কাদের তার বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ আনলে নিজেকে রক্ষা করার কোনো উপায় তার থাকবে না। এখন সে ভাবছে দাদাসাহেব কথাটি জেনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন। হয়তো তিনি তা বিশ্বাস করতেই চাইবেন না। অকারণে তার কনিষ্ঠভ্রাতার গুরুতর ক্ষতি সে করতে চাইছে এই ধারণায় বদ্ধমূল হয়ে কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করে কাদেরকে রক্ষা তো করবেনই, তার বিরুদ্ধে কাদেরের পাল্টা জবাবটি যাতে টেকে তার যথাযথ ব্যবস্থা করবেন। সত্য কথা জেনেই যে তিনি এমন অন্যায় কাজ করবেন তা নয় : কাদেরকে অপরাধী বলে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আরেকটি কথা। ভাইকে রক্ষা করার প্রয়োজন ছাড়া আরেকটি প্রয়োজনও তিনি বোধ করবেন : তাঁর পরিবারের সুনাম রক্ষা করা।

যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগ না আনলেও কথাটি প্রকাশ করার পর তাকে বড়বাড়ির আশ্রয় এবং ইস্কুলের শিক্ষকতার চাকুরিটি ছাড়াতে হবে, তারপর এখানে থাকতে তার বিবেকে বাধবে। তখন সে কোথায় যাবে? কোথায়ই-বা এমন লাভজনক চাকুরি বা দাদাসাহেবের মতো এমন স্নেহ-দয়াশীল অভিভাবক পাবে?

তবু কথাটা প্রকাশ না করে তার উপায় নাই। উপায় থাকলে সে বলত না। বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস, মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়। না, সত্যিই তার উপায় নাই।

যুবক শিক্ষকের শীর্ণ মুখ শুষ্ক কাঠের মতো নীরস-কঠিন মনে হয়। সে-মুখ কখনো যেন হাসবে না কাঁদবে না।

তেরো

দীর্ঘ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নানারকম মৃদু সঙ্কুচিত আওয়াজ শুরু হয়েছে : দিনাগমনের বেশি দেরি নাই।

শীতটা কনকনে মনে হয়। তার হাড়ে-মজ্জাতে সে-শীত হানা দিলেও যুবক শিক্ষক নিশ্চল হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করে। চৌকির নিকটে টিনের বাক্সটি তৈরি, টেবিলের ওপরটা শূন্য, ঘরের কোণ থেকে দড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর আকাশের ধূসর আলো কিছু পরিস্ফুট হয়ে উঠলে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। এবার যুবক শিক্ষক উঠে পড়ে দরজার নিচে দুইধাপ সিঁড়ির ওপর বসে ওজু করে। একবার সে দাদাসাহেবের জানালার দিকে তাকায়। তাঁর ঘরে আলো। মুহূর্তের মধ্যে যুবক শিক্ষকের ভেতরটা ব্যথায় মুচড়িয়ে ওঠে। দাদাসাহেব আজ নির্মম কথাটি জানতে পারবেন।

ঘরের কোণে এখনো অন্ধকার। সে-অন্ধকারে নক্‌শা-কাটা শীতলপাটির জায়নামাজ বিছিয়ে দাঁড়াতেই সে ভেজানো দরজার কাছে একটি আওয়াজ শোনে। মাথাটা ঈষৎ সরিয়ে দেখে, সেখানে কাদের দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাকে দেখেও সে যেন দেখে না। কোনো কথা না বলে তার দিকে পিঠ দিয়ে সে নামাজ পড়তে শুরু করে। কাদেরের অস্তিত্বের আর কোনো মূল্য নাই যেন। যুবক শিক্ষক তার মনে যে অত্যন্ত গুরুতর একটি কর্তব্যবোধের ভার বোধ করে, তার তলে কাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

বড়বাড়িতে আসার পূর্বে নিয়মিতভাবে নামাজ পড়ার অভ্যাস যুবক শিক্ষকের ছিল না। আজকাল অন্ততপক্ষে সকাল-সন্ধ্যায় নামাজটা পড়ে। তবু ঠিক মনঃপ্রাণ দিয়ে পড়ে যে তা নয়। তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করলেও তা সে সম্পূর্ণভাবে বোঝে না। কিন্তু আজ সে হঠাৎ অত্যন্ত নিঃসঙ্গ এবং অসহায় বোধ করে বলে নামাজ পড়তে দাঁড়ালেই তার মন একটি তীব্র ভাবোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে। সে যেন আর তোতার মতো মুখস্থ-করা বুলি আবৃত্তি করে সারশূন্য কর্তব্যপালন করছে না : যাঁর সামনে সে দাঁড়িয়েছে তাঁর উপস্থিতি সে অন্তর দিয়ে অনুভব করছে, তার বক্তব্য তাঁর কর্ণগোচর হচ্ছে তাতেও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

মনে যে-অপরিচিত ভাবোচ্ছ্বাসের উদয় হয়, তাতে কিছু আশান্বিত হয়ে সে নিঃশব্দে সূরা আল্‌-খালাক পড়ে। অসংখ্যবার পড়েও যে-সূরাটি তার মনে কখনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই, আজ সে-সূরার প্রতিটি শব্দ সহস্র অর্থে ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। তাতে আশ্রয়-রক্ষার জন্যে নিঃসহায়ের যে-আকুল আবেদন, সে-আবেদনের মর্মার্থও সহসা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তার সাহায্যের দরকার। সঙ্কটের সময় কেবল দাদাসাহেবের কাছেই সে যেতে পারত। আজ সে-দরজা বন্ধ।

কিন্তু যুবক শিক্ষক শীঘ্র এ-কথা উপলব্ধি করে যে, ভাবাপ্লুত হয়ে সজ্ঞানে প্রার্থনা করেও সে মনে কোনো শান্তি পাচ্ছে না। শীঘ্র তার মনে হয়, হয়তো কাদেরের উপস্থিতিই তার অশান্তির কারণ। কেন সে আবার এসেছে? কী তার বলার বাকি? যুবক শিক্ষকের সামনে কঠিন কর্তব্য। সে-কর্তব্যপালনের জন্যে তার শান্তি ও সাহসের প্রয়োজন। কাদের কেন তাকে বিরক্ত করতে এসেছে? যুবক শিক্ষকের মতো সে-ও যদি আজ নিঃসহায় নিঃসঙ্গ বোধ করে, তার জন্যে তার নির্দয় অন্তরই দায়ী। সে-অন্তর মরুপ্রান্তরের মতোই ধু-ধু করে। সেখানে কোনো উদ্ভিদের জন্ম হলেও সে-উদ্ভিদ শীঘ্র কণ্টকাকীর্ণ হয়। সেখানে যদি ক্ষীণ আর্তনাদ জাগে, সে-আর্তনাদ চতুর্দিকের বালুরাশি অতিক্রম করতে পারে না। না, কাদেরের কোনো আবেদন থাকলেও তার কানে তা পৌঁছুবে না।

অশান্তি কাটে না দেখে যুবক শিক্ষক আরেকটি সূরা পছন্দ করে। কেন সেটি পছন্দ করে তা বোঝে না, কিন্তু তৃষ্ণার্তের মতো অধীরভাবে নিঃশব্দে তা আওড়াতে থাকে। দ্রুতভাবে তার ঠোঁট নড়ে, মনের গহ্বর থেকে সূরাটির শব্দগুলি অনর্গল ধারায় কিন্তু অশ্রোতব্যভাবে ঝরতে থাকে, তার চোখে চঞ্চলতা আসে। আবু লাহাবের শক্তি ধ্বংস হবে, সে ধ্বংস হবে : তার ধনসম্পত্তি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। লেলিহান আগুনে সে নিক্ষিপ্ত হবে, তার স্ত্রী—কাষ্ঠবাহক স্ত্রী—তার গলায় তালতন্তু তৈরি ফাঁস-দড়ি পড়বে। সূরাটি পড়তে পড়তে তার বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠে, কিন্তু আবৃত্তিতে একটু স্খলন হয় না, মনে কোনো ভয়ও জাগে না। কেন সে সূরাটি পড়ছে? তার চোখে কাদের কি আবু লাহাব-দম্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে? তাদের পাপ কি তার পাপের সমতুল্য? তাদের যে-শাস্তিবিধান কেতাবে লিখিত,

সে-শাস্তিবিধানই কি যুবক শিক্ষক তার জন্যে কামনা করে? অথবা পাপীর শাস্তি যে অনিবার্য সে-বিষয়ে তার মনকে সে কি নিশ্চিত করতে চায় যাতে তার সম্মুখে যে-কঠোর কর্তব্য সে-কর্তব্যপালনে তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা দেখা না দেয়?

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে না। মনে সে শান্তিও পায় না। নিমীলিত চোখে ভক্তিমান শান্তচিত্ত ব্যক্তির মতো সে নামাজ পড়ে, কিন্তু সেটি বাহ্যিক রূপ । ভেতরে অশান্তির জ্বালা।

অবশেষে নামাজ শেষ করে মাটিতে বসেই কাদেরের দিকে মুখটা সামান্য ফেরায়, কিছু বলে না। কাদের এবার তার খনখনে গলায় প্রশ্ন করে, "কী ব্যাপার?"

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কাদের তার প্রস্থানোদ্যোগ লক্ষ করে। তার কারণ জানতে চায়।

সামনের দেয়ালটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সেদিকে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক নীরব হয়ে থকে। তার উত্তরের কোনো প্রয়োজন নাই। কাদের কিছু না বলে কতক্ষণ চুপ করে থাকে। মনে হয় সে আর কিছু বলবে না, কিছু ঘটবেও না। তারপর অকস্মাৎ বিষম ক্রোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করতে শুরু করে। যুবক শিক্ষক তার কথা বুঝতে পারে না, বুঝবার চেষ্টাও করে না। কেবল তার ক্রোধটা দমকা হাওয়ার মতো তার গায়ে ঝাপটা দিলে সে অকারণে দুর্বল বোধ করতে শুরু করে।

তারপর কাদের নীরব হয়ে কেমন দম খিচে থাকে যেন। অবশেষে কৃত্রিম সংযত গলায় প্রশ্ন করে, "ক-জন চাই? সাক্ষী। ক-জন চাই?"

সামনের দেয়ালের রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে। সে-রক্তিমাভার অর্থ যুবক শিক্ষক যেমন বোঝে না, তেমনি কাদেরের কথারও অর্থ সে বোঝে না। নিস্পন্দভাবে সে বসে থাকে : সে যেন স্তূপাকার হাড়মাত্র।

কাদেরের সংযম স্থায়ী হয় না। সে এবার গর্জে ওঠে, "ক-জন সাক্ষী চাই? তারা বলবে কোথায় আপনাকে দেখেছে।"

এবার যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, কাদের তাকে ভয়-প্রদর্শন করছে। কিন্তু এবারও কিছু না বলে সে পূর্ববৎ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে। তবে আরেকটি কথা বুঝতে পেরে সে স্বস্তিই বোধ করে। সে মুখ খুলে কথাটি যদিও বলে নাই, কাদের তার সঙ্কল্পটি অনুমান করতে পেরেছে। তাকে মুখ খুলে কথাটি বলতে হবে না।

যুবক শিক্ষকের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর না পেলে কাদের হয়তো হতাশ হয়েই এবার নীরব হয়ে পড়ে। মনে হয়, দমকা হাওয়া নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঘরময় নীরবতাটি অবিচ্ছিন্ন থাকলে এক সময়ে যুবক শিক্ষকের মনে হয়, হয়তো কাদের কখন নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে। তাকিয়ে দেখবে কি দেখবে না সে-কথা ভাবছে, এমন সময় নিতান্ত অপরিচিত গলায় আস্তে প্রশ্ন করে, "মেয়েলোকটাকে চিনতেন?"

কাদেরের কণ্ঠস্বর তাকে এতই বিস্মিত করে যে তার মুখ হতে আপনা থেকেই একটা উত্তর বেরিয়ে আসে। সে বলে, "না।"

"সে বেঁচে নাই বা কীভাবে মরেছে, তাতে আপনার কী?

প্রশ্নটির জন্যেই হোক বা তার কণ্ঠস্বরের জন্যেই হোক যুবক শিক্ষকের মনে এবার একটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কাদের তার জন্যে কোনো প্রকারের ফাঁক তৈরি করছে যেন। থেমে কাদের আবার বলে, "কিন্তু দুর্ঘটনাটির কথা কাউকে বললে আমার কী হবে জানেন?" সে যেন অবোধ শিশুর সঙ্গে কথা বলছে। যুবক শিক্ষক আরো সতর্ক হয়, কিন্তু উত্তরটা শুনবার জন্যে তার শ্রবণেন্দ্রিয়ও সজাগ হয়ে ওঠে। পূর্ববৎ কণ্ঠে কাদের বলে, "ফাঁসি।" থেমে আবার বলে, "তাতে আপনার লাভ কী হবে?"

প্রথমে কোনো প্রতিক্রিয়াই যুবক শিক্ষক অনুভব করে না। তারপর সে বুঝতে পারে,

হঠাৎ তার সমস্ত শরীর অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছে। এমন ক্ষিপ্রগতিতে সে-দুর্বলতা সমস্ত শরীরে বিস্তারলাভ করে যে সে তা প্রতিরোধ করার কোনোই চেষ্টা করে না। কিন্তু কাদের যে-শব্দটি উচ্চারণ করেছে সে-শব্দটিতে সে এমন তীব্রভাবে আঘাত পাবে কেন? কথাটা কি সে একবারও ভাবে নাই? না, কথাটা সে ভাবে নাই। অন্ততপক্ষে, স্পষ্টভাবে ভাবে নাই। সে তার কর্তব্যের কথা ভেবেছে, কিন্তু পরিণামের কথা স্পষ্টভাবে ভাবে নাই। সে কি মনে করেছিল কথাটি তার এলাকার বাইরে? না, কথাটি ভাবতে তার সাহস হয় নাই?

যুবক শিক্ষক তার মুখের পার্শ্বদেশে কাদেরের দৃষ্টি অনুভব করে। একটা উত্তরের আশায় কাদের তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একটা উত্তর দেয়ার প্রয়োজনও সে নিজেই বোধ করে কিন্তু কী করে উত্তর দেবে? তার মনে হয়, কাদেরের দৃষ্টির তলে সে যেন গলে যাচ্ছে। একটি কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষ ক্রমশ একটি দায়িত্বহীন মানুষে, একটি বুদ্ধিমান মানুষ নির্বোধ মানুষে পরিণত হচ্ছে। যা সে শক্ত করে ধরেছিল তা যেন হাত থেকে ফস্‌কে যাচ্ছে। না, তার প্রতি ভাগ্যের নির্মমতা সত্যিই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বাঁশঝাড়ে একটি মৃতদেহ দেখেই তার নিস্তার নাই, একটি মানুষের জীবনমৃত্যুর দায়িত্বও তাকে নিতে হবে।

যুবক শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেলেও হয়তো তার মুখে বিহ্বলতার ভাব লক্ষ করে কাদের আশ্বস্ত বোধ করে। এবার বড়বাড়ির ছোকরাটি সকালের নাস্তা-পানি নিয়ে এলে কোনো কথা বলে, যেন আলাপ-আলোচনার মধ্যখানে বক্তব্য অসমাপ্ত রেখে কাদের হঠাৎ উঠে চলে যায়। যুবক শিক্ষক যখন সে-কথা বুঝতে পারে তখন সে অতি বিস্মিত হয়ে দরজার দিকে তাকায়। দরজাটি অর্থহীনভাবে শূন্য মনে হয়।

কথা শেষ না করে এমনভাবে কাদের চলে গেল কেন? সে কি তাহলে বুঝতে পারে নাই যে আজই সকালে তার নিষ্ঠুর কীর্তির কথা প্রকাশ করবে বলে সে মনস্থির করেছে? কথাটা অবশ্য বিশ্বাস হয় না। তবে যুবক শিক্ষককে নীরব থাকবার জন্যে স্পষ্টভাবে অনুরোধ করে সে তার বক্তব্যটি সম্পূর্ণ করে নাই কেন?

অবশেষে একটি কথা যুবক শিক্ষকের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে এবং তা তার কাছে বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে হয়। কাদের তাকে ভয় দেখিয়েছে, পরিণামের কথা বলেছে, কিন্তু বাঁশঝাড়ের কথাটি প্রকাশ না করার জন্যে একবারও অনুরোধ করে নাই। কেন? কারণ এ-কথা সে জানে যে, যুবক শিক্ষক একবার তার কাজের পরিণাম বুঝতে পারলে কথাটি প্রকাশ করা উচিত হবে কি হবে না তা সে নিজেই বুঝতে পারবে, নিষেধের প্রয়োজন হবে না। কাদের কি তার বুদ্ধিবিবেচনায় গভীর আস্থা প্রকাশ করে নাই?

জায়নামাজে বসেই যুবক শিক্ষক স্থির হয়ে থাকে। সময় কাটে। টেবিলের ওপর চা কিছুক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে থেমে গেছে, বাইরে উঠানে রোদ পড়েছে।

যুবক শিক্ষকের সন্দেহ থাকে না, কোথায় কী যেন গোলতাল পাকিয়ে উঠেছে, সে যেন নিজের উদ্দেশ্যই ভালোভাবে বুঝতে পারছে না। সে কী চায়? কেনই-বা তার মধ্যে একটুতেই এমন বিহ্বলতা দেখা দেয়? অথচ মাঝে মাঝে রাগান্বিত হলেও কাদেরকে এমন সুস্থির এবং আত্মনির্ভরশীল মনে হয় কেন? সে যেন সব জানে, সব বোঝে।

তাছাড়া, একটি নারীর মৃত্যুর অর্থই-বা কী?

অবশেষে যুবক শিক্ষক উঠে দাঁড়ায়। দেহের অসীম দুর্বলতা তার মনেও গভীর অবসাদ সৃষ্টি করেছে। সে যন্ত্রচালিতের মতো বড়বাড়ির অভিমুখে রওনা হয়। সে জানে, অন্যান্য দিনের মতো সে ছেলেমেয়েদের পড়াতেই যাচ্ছে।

না, তার সঙ্কল্পে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তবে আজ সকালে সে দাদাসাহেবকে কথাটা না বলে সন্ধ্যাবেলায়ই বলবে। ইতিমধ্যে এত দেরি হয়েছে, আরেকটু দেরি হলে তেমন ক্ষতি কী? বিষয়টি আবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। তার বিবেচনায় যদি কোনো ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তবে একবার বলে ফেললে পরে শোধরানো সহজ হবে না। অবশ্য ভুলভ্রান্তির কোনো সুযোগ

সে দেখতে পায় না। তবু বিষয়টি অতি গুরুতর। তার সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া ভালো।

একটি কথায় সে নিজেই কিছু বিস্মিত না হয়ে পারে না। বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি প্রকাশ করায় কিছু বিলম্বের সুযোগ পেয়ে সে এমন স্বস্তিবোধ করছে কেন?

চৌদ্দ

দুপুরবেলায় ইস্কুলের বিশ্রামঘরে আত্মপ্রবঞ্চনার কথাটি যুবক শিক্ষক সর্বপ্রথম আপন-মনে স্বীকার করে। বস্তুত, স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়। সর্বপ্রকার চেষ্টার শেষ হয়েছে, কি করে তার ক'দিনব্যাপী মানসিক বিহ্বলতার সত্য কারণ নিজের কাছে আর ঢেকে রাখে? সঙ্গে সঙ্গে যে-ন্যায়বানের শ্বেতসৌধ সে সৃষ্টি করেছিল তা নিমেষে ধূলিসাৎ হয়। নিজের কাছেই সে নিজে ধরা পড়েছে অবশেষে : কোথাও আর একটি প্রাচীর দাঁড়িয়ে নাই যার পশ্চাতে সে আত্মগোপন করতে পারে।

সত্যি, সন্দেহের আর অবকাশ নাই। জটিল এবং পরিশ্রমসিদ্ধ আত্মপ্রবঞ্চনাটি শুরু হয় তখন যখন আত্মরক্ষার প্রবল বাসনার জন্য তার বিবেকের নির্দেশ শুনতে সে অক্ষম হয়। তারপর তার লজ্জাকর ভীতি-দুর্বলতা সে নিজের কাছেই লুকাবার চেষ্টা করে।

কাদের একটি গুরুতর অপরাধ করেছে তা জানতে পারলে একটি কঠিন সমস্যাও সে অনতিবিলম্বে দেখতে পায়। লোকটি সম্ভ্রান্তশালী অভিভাবক-আশ্রয়দাতার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। অন্যদিকে, যুবতী নারী শুধু যে তার সম্পূর্ণ অপরিচিতা তা নয়, সে আর জীবিতদের মধ্যে কখনো প্রত্যাবর্তন করবে না। আজ সকালে কাদেরের উক্তির পরেই সে তা বুঝতে পারে। কাদের তাকে প্রশ্ন করেছিল, সে যুবতী নারীকে চিনত কিনা। হত্যাকাণ্ডটি প্রকাশ করলে তার কী শাস্তি হবে তা-ও সে স্পষ্টভাবে বলেছিল। বস্তুত, আত্মপ্রবঞ্চনার কথাটি বুঝবার ব্যাপারে কাদেরই তাকে সাহায্য করেছে।

যুবক শিক্ষক লজ্জাই বোধ করে, তার কানে কেমন ঝাঁঝ ধরে। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নাই, সে-ভাবেই মানসিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বিবেক বলে, কথাটি প্রকাশ করা তার কর্তব্য, কিন্তু কাজটি তার কাছে দুষ্কর মনে হয়। সে দুর্বল মানুষ। মানসিক দ্বন্দ্বটি অসহ্য হয়ে উঠলে সে একটি পলায়নপথ আবিষ্কার করে : স্বপ্নরাজ্যে সে আশ্রয় গ্রহণ করে। তার দুর্বলতার সমর্থনে যদি কোনো যুক্তি থাকে তবে তা হয়তো এই যে, যুবতী নারী তার অপরিচিতা বলেই তার প্রতি নির্মম অবিচারটি সে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে নাই, কাদেরের অপরাধটিও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে নাই। কিন্তু সে-যুক্তিতে জোর আছে কি নাই তার বিবেচনা এখন তার কাছে অহেতুক মনে হয়।

কর্তব্যটি যাতে পালন না করতে হয় সে-জন্যে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করে সেখানেই সে এ-ক'দিন বাস করছে। যুবতী নারীর মৃতদেহটি বহনের ব্যাপারে কাদের যখন তার সাহায্যপ্রার্থী হয় তখন সে ইতিমধ্যে স্বপ্নরাজ্যে পৌঁচেছে। বাস্তবজগৎ তখন মূল্যহীন বলে কাদেরকে সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নাই। তবে স্বপ্নরাজ্যে সে নিরাপদ বোধ করে নাই : সব প্রবঞ্চনার মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনাই অধিকতম শক্ত। তাই সেখানে সে অলস হয়ে বসে থাকে নাই। তার বাহ্যিক আচরণ বিহ্বল মানুষের মতো হলেও সে অতি দক্ষতা এবং ব্যগ্রতার সঙ্গে কাদেরকে দোষমুক্ত করবার জন্যে একটির পর একটি বিচিত্র অবিশ্বাস্য যুক্তি-অজুহাত আবিষ্কার করেছে। কেন? কারণ কাদের নির্দোষ প্রমাণিত হলেই তার রক্ষা। তাহলে বিবেকের নির্দেশটি তাকে আর শুনতে হবে না, বিপজ্জনক কর্তব্যটিও পালন করতে হবে না। আত্মরক্ষার জন্যে সে কী সব যুক্তি-অজুহাতই না আবিষ্কার করেছে এবং তাতে নিজেই বিশ্বাস করেছে? যেমন, কাদের কেন মৃতদেহটি নদীতে ফেলবে ঠিক করে।

হঠাৎ যুবক শিক্ষকের কাছে কাদের একটি দয়াশীল মহৎ মানুষ হিসেবে উদয় হয় এবং সে যুবতী নারীকে একটি নিদারুণ অপমান থেকে উদ্ধার করতে চায়।

তবে গোড়াতে আত্মপ্রবঞ্চনা শক্ত বলেই নয়, অন্য একটি কারণেও সে-সব যুক্তির পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করা তার পক্ষে তত সহজ হয় নাই : তখন বাঁশঝাড়ের সত্য কথাটি সে নিশ্চিতভাবে জানত না। দুঃখের বিষয়, কাদের নিজের মুখেই কথাটি স্বীকার করে বসে। তারপর যুবক শিক্ষকের পক্ষে স্বপ্নরাজ্যে বাস করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে, পালাবারও কোনো পথ থাকে না। কিন্তু হাল ছাড়তে সে রাজি হয় না। তার ভীত-নিপীড়িত মস্তিষ্ক শীঘ্র একটি নূতন যুক্তি দেখতে পায়। যুক্তিটি এই যে, যুবতী নারীর প্রতি প্রেম ছিল বলেই কাদের তার অন্তিম ব্যবস্থা না করে পারে নাই। এবং, যেহেতু নারীর প্রতি কাদেরের প্রেম ছিল সেহেতু হত্যাকাণ্ডটি শুধুমাত্র একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা নয় কি? আর সে যুক্তি অনুসারে তার অপরাধও কি ক্ষমার্হ নয়?

কাদেরের হাতেই যুবক শিক্ষকের স্বপ্নরাজ্যের দুর্বল প্রাচীর দ্বিতীয় বার ভাঙে। প্রেমের কথাটি সে স্বীকার করে না। বরঞ্চ সেটি যে অচিন্তনীয় সে-কথা সে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়। এবার যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, তার পালাবার সত্যিই কোনো পথ নাই : তার কর্তব্যটি যতই ভীতিজনক হোক না কেন, সেটি এড়াবার আর কোনো উপায় নাই।

সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে সে যখন ঘটনাটি প্রকাশ করবার জন্যে সাহস যোগাড় করার চেষ্টা করছে তখন কাদের তাকে প্রথম বার একটু সাহায্য করে, স্বপ্নরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করার একটি পথ দেখায় তাকে। সে বলে, ঘটনাটি প্রকাশ করলে তার চূড়ান্ত শাস্তি হবে এবং তার জন্যে যুবক শিক্ষক একাই দায়ী হবে। কাদের যে-বীভৎস শব্দটির উচ্চারণ করে সে-শব্দটিই ঘোর তমসার মধ্যে একটু আলোর সৃষ্টি করে। নতুন উদ্যমে যুবক শিক্ষক তার যুক্তির তলোয়ারে শান দেয় এবং তার এই বিশ্বাস হয় যে, সে-অস্ত্রটির সাহায্যে সে যে শুধু বিবেকের সামনাসামনি হতে পারবে তা নয়, বিবেককে কাবু পর্যন্ত করতে পারবে। এবার তার নিজের সর্বনাশের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে অন্য একটি মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে। সে নিজের প্রাণের জন্যে ভীত নয়, অন্য মানুষের প্রাণের জন্যে ভীত। সে-মানুষের জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি ভীষণ দায়িত্ব গ্রহণ করার যথার্থ সব কারণ কি তার জানা আছে?

যুক্তিটি অব্যর্থ মনে হয় কেবল অল্প সময়ের জন্যেই। শীঘ্র সে বুঝতে পারে, সেটি অতিশয় দুর্বল। আত্মপ্রবঞ্চনার জন্যে যথেষ্ট তো নয়ই, তা দিয়ে বিবেককেও মানানো যায় না। আর কোনো উপায় যখন নাই তখন সত্য কথাটি স্বীকার করতে অসীম লজ্জা হলেও তা স্বীকার করাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? তাছাড়া, আপন-মনে বিবেকের মূল্য কী?

সত্য কথা হল এই, বাঁশঝাড়ের হত্যাকাণ্ডটি প্রকাশ করার সাহস তার নাই। প্রথমা দিন ছিল না, আজও নাই। সে ভীত, দুর্বলচিত্ত অসহায় মানুষ। কাদেরের ভয়-প্রদর্শন কার্যকরী হয়েছে। নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর যখন সম্ভব নয় তখন ফাঁকি দেবার চেষ্টা ছেড়ে কেন সে ভীত সে-কথা খোলাখুলিভাবে বুঝবার চেষ্টা করাটাই কি সাধু কাজ হবে না? তাছাড়া, বিবেকের মুখ বন্ধ করবার জন্যে ছলনার চেয়ে এ-পন্থাটাই অধিকতর কার্যকরী। বস্তুত তার মনে হয়, ভীতির নগ্ন চেহারা দেখে বিবেকের কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়েছে।

ঘটনাটি প্রকাশ না করার পক্ষে যে-সব যুক্তি সে পরিষ্কারভাবে ভাবতে সাহস পায় নাই, এবার সে-সব যুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখতে তার আর বাধে না। চারপাশে খোলা মাঠ, আর বাধা কোথায়? প্রথমত, সে নিজের কথাই ভাবে। কে সে? একজন দরিদ্র শিক্ষক মাত্র। বর্তমানে জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনী কিন্তু দয়াশীল মানুষের অভিভাবকত্বে জীবনে সর্বপ্রথম বেদনাদায়ক অভাব-অভিযোগটা যেন ভুলেছে, সুখের একটু আস্বাদ পেতে শুরু করেছে। তার ব্যক্তিগত দারিদ্র্যই যে শুধু ঘুচেছে তা নয়। সে তার বিধবা মা এবং তার মুখাপেক্ষী দুটি ভাই-বোনকেও খাওয়াতে-পরাতে পারছে। তার যদি কোনো ক্ষতি হয় তবে কে তাদের

দেখাশোনা করবে? কাদের যে তাকে মিছামিছি ভয় দেখিয়েছে সে-কথা ভাবা অন্যায়।

তাছাড়া, কার জন্যেই-বা সে নিজের সর্বনাশ করবে? যুবতী নারী তার আত্মীয়-বন্ধু নয়, তার মৃত্যুতে সে ব্যক্তিগতভাবে কোনোপ্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। এ-হতভাগা দেশে কত যুবতী নারীর জীবন অর্থহীনভাবে এবং অকারণে শেষ হয়, কে প্রতিবাদ করে, কে একবার ফিরে তাকায়? যেখানে জীবন মূল্যহীন সেখানে আরেকটি জীবন শেষ হয়েছে। কীভাবে হয়েছে, তাতে কোনো অন্যায়-অবিচার হয়েছে কিনা, সে-বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে সে নিজের ওপর বিপদ ডেকে আনবে কেন?

তারপর, কাদেরের কথা। হোক তার অপরাধ অতি গুরুতর বা যুবতী নারীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কারণ পশুবৎ বাসনা, হোক সে নির্মম-নির্দয় মানুষ, তবু সে যুবক শিক্ষকের কোনো ক্ষতি করে নাই। তাছাড়া, কাদের তার বন্ধু না হোক, সে তার শত্রুও নয় : তার প্রতি সে হিংসাদ্বেষ বা প্রতিহিংসার ভাব বোধ করে না। কাদেরের সঙ্গে লড়াই করে তার কী লাভ হবে, কারই-বা সে মঙ্গল করবে?

যুবক শিক্ষকের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, যুবতী নারীর মৃত্যুর সুবিচার হোক, তার চেষ্টা করলে কেউ তাকে সমর্থন করবে না, কেউ তাকে সাধু-সত্যবান বলে তার গলায় মালা দেবে না। সত্যবাদিতার মূল্য অবশ্য কেউ খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করে না। এ-কথাও কেউ অস্বীকার করে না যে, সাক্ষ্য দেবার সমন পড়লে মিথ্যা বলা অন্যায়—বিশেষ করে মিথ্যাবিবৃতি যখন ধরা পড়ে। কিন্তু যুবক শিক্ষককে কেউ সমন পাঠায় নাই। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সত্যকথা বললে, এবং তার জন্যে শাস্তি লাভ করলে, তাকে তারা নির্বোধই বলবে।

যুবক শিক্ষক সহসা তার সহযোগীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

"মানুষটি আরামে ছিল। খাসা চাকুরি, বড়বাড়িতে জামাই-আদর। বোকা না হলে খামাখা নিজের ওপর এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে কেন?"

"তাই। কত অন্যায়-দুর্নীতির কথা মানুষ জানতে পায়। কিন্তু নিজের ভাত মারা না পড়লে নিজের ক্ষতি করে কেউ সে-সব কথা প্রকাশ করে নাকি?"

আদর্শ চরিত্র শুধু রূপকথায় বিরাজ করে, বাস্তবজগতে তার অস্তিত্ব নাই।

যুবক শিক্ষকের কোনো ক্ষতি না হলেও, এবং কাদেরের যথাযথ শাস্তি হলেও তারা যুবক শিক্ষককে উচ্চাসনে বসাবে না। তার কার্যে তারা গূঢ় অভিসন্ধি খুঁজে বের করবে।

"নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কথা আছে।" (উক্তিটি যুবক শিক্ষক বারবার শোনে নাই কি?) "তার নিরীহ গোবেচারা চেহারায় ভুলবেন না।"

"কী কথা?

"বলে দিলাম, মেয়েলোকটির সঙ্গে আমাদের মাস্টারটিরও যোগাযোগ ছিল।"

ন্যায়বানের প্রতি ক্রূরহিংসায় তাদের হৃদয়ে অশান্তির সৃষ্টি হবে। অন্য কেউ আরেকটি সম্ভাবনার কথা বলবে।

"কোনো কারণে বড়বাড়িতে জামাইর আদর শেষ হয়ে আসছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে যাদের নিমক খেয়েছে তাদেরই ক্ষতি করবার জন্যে কথাটা সে প্রকাশ করেছে।"

অকারণে কেউ ন্যায়বানের মুখাচ্ছাদন পরে না।

যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কাদেরের পাল্টা অভিযোগটা প্রমাণিত হলে কারো মনে কি একবার কাদেরের দেরি করে কথাটা প্রকাশ করার বিষয়ে একটু প্রশ্ন জাগবে না? হয়তো জাগবে। কিন্তু যুবক শিক্ষক তারও একটা উত্তর শুনতে পায়।

"আহা, দরবেশ মানুষ। অতশত কী বোঝে?"

যুবক শিক্ষক তার সমর্থনে একটি কণ্ঠস্বরও শুনতে পায় না। কিন্তু জয় বা পরাজয়ের পরে তারা কী বলবে, সে-ভয়েই যে সে ভীত তা নয় : তাদের সম্ভাব্য মতামতের জন্যেও সে আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন বোধ করে নাই। তবু সে-সব কি ঘটনাটি প্রকাশ না করার পক্ষে গণ্য

কথা যায় না?

যুবক শিক্ষক কিছুক্ষণ আপন মনে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার অনুসন্ধান যেন শেষ হয়েছে। পূর্বের সিদ্ধান্তটি ত্যাগ করে নূতন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আর কোনো বাধা নাই। ভেতরটা কেমন হাল্কা-হাল্কাই মনে হয়, কষ্টকর আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে সে হয়তো স্বস্তিই বোধ করে।

তবু সে নিজের মনেই শেষবারের মতো দুটি প্রশ্ন না করে পারে না। যুবতী নারীর সঙ্গে কাদেরের সম্পর্কটি যখন নিন্দনীয় এবং হত্যাকাণ্ডটি যখন অতিশয় গুরুতর অপরাধ, তখন তা প্রকাশ না করে কেউ চুপচাপ বসে থাকতে পারে কি?

যুবক শিক্ষক আবার তার সহযোগীদের চেহারা দেখতে পায়। তারা যেন কেমন গোপনভাবে হাসছে। তারপর তাদের উত্তরটা সে শুনতে পায়।

"পুরুষের ওসব দুর্বলতা একটু থাকেই। দোষটা আসলে মেয়েলোকটির। দুশ্চরিত্রা হলে এমন অপঘাত মৃত্যু অবধারিত।"

বিশ্রামঘরটা শীতল হলেও কেমন ভ্যাপসা গরম বোধ করে যুবক শিক্ষক। চারপাশটা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে যেন। হয়তো ভালো করে শ্বাস নেবার জন্যেই সে সোজা হয়ে উঠে বসলে আরবির মৌলবীর ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। আজ সে বিপরীত দিকে বসে চোখ বুজে হয়তো ঝিমুচ্ছে। যুবক শিক্ষক অকারণে তার চিন্তাশূন্য শান্ত মুখমণ্ডলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর সে বুঝতে পারে, নিজের মনে যে-সব সহযোগীদের চেহারা সে দেখেছিল তার মধ্যে মৌলবীর শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারাটি নাই। তাকে কি একবার জিজ্ঞাসা করে দেখবে? হয়তো সে তাকে সমর্থন করবে। মনের ভীতির জন্যে যে-ব্যাপারটি তার কাছে অতীব গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়েছে, হয়তো সেটি তার কাছে কোনো সমস্যাই মনে হবে না। সমস্যা কোথায়? একটি খুনের কথা সে জানতে পেরেছে। সে-কথা সে প্রকাশ করবে। তাতে কোনো জটিলতা বা ভীতির প্রশ্ন নাই।

মৌলবী চোখ বুজে থাকলেও চোখের অন্তরালে তার দৃষ্টি অবিশ্রান্তভাবে এধার-ওধার নড়ে : যেন চোখ বুজেই সে সব কিছু দেখতে পায়। তারপর তার চোখের পাতা নিমীলিত থেকেই প্রজাপতির পাখার মতো ফড়ফড় করতে শুরু করে, মনে হয় চোখ খুলবে। কিন্তু এবার মৌলবীর জিহ্বাগ্র ধীরে-সুস্থে এবং নিপুণতার সঙ্গে দাঁতপাটির গুহাগহ্বরে খাদ্যকণার সন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনতিবিলম্বেই সে তার সন্ধানকার্যে সাফল্যমণ্ডিত হয়। তারপর কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার চোখমুখ নিশ্চল হয়ে পড়ে। সে কি তুচ্ছ খাদ্যকণাটির জন্যে মহান অন্নদাতার কাছে শোকর আদায় করছে?

হয়তো সেটি তার খেয়াল, তবু যুবক শিক্ষক ক্ষিপ্রগতিতে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর নিরাশায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। না, মৌলবীর মতো অসহায় ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো উপদেশ আশা করা বৃথা।

কিন্তু উপদেশের আর প্রয়োজনই-বা কী? ইতিমধ্যে তার সমস্যার সমাধান কি হয় নাই? ঘটনাটি প্রকাশ করার বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তিতর্কে সে কি সন্তুষ্ট নয়?

না, সে সন্তুষ্ট। সমস্যার সমাধান হয়েছে, আর ভাবনার কারণ নাই। কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন আর নাই।

বিশ্রামঘরে আজ প্রগাঢ় নীরবতা, তর্কবিতর্ক এখনো শুরু হয় নাই। সে-নীরবতার মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি অস্পষ্ট শ্রান্তিতে চোখ বোজে। তার কি ঘুম পাচ্ছে? জোয়ারের সময় চর যেমন আস্তে, অলক্ষিতে ডুবে যায়, তেমনি তার সমগ্র অস্তিত্ব শ্রান্তির কালো জোয়ারে নিমজ্জিত হয়। না, তার আর কোনো প্রশ্ন নাই, বলবারও কিছু নাই। নিঃশব্দে সময় কাটে। কখনো কখনো কেউ কথা বললে মনে হয় তার কণ্ঠ যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসে। বাইরে মাঠে খেলারত ছেলেদের চিৎকারধ্বনি অর্থহীন কোলাহলে পরিণত হয়।

তারপর একসময় যুবক শিক্ষক আস্তে চোখ খুলে তাকায়। তার দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন; কী যেন তার স্মরণ হয়েছে। একটু পর সে কারো সন্ধান করে, ধীরে ধীরে এধার-ওধার তাকায়। অবশেষে তারই বাম পাশে উপবিষ্ট সেদিনের বিজয়ী বক্তার ওপর তার দৃষ্টি থামে। সে আজ নির্বাক। নত মাথায় আঙুল দিয়ে নাক খুঁটতে খুঁটতে গভীর মনোযোগসহকারে সে একটি সংবাদপত্র পড়ে।

শীঘ্র সে পাতা উল্টাতে খস্‌খস আওয়াজে ঘরের নীরবতা ভঙ্গ হয়। যুবক শিক্ষক আর দ্বিধা করে না। বক্তাকে প্রশ্ন করে, "মেয়েলোকটার সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে কি?"

তার আকস্মিক প্রশ্নে বিশ্রামঘরে অতি ক্ষীণ একটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়, যেন শান্ত পানির বুকের ওপর দিয়ে একটা পাখি উড়ে গেল। তারপর কয়েক জোড়া দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ হয়।

সেদিনের খবরবিশারদ প্রথমে যুবক শিক্ষকের প্রশ্নটির অর্থোদ্ধার করতে যেন সক্ষম হয় না। সে কি এর মধ্যে এমন মুখরোচক কথাটি ভুলে গেছে?

না, তার স্মরণ হয়। বিপরীত দেয়ালের দিকে চোখ মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে নাকে একবার উচ্চ আওয়াজ করে, ডান উরুটা চুলকে নেয় বার কয়েক। তারপর সে পাল্টা প্রশ্ন করে, "কী জানা যাবে?"

যুবক শিক্ষকের গলায় ঈষৎ কাঁপন ধরবার উপক্রম করে। সরাসরি প্রশ্নটা করতে তার দ্বিধা হয়। অবশেষে অস্ফুটভাবে কেশে সে বলে, "কে তাকে খুন করেছে?"

"ও।" এবার বক্তার চোখ ক্ষিপ্রগতিতেই মিট্‌মিট্ করতে শুরু করে। তারপর তাতে সামান্য হাসির আভাস জাগে। যুবতী নারীর মৃত্যু সম্বন্ধে সে একটি বিচিত্র খবর দেয়।

যুবতী নারীর বৃদ্ধা মায়ের বিশ্বাস যে, হতভাগিনীর ওপর জিন-পরীর আছর পড়েছিল। একদিন দুপুরবেলায় উঠানে বসে সে শালীর চুলে উকুন দেখছিল, এমন সময় দীর্ঘকায় সাদা কিছু তার সামনে এসে দাঁড়ায়। মেঘহীন আকাশে সাদা মেঘের মতো, স্তব্ধদিনে দমকা হাওয়ার মতো। কানা শালী কিছু দেখতে না পেলেও তার গায়ে হাওয়া লাগে। তবে কেমন ধরনের হাওয়া যেন। বৃদ্ধা নারী ঘরে ছিল। অকারণে তার বুকটাও কেঁপে ওঠে।

সেদিন থেকে যুবতী নারীর দশা উপস্থিত হয়। যার একবার দশা হয় সে কি আর বাঁচতে পারে?

শীঘ্র হাসির ভাবটা মিলিয়ে যায় বক্তার চোখ থেকে।

"কেন?"

কয়েক জোড়া দৃষ্টি যুবক শিক্ষকের উপর পূর্ববৎ নিবদ্ধ হয়ে থাকে।

প্রশ্নটি সে শুনতে পায় না। এবার তার মনে পরম স্বস্তির ভাব এলে সে ভাবে, শেষ বাধাটিও অবশেষে দূর হয়েছে। চাষাভূষা মানুষেরাও কথাটা গোপন রাখার প্রয়োজন বোধ করে। এ-বিষয়ে হন্তা-নিহতের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই।

সন্দিগ্ধ চোখে বক্তা সহযোগীদের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে আবার বলে, " কেন?"

"এমনি।" যুবক শিক্ষক কোনোপ্রকারে উত্তর দেয়। তারপর সে মাথা নত করে। মুখে ভারি কিছু নেবেছে যেন, ঠোঁটের পাশটাও কেমন বিকৃত হয়ে উঠেছে। স্বস্তির ভাবটা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তারপর হঠাৎ ঝড়ের মতো তর্কবিতর্ক শুরু হয়। হাসিভরা চোখে বক্তা যে-কথাটি বলেছিল, সে-বিষয়ে অনেকের মৌলিক কিছু বলবার আছে।

তারপর যুবক শিক্ষক তার হাত দুটি টেবিলের তলায় লুকায়। তার ভয় হয়, হয়তো তার হাত কাঁপতে শুরু করবে।

পনেরো

দাদাসাহেব ফজরের নামাজ শেষ করে কারুকার্যময় রেহালে কোরান শরীফ রাখবেন এমন সময় একটি চাকর দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। এ-সময়ে তাঁর ধর্মীয় কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তিনি বিরক্ত বোধ করেন বলে চশমার ওপর দিয়ে অসন্তুষ্টদৃষ্টিতে তার দিকে তাকান।

"মাস্টার দেখা করতে চায়।"

দাদাসাহেবের মুখ থেকে অসন্তুষ্ট ভাবটি মিলিয়ে যায়। একটু ভেবে তিনি বলেন, "যাও, আসছি।"

চাকরটি অদৃশ্য হয়ে গেলে জরির কাজ-করা গাঢ় লালরঙের মখমলের সুদৃশ্য আবরণে কোরান শরীফ ভরে সেটি বুকের কাছে ধরে কতক্ষণ তিনি নিশ্চল হয়ে বসে থাকেন, মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা দেয়। তাঁর সন্দেহ থাকে না যে, যুবক শিক্ষক কাদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে এসেছে। কিন্তু কী কথা?

কাদের এবং যুবক শিক্ষকের মধ্যে হঠাৎ দেখাশুনা হলে তিনি কৌতূহলী হয়ে সেদিন যুবক শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তাদের দেখাশোনার কারণ যুবক শিক্ষকের নিকট হতেই জানা সহজ হবে। কিন্তু সে কিছু বলতে রাজি হয় নাই। তার আচরণ এবং না-বলতে চাওয়ার অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নাই। কী এমন কথা হতে পারে যা বলতে তার এত দ্বিধা? অকারণে কাদেরের সেদিনের বিচিত্র দৃষ্টিও তাঁর স্মরণ হয়। সে-দৃষ্টির অর্থও তিনি এখনো বুঝতে পারেন নাই।

কাদের দরবেশ সে-কথা তিনি নানা সময়ে বলে থাকেন বটে কিন্তু তাতে যে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন, তা নয়। তিনি নিজেই জানেন, তা তাঁর একটি খেয়াল মাত্র। তবে এমন একটি খেয়াল যা কাদেরের মতো মানুষের পক্ষে সত্য হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তার আচরণ-ব্যবহার দশজনের মতো নয়। সাধারণ জীবনের নক্‌শার সঙ্গে তার জীবনের মিল্‌জুক নাই। তার সম্বন্ধে তার বড় ভাইয়ের ভাবনাচিন্তা হওয়া স্বাভাবিক। তাই একদিন তিনি আশা করতে শুরু করেন, হয়তো কাদেরের মন দরবেশীতেই। আশাটি সত্য হলে তার আচরণের একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হবে, ভাবনাচিন্তারও কারণ থাকবে না। ক্রমশ আশাটি একদিন খেয়ালে পরিণত হয়। প্রথমে-প্রথমে সে-রসিকতা-অবিশ্বাসের অংশটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুবক শিক্ষক তাঁর সে আশা-খেয়াল ভাঙতে এসেছে কি?

অবশেষে সজোরে কেশে গলা সাফ করে তিনি উঠে দাঁড়ান। না, এমন আশঙ্কা অহেতুক।

রেহালটি প্রশস্ত বিছানায় স্থাপিত জায়নামাজের ওপর পড়ে থাকে। তবে কোরান শরীফটা তিনি খাটের মাথার কাছে তাকের ওপর সযত্নে তুলে রাখেন। তারপর গলার মাফলারটি ভালো করে পেঁচিয়ে আলোয়ানটাও আরেকবার জড়িয়ে নেন। এ-সময়ে মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ কেমন একটি কথা তাঁর মনে আসে। তিনি ভাবেন, না, তাঁকে কাদের সম্বন্ধে কোনো কু-কথা বলার সাহস যুবক শিক্ষকের হবে না। অবশ্য তৎক্ষণাৎ সেটিকে মন থেকে দূর করে তিনি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন।

শূন্য বারান্দায় নিশ্চল হয়ে বসে যুবক শিক্ষক দাদাসাহেবের জন্যে অপেক্ষা করে। একটু দুর্বল দেখালেও মুখ শান্ত। নিদ্রাহীনতার জন্যে চোখে শুষ্কতা কিন্তু তাতেও অস্থিরতা-বিহ্বলতার স্পর্শ নাই। মেঝের সাদা-কালো ছকের দিকে তাকিয়ে ধীর-স্থির ভাবেই সে ভাবে, অবশেষে দাদাসাহেবকে দুঃসংবাদটি দিতে এসেছে। দুঃসংবাদটি এই যে, কাদের একটি যুবতী নারী খুন করেছে। কিন্তু কেবল দুঃসংবাদটি দিতেই কি সে এসেছে? বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি আসলে বড় অস্পষ্ট মনে হয়। শুধু তা-ই নয়। যা সে বলতে এসেছে এবং যা দাদাসাহেবকে নিঃসন্দেহে ক্রুরভাবে আঘাত দেবে, তা যেন ঘটনাটির সঙ্গে অতি ক্ষীণভাবে

জড়িত। যা সে বলতে এসেছে আর যা ঘটেছে, সে দুটি পৃথক বিষয় যেন। হত্যাকাণ্ড নয়, কাদের যেভাবে তার সামনে স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে নিজেকে ধ্বংস করেছে সেটাই বড়। কাদের যখন নিম্নতম সোপানে এসে নাবে তখন তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই : কেবল থেকেছে সামান্য বিষাক্ত কালো ধুঁয়া, হয়তো একটা দূষিত ছায়া।

না, তার ধ্বংস হওয়াটাও আর বড় কথা নয়। বাঁশঝাড়ের ঘটনার মতো সেটিও যেন আবছা হয়ে উঠেছে। যুবক শিক্ষক এখন কেবল একটি কথাই বোঝে। কাদের অবশেষে যে বিষাক্ত ধুঁয়ায় এবং দূষিত ছায়ায় পরিণত হয়েছিল, সে-ধুঁয়া এবং ছায়া যুবক শিক্ষককেও যেন গ্রাস করার উপক্রম করেছিল।

মনের কথা বোঝা মুশকিল। বাঁশঝাড়ের ঘটনাটি কেন তার মনে এমন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল তা সে এখনো সঠিকভাবে জানে না। হয়তো হত্যাকাণ্ডের কথাটি তার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হয় নাই। এমন নির্মম কথা বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক। অথবা বিশ্বাস না-করাই সম্ভব হয় নাই। তাই কথাটা প্রকাশ করলে তার সমূহ ক্ষতি হতে পারে সে-কথা কাদেরের নিকট হতে শোনার আগেই নিজেকে বুঝতে পেরে স্বপ্নরাজ্যে সে আশ্রয় নিয়েছিল। দুটির ফল কিন্তু একই : ঘটনাটির বিষয়ে তার নীরবতা এবং দুটিই যে-কোনো একটির সাহায্যে তার পক্ষে সর্বপ্রকার আত্মরক্ষা করাও সম্ভব হত : মনটা নিষ্কলঙ্ক থাকত, কোনোপ্রকার ক্ষতিও হত না। কিন্তু কোনোটাই ধরে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কথাটা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে নাই, স্বপ্নরাজ্যে বাস করাও সম্ভব হয় নাই।

কেন? কারণ নিজের কাছে তার মনের ভয় লুকানো আর সম্ভব হয় নাই। আয়নায় একটি নগ্নভীতি দেখতে পায়; তার সন্দেহ থাকে না যে সেটি তারই প্রতিবিম্ব। তার কার্যের পরিণাম সম্বন্ধে এখনো সে ভীত, কিন্তু কাজটি না করে এখন তার উপায় নাই। ভয়টা যে তারই মনের ভয়, সে-কথা সে এখন জানে।

পরিণামভীতি না কাটা সত্ত্বেও সে যখন কথাটি প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে তখন কোনো একটি যুক্তির সাহায্যে সে নিশ্চয়ই তার ভীত মনকে মানিয়েছে। হ্যাঁ, যুক্তি একটা আছে বটে, কিন্তু হয়তো সেটি একটু বিচিত্র। দাদাসাহেবকে তা সে বোঝাবার চেষ্টা করবে। তাহলে তিনি একথাও বুঝতে পারবেন যে, সে তাঁকে কাদের সম্বন্ধে একটা নিষ্ঠুর খবরই দিতে আসে নাই। তারপর তাঁর পক্ষে যুবক শিক্ষককে খানিকটা ক্ষমা করাও হয়তো সম্ভব হবে।

গতকাল স্বচ্ছদৃষ্টিতে পরিণামের সম্ভাবনাগুলি ভেবে সে ভয়ই পেয়েছিল। তারপর সে একটি কথা জানতে পারে। কথাটি এই যে, যুবতী নারীর আত্মীয়-স্বজন হত্যার অপরাধটি জিন-পরীর ঘাড়ে চাপানোই শ্রেয় মনে করেছে। হত্যাকারী কে তা না-জানলেও হত্যার কথা সন্দেহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নাই; মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সরকারি ডাক্তারের রায়ের মধ্যে জিন-পরীর নামগন্ধ পর্যন্ত নাই। তবে কেন তারা জিন-পরীর নাম তুলেছে? কারণটি হয়তো এই যে, মৃত যুবতী নারীকে আর যখন তারা ফিরে পাবে না তখন তার মৃত্যুর অপ্রীতিকর ব্যাপারটি ঘাঁটিয়ে লাভ নাই। আত্মীয়-স্বজনের এমন বাসনা স্বাভাবিক।

এমন সময় যুবক শিক্ষক একটি বিচিত্র কথা লক্ষ করে। কথাটা সত্যিই বিচিত্র। (প্রথমে ঘটনাটি প্রকাশ না করার জন্যে সে যেমন অদ্ভুত যুক্তি-অজুহাতের সাহায্য নিয়েছিল, এবার তা প্রকাশ করবার জন্যেও কি তেমনি অদ্ভুত যুক্তি-অজুহাতের সাহায্য নিচ্ছে?) সে দেখতে পায় যে, সব যুক্তি কাদেরের, তার নিজের, এমন কি যুবতী নারীর মৃত্যুতে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ তার আত্মীয়-স্বজনের—সব যুক্তিই সত্য ঘটনাটি গোপন রাখার পক্ষে। সহসা তার মনে হয়, এই ঐকতানের মধ্যে একটি নিগূঢ় অর্থ আছে যেন।

না-বলার পক্ষে অতি আগ্রহের সঙ্গে কারা সে-সব যুক্তি জুগিয়ে দিয়েছে? জীবিত মানুষরা। জীবিত মানুষরা তাদেরই কথা বলছে, মৃত মানুষের কথা বলছে না। তারপর

আরেকটি কথা সে বুঝতে পারে। জীবিত মানুষের পক্ষে জীবিত থাকার জন্যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, বা জীবন থেকে যতটুকু পারা যায় লাভ-সুবিধা আদায় করার তীব্র বাসনা আপত্তিজনক নয়, কিন্তু যারা যুক্তিগুলি পেশ করেছে তারা যেন নামেই শুধু জীবিত। আসলে তারা মৃত, তাদের জীবনও ধার-করা জীবন। তা না-হলে তারা মৃত নারীর প্রতি কোনো সমবেদনা বোধ করবে না কেন, যে-মানুষ তার মৃত্যু ঘটিয়েছে তার প্রতি তীব্র ঘৃণা বোধ করবে না কেন? জীবনের ব্যাপারে তারা প্রতারক বলেই তাদের মনে এত ভীতি, সত্য ঘটনাটি লুকাবার জন্যে এত অধীরতা, এত শঠতা।

যুবক শিক্ষক শীঘ্র সে-দল থেকে কাদেরকে এবং যুবতী নারীর আত্মীয়-স্বজনকে বাদ দেয় : ঘটনাটি গোপন রাখার ইচ্ছাটি তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্যান্য যুক্তিগুলি সে কোথায় শুনেছে? কাদের ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে সে যখন আলাপ করে নাই, তখন সে-সব সে কি নিজের মনে শোনে নাই?

তার মানে এই নয় কি যে যুবক শিক্ষক নিজে জীবিত হয়েও মৃত, জীবনের ব্যাপারে সে-ই প্রতারক?

আয়নায় সে যেন নিজের আরেকটি চেহারা দেখতে পায়। তাহলে বাকি কথাও সত্য। কর্তব্য এড়াবার জন্যেই সে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করেছিল এবং নিজেরই সৃষ্ট অবিশ্বাস্য যুক্তি-অজুহাতে সে বিশ্বাস করেছিল। কাদের যে হত্যাকারী বা সে যে প্রেমিক নয় সে-কথা জানার পর তার মধ্যে যে-ভীষণ ক্রোধ দেখা দিয়েছিল তার কারণ অপরাধীর প্রতি ঘৃণা নয়, কাদের তাকে স্বপ্নরাজ্যে বাস করতে দেয় নাই বলেই সে এমন ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, এ-কথাও সত্য যে যুবতী নারীর মৃত্যুর বীভৎসতা সে কিছুক্ষণের জন্যে বোধ করলেও তার প্রতি কোনো দুঃখ হয় নাই বা তার প্রতি গভীর অন্যায়টির সুবিচার হোক তার প্রয়োজন বোধ করে নাই। সে শুধু ভয়ই বোধ করেছে, নিজের জীবনের জন্য ভয়। সে-ভয়েই প্রথম রাতে মাঠে-মাঠে এমন উন্মাদের মতো ছুটাছুটি করেছিল এবং এ-ক'দিন এমন দিশেহারা হয়েছিল।

নিজের সত্যরূপ সে কী করে সঠিকভাবে জানবে?

কথাটি জানবার একটি পথই আছে। তার সত্যাসত্য বিচার ঘটনাটি প্রকাশ না করলে সম্ভব নয়। আবার, সে-বিষয়ে একটি পরিষ্কার উত্তর চাইলে মূল্যস্বরূপ দুটি পরিণামের জন্যে তাকে তৈরি হয়ে থাকতে হবে : হয় কাদের শাস্তি পাবে, না হয় সে-ই শাস্তি পাবে।

তারা যেন দু-জনেই কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে আর প্রভেদ নাই।

না, দাদাসাহেবের কাছে সে কাদেরের কথাটিই কেবল বলতে আসে নাই।

হয়তো এখনো সে অন্যপ্রকারে স্বপ্নরাজ্যেই বাস করছে, নিজেকে ফাঁকি দেবার নূতন একটি পন্থা আবিষ্কার করেছে। তার একথা মনে হয় যে, সে যেন নিজেকেই কোনোপ্রকারে ভুলিয়ে ক্ষুধার্ত সিংহের গুহায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু তার মনে হয়, সে যেন ঘন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, কোথাও আশ্রয় নেবার স্থান নাই বলেই মনে বিচিত্র শান্তিও। বস্তুত, মন যেন শান্ত নদীর মতোই ঢেউশূন্য, মসৃণ। নদী তবু প্রবাহিত হয়। সে যেন নদীর মতোই একটি গন্তব্যস্থলের দিকে ভেসে যাচ্ছে। সে-গন্তব্যস্থল সে দেখতে পায় না, সেখানে তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর আছে কিনা তা-ও সে জানে না। তবে নদীর ধারা যেমন থামানো যায় না বা তার দিক্‌পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি তার পক্ষে থামা বা দিক্-পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

ভেতরের সিঁড়িতে দাদাসাহেবের খড়মের আওয়াজ শোনা যায়। সে-আওয়াজ ক্রূরভাবে সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনিত হয়। আচমকা সে-আওয়াজ শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যুবক শিক্ষক বেসামাল হয়ে পড়ে, তার শান্তমনে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দাদাসাহেবকে কথাটি বলতে এসে সে ভুল করে নাই তো? আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে নিস্তার পাওয়ার প্রয়াসে সে কি

আত্মহত্যা করতে বসেছে?

মনকে সংযত করার চেষ্টা করে সে আপন মনে বলে, না। ভীতির কোনোই কারণ নাই। দাদাসাহেব তার অসহায়তা বুঝতে পারবেন। যে-স্রোতের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াতে চেয়েছিল কিন্তু দাঁড়াতে পারে নাই এবং যে-স্রোতে সে এখন ভেসে যাচ্ছে—দুটির কোনোটার অর্থই সে বোঝে না। এমন নিঃসহায় মানুষের জন্যে তাঁর নিশ্চয় দয়া হবে।

দাদাসাহেবের খড়মের উচ্চ আওয়াজে উদ্বেগের আভাস নাই। হয়তো তাতেই সে অবশেষে আশ্বস্ত হয়, তার মনের আলোড়ন শান্ত হয়। তারপর দাদাসাহেব বারান্দায় উপস্থিত হলে সে সসম্মানে উঠে দাঁড়ায়, তিনি সশব্দে আসন-গ্রহণ করলে সে-ও আবার বসে। তারপর সে খোলা দরজা দিয়ে উঠানের দিকে তাকায়। সেখানে অস্পষ্ট ঈষৎ কুয়াশাচ্ছন্ন রোদ দেখা দিয়েছে। একধারে একটি ব্যস্তসমস্ত সাদারঙের মুরগি চঞ্চলভাবে খাদ্য অন্বেষণ করে। দাদাসাহেব কাশেন।

কোথায় সে শুরু করবে? নদীর উৎস কোথায়, কোথায়ই-বা জীবন-মৃত্যুর উৎপত্তি? তাছাড়া, জীবন কি সত্যিই মৃত্যুর চেয়ে অধিকতর মূল্যবান?

দাদাসাহেব আবার কাশেন। তিনি অপেক্ষা করছেন সে-কথা যুবক শিক্ষককে জানান। যুবক শিক্ষক বোধ করে, তার ভেতর ঝরঝর করে কী যেন ঝরতে শুরু করেছে। তার অন্তর কি কাঁদতে শুরু করেছে একটি নিঃসহায় অজ্ঞানতার জন্যে?

তারপর সে অস্পষ্ট গলায় বলে, "কাদের মিঞা একটি মেয়েলোককে খুন করেছে।"

কথাটি বলার পরও তার ভেতরে সে-অজানা ধারাটি ঝরতে থাকে। ধারাটি ঝরতেই থাকে, ঝরঝর করে ঝরতেই থাকে। অবশেষে সব কিছু ক্রমশ শেষ হয়ে যায়। নিঃস্ব শূন্যতায় কোনো শব্দ হয় না।

বহুক্ষণ পর যেন নীরবতা ভঙ্গ করে দাদাসাহেব আস্তে বলেন, "বুঝলাম না।"

যুবক শিক্ষক তখন দৃষ্টিহীনভাবে ছককাটা মেঝের দিকে তাকিয়ে নিঃস্পন্দভাবে বসে। পূর্ববৎ কণ্ঠে সে কথাটি আবার বলে। তারপর কতক্ষণের জন্যে নীরবতা অবিচ্ছিন্ন থাকে।

"পরিষ্কার করে বলেন।"

দাদাসাহেবের কথা ভালোভাবে বুঝবার ক্ষমতা না থাকলেও সে বোঝে, তিনি হয়তো ঘটনাটির বৃত্তান্ত জানতে চাইছেন। অনুচ্চ প্রাণহীন কণ্ঠে সে বাঁশঝাড়ের ঘটনাটির বৃত্তান্ত দিতে শুরু করে। কিন্তু শীঘ্র তার মনে হয়, তার শ্রোতা যেন নাই। তার কথা এলোমেলো হয়ে ওঠে। একবাক্যে যা বলেছে তার ব্যাখ্যা-সম্প্রসার হয়তো তার কাছে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বোধ হয়। বস্তুত, দাদাসাহেবকে আর কোনো কথা বলার প্রয়োজনই সে বোধ করে না। হঠাৎ লম্বা-চওড়া সম্ভ্রান্ত মানুষটি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। তাছাড়া, কোনো কথা জানার কৌতূহলও যেন শেষ হয়ে গেছে।

একটু পরে বিসদৃশভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে যুবক শিক্ষক বলে, "আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

গাঢ় নিঃশব্দতার মধ্যে তার কথাটা কেমন বেখাপ্পা শোনায়। হয়তো তা সে নিজেই অনুভব করে। তবু কয়েক মুহূর্ত সে অপেক্ষা করে। দাদাসাহেব নীরব হয়ে থাকলে সে এবার হাল্কা-পায়ে বারান্দা অতিক্রম করে বেরিয়ে যায়। প্রস্থানটিও কেমন বেখাপ্পা মনে হয় যেন, কিন্তু সে-কথা বুঝলেও সে থামে না। উঠানে মুরগিটি সচকিত হয়ে ডানা তুলে পলায়নোদ্যত হয়, উচ্চ কর্কশ রব তোলে, কিন্তু নড়ে না।

ঘরে সব তৈরি। ফুলতোলা টিনের সুটকেসটি কেবল হাতে তুলে নিলেই হয়। তবে মাথাটা কেমন শূন্য শূন্য মনে হয় বলে কতক্ষণ ঘরের মধ্যখানে স্থির হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে। যে-ঘরে সে দু-বছর বসবাস করেছে, সে-ঘরের চারধারে একবার তাকিয়ে দেখার ব্যর্থ চেষ্টা

করে, কিছু দেখতে পায় না। মনে কোনো বেদনার ভাবও বোধ করে না।

তারপর সে সুটকেসটি তুলে নেয়। কর্তব্য কাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। দু-ক্রোশ দূরে আদালতের সামনে ঘাসশূন্য বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণের এককোণে যে-থানা, সে-থানায় তাকে যেতে হবে। কথাটা কর্তৃপক্ষকে বলার দায়িত্ব তারই। কাদেরের বড় ভাইয়ের ওপর সে-দায়িত্বের ভার দেওয়ার মানে কর্তব্য শুধু অসম্পূর্ণ রাখাই নয়, তাঁকে অমানুষিক একটি কাজ করতে বলা।

উঠানে নেবে বড়বাড়ির দিকে না তাকিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে। তারপর যে-বাড়ি মূর্ছিত হয়ে আছে মনে হয়েছিল সে-বাড়ি থেকে এবার গুরুগম্ভীর একটা ডাক আসে। সে-ডাকটির জন্যে তারই অজ্ঞাতে সে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। অবশেষে সেটি যখন তার কানে পৌঁছায়, তখন সে হয়তো আর তার জন্যে তৈরি নয়, বা তাতে তার মনে একটা নতুন ভয়ের সৃষ্টি হয়।

সে ছুটতে শুরু করে। হাঁটার ভঙ্গিতে চললেও আসলে সে দৌড়তেই থাকে। টিনের সুটকেসটি সশব্দে হাঁটুতে বাড়ি খায়।

ষোল

আদালতের সামনে ঘাসশূন্য বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণটি অতিক্রম করে দু-দিন আগে স্ব-ইচ্ছায় যে-ঘরে সে এসেছিল, আজ সে-ঘরেই তারা তাকে নিয়ে এসেছে। টেবিলের ওপাশে সেদিনের মতো উপরিতন পুলিশ-কর্মচারীটিও যথাস্থানে বসে। ছোটখাটো মানুষ, দেখতে নিরীহ। সামনের দাঁত অসমান, নিচের ঠোঁটটা ভারি। তাই হয়তো মুখ খুলে রাখার অভ্যাস। তবে একটা স্থায়ী ভ্রূকুটির জন্যে তার মুখের শিথিলতা কিছু রক্ষা পায়।

তাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে পুলিশ-কর্মচারী চোখ তুলে তাকায়। দেখতে-না-দেখতে তার চোখে-মুখে বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হয়। তার ভ্রূকুটি গাঢ় হয়ে ওঠে, দৃষ্টিতে ক্ষীণ ধার দেখা দেয়। সন্দেহের অবশ্য কোনো অবকাশ ছিল না, তবু যুবক শিক্ষকের মন থেকে এবার সব সন্দেহ দূর হয়। কিন্তু তার মুখে ভাবান্তর ঘটে না। সেদিনের ঘরটি এবং টেবিলের ওপাশে পুলিশ-কর্মচারীকে সে যেন বহুদূর থেকেই দেখে। তার দৃষ্টি স্বচ্ছ, তবু কিছুই নিকটে মনে হয় না। পুলিশ-কর্মচারীটি সাব-ইন্সপেক্টরের দিকে তাকায়। সাব-ইন্সপেক্টরের পেছনে দণ্ডায়মান কনস্টেবলটির বুটে আওয়াজ হয়।

"বসেন।" পুলিশ-কর্মচারী সাব-ইন্সপেক্টরকে বসতে বলে। সাব-ইন্সপেক্টর বসলে তার মধ্যে সর্বপ্রথম স্বচ্ছন্দতা আসে। তার বয়স বেশি নয়।

"ঘরেই ছিল। পালাবার চেষ্টা করে নাই।" অল্পবয়স্ক সাব-ইন্সপেক্টরটি বলে।

যুবক শিক্ষক বুঝতে পারে, সে-ই উক্তিটির বিষয়বস্তু। তবু তার মনে হয়, সাব-ইন্সপেক্টর অন্য কোনো মানুষের কথা বলছে যেন। অপরিচিত কোনো মানুষ ঘরেই ছিল, পালাবার চেষ্টা করে নাই।

ততক্ষণে পুলিশ-কর্মচারির দৃষ্টি তার ওপর আবার নিবদ্ধ হয়েছে। সে-দৃষ্টিতে প্রবঞ্চিত মানুষের ক্রোধভাব যেন। যুবক শিক্ষক এবারও বোঝে যে, সে-ই তার ক্রোধের কারণ। কিন্তু তাতে বিচলিত না হয়ে নিস্পৃহ-নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় সরকারি ক্ষমতাপত্র সমেত অল্পবয়স্ক সাব-ইন্সপেক্টর এবং দু'জন বন্দুকধারী কনস্টেবল সকালবেলায় তার বাড়িতে উপস্থিত হলেও সে বিচলিত হয় নাই। বরঞ্চ তাদের আগমন, তারপর সুটকেস হাতে তাদের সঙ্গে থানা অভিমুখে যাত্রা—সবই তার কাছে বারবার মহড়া-দেয়া অভিনয়ের মতো সুপরিচিত মনে হয়েছে। পুলিশ-কর্মচারীর চোখে এখন সে যে-ক্রোধ দেখতে পায়, সে-ক্রোধও অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। তাছাড়া, সে-ক্রোধ সত্য নয়

যেন। আসলে তা বর্তমান অভিনয়ের একটি অংশমাত্র।

শীঘ্র যুবক শিক্ষক কেমন অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। তখনো সে ফুলতোলা সুটকেসটি হাতে করে দাঁড়িয়ে। সে-সুটকেসটি সমস্যায় পরিণত হয়েছে যেন। সে বুঝতে পারে না সেটি কোথায় রাখবে। কনস্টেবলটি তার সমস্যার কথা বুঝে তার হাত থেকে সুটকেসটি তুলে নিয়ে দেয়ালের পাশে রাখে। ঘরের নিঃশব্দতায় শক্ত বুটের অজস্র আওয়াজ হয়।

পুলিশ-কর্মচারীর রাগ পড়ে, ভ্রূকুটিটাও ক্ষণকালের জন্যে অন্তর্ধান করে। সে যুবক শিক্ষককে বলে, "বসেন।"

বসার অনুরোধটি মহড়ায় যেন বাদ পড়েছিল। তাই যুবক শিক্ষকের বসতে কিছু দ্বিধা হয়। তারপর আস্তে বসে পড়ে সে টেবিলের তলে আলগোছে হাত কচলাতে শুরু করে। তারপর সে অপেক্ষা করে।

পুলিশ-কর্মচারীর মুখমণ্ডলে ক্রোধভাব-কঠিনতা এবং ভ্রূকুটি ফিরতে দেরি হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ধম্‌কে বলে ওঠে, "চালাকি করতে চেয়েছিলেন? না, চালাকিতে কাজ হয় না।"

যুবক শিক্ষক তার ভর্ৎসনা শোনে, কিন্তু কিছু বলে না। হয়তো অভিনয়ে তার বলার সময় এখনো আসে নাই বলেই সে নির্বাক হয়ে থাকে। বাইরে আদালতের সামনে মামলাবাজদের কলরব তার কানে লাগে।

পুলিশ-কর্মচারী চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণভাবে যুবক শিক্ষককে কয়েক মুহূর্ত পরীক্ষা করে দেখে। নিচের ঠোঁটটা অভ্যাসমত ঝুলেই থাকে। তারপর হঠাৎ টেবিলে হাত পিটিয়ে বাঘা-গলায় আবার সে আগের কথাই একটু ঘুরিয়ে বলে, "ভেবেছিলেন চালাকি করে পার হয়ে যাবেন?"

এবারও যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না। সব কথা জেনে পুলিশ-কর্মচারী অর্থহীন কথা বলছে। সেটাও অভিনয়ের অংশ। এখানে যুবক শিক্ষকও একজন অভিনেতা। তবে যথানির্দিষ্ট সময়েই সে কথা বলবে।

তার নীরবতা পুলিশ-কর্মচারীর পছন্দ হয় না। টেবিলে দু-হাত চেপে সামনে ঝুঁকে থুত ছিটিয়ে আবার সে বলে, "কী, অপরাধ স্বীকার করতে রাজি আছেন?"

এবার একটা উত্তর না দিয়ে উপায় নাই। তবে প্রশ্নটির মতো উত্তরটিও তার মুখস্থ বলে কোনো দ্বিধা না করে সে ক্ষুদ্র গলায় তার বক্তব্য বলে। কিন্তু তার বক্তব্যটি শুনে পুলিশ-কর্মচারীটি অকস্মাৎ ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ে। সেটাও অভিনয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু তার ক্রোধের ঝাপটা গায়ে লাগে বলে যুবক শিক্ষক ঈষৎ চমকে ওঠে।

"সত্য কথা!" পুলিশ-কর্মচারী আবার হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

যুবক শিক্ষক তার বক্তব্যটি আবার বলে, ক্ষুদ্র নিস্তেজ কণ্ঠে। সেদিন সে সত্য কথাই বলেছিল।

পুলিশ-কর্মচারী কয়েক মুহূর্তের জন্যে বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে যেন। বাক্‌শক্তি ফিরে এলে সে এবার গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলে, "তদারক হবে। কিন্তু আপনার তাতে লোকসান বই লাভ নাই।"

যুবক শিক্ষক এবার নীরব হয়ে থাকলে পুলিশ-কর্মচারী সহসা হয়তো বুঝতে পারে না, সে কী বলবে। ভাগ্যবশত এমন সময় একটি ছেলে দু-পেয়ালা চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। এক পেয়ালা পুলিশ-কর্মচারীর জন্যে দ্বিতীয় পেয়ালা সাব-ইন্সপেক্টরের জন্যে। এক চুমুক দিয়ে উপরিতন কর্মচারীটি পকেট থেকে একটা আধা-ভরা সিগারেট-প্যাকেট বের করে একটি সিগারেট ধরায়। মুহূর্তের মধ্যে তার গন্ধে ঘরটা ভরে ওঠে।

গন্ধটা নাকে লাগতেই যুবক শিক্ষক সন্তর্পণে তা বার-দুয়েক ঘ্রাণ করে দেখে, তারপর তার মনের অন্তরালে কোথাও ঈষৎ বেদনার ভাব দেখা দেয়। কাদেরের কথা তার মনে পড়ে।

সে-রাতে কাদের তাকে একটি সিগারেট দিয়েছিল। সে-কথাটাই স্মরণ হয়। না, কাদেরের কথা যে স্মরণ হয়, তা নয়। কাদের যেন তার মন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবে সিগারেটের গন্ধটি একটি দৃঢ়জীবনের স্মৃতিই যেন জাগায় তার মনে। সে-রাত আর আজকার মধ্যে এতই কি ব্যবধান?

চা-এ আরো কয়েকবার চুমুক দিয়ে পুলিশ-কর্মচারী কণ্ঠস্বর নিচতম খাদে নাবিয়ে অন্তরঙ্গভাবে বলে, "আপনি মাস্টার। কথাটা বুঝতে দেরি হবে না আপনার।"

পরম হিতৈষীর মতো সে একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু সহৃদয় বক্তৃতা শুরু করে। প্রথমে তার দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবক শিক্ষক কান দিয়েই তার কথা শোনে। তারপর বিস্ময়ে তার মন ভরে ওঠে। সে বুঝতে পারে যে, পুলিশ-কর্মচারী তাকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মতো ব্যবহার করতে বলে যে-সব যুক্তিতর্কের অবতারণা করছে, সে-সব যুক্তিতর্ক সে যে শুধু জানে তা নয়, সে-সব নিজেই সে ভেবে দেখেছে। পুলিশ-কর্মচারী নূতন কিছুই বলছে না; যা সে বলছে যুবক শিক্ষক তার মহড়া দিয়েছে অনেকবার। তার কার্যের কী পরিণাম হবে, কেন হবে, কী কী ভাবে হবে—সে-সব কথা উপলব্ধি করে তার ভীতির শেষ থাকে নাই। সে-ভীতি এখনো যায় নাই। তবে তা এমনই এক ধরনের ভীতি যা শরীরে কোথাও গভীর ক্ষতের মতো লেগে আছে, তা উপড়ানোও যায় না অস্বীকার করাও যায় না। এমন ভয়কে মেনে নিয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো।

পুলিশ-কর্মচারীর কথা শুনে অকস্মাৎ সে একটা অপরিসীম তৃপ্তিও বোধ করতে শুরু করে। সে কি তার মনের যুক্তিতর্কের কথা অপরের মুখে শুনছে না? এ কি তার বিচক্ষণতা এবং পরিণামদর্শিতার প্রমাণ নয়?

ভ্রূকুটি করে পুলিশ-কর্মচারী প্রশ্ন করে, "শুনছেন আমার কথা?"

সচকিত হয়ে যুবক শিক্ষক উত্তর দেয়, কিন্তু পুলিশ-কর্মচারী তাকে ভুল বোঝে। তার চোখে প্রথমে সন্দেহ, শেষে কেমন যেন অহেতুক প্রতিহিংসার ভাব দেখা দেয়। বিকৃতকণ্ঠে সে বলে, "হবে, তদারক হবে। আপনার ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। যার ক্ষতি করতে চান, তার ক্ষতি করা সহজ হবে না।"

সে যে কারো ক্ষতি করতে চায় না, সে-কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলেও শেষপর্যন্ত সে কিছুই বলতে পারে না। এক কথায় উক্তিটির উত্তর দেয়া যায় না। তাছাড়া, কী একটা কথা সে বুঝতে চেষ্টা করে বলে কোনো উত্তর তৈরি করাও তার পক্ষে হয় না।

নিজেকে কিছুটা সংযত করে পুলিশ-কর্মচারী আবার বলে, "হয় অপরাধ স্বীকার করেন, না হয় আজগুবি কথাটা ছাড়েন।"

সাব-ইন্সপেক্টরও এবার তার উপরিতন কর্মচারীকে সমর্থন করে বলে, "নিজের মন্দ না চাইলে আজগুবি কথাটা ছাড়াই ভালো হবে।"

তাদের কথা যুবক শিক্ষকের কানে আর পৌঁছায় না। তার মন অন্যত্র। তার মনের তৃপ্তির কারণ সে বুঝতে পেরেছে। বিচক্ষণতা-পরিণামদর্শিতার প্রমাণ পেলে তৃপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু সে-জন্যে সে তৃপ্ত নয়। তার তৃপ্তির কারণ এই যে, মনে-মনে যে-সব সম্ভাবনা সে দেখেছিল, তা সত্যে পরিণত হয়ে তার সিদ্ধান্তকে অর্থপূর্ণ করেছে। কথাটা অত্যন্ত বড় মনে হয় তার কাছে। তার মনে যে তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, সে-দ্বন্দ্বের ভিত্তি কাল্পনিক ভয় নয়। তাছাড়া, যে-সংগ্রাম পরের বিরুদ্ধে মনে হলেও আসলে নিজেরই বিরুদ্ধে ছিল, সে-সংগ্রামে সে জয়লাভ করেছে।

তার তৃপ্তির ভাবটি স্থায়ী হয় না। এক প্রকার প্রাকৃতিক আলোড়নে নদী যেমন হঠাৎ শুকিয়ে যায়, তেমনি তার মন থেকে সব ভাববোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। সে তার উত্তর পেয়েছে। কিন্তু সে উত্তরটি চতুর্দিকে মরুভূমির সৃষ্টি করে যেন।

দূর থেকে পুলিশ-কর্মচারীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

"বুঝতে পারছেন? হোক আপনার কথা সত্য, কিন্তু সাক্ষী কই? আপনি নিজের চোখে কিছু দেখেন নাই, কিন্তু অপর পক্ষ দেখেছে।" সে যেন একটু দ্বিধা করে। তারপর বলে, "আপনাকে স্বচক্ষে দেখেছে।"

হয়তো কথাটি পুলিশ-কর্মচারীর নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, কিন্তু সে কী করতে পারে? ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মূল্য কী?

ক্ষীণভাবে পুলিশ-কর্মচারীর কণ্ঠস্বর যুবক শিক্ষকের কানে পৌঁছালে সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার বক্তব্যটির পুনরাবৃত্তি করে। যেন সে কথাটি প্রথম বার বলছে। কিন্তু তার দ্বিতীয় বক্তব্য নাই। একই কথা বারবার বলছে সে-কথা বুঝলেও সে অপ্রস্তুত বোধ করে না।

"সত্য কথা!" ব্যঙ্গের সুরে পুলিশ-কর্মচারী চিৎকার করে ওঠে। ব্যঙ্গটি যুবক শিক্ষককে স্পর্শ করে না। সে আপন-মনে একটি দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করে। যে-দৃশ্যটি মন থেকে এ-ক'দিন ঠেকিয়ে রেখেছে, সে-দৃশ্যটিই সে দেখবার চেষ্টা করে। অল্প চেষ্টাতে দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর দৃশ্য। একটু পরে সে বোঝে, কিছুই সে স্পষ্টভাবে দেখতে পারছে না। কী করে দেখতে পারবে? দু-রাতের এক রাতেও সে-প্রাণহীন দেহটির দিকে ভালো করে তাকাবার সাহস তার হয় নাই। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যেই সে তার দিকে তাকাতে সক্ষম হয়েছিল। তার দেহে যে প্রাণ নাই, সে-কথা বোঝার আগে। এখন যেটুকু সে দেখতে পায়, তা সে সংক্ষিপ্ত স্মৃতির জন্যেই। শাড়িটা অসংলগ্ন, পায়ের কাছে এক ঝলক চাঁদের আলো। একটি হাতই দেখা যায়। অন্য হাতটি কি দেহের তলে চাপা পড়েছে? মুখে ছায়া, শুধু ছায়া। আসলে মুখটা ঠিক মনে পড়ে না।

যুবক শিক্ষকের মনে ভয় বা ঘৃণা বা দুঃখ—কোনো ভাবই জাগে না। তবে কেন সে দৃশ্যটি স্মরণ করার চেষ্টা করছে? আজ যে-স্থানে সে এসে পৌঁচেছে, তারই অর্থ কি সে-পরিত্যক্ত প্রাণহীন দেহটির মধ্যে সন্ধান করছে? কাদের তার জন্যে যে-ভাবাবেগ বোধ করে নাই, সে-ভাবাবেগই কি সে নিজের মনে সৃষ্টি করতে চাইছে? সে জানে না কেন সে দৃশ্যটি স্মরণ করবার চেষ্টা করে।

হয়তো সে-দেহটি প্রাণ নেই বলে অর্থহীন নয়। বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর জীবন শেষ হলেও সে-দৃশ্য স্মরণ করে যুবক শিক্ষকের মনে কোনো ভাবের আভাসও না দেখা গেলেও, সেখানেই যুবতী নারীর কথা শেষ হয় নাই। কারণ, তার জন্যে এখনো কি কারো শাস্তি পাওয়া বাকি নাই?

কিন্তু কে শাস্তি পাবে? পুলিশ-কর্মচারীর সামনে বসে যুবক শিক্ষকের হয়তো এই ধারণা হয় যে, কে শাস্তি পাবে সেটি আর প্রধান কথা নয়। শাস্তিটার অর্থ যখন মৃত যুবতী নারীর কাছে আর পৌঁছবে না, তখন কে শাস্তি পাবে তাতে তার আর কী এসে যাবে? শাস্তিটা তার জন্যে নয়। যুবক শিক্ষক যদি ভুল করে শাস্তিটা নিজের ওপরই টেনে আনে, যুবতী নারীর মৃত্যুর জন্যে সে-ই যদি অবশেষে শাস্তি পায়, তবে শাস্তিটা আসলে যার উদ্দেশ্যে সেখানে তা পৌঁছুবে। সে-কথায় সে কি একবার সান্ত্বনা পেতে পারে না?

কিন্তু যুবক শিক্ষক জানে না। যে-দৃশ্যে কোনোই মনোভাব জাগে না, সে-দৃশ্যই সে অর্থহীনভাবে দেখবার চেষ্টা করে।

তার ব্যঙ্গ যুবক শিক্ষকের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না দেখে পুলিশ-কর্মচারী এবার তার দিকে তাকায়, তারপর তার ঝানু চোখে ঈষৎ কৌতূহলের ভাব দেখা দেয়। যুবক শিক্ষক তারই দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে চেয়ে পূর্ববৎ স্থির হয়ে বসে আছে, চোখে-মুখে কোনো উদ্ধত ভাব নাই। বরঞ্চ সমীহ-বিনয়ের ভাবই যেন তাতে। গায়ের জীর্ণ আলোয়ানটি ঘরের উজ্জ্বল আলোয় অতিশয় জীর্ণ মনে হয়। আর মনে হয় কোনো কথায় তার কান নাই। কোনো কথার প্রয়োজন সে বোধ করে না।

পুলিশ–কর্মচারীর চোখ একবার ক্রোধে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যুবক শিক্ষকের দৃষ্টির সামনে সে–ক্রোধ হয়তো অর্থহীন মনে হয় বলে সে নিজেকে সংযত করে। তারপর তার সরকারি ভ্রূকুটিও প্রত্যাবর্তন করে। সোজা হয়ে বসে কঠিন–দৃষ্টিতে তাকিয়ে যুবক শিক্ষককে প্রশ্ন করে, "আপনার আর কিছু বলবার নাই?"

যুবক শিক্ষক উত্তর দেয় না।

"শুনছেন?" সাব–ইন্সপেক্টর বলে। কনস্টেবলের বুটের আওয়াজ হয়।

সচকিতভাবে সজ্ঞান হয়ে যুবক শিক্ষক আবার তার বক্তব্যটি বলে। শুনে পুলিশ–কর্মচারীর মুখে তীব্র বিরক্তির ভাব জাগে। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে কেবল। তারপর সে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওঠে। বাজে কথার সময় শেষ হয়েছে।

কাঁদো নদী কাঁদো

লোকটিকে যখন দেখতে পাই তখন অপরাহ্ণ, হেলে-পড়া সূর্য গা-ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে থাকা অসংখ্য যাত্রীর উষ্ণ নিঃশ্বাসে দেহতাপে এমনিতে উত্তপ্ত তৃতীয়শ্রেণীকে আরো উত্তপ্ত করে তুলেছে। সে-জন্যে, এবং রোদ-ঝল্‌সানো দিগন্তবিস্তারিত পানি দেখে-দেখে চোখে শ্রান্তি এসেছিল, তন্দ্রার ভাবও দেখা দিয়েছিল। তারপর কখন নিকটে গোল হয়ে বসে তাস খেলায় মগ্ন একদল যাত্রীর মধ্যে কেউ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলে তন্দ্রা ভাঙে, দেখি আমাদের স্টিমার প্রশস্ত নদী ছেড়ে একটি সঙ্কীর্ণ নদীতে প্রবেশ করে বাম পাশের তীরের ধার দিয়ে চলেছে। উঁচু খাড়া তীর, তীরের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে ছোট ছোট ছায়া-শীতল চালাঘর, এখানে-সেখানে সুপারিগাছের সারি, পেছনে বিস্তীর্ণ মাঠ, আরো দূরে আবার জনপদের চিহ্ন। সে-সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি এমন সময়ে কী কারণে পাশে দৃষ্টি গেলে সহসা লোকটিকে দেখতে পাই। আগে তাকে দেখি নি; নিঃসন্দেহে এতক্ষণ সে যাত্রী এবং মালপত্রের মধ্যে কেমন নিরাকার হয়ে নিদ্রাভিভূত হয়ে ছিল। বোধহয় সবেমাত্র উঠে বসেছে, ঘুমভারি চোখে এখনো রক্তাক্ত ভাব। তাছাড়া ঈষৎ কৌতূহলভরে চতুর্দিকে যাত্রীদের—যে-যাত্রীদের কেউ কেউ নাসিকাগর্জন সহকারে একনাগাড়ে ঘুমায়, কেউ কেউ মনে কোনো গুপ্ত ভাবনা-চিন্তা নিয়ে কেমন ঝিম্ ধরে বসে হয়তো পথ শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করে, কেউ কেউ আবার শূন্য-চোখে অনির্দিষ্টভাবে সুবৃহৎ পাটাতনের এক প্রান্তে সিঁড়িটা বেয়ে ওপর-নিচ করে—দেখলেও তার দেহভঙ্গিতে সদ্যজাগা মানুষের নিথর ভাব।

লোকটির বয়স চল্লিশের মতো, বা কিছু বেশি, কারণ কানের ওপর চুলে বেশ চাপ দিয়ে পাক ধরেছে। গা-এর রঙটি এমন যে মনে হয় একদা তা ফর্সা ধরনের ছিল কিন্তু আজ জ্বলে-পুড়ে মলিন হয়ে গিয়েছে। তবু চোখে-মুখে কেমন তারুণ্যের নমনীয়তা, সুশীল শান্তভাব। পরনের জামাকাপড় পুরাতন, বহু ব্যবহৃত, তবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাশে খুলে রাখা জুতা জোড়ার গোড়ালি ক্ষয়ে গিয়েছে, একটির অগ্রভাগে মেরামতের চিহ্ন, তাছাড়া দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে নিজস্ব আকৃতি হারিয়ে দুটি জুতাই মালিকের ঈষৎ বেঢপ ধরনের পায়ের আকৃতি গ্রহণ করেছে, তবু তাতে কালি-বুরুশের জৌলুশ। নিঃসন্দেহে তার স্বভাব বেশ পরিপাটি ধরনের যার প্রমাণ শুধু দেহবস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা বা পাদুকার জৌলুশের মধ্যেই নয়, অনেক কিছুতেই ক্রমশ দেখতে পাই। ঘুমের আমেজটি কাটিয়ে ওঠার পর সহসা সে পকেট থেকে ছোট ধরনের কিছু দাঁত-ভাঙ্গা একটি চিরুনি বের করে আলগোছে কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে চুলটা ঠিক করে, একটু পরে শার্টের গুটানো আস্তিন খুলে আবার সযত্নে কনুইর ওপর পর্যন্ত ভাঁজ করে নেয়, কিছু মুচড়ে-যাওয়া শার্টের কলারটিও সোজা করে, অবশেষে যে-ধবধবে সাদা চাদরের ওপর বসে ছিল সেটি সজোরে হাত দিয়ে ঝেড়ে সাফ করে। তার পরিপাটি স্বভাবে একটু শৌখিনতার স্পর্শও যেন, কারণ শীঘ্র সে পকেট থেকে একটি ফুলতোলা রুমাল বের করে মুখ-চোখ সযত্নে মোছে যদিও এত গরমেও সেখানে ঘামের চিহ্নমাত্র নজরে পড়ে না। এবার তৃপ্ত সন্তুষ্ট হয়ে সে আসন-পিঁড়ে হয়ে বসে উরুর ওপর স্থাপিত পাটি দ্রুতভাবে

নাড়তে শুরু করে। শীঘ্র তার দৃষ্টি আবার ফিরে যায় যাত্রীদের দিকে। তাদের সে এবার ধীরে-সুস্থে কিন্তু তীক্ষ্ণ কৌতূহলের সঙ্গেই নিরীক্ষণ করে, চোখের কোণে ঈষৎ হাসির আভাস।

তারপর লোকটির বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে পড়ি, আমার চোখে আবার ঘুমের আমেজ ধরে। অনেকক্ষণ পরে একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পাই—নিম্ন শান্ত কণ্ঠ, কিছু সঙ্কোচের আভাস তাতে। চোখ খুলে দেখি, পরিপাটি স্বভাবের লোকটি কিছু বলছে। ধীরে ধীরে, থেমে-থেমেই সে বলে, যেন কি বলবে সে-বিষয়ে মনস্থির করতে পারে নি, শ্রোতাদের সম্বন্ধেও নিশ্চিত নয়। তারপর কখন কী করে কোথায় একটা অদৃশ্য বাধা প্রতিবন্ধক দূর হয়, কী একটা জড়তা কাটে, কণ্ঠস্বর উঁচু না করলেও এবার সে অনর্গলভাবে কথা বলতে শুরু করে। আরো পরে মনে হয় তার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে যা নিঃসৃত হয় তার ওপর সমস্ত শাসন সে হারিয়েছে, কথার ধারা রোধ করার ইচ্ছা থাকলেও রোধ করার কৌশল তার জানা নেই; বস্তুত তার বাক্যস্রোত রীতিমত একটি নদীর ধারায় পরিণত হয়। তবে এমন একটি ধারা যা মৃদুকণ্ঠে কলতান করে কিন্তু বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি করে না, দুর্বারবেগে ছুটে যায় না। সে-ধারা ক্রমশ অজানা মাঠ-প্রান্তর গ্রাম-জনপদ চড়াই-উৎরাই দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। অনেক কিছুই সে বলে, যার কিছু কানে আসে কিছু আসে না, কিছু বুঝতে পারি কিছু পারি না; মনটার ওপর তখন তন্দ্রা উড়ন্ত মেঘের মতো থেকে থেকে ছায়াসম্পাত করছিল। অনেকক্ষণ ধরে সে যেন হরতনপুর নামক একটি অখ্যাত গ্রামের মকসুদ জোলা বলে কোন অজানা মানুষের কথা বলে। লোকটি হতভাগ্য—এমনই হতভাগ্য যে এক বছর যদি বিনা বৃষ্টির দরুন তার ফসল ধ্বংস হয় অন্য বছর ধূলিসাৎ হয় শিলাবৃষ্টিতে, এ-বছর তার বাড়িঘর যদি বন্যায় ভেসে যায় অন্য বছর ভস্মীভূত হয় নিদারুণ অগ্নিকাণ্ডে, যার প্রিয়জন একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যার বিষয় সম্পত্তি হাতছাড়া হয় দুর্বৃত্ত লোকের কারসাজিতে, কাঠ কাটতে গিয়ে কাঠে না পড়ে তার পায়েই কুঠার নেবে আসে নির্মমভাবে, অবশেষে মেঘশূন্য আকাশে বজ্রাঘাতের মতো অকারণেই যেন ভাগ্য-পরাক্রান্ত লোকটি পঙ্গু হয়ে পড়ে। একবার হয়তো চোখ খুলে লোকটির দিকে তাকিয়েছিলাম, কারণ সহসা তন্দ্রাচ্ছন্ন মনে কোথাও কেমন অস্থিরতা দেখা দিয়ে থাকবে; এমন হতভাগ্য মানুষের কাহিনী শুনলে কার মনে অস্থিরতা না জাগে? লোকটির ধীর-স্থির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, তারপর তার শান্ত মুখ, চোখের কোণে ঈষৎ হাসিটি—এসবও নজরে পড়ে, কিছু আশ্বস্ত হই। তবে তখন লোকটি কী কারণে কামারান এবং কাতবিয়ান নামক যে-ফেরেশতা দুটি মানুষের স্কন্ধে বসে তার সুকাজ-কুকাজ লিপিবদ্ধ করে তাদের কথা বলতে শুরু করেছে। তার বর্ণনায় ফেরেশতা দুটির একজন সুপরিচিত হিসাব-নবিশের চেহারা ধারণ করে—বক্র-মেরুদণ্ড শীর্ণদেহ কুটিলমনা কদাকার লোক, কানের পশ্চাতে আধা-খাওয়া বিড়ি, চোখে গোলাকার ঘোলাটে চশমা যার মধ্যে দিয়ে নয়, ওপর বা নিচে দিয়েই কখনো-কখনো সে দুনিয়াটি নিরীক্ষণ করে থাকে। সে কি কাতবিয়ান না কামারান? তন্দ্রাচ্ছন্ন মন বৃথা উত্তর সন্ধান করে। হয়তো অবশেষে আমার মনে দুজনেই হিসাব-নবিশের চেহারা ধারণ করে এবং পরে কী যাদুমন্ত্রে অর্শরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শুধু যখন আবার ক্ষণকালের জন্যে জেগে উঠি তখন বুঝতে পারি লোকটি মকসুদ নামক হতভাগ্য জোলার বা কামারান-কাতবিয়ান নামক ফেরেশতা দুটির কথা নয়, কী দুর্বোধ্য কারণে অর্শরোগের কথা পেড়েছে। কণ্ঠস্বর পূর্ববৎ অনুচ্চ, ঈষৎ হাসিটি তেমনি চোখের প্রান্তে খেলা করে, কিন্তু অর্শরোগের বিস্তারিত বর্ণনা এবং ভুক্তভোগী কয়েকজন রোগীর নিদারুণ যন্ত্রণার বিশদ বিবরণ দিয়ে ততক্ষণে সে শ্রোতাদের মুখ ফ্যাকাসে করে তুলেছে, শ্রোতারা যেন তাদের দেহেরই বিশেষ অঞ্চলে স্ফীত-হয়ে-ওঠা কোনো শিরার অকথ্য বেদনা অনুভব করতে শুরু করেছে।

তারপর হয়তো কিছুক্ষণ তার কথা শুনি নি, হয়তো সে নীরব হয়ে পড়েছিল। তবে নিশ্চয় বেশিক্ষণের জন্যে নয়। এবার তার কণ্ঠস্বর আমার অর্ধঘুমন্ত কানে এসে পৌঁছালে তা

গুঞ্জনের মতো শোনায়, যে-গুঞ্জনে ঈষৎ রহস্যের ভাব, একটু গাম্ভীর্যের আভাস। মনে হয় সে যেন জিজ্ঞাসা করছে কোথা থেকে মানুষ আসে, কোথায় সে ফিরে যায়। শ্রোতাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না, পরে দূরে কোথাও একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুর কান্নার আওয়াজ জেগে উঠলে তাতে লোকটির গলার শব্দও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ততক্ষণে দিগন্তে হেলে-পড়া সূর্যের ওপর মেঘ উঠেছে, কিছু শীতল হাওয়াও বইতে শুরু করেছে, এবং মুখে-চোখে সে-শীতল হাওয়া এসে লাগলে তন্দ্রার ভাবটা বেশ জমে উঠে থাকবে। হাওয়া দেখতে-না-দেখতে প্রবল হয়ে ওঠে এবং আঘাতে ছাদের প্রান্তে গুটানো তেরপলের ঝুলে-পড়া একটি অংশ সশব্দে দুলতে থাকে। কখনো সে-শব্দ, কখনো লোকটির ধীর-মন্থর কণ্ঠস্বর ঢেউয়ের মতো কানে এসে বাজে। তবে আবার তার কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছালে বিস্মিত হই, কারণ ছালাম মিঞা নামক জোতদারটির সঙ্গে দর্শনমূলক বিষয়টির যোগসূত্র ঠিক বুঝতে পারি না। যে-টুকু বুঝতে সক্ষম হই তা এই যে, জোতদারটি বড় উদ্যোগ আয়োজন করে বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়েছিল মক্কা দেশে কিন্তু কোনো কারণে কাবাশরীফে পৌঁছে আচম্বিতে অন্ধ হয়ে পড়ে। কেন? সে কি ঘোর গুনাহ্‌গারি যে-গুনাহ্‌র মাফ নেই? শীঘ্র একটি কান্না শুনতে পাই। কান্না নয়, আর্তনাদ। হয়তো জোতদারটিই আর্তনাদ করে। হঠাৎ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়া মানুষটির অন্তরে যে-প্রগাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার সৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে দিশেহারাভাবে সে হয়তো পথ সন্ধান করছে, একটু আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোথাও পথ বা আলো দেখতে পাচ্ছে না। জোতদার আর্তনাদ করে চলে, যে-আর্তনাদ অতল কোনো গহ্বর থেকে উঠে এসে অন্ধকারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে : অন্ধকার অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

হয়তো সে-অন্ধকারেই আমার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয় বলে হঠাৎ জেগে উঠি। তখন সূর্যের ওপর থেকে মেঘ সরে গিয়েছে, গুমোট গরমটা আবার অসহ্য রূপ গ্রহণ করেছে। সে-গরম যেন শুধু বাইরে নয়, মানুষের বস্ত্রের ভাঁজে-ভাঁজেও আশ্রয় নিয়েছে, অসংখ্য পিপীলিকার মতো তার দেহ বেয়ে ওঠা-নাবা করছে। দূরে কোথাও আবার একটি শিশু কাঁদে। তখন তার কান্নাই কি ছালাম মিঞা নামক জোতদারের আর্তনাদে পরিণত হয়েছিল? শিশুটি, এবং তার ঘোমটা দেয়া অল্পবয়স্কা মাকে দেখতে পাই। রেলিং থেকে অনেক দূরে হলেও যেখানে শিশুকোলে মেয়েলোকটি বসেছিল সেখান পর্যন্ত শেষ-অপরাহ্ণের সূর্য এসে পৌঁছেছে। রোদের দিকে পিঠ দিয়ে কোলের শিশুটির জন্যে ছায়া সৃষ্টি করে মেয়েটি নত মাথায় মূর্তিবৎ নিশ্চল হয়ে বসে।

লোকটি তখনো থামে নি। সে কি জোতদার মানুষটির কাহিনী শেষ করে নি? তারপর কী হয়েছিল তার? তার গুনাহ্ কি মাফ হয়েছিল, সে কি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল? কয়েক মুহূর্ত কান পেতে শোনার পর বুঝতে পারি ছালাম মিঞা নামক জোতদারের কাহিনী নয়, বড় কৌতূহলী ধরনের অন্য কোনো মানুষের কথা বলছে সে, এবং তার নাম-ধাম-সাকিনের খবর জানা সম্ভব না হলেও আরেকটু শোনার পর সন্দেহ থাকে না যে কৌতূহলী লোকটি সে নিজেই : অবশেষে সে নিজের কথা বলতে শুরু করেছে। কী কারণে আমার ঘুমতন্দ্রা এবার সম্পূর্ণভাবেই কাটে, চোখ-মন স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, লোকটির কণ্ঠস্বরও এবার পরিষ্কারভাবে শুনতে পাই।

"ছোটবেলায় নাম পড়েছিল পেঁচা। লোকেরা পেঁচা বলত।" শ্রোতাদের দৃষ্টি তার খুদে ধরনের চোখের দিকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে দেখে সে আবার বলে, "না, চোখের জন্যে নয়, স্বভাবের জন্যে।"

পূর্ববৎ নিম্নকণ্ঠে, হয়তো-বা ঈষৎ লজ্জিতভাবে লোকটি তার কৌতূহলী স্বভাবের কথা বলে। ছোটবেলাতেই লোকটির মধ্যে কৌতূহলটা দেখা দিয়েছিল। তার সমবয়সী ছেলেরা যখন মাঠে-মাঠে খেলা করে গৃহস্থের বাড়ির ফলমূল চুরি করে নদী-পুকুরে সাঁতার কেটে সময় কাটাত তখন সে সবকিছু ভুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষের জীবনযাত্রা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখত।

সে-সময়ে কত দেউড়ি-খিড়কির পথ দিয়ে সে যে ছায়ার মতো আসা-যাওয়া করেছে, এ-বাড়ি সে-বাড়ি গিয়ে কত নরনারীর দৈনন্দিন জীবন-নাটকে মশগুল হয়ে সময় কাটিয়েছে—তার ইয়ত্তা নেই। সে-জন্যেই চক্ষুসর্বস্ব নিশাচর পাখির নাম পেয়েছিল।

বিচিত্র নেশাটি শুরু হয় এক ভরা গ্রীষ্মে। হয়তো কাঠ-ফাটানো জ্যৈষ্ঠ মাস। তখনো সে বেশ ছোট, বোধহয় পাঁচে, বড়জোর ছয়ে পড়েছে। এ-সময়ে সহসা একটি প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ির উঠানে প্রতি দুপুরে নিয়মিতভাবে হাজির হতে শুরু করে। সে-বাড়িতে কী যে তাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করত আজ তার মনে নেই, তবে খুব সম্ভব আকর্ষণের বিশেষ কোনো কারণ ছিল না। তাছাড়া যতদূর মনে পড়ে, সে-বাড়ির সাংসারিক কাজকর্মে আত্মমগ্ন মেয়ে-পুরুষেরা তার চোখের সামনে যে-চলচ্চিত্র সৃষ্টি করত সে-চলচ্চিত্রে না ছিল কোনো নায়ক বা নায়িকা, না কোনো কাহিনী। ঢেঁকিশালে ধানভানা, দাওয়ায় চুলবিনুনির পালা, পেছনের পুকুর থেকে সিক্তবসনে মেয়েদের প্রত্যাবর্তন, রান্না-ঘরের সামনে কুলা দিয়ে চাল-ঝাড়ার পর্ব, স্বল্পভাষী পুরুষদের আনাগোনা বা অটুট গাম্ভীর্যে জমাট হয়ে বসে ধূমপান করা—এ-সব গতানুগতিক দৃশ্যই তার কচি মনে মায়াজাল সৃষ্টি করত, নিত্য একই দৃশ্য দেখে তার সাধ মিটত না, মোহ ভাঙত না। আরো পরে, যখন কিছু বুদ্ধি হয়েছে, বুঝবার ক্ষমতা পেয়েছে, তখন পুনঃকৃত প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যে সে বৃহত্তর কিছু আবিষ্কার করে। সে-দিন থেকে বুঝতে পারে যে-মেয়েমানুষ সকালের দিকে উঠানে বসে চাল ঝাড়ে বা যে-লোক নির্দিষ্ট সময়ে ছাতা মাথায় বাজার অভিমুখে রওনা হয় সে-মেয়েমানুষ বা সে-লোক প্রতিদিন একই কাজ করেও সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী রচনা করে, পদে-পদে, তিলে-তিলে। সে-দিন থেকে তার পেঁচা-চোখে আর পলক পড়ে নি।

তবু বহুদিন ধরে সে যেন কেবল দর্শকই ছিল—যে-দর্শক দেখে কিন্তু কিছু অনুভব করে না, যা দেখে তার অর্থ বুঝলেও সে-অর্থ তার হৃদয় স্পর্শ করে না, সহসা চোখে অশ্রুর আভাস দেখা দিলেও সে-অশ্রু চোখ থেকেই নাবে অন্তর থেকে উঠে আসে না। নূতন বধূটির ব্যথায় অকস্মাৎ তার চোখে পানি আসার কথা এখনো তার মনে পড়ে।

দুদু মিঞার বাড়িতে নূতন বউ এসেছে শুনতে পেয়ে সেখানে উপস্থিত হতে তার দেরি হয় নি। টকটকে লাল শাড়ি পরে নূতন বউ সুদৃশ্য একটি চাটাইর ওপর বসে ছিল, মাথায় দীর্ঘ ঘোমটা, গায়ে অলঙ্কার, হাতে-পায়ে মেহেদি। প্রথমে দূর থেকে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে, কখনো কখনো তার উজ্জ্বল লাল শাড়ি লেলিহান শিখার মতো আচমকা জেগে উঠে তার চোখে ধাঁধা লাগায়। পরে নিকটে এসে মাথা নিচু করে ঘোমটা-ঢাকা মুখের দিকে তাকায়। সে-সময়ে তার চোখে পানি দেখতে পায় : চোখ-মুখ নিথর, গাল বেয়ে কী ব্যথায় নিঃশব্দ অশ্রুধারা নেবে আসছে। কৌতূহলী দৃষ্টি সম্বন্ধে সজ্ঞান হলে নূতন বউ হঠাৎ লজ্জিত হয়ে ভেঙচি কাটে। তার মুখ-ভেঙচানিতে সে বিব্রত বোধ করে নি, তবে তার চোখে-গালের অশ্রুধারার দিকে তাকিয়ে তার চোখও সহসা অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। অজানা মেয়েটির দুঃখে সে যে বুকে কোথাও ব্যথা বোধ করেছিল তা নয়, মেয়েটির চোখের অশ্রু পুষ্পরেণুর মতো অদৃশ্যভাবে ভেসে এসে তার চোখ ভিজিয়ে দিয়েছিল কেবল। সে-অশ্রু চোখেরই অশ্রু, হৃদয়ের অশ্রু নয়; হৃদয়ের অশ্রু দেখা দিতে সময় লাগে।

এমনি অনেক বাড়ির উঠানে দাওয়ায় অন্দরমহলে দাঁড়িয়ে বা খাটুমালা হয়ে বসে পেঁচা-চোখ মেলে সে সময় কাটাত, নিঃশব্দে, ছায়ার মতো। কোনো বাড়িতে এন্তেকাল ঘটলে ক্রন্দনরত শোকাকুল পরিবারের অজান্তে অলক্ষিতে সে যেমন সেখানে উপস্থিত হত তেমনি কোথাও নবজাত শিশু আকস্মিক কান্নার সাহায্যে তার আগমন-বার্তা ঘোষণা করতেই তার সান্নিধ্যে হাজির হত। সে দেখত, শুনত—কিছুই তার চোখ-কান এড়াত না। দেখে-দেখে শুনে-শুনে এক সময়ে মানুষের জীবন সম্বন্ধে এমনই পারদর্শী হয়ে পড়ে যে দূর থেকে কেবল মুখভঙ্গি দেখেই বলতে পারত কে ধানের কথা বলছে কে-বা বলছে খাজনার কথা।

বাল্যকালের সে-কৌতূহল বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গে কমে না গিয়ে দিন-দিন বেড়েই চলে। তবে যা বাল্যকালে সম্ভব, পরে সম্ভব নয়; বড় হয়ে উঠলে পেঁচা-চোখ লোকেরা সহ্য করে না। তাই ধীরে ধীরে সে নানাপ্রকার ছলনা-কৌশলের শরণাপন্ন হয়, এবং কীভাবে আলগোছে-অলক্ষিতে মানুষের অন্তরের গভীরতম কক্ষে প্রবেশ করে কেউ কিছু সন্দেহ করার আগেই যা জানবার তা জেনে নিতে হয়—এ-সব কায়দা শিখে নেয়। না নিয়ে উপায় কী? ততদিনে কৌতূহলটি নেশার মতো পেয়ে বসেছে তাকে।

"সে-জন্যেই জীবনে কিছু হয় নি। পরের জীবনের দিকে তাকিয়ে দিন কাটিয়েছি, নিজের জীবনের কথা ভাবার সময় হয়ে ওঠে নি।" হঠাৎ একটু আফসোসের সঙ্গেই যেন লোকটি বলে।

বাল্যকালে সে মেধাবী ছাত্র ছিল। বর্ষান্তের পরীক্ষায় প্রতিবছর প্রথম স্থান দখল করত, প্রাইজ-পুরস্কার পেত। তার পেশকার বাপ আশা করেছিল ছেলে যথাসময়ে ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের সঙ্কীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় উপস্থিত হবে, পরে জজ-হাকিম বা উকিল-ডাক্তার হবে। বাপের প্রতি আদর্শ-বাধ্যতা প্রদর্শন করে স্টিমারে সওয়ার হয়ে একদিন উচ্চশিক্ষার্থে অন্যত্র গিয়েছিলও, কিন্তু উচ্চাশার অভাবেই হোক, নিজের ক্ষুদ্র শহরের জীবনধারা থেকে বেশিদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব হয় নি বলেই হোক, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে তার দেরি লাগে নি। বাপকে নয়, বন্ধুবান্ধবকে বলেছিল : গাঁদা-ফুল গাঁদা-ফুলই হয়ে থাকবে, গোলাপ ফুল হবে না কখনো। এই বলে পূর্ণ উদ্যমে তার সুপরিচিত জীবনযাত্রায় আবার পরিপূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল, কোনো ক্ষোভ-মনস্তাপ অনুভব করেছিল কিনা সন্দেহ। তবে মানুষকে জীবিকার ব্যবস্থা করতে হয়। তাই বাপের মৃত্যু ঘটলে কিছু তদবির করে প্রথমে স্থানীয় স্টিমারঘাটে টিকেট-কেরানির পদে নিযুক্ত হয়, পরে স্টিমারঘাট বন্ধ হলে কাছারি-আদালতেই ছোটখাটো একটি কলম-ঠেসার কাজ নিয়ে নেয়। বলতে গেলে শ্রদ্ধেয় জন্মদাতার পদাঙ্কানুসরণই করে; তাতে খেদ-দুঃখের কিছু সে দেখতে পায় না। স্টিমারঘাটে চাকুরি নিয়ে একটি বিয়েও করে নিয়েছিল। বউ-এর সন্ধানে নদী পাড়ি দিয়ে হাসনাতপুর নামক একটি গ্রামে চলে গিয়েছিল; হয়তো তার ক্ষুদ্র শহরের সব ঘরের খবর-বৃত্তান্ত তার জানা ছিল বলে বউ খুঁজতে অন্যত্র যাওয়া তার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল। তবে তার মনে পড়ে, বিয়ে করতে যাবার সময়ে একটি কথা বুঝতে পেরে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সেটি এই যে, বয়ঃপ্রাপ্তির পর যে-সব বাড়ির অন্দরমহলে তার গতিবিধি বন্ধ হয়ে পড়েছিল সে-সব অস্পষ্ট-হয়ে-ওঠা অন্দরমহলের অভ্যন্তর তার স্ত্রীর দৃষ্টির সাহায্যে আবার পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে। তখন বউ সুন্দরী হবে কিনা তা নয়, তার সঙ্গে মন মিলবে কিনা—এই চিন্তায় সে বড় অধীর হয়ে পড়ে। তার চিন্তা দূর হয় তখন যখন সে দেখতে পায় একজোড়া সপ্রতিভ কৌতুকোজ্জ্বল চোখ যে-চোখে নিমিষেই হাসি জেগে ওঠে; সলজ্জ অপ্রস্তুত হাসি নয়, মন-খোলা হাসি, যেন ঘোমটা তোলার রস্‌মটি পুরানো বন্ধুর মধ্যে লুকোচুরির খেলা মাত্র। তখনই বুঝেছিল বউ-এর সঙ্গে মন মিলবে। তারপর সব ভালো লেগেছিল। হয়তো প্রচলিত রেওয়াজ একেবারে উপেক্ষা করা উচিত হবে না মনে করে স্ত্রী যখন মান-অভিমানের খেলা করেছিল তখন তাও ভালো লেগেছিল। একবার মনের মিল হলে মান-অভিমানের পালা ফলবৃক্ষে ফলের ওপর ফুলের বাহারের মতো, সুন্দরী নারীর দেহে মণিমুক্তার বিচ্ছুরণের মতো, অপরূপ সূর্যাস্তের সময়ে রঙধনুর বর্ণশোভার মতো উপরিলভ্য; সে-সব ফাউ।

লোকটির কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। একবার মনে হয়, তার কথা আমার স্মৃতির পর্দায় কোথায় যেন ঈষৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তবে ধারণাটির কোনো যথার্থ কারণ দেখতে না পেলে ভাবি, অন্যের জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে কৌতূহলী মানুষের প্রতি আমি কি বরাবর কেমন একটা

আকর্ষণ বোধ করি না? তেমন মানুষ নিয়ে কত প্রশ্ন জাগে মনে : এই কৌতূহলের পশ্চাতে কী, মানুষের জীবনে কী তারা সন্ধান করে, এবং অবশেষে কীই-বা খুঁজে পায়? নিরন্তর মানুষের মনে নিরাশা দেখে তাদের কৌতূহল কি বালুচরে হারিয়ে-যাওয়া নদীর মতো সহসা অদৃশ্য হয়ে যায় না, মানুষের কুচিন্তা-কুকাজের প্রভূত প্রমাণে তাদের মনে কি অবশেষে একটি গভীর বিতৃষ্ণা জাগে না? কখনো-কখনো সহজ এবং সম্ভবত সত্য উত্তরটিই গ্রহণ করি। অন্য মানুষের মনের কথা জানা কিছুতেই সম্ভব নয় তা সন্ধানকারী যতই কৌশলী-কারসাজিবাজ হোক না কেন, এবং যারা জানে বলে দাবি করে তারা বড়াই করে কেবল। সে-জন্যেই মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে তারা সুস্থ মনে বসবাস করতে পারে, নিশ্চিন্ত মনে রাতে ঘুমাতে পারে, হাসতে পারে, বন্ধুত্ব করতে পারে অন্যের সঙ্গে।

লোকটিও বড়াই করে থাকবে—এ-বিশ্বাস সত্ত্বেও সে কী বলছে তা শুনবার জন্যে আবার সকর্ণ হয়েছি এমন সময়ে বুঝতে পারি সমগ্র স্টিমারময় কেমন নীরবতা নেবেছে। তখন সূর্যাস্ত শুরু হয়েছে। যারা স্টিমারযোগে নিয়মিতভাবে ভ্রমণ করে তারা জানে এ-সময়ে যাত্রীদের মধ্যে তাদের অজান্তেই নীরবতা নেবে আসে, যে-নীরবতার মধ্যে এবার স্টিমারের ঘূর্ণ্যমান মস্ত পাখা দুটির, সে-পাখা দুটির নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত পানির, এবং নিচে জীবন্ত ইঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ সুস্পষ্টভাবে শোনা যায়। যাত্রীরা সহসা নীরব হয়ে গিয়ে সে-সব আওয়াজ শোনে যেন তা আগে শোনে নি। এ-সময়ে যাত্রীরা স্টিমারের দেহের স্পন্দন এবং গতি সম্বন্ধেও যেন সর্বপ্রথম সজ্ঞান হয়, তারপর তাদের দৃষ্টি যায় দূরে তীরের দিকে দিগন্তের দিকে ম্লান নিষ্প্রভ আকাশের দিকে; উন্মুক্ত আকাশের তলে দিন-রাতের সন্ধিক্ষণে যে-বিচিত্র অসীমতা প্রকাশ পায় তারই স্পর্শে তারা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। নীরবতা আরো ঘনীভূত হয়। এবার শুধু নিকটের পানির গর্জন নয়, দূরে যে-ঢেউ দীর্ঘশ্বাসের মতো অস্ফুট শব্দ করে ছড়িয়ে পড়ে তার ক্ষীণ শব্দও শুনতে পায়, আরো দূরের ঢেউ—যে-ঢেউ-এর শব্দ শোনা যায় না—সে ঢেউ সহসা দৃষ্টিগোচর হয়, হয়তো-বা ছায়াচ্ছন্ন আকাশে দৃষ্টিহীনভাবে উড়তে থাকা পথ-হারা কোনো পাখিও নজরে পড়ে।

তবে শীঘ্র বুঝতে পারি, শুধু সূর্যাস্তের জন্যে নয়, মাঝ-নদীতে স্টিমারটি হঠাৎ ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে বলেও যেন যাত্রীরা নীরব হয়ে পড়েছে। এ-স্থানে নদীর গভীরতা বেশ কম হবে। স্টিমারটি কিছুক্ষণ গভীরতা মেপে মেপে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, তারপর থেমেই পড়ে, যেন আর এগুতে সাহস হয় না। স্টিমারটি আবার যখন চলতে শুরু করে তখন বেশ সাবধানতার সঙ্গে চলে, কখনো এদিক-ওদিক মোড় নিয়ে, কখনো একটু পশ্চাতে হটে, কখনো-বা পুনরায় অল্প সময়ের জন্যে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে দ্রুতভাবে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, যে-অন্ধকারে তেরপলের ঝুলে-পড়া অংশটি সশব্দে আন্দোলিত করে আবার প্রবলবেগে হাওয়া ছুটতে শুরু করে।

একবার লোকটির দিকে দৃষ্টি দেই। ইতিমধ্যে বুঝে ফেলেছি যে বেশিক্ষণ নীরব হয়ে থাকা তার পক্ষে সহজ নয়; কী সে বলে কেনই-বা বলে—তা নিজেও সব সময়ে না বুঝলেও তাকে কথা বলতেই হয়, না বললে হয়তো কেমন নিঃসহায় এবং নিরস্ত্র বোধ করে। কিন্তু এখন সে-লোকের মুখে কথা নেই। মনে হয় গভীর মনোযোগ-সহকারে স্টিমারের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও নিরাপদ পথ খুঁজছে, অনেকটা রুদ্ধশ্বাসে। তার চোখের হাসিটি মিলিয়ে গিয়েছে, দৃষ্টি নদীর দিকে, হাসিশূন্য কথাশূন্য মুখে অপেক্ষার, কিছু আশঙ্কার ভাব।

অবশেষে স্টিমারটি বিপদজনক অঞ্চলটি নিরাপদে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। তেজ বাড়িয়ে স্টিমার পূর্ণোদ্যমে চলতে শুরু করলে মুক্তি-পাওয়ার আনন্দেই যেন তার সমগ্র দেহ কাঁপতে শুরু করে থরথর করে; তার চতুষ্পার্শ্বে পানির গর্জন আর্তনাদের মতো নয়, শৃঙ্খলমুক্ত প্রাণীর উল্লাসধ্বনির মতো শোনায়। যাত্রীদের মধ্যে আবার গুঞ্জন জাগে। সামনের ঘাট আর দূরে নয়।

লোকটি আরো কয়েকমুহূর্ত নীরব হয়ে থাকে। তারপর সহসা সে একটি শহরের নাম নেয় যে-নাম শুনে প্রথমে চমকিত হই, তারপর এ-কথা বুঝতে পারি যে তখন স্মৃতির পর্দায় অকারণে দোলা লাগে নি। তবে লোকটি কি তবারক ভুইঞা? তাকে কখনো স্বচক্ষে দেখি নি, কিন্তু সহসা কেমন নিঃসন্দেহ হয়ে পড়ি যে সে তবারক ভুইঞাই হবে। সে-বিষয়ে নিশ্চিত হলে মনে-মনে বড় উত্তেজিত হয়ে পড়ি, একটি মানুষের স্মৃতি অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সহসা। স্মৃতি নয়, একটি ভার, যে-ভার এত বছরেও হাল্কা হয় নি। উত্তেজিত হয়ে ভাবি : তবে লোকটির মুখে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা শুনতে পাব কি? আমি জানি মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে লোকটির পরিচয় হয়েছিল। শুধু তাই নয়; যে-বিচিত্র দ্বন্দ্বে সে-সময় মুহাম্মদ মুস্তফা সমগ্র মনে-প্রাণে নিপীড়িত হয়েছিল সে-দ্বন্দ্বের কথা এবং সে-দ্বন্দ্বের কারণের কথাও জানতে পেরেছিল। তখন শিক্ষানবিশী শেষ হবার পর মুহাম্মদ মুস্তফা সবেমাত্র সে-শহরে ছোট হাকিমের পদে নিযুক্ত হয়েছে এবং তবারক ভুইঞা সে-শহরেরই স্টিমারঘাটে টিকেট-কেরানির কাজ করত। কীভাবে তবারক ভুইঞা মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছিল জানি না, তবে তবারক ভুইঞার মতো লোকের পক্ষে কাজটি তেমন কিছু কঠিন নয়। প্রথমে পরিচয়, তারপর একরকম ঘনিষ্ঠতার মতো। হয়তো ঘনিষ্ঠতা কথাটা ঠিক নয়, কারণ যাদের সঙ্গে সমানে-সমানে মেলামেশা করা যায় না, পদমর্যাদায় যারা তার চেয়ে উঁচু স্থান রাখে, তাদের সঙ্গে হয়তো সে ভাবমিতালি করে না, ভাবমিতালির প্রয়োজনও বোধ করে না। তবে তেমন কোনো লোকের নিকটবর্তী হবার প্রয়োজন বোধ করলে সে কেবল আলগোছে কোথাও একটি দেউড়ি পেরিয়ে যায় যার পর সে-লোকটির অন্তরের গভীরতম অঞ্চলেও দৃষ্টি দিতে আর বাধে না, এবং সহসা তার সান্নিধ্য সম্বন্ধে লোকটি যদি সচেতন হয়ে কেমন আশঙ্কিত হয়ে পড়ে তখন তার দিকে একবার দৃষ্টি দিলে আবার আশ্বস্ত হতে দেরি হয় না। মুহাম্মদ মুস্তফাও অবিলম্বে আশ্বস্ত হয়েছিল। অল্পবয়স্ক টিকেট-কেরানির দিকে তাকালে সে দেখতে পায়, বিশ্বস্ততার আদর্শ চিরশ্রদ্ধ মানুষটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় নি, তার চোখের অন্তরস্পর্শী সরলতায়, মুখের নিরীহ ভাবে থুতনির পরিচ্ছন্ন রেখাতে বা নিত্যকার সজ্জনতায় কোনো কিছুতেই তারতম্য ঘটে নি, তাছাড়া এত কাছে বসেও সে যেন অনেক দূরে, এমনকি সে যে কিছু শুনছে তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না; বস্তুত সে এমনই মানুষ যার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় যদিও কী কারণে নির্ভর করা যায় তা বলা মুশকিল। তবু সে ভয়ানক জ্বরে না পড়লে হয়তো তবারক ভুইঞা কথাটা জানতে পারত না।

অকস্মাৎ মুহাম্মদ মুস্তফার প্রবল জ্বর শুরু হয়। তবারক ভুইঞা পূর্ণ উদ্যমে জ্বরাক্রান্ত নিঃসঙ্গ মুহাম্মদ মুস্তফার সেবা-শুশ্রূষায় লেগে যায়। একদিন রাতে মুহাম্মদ মুস্তফা দেখতে পায় তবারক ভুইঞা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সহসা সে একটি কণ্ঠস্বরও শুনতে পায়। তবে সে বুঝতে পারে, কণ্ঠস্বরটি তবারক ভুইঞার নয়, নিজেরই কণ্ঠস্বর। অকারণেই সে যেন চমকিত হয়ে পড়ে, অকারণে এ-জন্যে যে নিজের কণ্ঠস্বর শুনলে চমকিত হবার কোনো যথার্থ কারণ নেই। তারপর ঘরময় সহসা নীরবতা নাবে। অনেকক্ষণ সে-নীরবতা জমাট হয়ে থাকে, যে-নীরবতার মধ্যে বাইরে কোথাও বিদ্যুৎগতিতে চক্কর দিতে থাকা একটি বাদুড়ের আবির্ভাব হলে সে-বাদুড়ের শব্দ, পরে দূরে কোথাও একটি বিড়াল-ছানা ক্ষীণ-কাতর কণ্ঠে কাঁদতে শুরু করলে সে-কান্নার শব্দ—এ সব উচ্চরব ধারণ করে। তবারক ভুইঞা কেমন চঞ্চল হয়ে একবার হাত-পাখাটি তুলে নেয়, পরক্ষণে রোগীর তৃষ্ণা পেয়ে থাকবে ভেবে পুঁতি-ঝোলানো জালি দিয়ে ঢাকা পানির গেলাসটি ওঠায়। জালিটা তার বউ-এর হাতের কাজ, দুদিন হল মুহাম্মদ মুস্তফাকে এনে দিয়েছে। "থাক পানি।" মুহাম্মদ মুস্তফা বলেছিল। ততক্ষণে সে বুঝে নিয়েছে, শ্যাওলাপড়া ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে খোদেজার মৃত্যুর কথা তবারক ভুইঞা বলে ফেলেছে। এবার সে অপেক্ষা করে। তার বিশ্বাস হয় তবারক ভুইঞা বলবে : মেয়েমানুষেরা কত আজে-বাজে কথা বলে। অবশেষে লণ্ঠনের তেজ কমিয়ে

তবারক ভুইঞা বলেছিল, "ওসব কথা এখন ভাববেন না।"

তবারক ভুইঞা চলে যাবার পর মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ নিথর হয়ে থাকে। জ্বর কমে নি, কিন্তু মাথাটি কেমন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। প্রথমে সে একটু লজ্জা বোধ করে। তার মনে হয় সে যেন জ্বরের অজুহাতেই শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো পুকুরে যে-ঘটনা ঘটেছিল সে-ঘটনার কথা তবারক ভুইঞাকে বলেছে। লজ্জার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু স্বস্তিও যেন পায়। হয়তো কথাটি কাউকে বলতেই হত। তাছাড়া, তবারক ভুইঞা লোকটি যেন ভালো, বিশ্বাসী, এবং বয়স তেমন না হলেও কেমন সমঝদার, দরদবানও, তাকে বলায় কোনো ক্ষতি নেই। তবে একটি কথায় মনটা কেমন খচখচ করে। সে তবারক ভুইঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কথাটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা। তবারক ভুইঞা হাঁ-না কিছু বলে নি, কোনো মতও প্রকাশ করে নি। তবারক ভুইঞার প্রতিক্রিয়াটি ঠিক বুঝতে পারে না। অথচ সব কথাই সে যেন তাকে বলেছে, কিছুই ঢাকে নি।

মনের অধীরতা চেপে আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, কারণ জলাপাড়া নামক একটি ঘাটে স্টিমার থামলে লোকটি যাত্রীদের ওঠা-নাবায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তবে তেমন ওঠা-নাবা যে হয় তা নয়; ঘাটটি ছোটখাটো ধরনের হবে। সন্ধ্যা-উত্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে কয়েকজন যাত্রী অদৃশ্য হয়ে যায়, সে-অন্ধকার থেকে আবার কয়েকজন নূতন যাত্রী স্বল্পালোকিত স্টিমারের পাটাতনে মূর্তিমান হয়।

স্টিমারটি পুনরায় মাঝ-নদীতে এসে পথ ধরেছে এমন সময়ে লোকটি কুমুরডাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র একটি শহরের কথা বলতে শুরু করে; জলাপাড়া ঘাটের আগে স্টিমার যখন নদীর অগভীর স্থানটি সন্তর্পণে পার হয়ে আবার পূর্ণবেগে চলতে শুরু করেছে তখন সে-শহরের নামই লোকটির মুখে শুনতে পেয়ে চমকে উঠেছিলাম; সে-শহরে মুহাম্মদ মুস্তফা ছোট হাকিমের পদে নিযুক্ত হয়েছিল। লোকটি বলে : অনেক মহকুমা শহর ক্ষুদ্র হয় কিন্তু কোনোটাই হয়তো কুমুরডাঙ্গার মতো ভাগ্যহীন নয়। জলাপাড়া ঘাটের আগে নদী যেমন অগভীর হয়ে উঠেছে তেমনি সে-শহরের পাশে দিয়ে প্রবাহিত বাকাল নদীটি একদিন অগভীর হয়ে ওঠে শহরবাসীদের অজান্তেই এবং তারপর স্টিমার চলাচলের জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। কুমুরডাঙ্গা শহর এমনই এক অঞ্চলে অবস্থিত যেখানে রেলগাড়ির মতো লৌহদানব তো দূরের কথা, তেমন একটি সড়কও কল্পনাতীত যে-সড়ক বর্ষাকালে তলিয়ে যাবে না, বৃষ্টিতে ভেসে যাবে না। নদী-খাল-বিল এবং বিস্তীর্ণ জলাভূমি পরিবেষ্টিত শহরটির জন্যে দ্রুত যানবাহন হিসেবে যে-স্টিমার ছাড়া আর কোনো গতি ছিল না সে-স্টিমারও বন্ধ হয়ে যায়। শহরের আর্থিক অবস্থা এমনিতে ভালো ছিল না। তার সমৃদ্ধি শুধু যে স্তব্ধ হয়েছিল তা নয়, দিন-দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছিল। অনেকদিন ধরে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঘুণ ধরেছিল, উকিল-মোক্তার, হেকিম-ডাক্তারের তেমন পসার ছিল না; কাছারি-আদালত, ছোট একটি হাসাপাতাল, হাই স্কুল, এমনকি মেয়েদের জন্যে একটি মাইনর স্কুল নিয়ে গর্ব করতে পারলেও যে-রহস্যময় কল্যাণস্পর্শে একটি জায়গা জীবিত থাকে, তার উন্নতি হয়, সে-কল্যাণস্পর্শ থেকে শহরটি সদা বঞ্চিত। তার ওপর স্টিমারঘাটও বন্ধ হলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ে আর কি।

লোকটির চোখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী একটা ভাব জাগে। সে বলে, সে যখন সর্বপ্রথম শুনতে পায় বাকাল নদীতে চরা পড়েছে তখন সহসা তার মানস-চোখে বাল্যকালে দেখা একটি নদীর চিত্রই ভেসে উঠেছিল। সেটি একটি অতিশয় খরধার বিশাল নদী যার অপর তীরে প্রতি শরৎকালে মাঠের পর মাঠ ঢেকে বিস্তৃত কাশবন রূপালি শুভ্রতায় ধবধব করত, যার দ্রুতগতি স্রোতে ভেসে যেত জোটবাঁধা অজস্র কচুরিপানার দল এবং নূতন হাঁড়ি-পাতিলে বোঝাই ডুবু-ডুবুপ্রায় অসংখ্য কুমোর-নৌকা, মধ্যে-মধ্যে ঝড় এসে যার পানিতে তুমুল

তরঙ্গমালা সৃষ্টি করত আর যার গভীরতাসূচক গাঢ় রঙ দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকেও হাল্কা হত না। তবে সে-নদীর বিশালতা, তার অপর তীরের রহস্যময় অস্পষ্টতা, সে-তীরের শরৎকালীন বিস্তৃত কাশবন বা তার পানির রঙ—এ-সব লক্ষ্য করলেও যা বালকমনকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করত তা নদীটির অবিরাম বলিষ্ঠ ধারা। সে-কারণেই হয়তো বালক-চোখ যখন কুমোর-নৌকা বা কচুরিপানার দিকে তাকাত তখন তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পেত না, সে-চোখ কেবল লক্ষ্য করত তাদের ভেসে যাওয়া, যে-ভেসে যাওয়ার মধ্যে নৌকাগুলি এবং গাঢ় সবুজ জলজ-উদ্ভিদ তাদের আকার-আকৃতি হারিয়ে একাকার হয়ে পড়ত, মনে এ-প্রশ্নও জাগত না কোথায় সে-সব উদ্ভিদের জন্ম কোথায়-বা তা যায়, কোন ঘাটেগঞ্জেই বা কুমোর-নৌকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় হয়। শুধু সে-সব বস্তুর মধ্যেই নয়, সে-সব বস্তু এবং স্রোতের মধ্যেও বালক-চোখে কোনো পার্থক্য ধরা পড়ত না : স্রোত, নৌকা, কচুরিপানা, বর্ষার দিনের অন্যান্য জিনিস—গাছের শাখা বা গৃহপালিত কোনো জীবজন্তুর মৃতদেহ, সবই ভেসে যায়, নিরন্তরভাবে, মানুষের জীবন সম্বন্ধে একটি দৃষ্টিহীন গভীর উদাসীনতায়। সে ভেসে-যাওয়া বালক-মনে অবশেষে একটি দুর্বোধ্য ভাবের সৃষ্টি করত, সুপরিচিত মাঠঘাট জনপদ ছেড়ে অস্পষ্ট তবু নিত্য দেখা দিগন্ত পেরিয়ে সে-মন তীরহীন কোনো নদীতে হারিয়ে যেত যে-নদীতেও সব কিছু ভাসত। এবং সেও ভাসত, প্রশ্ন না করে, সম্মুখে বা পশ্চাতে না তাকিয়ে, ভয় না পেয়ে; বালক-মন আদি বা অন্তের সন্ধান করে না বলে ভীত হয় না। তারপর এক সময়ে নদীতে সহসা রাত নেমে আসত যে-রাতে কুমোর-নৌকা, কচুরিপানার দল, বর্ষাকালে ভাসমান অন্যান্য বস্তু, এমনকি শরৎকালের অপর তীরের ধবধব-করা কাশবনও নিমজ্জিত হত যেমন দিনান্তে রক্তিমাভাও নিশ্চিহ্ন করে নদীগর্ভে সূর্য নিমজ্জিত হয়। তখনো সে ভেসে-যাওয়া ক্ষান্ত হত না, যদিও সময়টা অপেক্ষার সময়—ঘুমের মধ্যে দিয়ে, কালো রাতে মৃদু আলো জ্বালিয়ে নদীর বুকে জাল ফেলে বসে, স্বপ্নের জন্যে নয় মাছের জন্যেও নয়, সূর্য ওঠার জন্যে যাতে সে-নিরন্তর ভেসে-যাওয়া আবার দৃষ্টিগত হয়—স্রোতের কুমোর-নৌকার, কচুরিপানার, বর্ষার দিনে অন্যান্য অপ্রত্যাশিত বস্তুর। হয়তো কখনো এমন নদীর মৃত্যু হয় না। তাই একদিন বাল্যকালের বিশাল নদীটি ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে-হয়ে একটি ছোটখাটো শাখানদীতে পরিণত হলেও দুই নদীর মধ্যে কোনো সংঘাত সৃষ্টি হয় নি, পূর্ণবয়স্ক চোখ স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা মেনে নেয় যে বাস্তব নদীটির অপর তীর তেমন দূরে নয়, অস্পষ্টও নয়, সেখানে শরৎকালে যে-কাশবন দেখা দেয় তা দিগন্তপ্রসারী নয়, দুরন্ত ঝড় জাগলেও তার পানিতে তুমুল তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয় না বা আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হলেও সে-পানি গাঢ় রঙ ধরে না, তার ধারাও দ্রুতগামী নয়, তাছাড়া এখনো সে-পথে কুমোর-নৌকা ভেসে গেলেও তাদের সংখ্যা অগণিত নয়। কোনো আক্ষেপ না করে সে-সব কথা সে গ্রহণ করে নেয় : বাকাল নদী ছোটখাটো শাখা নদী মাত্র।

"কুমুরডাঙ্গার স্টিমারঘাটের ফ্ল্যাটটি শহরের ছেলেদের জন্যে মস্ত আকর্ষণের বস্তু ছিল। লুকিয়ে-লুকিয়ে তাতে চড়ে আমরা দুঃসাহসের এবং বীরত্বের পরিচয় দিতাম। ধরা পড়লে লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞা বাঘের মতো গর্জন করে উঠত যে-গর্জনে বুকের পানি জমে যেত", লোকটি বলে, চোখের কোণে হাসিটায় যেন দূরত্বের অস্পষ্টতা।

লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞা শহরে বড় একটা দেখা দিত না। শহরবাসীদের প্রতি তার ছিল নাকউঁচু ভাব। স্টিমারের মতো অত্যাশ্চর্য কলের বস্তুর সে একটি অংশ; তার আত্মগর্ব অযথার্থ মনে হত না। তার শরীরটা ছিল তাগড়া-বলিষ্ঠ, লম্বাতেও কম ছিল না। মুখে ছিল বাহারি ধরনের গোঁফ যা সে তার গর্বিত ব্যক্তিত্বের ঝাণ্ডার মতোই ব্যবহার করত। তার খৈনি খাবার অভ্যাস ছিল। সে যখন কালে-ভদ্রে মুখে খৈনি পুরে অতি ধীরে-ধীরে চোয়াল নেড়ে দৃষ্টি ঊর্ধ্বে রেখে শহরের পথে দেখা দিত তখন মনে হত হেলাফেলা করবার মতো লোক সে নয়। বস্তুত তার মুখভাব, হাঁটার ভঙ্গি, শরীরের গঠন, খৈনিরসসিঞ্চিত চোয়ালের শ্লথ সঞ্চালন, তার বাহারি

গোঁফ—এসব জনসাধারণের মধ্যে অনিচ্ছাকৃত সমীহের ভাবই জাগাত। তবে সমীহটা কিছু ভাঙত যখন সে-কথা বলতে বাধ্য হত, কারণ তার জবানটি ছিল নিতান্ত স্থানীয়। প্রকৃতপক্ষে, নদীর অপর তীরে একটি গ্রামে সে জন্মগ্রহণ করেছিল, এবং কয়েক বছর ধরে স্টিমারঘাটে নোকরি করলেও কখনো স্টিমারে ভ্রমণ করে নি।

স্টিমারঘাটে যে-ফ্ল্যাটের নিচের তলায় লস্কর-সর্দার সপরিবারে বসবাস করত কোম্পানির সম্পত্তির পাহারাদারের অধিকারে এবং যে-ফ্ল্যাট কুমুরডাঙ্গার ছেলেদের নিত্য হাতছানি দিয়ে ডাকত, তাদের কল্পনায় উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করত, সেটি আবার তাদের চোখে ডানা-কাটা পাখির মতোও ঠেকত। নিঃসন্দেহে সেটি একদিন রীতিমত স্টিমারই ছিল। তখন নিঃসন্দেহে অনেক কিছু তাতে শোভা পেত : ঝকঝকে পাটাতনের ওপর সুদৃশ্য ক্যাবিন-কামরা, ধুঁয়াত্যাগের জন্যে গোলাকার উত্তুঙ্গ চুঙ্গা, দু-পাশে মস্ত দুটি পাখা, ছাদে সারেঙ্গের ঘর, বিশাল নদীর বুকে ঢেউ তুলে মাল ও যাত্রী বহন করে দূর-দূর ঘাট-বন্দরে যাতায়াত করবার জন্যে যথাবিধি কলকব্জা—আমূল পরিবর্তনের ফলে যে-সবের আর কোনো চিহ্ন ছিল না। কেবল একটি বসতবাটি সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হলেও মাটিতে যেমন তার ভিতের একটু আভাস-ইঙ্গিত থেকে যায় তেমনি ফ্ল্যাটটির পূর্ব-চেহারার ঈষৎ আভাস-ইঙ্গিত ধরা পড়ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দর্শকের চোখে। কতগুলি অস্পষ্ট রেখা থেকে সে অনুমান করতে পারত কোথায় ক্যাবিন-কামরা ছিল, কোথায় ছিল কলকব্জা যে-সব কলকব্জা সারেঙ্গের সঙ্কেতে নিমেষে জীবন্ত হয়ে উঠত, কোথা দিয়ে ধুঁয়াত্যাগের চুঙ্গাটি উর্ধ্বগামী হত। অনেকদিন আগে শেষ হয়ে যাওয়া গৌরবময় জীবনের যা তখনো বিদ্যমান ছিল তা তার লৌহনির্মিত চ্যাপ্টা ধরনের তলদেশ এবং তার কাঠামো। তলদেশ অক্ষত ছিল এবং সে-কারণে ভেসে থাকার ক্ষমতা তখনো হারায় নি, কিন্তু তার কাঠামোটিকে যে-ভাবে স্থাবর জীবনের প্রয়োজনানুসারে কামরা কুঠরির নিমিত্তে বাঁশবাখারি টিনকাঠে বা নলখাগড়ার বেড়ার সাহায্যে আবৃত করা হয়েছিল তাতে তার চেহারা অনেকটা গ্রাম্য কুটিরের রূপই গ্রহণ করেছিল; আদি বস্তুটির কঙ্কাল যেন তাচ্ছিল্য এবং অযত্নের সঙ্গে কোনো প্রকারে পুনরাচ্ছাদিত করা হয়েছিল। কেবল একটি কথা অস্বীকার করা যেত না। সমস্ত গতিশক্তি হারিয়ে নিতান্ত স্থবির-অথর্ব হয়ে পড়লেও তখনো তা অকেজো হয়ে পড়ে নি, যাত্রী নিয়ে কোথাও আর না গেলেও তাদের পদস্পর্শ থেকেও বঞ্চিত হয় নি; প্রতিদিন যাত্রারম্ভে বা যাত্রাশেষে তারই বুকে যাত্রীরা কিছু সময়ের জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করত। তাছাড়া তার দৌরাত্ম্য শেষ হয়েছিল, স্বাধীনতা বলশক্তির অবসান ঘটেছিল, যৌবনের রূপছটাও আর ছিল না, কিন্তু নদীর সঙ্গে আজীবনের সম্বন্ধ তখনো ছিন্ন হয় নি, কারণ নদনদী আর পাড়ি না দিলেও তখনো তার চতুষ্পার্শ্বে সে-নদনদীর শাশ্বত ধারা কলতান করত, বহুদিনের সহবাসের কথা স্মরণ করে হয়তো স্নেহভরেই তার অক্ষম দেহটি আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রাখত।

"ঘাটের কথায় একটি কথা মনে পড়ে গেল", লোকটি একটু থেমে আবার বলে। "ঘাটের জন্যেই কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের একটা দুর্নাম। তারা নাকি অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির লোক।"

কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা অতিশয় হিংস্রপ্রকৃতির লোক— এই বলে সমগ্র অঞ্চলে যে-একটা কুখ্যাতি সে-কুখ্যাতির উৎপত্তি হয় তাদের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ স্টিমার কোম্পানির একটি গুপ্ত মতে যা একদিন কী করে প্রকাশ পেয়ে মুখে-মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। যে-ঘটনার জন্যে কোম্পানি সমগ্র কুমুরডাঙ্গাকে জড়িয়ে এ-অন্যায্য মতটি লিপিবদ্ধ করেছিল সে-ঘটনাটি ঘটেছিল প্রায় আশি বছর আগে। সেদিনই সে-শহরে সর্বপ্রথম স্টিমারঘাট খোলা হয়েছিল।

ঘাট খোলার উপলক্ষটিকে একটি স্মরণীয় ব্যাপারে পরিণত করার জন্যে কোম্পানি বেশ জাঁকজমক-সমারোহের ব্যবস্থা করেছিল। তখনো ঘাটে ফ্ল্যাটটি বসানো হয় নি, তবে

নদীতীরে উঁচু দরওয়াজা তৈরি করে সেটি নানা রঙের কাগজে আবৃত করে পতাকা ঝুলিয়ে শোভিত করেছিল, তারপর জেলা থেকে আমদানি করেছিল পুলিশের বাদ্যকদল চমকপ্রদ রণবাদ্যের ঝঙ্কার তুলে শহরবাসীদের আমোদিত করার জন্যে। নির্দিষ্ট দিনে স্টিমার আসার অনেক আগে ঘাট লোকে-লোকারণ্য হয়ে পড়ে। শুধু শহর থেকে নয়, কোম্পানি দশ গ্রামে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে ঘাট প্রতিষ্ঠানের খবরটি সাড়ম্বরে প্রচার করেছিল বলে সারা অঞ্চল থেকে মিছিল করে লোকেরা ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল তামাশা দেখবার জন্য। দেখতে-না-দেখতে ঘাটের সামনে রীতিমত হাট-বাজারও বসে গিয়েছিল; জনতার সমাগম ব্যবসায়ী মানুষের মনে অবিলম্বে অর্থলিপ্সা জাগায়। বস্তুত সব কিছু মিলে সদ্য-খোলা ঘাটটি একটি বৃহৎ মেলার রূপ ধারণ করে, আনন্দোৎফুল্ল উদ্দীপনা উল্লাস-উত্তেজনায় স্থানটি সরগরম হয়ে ওঠে। বলতে গেলে তখন এ-অঞ্চলে কারো বাষ্পীয় জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, মুষ্টিমেয় যারা অত্যাশ্চর্য বস্তুটিকে সচক্ষে দেখেছিল তারা দূর থেকেই দেখেছিল কেবল, কখনো তাতে চড়ে নি। এক-আধজন সৌভাগ্যবান যারা শুধু দেখে নি তাতে আরোহণ করে ভ্রমণও করেছে, তারা এ-সুযোগে আসন্ন যন্ত্রদৈত্যের সম্বন্ধে চটকদার বিবরণ দিয়ে অজ্ঞদের ঔৎসুক্য মাত্রাতিরিক্তভাবে শাণিত করে তোলে।

স্টিমারের আগমন নিরীহ আমোদ-উল্লাসের মধ্যে দিয়ে নিরুপদ্রবেই কাটত যদি কোম্পানির কর্তৃপক্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের স্টিমারের ডেক-এ চা-পানের দাওয়াতে মেহমানদের তালিকায় হিন্দু জমিদারবাবুর নাম অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলে না যেত। ভুলটা হয়তো এই কারণেই ঘটেছিল যে সমগ্র অঞ্চলে অশেষ প্রতাপ-প্রতিপত্তি রাখলেও জমিদারবাবুর বাসস্থান ছিল শহর থেকে বেশ কয়েক ক্রোশ দূরে। তাছাড়া জমিদারবাবু কদাচিৎই তার বাসস্থানে থাকত; শস্যসংগ্রহকাল ছাড়া বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে দেশের বাড়িতে ডাক না পড়লে অধিকাংশ সময়ে শৌখিনহালে কলকাতার নেশায় মৌজ হয়ে সে-বৃহৎ শহরেই দিন কাটাত। ঘাট খোলার পূর্ব রাতে সে যে আচমকা দেশের বাড়িতে ফিরে এসেছে তা কেউ জানতে পায় নি।

দাওয়াত নেই দেখে জমিদারবাবু গভীরভাবে অপমানিত বোধ করে। তখন বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের জন্যে ইংরেজ এবং হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড মনোমালিন্যের ভাব বলে তার ধারণা হয়, কোম্পানির ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করেই মেহমানদের তালিকা থেকে তাকে বাদ দিয়েছে। জমিদারবাবু তাগড়া-তাগড়া চেহারার বেহারি লাঠিয়াল পুষত। নির্ভেজাল খাঁটি দুধ-ঘি খেয়ে কুস্তি-বৈঠক-মল্লযুদ্ধ করে অন্য সময়ে নিষ্কর্মা আলস্যে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে তারা তৃপ্ত বোধ করত না, একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা মারপিটের জন্য তাদের হাত সর্বদা নিশপিশ করত। জমিদারবাবু তাদেরই পাঠিয়ে দেয় কুমুরডাঙ্গার ঘাটে, ডাণ্ডাবাজির গন্ধ পেয়ে তারাও তিনলাফে যথাস্থানে উপস্থিত হয়। স্টিমার আসে, পুলিশের বাদ্যকদল রণবাদ্য শুরু করে, ঘাটে সমবেত জনতার মধ্যে ভয়শ্রদ্ধামিশ্রিত গভীর স্তব্ধতা নাবে। সমস্ত কিছু ঠিকভাবে চলছে এমন সময় রণবাদ্যে বিভিন্ন সুর ঢুকিয়ে জমিদারবাবুর লাঠিয়ালরা রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে স্টিমারে ওঠার সুসজ্জিত পুলের ওপর দিয়ে স্টিমারে চড়ে তার ধ্বংসকার্যে লিপ্ত হয়। পুলিশ আসার আগেই স্টিমারের আসবাবপত্র জানলা-দরজা ভেঙে-চুরে তারা যে-কাণ্ড করেছিল তার জন্যে স্টিমারটি মাস কয়েক এ-পথে মুখ দেখাতে পারে নি।

সরকার ঘটনাটির তদন্ত করেছিল এবং লাঠিয়ালদের যথাবিহিত শাস্তি দিয়েছিল। তবে তাদের পশ্চাতে কে ছিল তা অনুমান করা সহজ হলেও সাক্ষীর অভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নি; লাঠিয়ালরা জমিদারবাবুর নাম নিতে অস্বীকার করেছিল। একমুখে কেবল বলেছিল, শত-শত দর্শকের মতো তামাশা দেখবার জন্যই তারা কয়েক ক্রোশ পথ ভেঙে স্টিমারঘাটে উপস্থিত হয়েছিল এবং বিচিত্র যন্ত্রদানবটি দেখে উত্তেজনায় সম্বিৎ হারিয়ে কী করেছিল বলতে পারবে না। একজন এ-কথাও বলেছিল যে, পুলিশের বাজনার জন্যে তার মতিভ্রম

হয়েছিল; সে-বাজনা শুনে তার সমস্ত শরীরে রক্তস্রোত এমন টগবগ করে উঠেছিল যে সে নিজেকে সামলাতে পারে নি। নিঃসন্দেহে সেদিন জমিদাররা তাদের লাঠিয়ালদের খাঁটি দুধ-ঘিই দিত।

স্টিমারের ওপর আক্রমণের বিষয়ে রিপোর্ট লিখতে গিয়ে কোম্পানি সে-মতটি প্রকাশ করেছিল : কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের চরিত্রটা অতিশয় হিংস্র প্রকৃতির। হয়তো জমিদারবাবু এবং তার দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালরা কোম্পানির নজরে পড়ে নি, বা পড়লেও আসল আসামিকে যখন সরকার পর্যন্ত ধরতে পারে নি, চেলাসমেত তার নামও উহ্য রাখা তারা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে থাকবে; মানহানির আইনের বিষয়ে উচ্চ ব্যবসায়ীরা সদাসতর্ক, যে-সতর্কতার প্রয়োজন গোপন-রিপোর্ট লিখতে বসেও তারা ভোলে না। তাছাড়া, সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত এ-সব গুপ্ত মন্তব্য কদাচিৎ সত্যের পথ অনুসরণ করে। মাস কয়েক পরে অনেক গবেষণা-আলোচনার পর কোম্পানি যেদিন কুমুরডাঙ্গা নামক ভয়ানক স্থানে আবার স্টিমার পাঠায় সেদিন সাবধানতার অন্ত থাকে নি। সেদিন স্টিমার অভ্যর্থনার জন্যে তারা কোনো জাঁকজমক-সমারোহের ব্যবস্থা তো করেই নি, বরঞ্চ পুলিশের এমন কড়াকড়ি করেছিল যে দু-একজন ন্যায্য যাত্রী ছাড়া আর কেউ ঘাটের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে নি। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নয়, সেদিন বন্দুক নিয়েই পুলিশ ঘাটে মোতায়েন ছিল।

আজ সে-জমিদারবাবু নেই তার লাঠিয়ালরাও নেই। লাঠিয়ালদের কেউ কোথাও বেঁচে থাকলেও এতদিনে বার্ধক্যের প্রকোপে লাঠি ছেড়ে ছড়ি ধরে থাকবে। কেবল জমিদারবাবুর আদেশে লাঠিয়ালরা যে-কীর্তি করেছিল সে-কীর্তি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের স্মৃতির বুকে বীরত্বের স্বর্ণপদকের মতো উজ্জ্বলভাবে শোভা পায়। তবে সেটি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা পদকই বটে।

কুমুরডাঙ্গায় যাবার সময়ে একজন দারোগার মুখে মুহাম্মদ মুস্তফা স্টিমারের ওপর আক্রমণের কাহিনীটা শুনেছিল। সদরে কোনো মামলায় সাক্ষী দিয়ে দারোগাটি কর্মস্থলে ফিরছিল, একই স্টিমারে মুহাম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গার ছোট হাকিমের পদ গ্রহণ করতে যাচ্ছে সে-খবর পেয়ে দারোগাটি অবিলম্বে সালাম জানাবার জন্যে তার নিকট হাজির হয়; কর্মভার নেবার আগে একটি হাকিমের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করার সুযোগ দারোগাটির কাছে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে হয়ে থাকবে। তারপর কুমুরডাঙ্গা কী রকম জায়গা তা জানবার জন্যে নূতন হাকিম উদ্‌গ্রীব ভেবে সে-শহর সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভালো-মন্দ খবরাখবর দিয়ে তাকে যথাসম্ভব ওয়াকিবহাল করার লোভও সম্বরণ করতে পারে নি। সে বলেছিল : কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু বলা কি সম্ভব? সে অনেক জায়গা দেখেছে, অনেক ঘাটে পানি খেয়েছে—তার চাকুরিটি অনেক দিনের—কিন্তু কুমুরডাঙ্গার মতো এমন জায়গা বেশি দেখে নি। বহুদিন আগে স্টিমারঘাটের ওপর আক্রমণের উল্লেখ করে বলেছিল, কুমুরডাঙ্গার লোকেরা এমনই হিংসুটে এবং নীচমনা যে নিজের নাক কেটেও পরের ক্ষতি করতে তারা সদা প্রস্তুত। অবশ্য কুমুরডাঙ্গার অর্থনৈতিক অবস্থাটা ভালো নয়, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি সমাজে তখনই দারিদ্র দেখা দেয় যখন সে-সমাজে ধর্ম-দুর্বলতা এসে পড়ে; দারিদ্র হল অধার্মিকতার ফল, রাহাজানি খুনখারাবি নারীধর্ষণ এ-সবের মতো দারিদ্রও নৈতিক অবনতির একটি লক্ষণ। এরপর খাকি রঙের পুলিশি পোশাকের আড়াল থেকে দারোগাটির ধর্মপ্রাণ উঁকি মারতে সময় লাগে নি এবং এ-সময়ে তার গোঁফ-কামানো মাথা-মুড়ানো কিন্তু দীর্ঘ দাড়ি-শোভিত মুখাবয়বটিও মুহাম্মদ মুস্তফা প্রথম লক্ষ করে। গভীর দুঃখের সঙ্গে দারোগাটি বলে চলে : সে যদি কুমুরডাঙ্গার নিন্দা করে থাকে তার কারণ সে-শহরের ধর্মাভাব, যে-ধর্মাভাব শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, শহরের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত এলেমদার লোকেদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। বাইরে তারা ধার্মিক, কিন্তু সে-ধার্মিকতা একটি মুখোশ মাত্র। খোদা তাদের যা দিয়েছেন তার জন্যে তারা যখন

উচ্চৈঃস্বরে শোকর আদায় করে তখন তাদের কণ্ঠে আন্তরিকতার অভাব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যেন খোদার রহমতে তাদের সম্পূর্ণ আস্থা নেই, যেন খোদা ভুল করেই তাদের তাঁর অপার দয়ার পাত্র করেছেন এবং সে-ভুল ভাঙলে আচম্বিতে সে-দয়া থেকে তাদের বঞ্চিত করবেন। তাদের নেতৃত্বে জুমাবারে শহরের মসজিদে এত নামাজির সমাগম হয় যে উঠানেও জায়গা হয় না, ঈদের দিনে ঈদগাহ এমনভাবে লোকে-লোকারণ্য হয়ে পড়ে যে প্রতিবছর ভিড়ের ঠেলায় একটা-দুটো দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে। তারপর মিলাদ পড়ানো, শিন্নি-জাকাত দেওয়া, নামাজ কালামের শিক্ষার ব্যবস্থা—কোনোদিকে গাফিলতি দেখা যায় না। তবু সব কিছুর মধ্যে কেমন দ্বিধা-সংশয়, কী-একটা সদাজাগ্রত ভয়। যেন খোদাকে নয় খোদার সৃষ্টিকে তাদের ভয়, দোজখকে নয় নশ্বর জীবনকে তাদের ভয়! নশ্বর জীবনকে যে ভয় করে তার মনে কি শান্তি থাকা সম্ভব? এবং যাদের অন্তরে শান্তি নেই তারা কি ন্যায়জ্ঞান এবং বুদ্ধিবিবেচনার সাথে নিজের বা পরিবারের বা সমাজের জীবন পরিচালিত করতে পারে?

মুহাম্মদ মুস্তফা মনোযোগ দিয়েই দারোগাটির কথা শোনে। ক্রমশ তার মনে হয়, কুমুরডাঙ্গা নামক শহরের কথা বলছে ভাবলেও দারোগাটি আসলে মানুষ সম্বন্ধে তার ব্যক্তিগত মতামতই প্রকাশ করছে। কোনো বিশেষ স্থান বা সমাজে তার হয়তো আর কৌতূহল নেই, এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে এ-শহর থেকে সে-শহরে ঘোরাফিরি করলেও সে আর কিছুই দেখে না, কারণ তার নিজস্ব মতামতের উঁচু শক্ত দেয়ালে সে বন্দী হয়ে পড়েছে। অবশ্য মুহাম্মদ মুস্তফা মানুষের মতামতে কদাচিৎ দোষের বা আপত্তির কিছু দেখতে পায়, কারো মত তার নিজস্ব মতের বিরুদ্ধে গেলেও বিচলিত হয় না, সে-বিরুদ্ধ মতটিকে ধ্বংস করার ইচ্ছাও জাগে না তার মনে। সে ভাবে, অন্যের ভুলত্রুটি শুধরিয়ে কী লাভ? ছাত্র বয়সে তারুণ্যের আতিশয্যে নবলব্ধ জ্ঞানের মাদকতায় অন্যেরা যখন তুমুল তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয় সে-বয়সেও সে কোনোদিন এ-পক্ষে সে-পক্ষে কোনো মত প্রকাশ করে নি। বলতে গেলে, এ-পর্যন্ত তার জীবনটা একটি গভীর নীরবতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। অনেক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোনো মত থাকেও না। জীবনসমুদ্র পার হতে হলে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সহজবোধ্য বিশ্বাসই কি যথেষ্ট নয়? দাঁড়-হাল-পাল এবং সম্মুখে একটিমাত্র ধ্রুবতারা থাকলেই গহিন রাতে অকূল সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া যায়; বোঝার ভার ডুবে মরার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে কেবল। তার চিন্তাধারা এমনই যে তার যদি ধারণা হয় বিভিন্ন ফুলের নাম-বিবরণ জানা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় তবে ফুলের দিকে একবার ফিরেও তাকাবে না, কেউ গোলাপকে সূর্যমুখী বলে ভুল করলে বিস্মিত হবে না, প্রতিবাদও করবে না। সে আমার চাচাতো ভাই, আমাদের বয়সে তেমন প্রভেদও নেই, একই বাড়িতে আমাদের জন্ম। তার কথা আমি জানব না তো কে জানবে?

মুহাম্মদ মুস্তফার শান্ত সশ্রদ্ধ—দারোগার ধর্মপরায়ণতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হবার পর আপনা থেকেই তার প্রতি মুহাম্মদ মুস্তফার মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছিল—চোখ নিবদ্ধ থাকে পুলিশের কর্মচারীটির ওপর,. মনোযোগ-সহকারেই তার মুখে সে কুমুরডাঙ্গার খবরাখবর শোনে। সে-শহরে কখনো যায় নি, সে-শহরে যাচ্ছে হাকিমগিরি করতে যে-কাজও পূর্বে কখনো করে নি। বস্তুত, সে-শহরে তার জীবনের একেবারে নূতন একটি অধ্যায় শুরু হবে। তবু সে যে মনে কোনো উত্তেজনা বোধ করে তা নয়, বরঞ্চ জীবনের একটি নূতন অধ্যায় শুরু করবার জন্যে অজানা অপরিচিত একটি শহরের অভিমুখে যাওয়া তার কাছে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হয়। সবকিছু সে অতি সহজে গ্রহণ করে নেয়—ছোট-বড় ঘটনা, সাধারণ-অসাধারণ ঘটনা। সর্বদা সে ভাগ্যের নৌকায় একটি আরোহীর মতোই বোধ করে, যে-নৌকা সে চালনা করে না, যার দিক-গতিপথ স্থির করে না। সে যে একাকী কুমুরডাঙ্গা অভিমুখে চলেছে, তাও তার নিকট স্বাভাবিক মনে হয়। একা যাওয়ার কথা ছিল না, ব্যবস্থা হয়েছিল প্রথমে বিয়ে হবে, তারপর কুমুরডাঙ্গায় যাবে স্ত্রীকে নিয়ে। কিন্তু বিয়ে হয় নি, খোদেজার আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে বিয়েটা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো তার প্রয়োজন ছিল না।

তবু বিয়ের পাকা দিনটা না ভেঙে পারে নি। সে কি তবে বাড়ির লোকদের বিচিত্র, উদ্ভট কথায় তারই অজান্তে কিছু বিচলিত হয়ে পড়েছিল? সে-সম্ভাবনা তাকে ক্ষণকালের জন্যে ঈষৎ চিন্তিত করে, কিন্তু ধারণাটি যে নিতান্ত অহেতুক তা বুঝে শীঘ্র তা মন থেকে তাড়িয়ে দেয়। না, সে যে সস্ত্রীক নয়, একাকীই কুমুরডাঙ্গার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ব্যবস্থায় যে একটু গোলযোগ হয়েছে—তাও সে নির্বিবাদে গ্রহণ করে নিয়েছে। যা হবার হয়েছে, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা খেদ-দুঃখ করা বৃথা।

যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে সত্যিই কখনো সে ভাবে না। মনে আছে, একবার বাড়ি থেকে চাঁদবরণঘাট পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিতে গিয়েছিলাম। গ্রীষ্মের ছুটির পর সে শহরে ফিরে যাচ্ছিল। খালের পথে নৌকায় করে কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছি এমন সময় সহসা তার স্মরণ হয় একটি বড় দরকারি বই বাড়িতে ভুলে এসেছে। সারা ছুটিতে উঠানে গাছের তলায়, পুকুরের ধারে, ক্ষেতের পাশে বসে বা বিছানায় শুয়ে বইটি পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করে নি, এমনকি শোবার সময়েও বইটি তার বালিশের নিচে রাখত যাতে সকালে ঘুম ভাঙলেই সেটি খুলে চোখের সামনে ধরতে পারে।

ছোট টিনের সুটকেসে বইটা নেই তা জেনেও সে ক্ষিপ্রহস্তে সেটি খুলে একবার তার ভেতরটা হাতড়ে দেখে, মুখে গভীর উৎকণ্ঠার ছায়া। তবে সুটকেসটি বন্ধ করেছে কি অমনি ছায়াটি মিলিয়ে যায়। সারা পথে বইটির কথা একবার বলেও নি, ভাবেও নি। যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে ভেবে লাভ কী? তবে এটি একটি ছোট উদাহরণ। একবার তার বৃত্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন আমাদের দক্ষিণ-বাড়ি উত্তর-বাড়ি দুই বাড়িরই সংসারে বড় অনটন, একটি কলেজের ছাত্র পোষার সাধ্য কারো নেই। তার ওপর তখন আমার চাচা, অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ, আর জীবিত নেই। সে বুঝতে পারে, পড়াশুনা চালানো সম্ভব নয়। এক রাত ভেবে পরদিন স্থির করে, আর কলেজে ফিরে যাবে না। কথাটি শান্তকণ্ঠে জানায়, মুখে কোনো রকম দুঃখ বা আফসোসের ক্ষীণতম চিহ্ন দেখা যায় না। অনেকে মনের কথা ঢাকে, সমগ্র হৃদয় দিয়ে যা কামনা করে তাতে বিফল মনোরথ হলেও তাদের দুঃখ প্রকাশ করে না। মুহাম্মদ মুস্তফা যে তার দুঃখ হতাশা ঢাকে তা নয়, অতি দুঃখের কথাও সম্পূর্ণচিত্তে গ্রহণ করে বলে দুঃখবোধের অবকাশই ঘটে না তার।

ভাগ্যবশত সেবার মুহাম্মদ মুস্তফাকে পড়াশুনা বন্ধ করতে হয় নি; বৃত্তির কর্তৃপক্ষ নামে ভুল করেছিল।

সহসা তীরের দিকে তাকিয়ে দারোগা বলে, "এই যে, কুমুরডাঙ্গা এসে পড়েছে।"

ঈষৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফা দারোগার দৃষ্টি অনুসরণ করে তীরের দিকে তাকায়, কিন্তু কোথাও কোনো শহরের চিহ্ন দেখতে পায় না।

"ঝাউগাছটি দেখতে পাচ্ছেন?" খোলা দরজা দিয়ে হাত প্রসারিত করে দারোগা জিজ্ঞাসা করে। "ঝাউগাছটি কুমুরডাঙ্গার নিশানা। তারপর একটি বাঁক, বাঁকের পরে কুমুরডাঙ্গা।"

যথাসময়ে একটি বাঁক পেরিয়ে স্টিমার কুমুরডাঙ্গার নিকটবর্তী হয়। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নদীর তীরে যে-স্টিমারঘাটটি সহসা দৃশ্যমান হয়, সে-ঘাট দিনান্তের ধূসর আলোয় বিষণ্ন, একটু নিঃসঙ্গ দেখায়।

তবারক ভুইঞা (সে যে তবারক ভুইঞা—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোনোই কারণ দেখতে পাই না) বলছিল : যেদিন স্টিমার-চলাচল বন্ধ হয় সেদিন স্টিমারঘাটের ফ্ল্যাটের ওপর-তলায় নদীর ধারে তার ছোট আপিস-ঘরে স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞা স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, মুখে দুশ্চিন্তার রেখা। এ-সময়ে সূর্যের আলো নদীর পানি থেকে আপিস-ঘরের ছাদে প্রতিফলিত হয়ে নিঃশব্দে নৃত্য করে; তারই ছিটেফোঁটা তার মুখে। বস্তুত সে-আলোর ঝলকানি তার মুখের দুশ্চিন্তার রেখাগুলি নিয়ে নির্মমভাবে খেলা করে যেন।

ঘণ্টাখানেক আগে কোম্পানির সদর-দফতর থেকে যে-সংক্ষিপ্ত তার এসে পৌঁছেছে, সে-তারের সংবাদ অপ্রত্যাশিত না-হলেও তা স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞাকে কেমন বিচলিত করে ফেলেছে। সংবাদটি এই যে, স্টিমার আসবে না। কেন আসবে না—তার কোনো উল্লেখ নেই সে-সংক্ষিপ্ত তারে।

স্টিমার আসবে না—সে-কথাই স্টেশনমাস্টার বার বার ভাবে : নিত্য একবার উজানে একবার ভাটিতে দু-দুবার ঘাটে জীবন-স্পন্দন জাগিয়ে অব্যর্থভাবে যে-স্টিমার এসেছে সে-স্টিমার আসবে না। সুগম্ভীর সুরে বাঁশি বাজিয়ে দূরত্বের বিচিত্র আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্টিমারের আগমন, ঢেউ-এর উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য, যাত্রীদের ত্রস্তব্যস্ত ওঠা-নাবা, লস্করদের কর্মতৎপরতা, অবশেষে স্টিমারের প্রস্থানের পর আকস্মিক নীরবতা, আরো পরে উল্টো পথের স্টিমারের জন্যে প্রতীক্ষা—এ-সব দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পর নিতান্ত গতানুগতিক মনে হলেও খতিব মিঞার জন্যে একটি সত্যের পুনরোচ্চারণের মতোই : সে ঘাটের স্টেশনমাস্টার। তাছাড়া মানুষ জীবনের যে-ছন্দ শ্বসনের মতো স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে নেয় তাতে অকস্মাৎ বাধা পড়লে নিরাপত্তার শত আশ্বাস সত্ত্বেও তার মনের অতলে লুক্কায়িত যে-শঙ্কাভীতি চিরজাগ্রত, সে-শঙ্কাভীতি অকারণেই মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে : অস্বাভাবিক কোনো আওয়াজে বিবরবাসী জীব যেন সভয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

খতিব মিঞা নিজেকে কিছু সংযত করে। তবু অনভিজ্ঞ শিক্ষানবিশীর মতো অসহায় বোধ না করে পারে না। সে বুঝতে পারে না কী করবে : সহসা যেন কিছু করার নেই। করবার কীই-বা রয়েছে? একটু আগে একবার নিচে গিয়েছিল। তখন সে অল্পবয়স্ক টিকিট-কেরানিকে নোটিশ টাঙিয়ে দিতে বলেছে; অধিকাংশ যাত্রী নিরক্ষর হলেও লিখিত নোটিশ জারি করা একটি অলঙ্ঘনীয় আইন। তারপর অনির্দিষ্টভাবে নিচে কিছু ঘোরাঘুরি করে ওপরে উঠে এসেছে। আসবার সময় কী কারণে যাত্রীদের কথা নয়, মালঘরে স্তূপাকার করে রাখা চালানি কলার কথাই একবার তার মনে পড়েছিল। কুমুরডাঙ্গা থেকে রাশি-রাশি কলা চালান যায়, যার জন্যে মাল-ঘরে সে-ফলের গন্ধ ভারি হয়ে থাকে সর্বক্ষণ, নদী থেকে অনবরত ভেসে-আসা হাওয়ায়ও তা দূর হয় না। খতিব মিঞা মনে-মনে বলেছিল, কলাগুলো পচবে। তারপর সিঁড়িতে পা দিয়ে ইতিমধ্যে সমাগত কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি একবার দৃষ্টি দিয়েছিল, তবে তাদের ঠিক দেখতে পায় নি। হয়তো কেবল তার মনে হয়েছিল, যাত্রীরা আজ বেশ সকালে-সকালেই এসে পড়েছে। কোনো কোনোদিন তারা অসময়েই ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ লোক ঘড়ি দেখে স্টিমার ধরতে আসে না, মেঘশূন্য দিনে আকাশের সূর্যের দিকে চেয়ে সময় নির্ণয় করে এবং ঝড়বাদলের দিনে সময়-আন্দাজ করে ঘাট অভিমুখে রওনা হয়। তবে সময়ের বিষয়ে কখনো নিশ্চিত হতে পারে না বলে বা যাত্রায় একবার মনস্থির করে ফেলার পর আর দেরি সয় না বলে আগে-ভাগেই এসে পড়ে। তাছাড়া শহরের বাইরে থেকে এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে হেঁটে গরুগাড়ি করে নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে যারা আসে তারাও অসময়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। তারা যে এসে পড়েছে সে-কথা মাল-ঘরে বা ওপরের আপিস-ঘরে থাকলেও খতিব মিঞা বুঝতে পারে, কারণ নিত্য একইভাবে ঘাটে তাদের আগমন ঘোষিত হয় : সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হঠাৎ আতস-বাজির মতো আকস্মিক হাঁক-ডাক শোনা যায়, যে-হাঁক-ডাক পরে একটি অস্পষ্ট গুঞ্জনে, আরো পরে একটি অবিচ্ছিন্ন কোলাহলে পরিণত হয়। তবে সে কেবল প্রথম হাঁক-ডাকটাই শোনে, এবং তখন চমকিত হয়ে পকেট থেকে জেবঘড়ি বের করে সময়টা যাচাই করে নেয়, কিন্তু পরে যাত্রীদের কোলাহল আর তার কর্ণগোচর হয় না : দূর থেকে শোনা স্টিমারের বংশীধ্বনি বা স্টিমার কাছে এলে তার পাখার আঘাতে নির্মমভাবে আন্দোলিত মথিত পানির আর্তনাদের মতোই যাত্রীদের কোলাহল ঘাটের অন্যতম সুপরিচিত আওয়াজ মাত্র।

ওপরে এসে আপিস-ঘরে প্রবেশ করার আগে নদীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কতক্ষণ

স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল যদিও সে জানে নদীর বুকে যে-রহস্যময় লীলাখেলা চলে থাকবে তার কোনো চিহ্ন সেখানে নেই; নদীর উপরিভাগে এখনো কিছু দৃশ্যমান হয় নি। তবু সামনে নদীর বুকে সে কী যেন দেখবার চেষ্টা করে। তার সে-চেষ্টা অর্থহীন বুঝে দূরে নদীর অপর তীরের দিকে দৃষ্টি দেয়। এ-ধারে কড়া রোদের বর্ষণ, কিন্তু ওপারে দিগন্তের কাছে আকাশ কালো করে মেঘ সঞ্চার হয়েছে। সে দাঁড়িয়েই থাকে, নদীর দিক থেকে যে-হাওয়া ভেসে আসে সে-হাওয়ায় তার পায়জামার নিম্নাংশ পতাকার মতো ফৎফৎ করে আন্দোলিত হয়। খতিব মিঞা ছোটখাটো মানুষ, তবে চওড়া কপালের তলে অস্থিসর্বস্ব মুখটিতে দায়িত্বশীল মানুষের সহজ-গাম্ভীর্য : দীর্ঘদিন ধরে কোম্পানি তার ওপর যে-আস্থা প্রদর্শন করেছে সে-আস্থা তার ব্যক্তিত্বে প্রতিফলিত হয়ে-হয়ে এক সময়ে সে-ব্যক্তিত্বের একটি অবিভাজ্য অংশে পরিণত হয়েছে যেন।

আপিস-ঘরে ঢুকে কিছু-ভাঙ্গা একটি কাঠের চেয়ারে বসে পিঠদাঁড়া খাড়া করে সামনের টেবিলের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকার পর সে স্থির করে, না, কিছুই করবার নেই, অন্য দিন এ-সময়ে মাল-ঘরে তালা দিয়ে টিকিট-ঘরে গিয়ে বসত, আজ মাল-ঘরে বা টিকিট-ঘরে কোনো কাজ নেই। স্টিমার আসবে না সে-খবর প্রচার করবার জন্যে টিকিট-ঘরের জানলার সামনে টাঙ্গানো নোটিশটি যথেষ্ট না হলে অল্পবয়স্ক কেরানিটি এবং হেঁড়ে-কণ্ঠ লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞা রয়েছে। বাদশা মিঞার বয়স হয়েছে, কিন্তু তার গলা কমজোর হয় নি।

খতিব মিঞা যখন একবার স্থির করে তার কিছুই করবার নেই তখন তার দুশ্চিন্তাটা কিছু লাঘব হয়, এবং এ-সময়ে সহসা সে অনুভব করে হাওয়াটা আর্দ্র-শীতল হয়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, অদূরে নদীর বুকেও একটা কালো ছায়ার সঞ্চার হয়েছে। মেঘ এদিকে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে কতক্ষণ সে নিচে থেকে ভেসে-আসা কোলাহলের প্রতি কান দেয়। সে বুঝতে পারে, কোলাহলটি অন্য দিনের মতো নয়, কারণ তাতে যেন যাত্রা-উন্মুখ লোকদের সুপরিচিত ব্যাকুলতা উত্তেজনা নয়, বিস্ময় বিহ্বলতার সঙ্গে মিশ্রিত একটি গভীর অসহায়তা প্রকাশ পায়; যেন যাত্রীর নয়, মানুষের অসহায়তাই। তবে কথাটি তার মনে স্পষ্ট রূপ ধারণ করে না : তেমন কোনো কথা স্পষ্টরূপে বুঝবার ক্ষমতা কোনোদিন সে রাখলেও আজ রাখে না। তাছাড়া, এ-সময়ে হয়তো আর্দ্র-শীতল হাওয়ার জন্যে তার চোখটা লালচে হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে-সঙ্গে দেহে যে-আমেজ ধরে সে-আমেজের রস সন্ধানে সে মনোনিবেশ করে। নিদ্রা আলো-হাওয়ার মতো খোদাই নেয়ামত : সুযোগ-সুবিধা পেলে স্টেশনমাস্টার সে-নেয়ামত উপভোগ করে থাকে। এবং নিশ্চিতভাবেই উপভোগ করে এই কারণে যে দরকার হলে নিমেষের মধ্যে সে পাখির মতো জড়তাশূন্য দৃষ্টি নিয়ে জেগে উঠতে পারে, সে-চোখে ঘুমের লেশ পর্যন্ত দেখা যায় না তখন।

তার নিদ্রাভঙ্গ হতে দেরি হয় না। বিলম্বিত ঢেউ-এ ভর করে লস্কর-সর্দার বাদশা মিঞার হেঁড়ে-গলা, তারপর তার পশ্চাতে আরেকটি গলা এবার সহসা তার কর্ণগোচর হয়। দ্বিতীয় গলা শহরের গণ্যমান্য উকিল কফিলউদ্দিনের হবে; উকিলের কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সিঁড়ি থেকে একবার তার জুতার এবং লাঠির শব্দ আসে : নিঃসন্দেহে সে ওপরের দিকেই আসছে। তারপর আরো পদধ্বনি শোনা যায়; হয়তো কুমুরডাঙ্গার গণ্যমান্য উকিলকে অনুসরণ করে অনেক লোক ওপরের পথ ধরেছে।

দীর্ঘাকৃতি বৃদ্ধবয়সী উকিল কফিলউদ্দিন অবশেষে ওপরে যখন দৃশ্যমান হয় তখন খতিব মিঞা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে ভালো-মন্দ সর্বপ্রকারের পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে, তার চোখ পাখির চোখের মতো জড়তাশূন্য।

"স্টিমারের কী হল?" উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নে আশঙ্কা নয়, গভীর বিরক্তি প্রকাশ পায়।

খতিব মিঞা কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন সে মুখের কথা হারিয়েছে। সে ভাবে, তারযোগে যে-সংবাদ এসেছে তার বেশি বলা উচিত হবে কিনা। কী উচিত কী উচিত নয়—সে-বিষয়ে কখনো সে মনস্থির করতে পারে না। কালেভদ্রে উচ্চপদস্থ কোনো কর্মচারী ঘাট পরিদর্শন করতে আসছে খবর পেলে সে কেমন বেসামাল হয়ে পড়ে। কখনো তার মনে হয়, পরিদর্শনকারী কর্মচারী ফ্ল্যাটটিকে নোংরা অবস্থায় পেলে তার মান-ইজ্জত যাবে। সবকিছু তুলে সে ফ্ল্যাটের পরিচ্ছন্নতার কাজে উঠে-পড়ে লেগে যায়, কতবার সে ওপরের অসমতল কালের হাওয়ায় বিবর্ণ, চামচিকা-বাদুড়ের মল-বিষ্ঠায় চিত্রিত পাটাতনটি সাফ করায় তার ঠিক নেই; পরিদর্শনকারী কর্মচারী এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ সচরাচর ওখানেই বসে। অন্যবার ফ্ল্যাটের স্বাভাবিক অপরিচ্ছন্নতার কথা ভুলে গিয়ে হিসাবপত্রের দিকে মন দেয়। আবার কোনোবার মালপত্রের দিকে তার দৃষ্টি যায়। সেবার তার মনে সন্ত্রাস উপস্থিত হয় এই ভেবে যে পরিদর্শনকারী কর্মচারী হঠাৎ আবিষ্কার করবে তার দায়িত্বে সোপর্দকরা কোনো জিনিস গুম হয়ে গিয়েছে। মান-ইজ্জত কীভাবে যায় সে-বিষয়ে প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব মতামত পোষণ করে থাকে। তহবিল তছরূপ করেছে—এমন অভিযোগে যে-মানুষ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সে আবার অধার্মিকতার অভিযোগে গভীরভাবে আহত হয়, যে-মানুষ চরিত্রহীনতার অপবাদে অবিচল থাকে সেই আবার মিথ্যাবাদের অভিযোগে ক্রোধে অপমানে আত্মহারা হয়ে পড়ে। হয়তো খতিব মিঞা কখনো বুঝে উঠতে পারে নি তার মান-ইজ্জতটা ঠিক কোথায়। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে সমস্যাটি বড়ই জটিল মনে হয় এই কারণে যে সে দেখতে পায় তার মান-ইজ্জত নয়, কোম্পানির মান-ইজ্জতই সঙ্কটাপন্ন। কোম্পানির নামে সে যদি অন্যায় কিছু বলে ফেলে তাহলে কোম্পানির মান-ইজ্জত যাবে না কি?

খতিব মিঞা উত্তরের জন্যে অপেক্ষমাণ উকিল কফিলউদ্দিনের দিকে তাকায়, লোকটি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তাই যেন জানবার চেষ্টা করে। তবে মানুষের স্বভাবচরিত্র বা অন্তরের কথা বোঝা তার পক্ষে সহজ নয়। বহুদিন হল তারই অজান্তে দুনিয়াটি কখন সঙ্কীর্ণ হয়ে কর্মজীবন ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং মানুষ এখন একটি রূপেই দেখা দেয় তার চোখে—যাত্রীর, এবং দু-দণ্ডের জন্য দেখা সে-যাত্রীও ভালো-মন্দ আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ মিশ্রিত রক্তমাংসের মানুষে পরিণত হবার সুযোগ পায় না : যাত্রীরা ছায়া, উড়ন্ত পাখির ছায়া, যে-ছায়া দিনে দুবার দেখা দেয় তার কর্মজীবনের প্রাঙ্গণে; কে কী-রকমের লোক তা বোঝার ক্ষমতা সে সত্যিই হারিয়েছে। তবে সব ছায়া এক নয়, ছায়ার মধ্যেও প্রভেদ রয়েছে, সে-ছায়া শ্রেণীবিভক্ত—যে-কথা বুঝবার জন্য তাকে কারো চেহারা পোশাক-পরিচ্ছদ আচরণ-ব্যবহার লক্ষ করে দেখতে হয় না। হয়তো পায়ের শব্দে বা গলার আওয়াজেই সে বুঝে নেয় কোন যাত্রী উচ্চ-শ্রেণীর, মধ্যম-শ্রেণীর বা নিম্ন-শ্রেণীর। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি আপনা থেকেই তার আচরণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। অতএব সে যখন উকিল কফিলউদ্দিনের দিকে তাকায় তখন সে তার সম্ভ্রান্ত চেহারা বা তার কপালে বিরক্তির রেখা ঠিক দেখতে পায় না, একথাই তার স্মরণ হয় যে সে উচ্চ-শ্রেণীতে ভ্রমণ করে, তার দাবিদাওয়া বেশি, তাকে হেলা করাও সম্ভব নয়। নিচে যে-নোটিশ টাঙ্গানো হয়েছে সে-নোটিশের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করেই কি এ-যাত্রীকে সন্তুষ্ট করা যাবে?

খতিব মিঞা দ্রুতভাবে কিন্তু গোপনে একটি বড় ধরনের নিঃশ্বাস নেয়, তার নাসারন্ধ্র কেঁপে ওঠে। দ্রুতভাবে একবার ভাবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ঝড়-তুফান বা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্যে স্টিমার আসছে না, তা নয়। সে-সব কারণে ক্বচিৎ কখনো স্টিমার আসতে দেরি করে বৈকি। বছর তিনেক আগে কুমুরডাঙ্গা থেকে দশ ক্রোশ দূরে উজানের স্টিমারে একবার আগুন ধরেছিল। আগুন ঠিক নয়, তার একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল মাত্র যা দমন করতে বেগ পেতে হয় নি। তবে মাঝ-দরিয়ায় দোজখি অগ্নিকাণ্ডে নির্মমভাবে প্রাণ যাবে এই ভয়ে দু-একজন যাত্রী তারস্বরে খোদার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লে তাদের

আবার আশ্বাস দিয়ে তুলে নিতে কিছু সময় লাগে, তারপর একটি ভাসন্ত নারকেলকে মনুষ্যমস্তক বলে ভুল করে কেউ বেহুদা হুজুগ তুললে কল্পনার মানুষটির সন্ধানে আরেক দফা বিলম্ব হয়। তবে আজকার ঘটনা তেমন কিছু নয়, ঝড়-তুফান বা আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনার জন্যে যে স্টিমার আসবে না, তা নয়। তাছাড়া আসল কথা কি সে জানে না? গত এক মাসের মধ্যে কতবার সাদা-সবুজ রঙের লঞ্চটিকে সদরের দিক থেকে এসে বাঁক পেরিয়ে ঘাটের সামনে দিয়ে উজানের পথে যেতে দেখেছে, তার আওয়াজও শুনেছে; কর্কশ অমসৃণ আওয়াজ যেন ইচ্ছা থাকলেও চলার ক্ষমতা নেই, আনুগত্যের অভাব না থাকলেও যৌবনের তেজশক্তি নেই নূতন করে রঙ-দেয়া সেই অতি পুরানো লঞ্চের। গতকাল লঞ্চটি আবার দেখা দিয়েছিল। সেটি যখন ফিরে যায় তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। কেন লঞ্চটি একমাস ধরে এ-পথে আসা-যাওয়া করেছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাছাড়া সেদিন দুপুরে সদরগামী স্টিমার এলে সারেঙ্গের মুখে শুনেছিল যে, কুমুরডাঙ্গা থেকে কিছু আগে উজানের পথে নদীর ধারা যেখানে বরাবর বেশ সঙ্কীর্ণ এবং যেখানে শীতের দিনে স্টিমারকে বড় হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়, সেখানে সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটিও নাকি মস্ত চড়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে, যে-টুকু এখনো স্টিমার গমনোপযোগী আছে সে-টুকুও শীঘ্র ঢেকে যাবে। সারেঙ্গ বলেছিল, ধাঁ-ধাঁ করে চড়াটা জাগছে। এ-সব কথা কি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের কানে পৌঁছায় নি? নদীটি তাদেরই নদী।

"স্টিমার আসবে না, নদীতে চড়া পড়েছে।" খতিব মিঞা অবশেষে বলে। একটু থেমে, কোম্পানি যে সত্যিই নির্দোষ সে-বিষয়ে সর্ব সন্দেহ দূর করবার জন্যে আবার বলে, "নদীর বুক জুড়ে মস্ত চড়া পড়েছে, নদীর শ্বাসরোধ হবার আর দেরি নেই।"

একটি কথা লক্ষ্য করে বিস্মিত হই : তবারক ভুইঞা মুহাম্মদ মুস্তফার নাম উল্লেখ করে নি। অথচ সেদিন সে-ও ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল স্টিমার ধরবার জন্যে, ধরতে পারে নি। যদিও সে-সময়ে তবারক ভুইঞা শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো পুকুরে খোদেজার মৃত্যুর কথা জানত না, তবু সে যে স্টিমারঘাটে মুহাম্মদ মুস্তফার আগমন, তারপর বিফল মনোরথ হয়ে ঘাট থেকে বাড়ি প্রত্যাবর্তন—এ-সব যে লক্ষ্য করে নি তা সম্ভব নয়। মুহাম্মদ মুস্তফা বেশ সময় হাতে নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হয়েছিল; অন্ততপক্ষে তখনো উকিল কফিলউদ্দিন সেখানে দেখা দেয় নি। নিচে স্টিমার না আসার খবর পেয়ে ওপরেও এসেছিল, এবং যতদূর মনে পড়ে সে বসেছিল, সামনের ডেকে বসে সে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়েছিল, পাশে ছিল স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞা। চড়ার কথা এবং স্টিমার না-আসার কথা সে নির্বিবাদেই মেনে নিয়েছিল। সে স্বল্পভাষী মানুষ, বস্তুত বিশেষ প্রয়োজন না হলে কথা বলতে কদাচিৎ শোনা যায় তাকে। হয়তো নদীর দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিল, তার নীরবতা লক্ষ্য করে খতিব মিঞাও হয়তো নীরব হয়ে পড়েছিল, এবং এমত অবস্থায় এক সময়ে কখন একটু তন্দ্রার ভাব এসে গিয়েছিল তার চোখে। তার তন্দ্রা ভাঙে তখন যখন সে উকিল সাহেবের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। তারপর, মুহাম্মদ মুস্তফা যখন প্রস্থান করে, সে-সময়েও তবারক ভুইঞা তাকে কৌতূহল ভরে চেয়ে-চেয়ে দেখে থাকবে : লম্বা কিন্তু শীর্ণ-পাতলা লোক, মাথাটি শরীরের তুলনায় একটু বড় যা দেহের শীর্ণতার জন্যে অযথার্থভাবে বড় মনে হয়, নীরস মুখ, চোখে কেমন সতর্কতা, চলার ভঙ্গিতে একটু অনিশ্চিত ভাব যেন কোথায় যাচ্ছে তা ঠিক জানে না, বাঁ-হাতটা ঈষৎ ঘোরানো (সে যখন চেয়ারে-চৌকিতে বসে তখন সে-হাতেই ভর দিয়ে দেহটা একটু হেলিয়ে বসে যেন অদৃশ্য কোনো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রয়েছে), অন্তরে-অন্তরে লাজুক প্রকৃতির মানুষ যে-লাজুকতা তার জীবনে আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সাময়িকভাবে কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল এই কারণে যে তখনো সে তার নূতন এবং পুরাতন অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সক্ষম হয় নি; দুটির মধ্যে বিরোধিতা ছিল না, কেবল দুটি তখনো পৃথক সত্তাই ছিল। আরেক কারণেও ঘাটে তার আগমন এবং ঘাট হতে প্রস্থান তবারক ভুইঞা লক্ষ্য করে থাকবে। সাধারণ কোনো উপলক্ষে

মুহাম্মদ মুস্তফা স্টিমার ধরতে আসে নি; যে-শুভকাজটি খোদেজার আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়েছিল সে-শুভকাজটি সম্পন্ন করবার উদ্দেশ্যেই স্টিমার ধরতে এসেছিল। সব বৃত্তান্ত না জানলেও সে-কথা তবারক ভুইঞা জানত। মুহাম্মদ মুস্তফার বন্ধু তসলিম লিখেছিল, আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব হজ করে নানা দেশে পীর-দরবেশের দরগাহ-মাজারে জেয়ারত করে দেশে ফিরেছেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। এমনিতে দেরি হয়ে গিয়েছে, খোদেজার মৃত্যুর জন্যে তখন বিয়েটা শোভনীয় হত না বলে পাকা দিনটা ভাঙতে হল, তারপর তোমার ভাবী শ্বশুরকেও হজে রওনা হতে হল। এবার তিনি ফিরেছেন, আর বিলম্ব নয়। তিনি একটু অধীর হয়েই পড়েছেন শুভকাজটি সম্পন্ন করবার জন্যে। বলছেন, আর বেশিদিন বাঁচবেন না। হজ-ওম্‌রাহ্ দরগাহ-মাজার করার পর এমন ভাবটি অস্বাভাবিক নয়, মনে-প্রাণে শুদ্ধ পবিত্র বোধ করলে মানুষ মৃত্যু কামনা করে থাকে, কারণ এ-সময়ে বেহেস্ত সম্বন্ধে মানুষ যতটা নিশ্চিত বোধ করে অন্য কোনো সময় ততটা করে না। তবে মনের ইচ্ছা যাই হোক না কেন, তিনি বিদেশ থেকে বেশ উত্তম স্বাস্থ্য নিয়েই ফিরেছেন; বিদেশে সস্তায় ভালো ফলমূল পাওয়া যায়। লোকেরা এমনও বলে যে, কবরখানার দিকে নয়, শীঘ্র তিনি মন্ত্রীসভার দিকেই যাবেন। সেটা সম্ভব। অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট, নানা উঁচু দরবারে তাঁর অবারিত দ্বার, যাতায়াতও কম নয়। আর তোমার ভাবী স্ত্রীর কথা কী আবার বলতে হবে? এমন মেয়ে সত্যি দুটি হয় না—শিক্ষায় বল, দেখতে-শুনতে বল, লেহাজ-নম্রতায় বল। আর যাতে দেরি না হয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি তাই নিজেই একটি দিন ঠিক করেছি, দিনটি তোমার ভাবী-শ্বশুরেরও পছন্দ। তারযোগে সম্মতি জানাও। মুহাম্মদ মুস্তফা অকারণে একদিন সময় নিয়ে তারযোগে তার সম্মতি জানিয়েছিল, তারপর নির্দিষ্ট দিনটি কাছে এলে ক-দিনের ছুটি নিয়ে ঢাকায় যাবার জন্যে স্টিমারঘাটে উপস্থিত হয়েছিল।

সে-কথা তবারক ভুইঞা উত্তমরূপেই জানত। সে-জন্যেই কি সেদিন সন্ধ্যা বেলায় নৌকায় করে যাবার উপদেশ দেয় নি তাকে? ততক্ষণে মুহাম্মদ মুস্তফার কেমন খেয়াল হয়েছিল, হয়তো দু-একদিনের মধ্যে স্টিমার ফিরে আসবে। তবারক ভুইঞাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, স্টিমারঘাটে নূতন কোনো খবর এসেছে কিনা। তবারক ভুইঞা বলেছিল, না, কোনো খবর নেই, তবে দু-একদিনের মধ্যে স্টিমার আসবে কিনা সন্দেহ। তখনই নৌকার কথা তুলেছিল। নৌকায় করে যেতে কষ্ট হবে, সময়ও নেবে। পথটা উজানের। স্টিমারে যে-পথ বারো ঘণ্টার মাত্র, নৌকায় সে-পথ অতিক্রম করতে দু-দিন লাগবে। তবু বিলম্ব না করে সে যদি রওনা হয়ে পড়ে তবে সময়মতো ঢাকায় পৌঁছুতে পারবে।

"কাল সকালের জন্যে একটি নৌকা ঠিক করে দেন", মুহাম্মদ মুস্তফা বলেছিল। তবে নৌকায় করেও তার যাওয়া হয় নি, সেদিন রাতে তার ভয়ানক জ্বর ওঠে। এবং দুদিন পরে তবারক ভুইঞা খোদেজার মৃত্যুর কথা জানতে পায়।

কুমুরডাঙ্গায় আসার কিছুদিন আগে মুহাম্মদ মুস্তফার দেশের বাড়ির শ্যাওলা-আবৃত লতাপাতা জলজ-আগাছায় ভরা ডোবার মতো পুকুরে খোদেজার মৃত্যু ঘটে। তখন মুহাম্মদ মুস্তফার শিক্ষানবিশী সবেমাত্র শেষ হয়েছে।

খোদেজার মৃত্যুর খবর আসে গ্রামের চৌধুরীদের ছেলের হাতে লেখা একটি পত্রে; আমি বাড়ি না থাকলে বাড়ির লোকেরা তাকে দিয়েই পত্রাদি লিখিয়ে নিত। খোদেজার মৃত্যুর খবর ছাড়া সে-চিঠিতে আরেকটি কথা ছিল যা মুহাম্মদ মুস্তফা প্রথমবার লক্ষ্য করে নি, কী কারণে চিঠিটা আবার পড়ছে তখন তা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রলেখক যার মুখের কথা অক্ষর-নিবদ্ধ করেছে তার উদ্দেশ্য হয়তো প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে নি। পরে বুঝতে পারলেও লিখতে গিয়ে কেমন একটি লজ্জা বোধ করে থাকবে, কারণ দুবার লিখে দুবার কেটে হঠাৎ যেন লজ্জাশরম জয় করে দৃঢ়হস্তে বড়-বড় করে লিখেছে তা। তবে লজ্জাশরম সম্পূর্ণভাবে

জয় করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ, কারণ ছোট বাক্যটি লিখতে গিয়ে সচরাচর যার বানানে ভুল হয় না তার বানান-জ্ঞান কেমন যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে।

বাক্যটি এবার মুহাম্মদ মুস্তফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে কিন্তু তার অর্থ সে বুঝতে পারে না, দু-একবার অর্থোদ্ধার করার চেষ্টা করে স্থির করে তা অর্থহীন হবে; কখনো-কখনো গ্রাম্য চিঠিতে অসংলগ্ন বা নিতান্ত অর্থহীন এক-আধটা বাক্য থাকা অস্বাভাবিক নয়, কারণ অন্যের মুখের কথা বুঝতে পারলেও ভাষার দীনতার জন্যে পত্রলেখক সে-কথা যেভাবে প্রকাশ করে তাতে তা সব সময়ে বুদ্ধিগম্য হয় না।

দু-দিনের ছুটি নিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন বাড়ি অভিমুখে রওনা হয় তখন দুর্বোধ্য বাক্যটি তো বটেই, যে-মৃত্যুর খবরে মনে একটু ঈষৎ আঘাত পেয়েছিল বা সামান্য ব্যথা বোধ করেছিল সে-মৃত্যু সম্বন্ধেও বিস্মৃত হয়ে পড়েছে : জীবন-মৃত্যু দুটিই সে অতি সহজে গ্রহণ করে। আলো-অন্ধকারের মতো জীবন এবং মৃত্যু পাশাপাশি বসবাস করে একই নদীতে মিলিত দুটি ধারার মতো গলাগলি হয়ে প্রবাহিত হয়; দুটিই বিনা বাক্যে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় তার কাছে।

অন্যবারের মতো স্টিমারে করে প্রথমে চাঁদবরণ ঘাটে, তারপর সে-ঘাটে স্টিমার ছেড়ে যথারীতি নৌকার পথ ধরে। ছোট খালের পথ। কখনো ঝুলে-পড়া গাছপালার শাখাপল্লবে ছায়াচ্ছন্ন কখনো উন্মুক্ত স্থানে মেঘনীলাম্বর-প্রতিফলিত স্রোতো হীনপ্রায় সে-খাল মাঠক্ষেত জনপদের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে, কখনো তীরের বেশ নিচে দিয়ে কখনো তীরের সঙ্গে সমতল হয়ে। পানিতে সোঁদালো গন্ধ, বদ্ধপ্রায় ধারায় নীরবতা, অন্যবারের মতোই লগির ধাক্কায়-ধাক্কায় ছাপরবিহীন খোলা নৌকা এগিয়ে চলে, প্রতিবারই পানিতে তরল আওয়াজ জাগে, প্রতিবারই গলুইর নিশানা কেমন দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়ে আবার আপনা থেকেই সোজা হয়ে পড়ে। নৌকার মাঝখানে কোনোদিন ছাতার তলে, কোনোদিন শূন্য মাথায় হাঁটু তুলে পিঠ খাড়া করে বসে মুহাম্মদ মুস্তফা এ-পথে কতবার গিয়েছে কোনো দিকে না তাকিয়ে নৌকার গতি লক্ষ্য না করে, খাল থেকে যে-সোঁদালো গন্ধ উঠে ধীরে-ধীরে তার নাসারন্ধ্র ভরে দিয়েছে সে-গন্ধ সম্বন্ধে সজ্ঞান না হয়ে, পানির রঙ হঠাৎ রৌদ্রদীপ্ত আকাশের তলে আকস্মিক উজ্জ্বলতায় ঝল্‌মল করে উঠলেও তাতে চমকিত না হয়ে। সেদিনও সে কিছুই লক্ষ্য করে নি, কিছুই দেখে নি। শুধু তাই নয়। যে-বাড়ি অভিমুখে সে ধীরে-ধীরে এগিয়ে যায় সে-বাড়ির কথাও ভাবে নি।

খালের পর এবার পায়ের পথ। হাতে ছোট বাক্স, যে-বাক্সে অন্যবার বাপ-জান মা-জান তাদের আশ্রিতা বিধবা চাচী এবং চাচীর মেয়ে খোদেজা—সকলের জন্যেই কিছু না-কিছু টুকিটাকি উপহার থাকত। কোনো-কোনোবার অর্থাভাবে বড়দের জন্যে কিছু না থাকলেও খোদেজার জন্যে কিছু থাকত। অনেক সময় বেশ ফ্যান্‌সি ধরনের জিনিস : সখের রঙিন ফিতা বা চিরুনি, বা ছোট হাত-আয়না, কোনোদিন-বা সুগন্ধ তেলের শিশি। সেদিন কারো জন্যে কিছু ছিল না, খোদেজার জন্যেও নয়; মৃত মানুষের জন্যে কেউ উপহার বহন করে নিয়ে যায় না। পায়ের পথের পর আইলের পথ, যে-পথ কোথাও শুষ্ক, কোথাও কর্দমাক্ত, কোথাও দলাবাঁধা। তারপর একটি বাঁশের পুল, শেষ অপরাহ্ণের সোনালি আলোয় স্নাত তন্দ্রাচ্ছন্ন জনহীন একটা ঘাটলা। ঘাটলার পর নূতন ছাদের টিনে সুশোভিত ঝুনু মিঞাদের বাড়ি; তারপর পুকুর-মসজিদ, আবার ধানক্ষেত, আবার একটি পুকুর যার উত্তর পাড়ে বরকতপুরের হাট সেদিন শূন্যতায় খাঁখাঁ করে। হাটটি বসে সপ্তাহে দু-দিন : বুধবার আর শনিবার। কোনো-কোনোবার শহর থেকে খোদেজার জন্যে উপহার আনা সম্ভব না হলে এবং দিনটি হাটের দিন হলে সে হাট থেকেই কিছু কিনে নিয়ে গিয়েছে খোদেজার জন্যে। বস্তুত খোদেজার জন্যে কিছু-না-কিছু নিয়ে যায় নি—এমন দিনের কথা মনে পড়ে না। ক্ষণকালের জন্যে তার কথা স্মরণ হয়, তবে শীঘ্র তা ভারহীন সারশূন্য তুলাসম মেঘখণ্ডের মতো মনাকাশে দেখা দিয়ে আবার উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পথ শেষ হয়ে এসেছে। আসফ তরফদারের কলাবাগানের পাশে অল্পক্ষণ হাঁটার পর হিজলগাছের দক্ষিণ দিকে সহসা বাড়িটা জেগে ওঠে।

মুরুব্বিদের সালাম কদমবুচি জানিয়ে সেদিন সে অন্যবারের মতো স্বাভাবিক শুষ্ক নিম্নকণ্ঠে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে নি, তবে অভ্যাসমত ঘর্মাক্ত শার্ট-গেঞ্জি এবং ধুলাচ্ছন্ন কর্দমাক্ত জুতা খুলে উঠানে হাত-পা ধুয়ে শীতল হয়। তারপর অন্যবারের মতো ডাবের পানি আসে। কেবল খোদেজা নয়, তার মা-ই আনে। সন্ধ্যা কাটলে অন্যবারের মতো তার আগমন উপলক্ষে জ্বালানো বড় হ্যারিকেনের লণ্ঠনের আলোয় খেতে বসলে কেবল দুই জোড়া চোখই তার খাওয়া পরিদর্শন করে—মা এবং চাচীর, পেছনে স্বল্প-আলোকিত স্থানটি খোদেজার অভাবে শূন্য থাকে। খাওয়া শেষ হলে যে-উঠানের প্রান্তে তখন গাছগাছালি ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে জোনাকিরা জ্যোতিষ্মান হয়ে বা অর্ধঘুমন্ত পাখিরা মধ্যে-মধ্যে অকস্মাৎ ডানা ঝাপটিয়ে প্রাণসঞ্চারের বৃথা চেষ্টা করছিল সে-উঠানে নেবে সজোরে গলা সাফ করে একাই হাতমুখ ধোয়, খোদেজা সে-রাতে বদনা থেকে পানি ঢেলে তাকে সাহায্য করে না। বাড়িতে ফেরা অবধি একবারও সে খোদেজার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে নি, এবারও করে না; ঘরে বা আঙ্গিনায় কোথাও যে মেয়েটির দেহ আর ছায়া ফেলে না, সে যে আর নেই, বাড়ি পৌঁছার পর যে-মাটির ঢিবির সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া-দরুদ পড়ে তার রুহের জন্যে শান্তি কামনা করেছে সে-মাটির তলে সে যে চিরনিদ্রায় শায়িতা—এসব কথা পত্রযোগে তার মৃত্যুর সংবাদটি যখন জানতে পায় তখনই মেনে নিয়েছিল। পরদিন সকালে বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-ঢাকা লতাপাতা-উদ্ভিদে সমাকীর্ণ ডোবার মতো পুকুরের পাড়ে যখন হাতমুখ ধোবার জন্যে উপস্থিত হয় তখন সেখানে সে কিছু সন্ধান করে না; সেখানে যা ঘটে গিয়েছে তার কোনো চিহ্ন থাকার কথা নয় : একটি জীবন যে-ভাবেই শেষ হোক না কেন সে-জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর পুকুরের পিছল ঘাটে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে নাস্তাপানি করে রীতিমাফিক উত্তর-ঘরে কথালাপের জন্যে উপস্থিত হয়। আমার মা, অর্থাৎ তার বড় চাচী পান সাজিয়ে তার সামনে ধরে, তারপর মুখে পান পুরে তা রসালো করে নেবার জন্যে তাকে একটু সময় দিয়ে সহসা কথাটি বলে—যে-কথা চৌধুরীদের ছেলে দু-বার লিখে দু-বার কেটে তৃতীয় বার বানানে গোলযোগ করে বড়-বড় সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখেছিল। আমার মায়ের মুখটা সুচালো; তাই সে যখন কথা বলে তখন অনেক সময় মনে হয় সে বুঝি মস্করা করছে। তবে তার চোখের দিকে তাকালেই নিমেষে ভ্রম ভাঙে। সমস্ত জীবনের ব্যথা-বেদনা সে-চোখে যেন কেন্দ্রীভূত।

আমার মা বলে, মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে খোদেজা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করেছে।

তবারক ভুইঞা (সে কি সত্যিই তবারক ভুইঞা? আমার ভুল হয় নি তো?) বলছিল : সুসংবাদের চেয়ে দুঃসংবাদে, সুখের চেয়ে দুঃখেই কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের বেশি বিশ্বাস। বস্তুত সর্বপ্রকার মছিবতের জন্যে তারা সদা-তৈরি, এবং একবার কোনো মছিবত এলে তার অস্তিত্ব বা ন্যায্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলে না। তারা এ-ও জানে যে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রূপে মানুষের জীবনে মছিবত দেখা দেয় : কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে, কখনো ধ্বংসাত্মক ঝড়-তুফানের মতো সগর্জনে, কখনো ফসল-পোড়ানো অনাবৃষ্টির মতো নিঃশব্দে, কখনো মহামারীর মতো অদৃশ্যভাবে, কখনো প্লাবনের মতো প্রকাশ্যভাবে, কখনো তৈলাক্তদেহ রাতচোরের বেশে, কখনো শস্ত্রসজ্জিত নিষ্ঠুর ডাকাতের মূর্তিতে। অতএব নদীতে চড়া পড়েছে এবং সে-জন্যে স্টিমার চলাচল বন্ধ হয়েছে—এ-সব ঘটনার মধ্যে সুপরিচিত মছিবতের চেহারাই দেখতে পায় তারা, তাদের অসহায়তা সম্বন্ধেও তাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না। অবশ্য ঘটনাটি বড়ই দুঃখের, যারা স্টিমারে কখনো চড়ে নি তারাও স্টিমারঘাটের আকস্মিক নীরবতায় দুঃখবোধ করে; স্টিমারে চড়ে কোনোদিন কোথাও যাবার সৌভাগ্য না হলেও তারা আজীবন প্রতিদিন তার বংশীধ্বনি শুনেছে, ঘাটে উপস্থিত না থাকলেও

জানতে পেরেছে কখন স্টিমার এসেছে, কখন যাত্রী নাবিয়ে যাত্রী তুলে আবার আপন-পথে চলে গিয়েছে : দিনের পর দিন বছরের পর বছর, বস্তুত যতদূর স্মৃতি যায় শ্রুতি পৌঁছায় ততদিন এমনি চলেছে, কখনো অন্যথা হয় নি। এবং যাদের জন্যে স্টিমারটি অপরিহার্য বস্তু, ব্যবসা-বাণিজ্য মামলা-মকদ্দমা এবং শতপ্রকারের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে তা ব্যবহার করে থাকে, তাদের কাছে ঘটনাটি নিতান্ত শোচনীয় বলে মনে হয়। তবু নদীতে চড়া পড়লে কী আর করা যায়, কপাল মন্দ হলে কাকেই-বা দোষ দেওয়া যায়?

তবে সে-বার একটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে, কারণ দু-দিন পরে সহসা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা স্থির করে নদীতে চড়া পড়েছে তা সত্য নয়, অতএব স্টিমার না আসারও কোনো যুক্তি নেই। হয়তো শহরের নেতৃস্থানীয় প্রবীণ উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব নিজেই এ-বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে এমনটি ঘটত না; যা শহরের নেতৃস্থানীয় মুরুব্বি মানুষ বিশ্বাস করে না তা অন্যেরাই বা বিশ্বাস করবে কেন? এমন লোক রাতকে দিন বললে অনেকেই যে তমসাচ্ছন্ন রাতেও সূর্যালোক দেখতে পায়, তেমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সেদিন স্টিমারঘাট থেকে উকিল কফিলউদ্দিন সোজা বার-লাইব্রেরি চলে গিয়েছিল। ততক্ষণে স্টিমার না-আসার খবর সেখানে পৌঁছে গেছে এবং সে-বিষয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে আলাপ-আলোচনা চলছে। তাতে অল্পসময়ের জন্যে অন্যমনস্কভাবে যোগ দিয়ে উকিল সাহেব নীরব হয়ে পড়ে; আকস্মিক কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে সে-বিষয়ে প্রথমে আপন মনে ভেবে দেখতে সে ভালোবাসে, কারণ পরের বুদ্ধিমত্তা বা মতামতের ওপর তার বিশ্বাসটি কম। নীরবতার আরেক কারণ ছিল। সে বুঝতে পারে কুমুরডাঙ্গা শহরের বা তার অধিবাসীদের ক্ষতি-অসুবিধার কথায় নয়, নিতান্ত একটি ব্যক্তিগত কারণে সে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। স্টিমার-চলাচল যদি সত্যিই বন্ধ হয় তবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে কি একটি বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হবে না? সকলের পক্ষে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলিত হয়ে একই স্থানে বসবাস করা সম্ভব নয়, ঘটনাচক্রে কার্যোপলক্ষে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবু কোনো আপদ-বিপদ ঘটলে তারা মিলিত হয় এবং রেল-স্টিমার থাকলে সহজে এবং অবিলম্বেই পরস্পরের নিকটবর্তী হতে পারে। কুমুরডাঙ্গা থেকে স্টিমার উঠে গেলে সেটি কী একটি সমস্যায় পরিণত হবে না? এবং তেমন চিন্তা যে অহেতুক নয়, তার জ্বলন্ত প্রমাণও সে কি ইতিমধ্যে পায় নি? কোনো জরুরি মামলা-মকদ্দমার কাজে যাচ্ছে—এ-কথা সকলকে বলে থাকলেও আসলে সে তার সদর শহরবাসিনী অতি আদুরে মেয়ে হোসনাকে দেখবার জন্যেই স্টিমার ধরতে গিয়েছিল। আসল কথা লুকিয়েছিল দুই কারণে। প্রথমত, যে-উকিল এ-স্থানে সে-স্থানে ছুটাছুটি করে, মক্কেলের চোখে তার দাম বেশি। দ্বিতীয়ত, স্নেহকাতর উকিলের ওপর মক্কেলদের বিশ্বাস কম হয় : উকিলের মধ্যে হৃদয়হীন চরিত্রেরই সন্ধান করে তারা। তবে শুধু মক্কেলদের কাছ থেকে নয়, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও সে মেয়েটির প্রতি তার গভীর স্নেহ-ভালোবাসার কথা সযত্নে লুকিয়ে রাখে : যে-স্নেহ পুষ্পের মতো পবিত্র এবং সৌরভময়, সে-স্নেহকে সূর্যালোকে প্রকাশ করতে নেই বলে তার বিশ্বাস।

বিয়ের পর থেকে আজ তিন বছর যাবৎ তার মেয়ে হোসনা স্বামীর সঙ্গে সদর শহরে বাস করে এবং এ-উছিলা সে-উছিলায় প্রায়ই উকিল কফিলউদ্দিন সেখানে হাজির হয় মেয়েটিকে দেখতে। ক-দিন ধরে কেমন খেয়াল, মেয়েটির বুঝি শরীরটা ভালো নয়। তেমন খেয়ালের কারণ নেই, তবু যে-কথা আপনা থেকেই মনে জাগে সে-কথা সচরাচর সে হেলা করে না।

"কী বলেন উকিল সাহেব?" একজন অল্পবয়স্ক সহযোগী জিজ্ঞাসা করে।

"ভাবছি।" গলা কেশে, রহস্যময়ভাবে সে উত্তর দেয়!

দু-দিন পরে সন্ধ্যার পর উকিল কফিলউদ্দিন তার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে ছিল, সামনে দু-চারজন মক্কেল।

উকিল কফিলউদ্দিনের নদীমুখো দোতলা বাড়িটি শহরের অন্যান্য বাড়ির তুলনায় মস্ত বড়

মনে হয়, বাড়িটি নিয়ে উকিলের গর্বও কম নয়। বাড়িটি হালের নয়। সেটি যখন তৈরি হয় তখন দোতলা বাড়ি তো দূরের কথা, গুটি কয়েক সরকারি দালান-কোঠা ছাড়া সারা শহরে আর কোনো বে-সরকারি পাকা বাড়ি ছিল না। একদা শহরের একজন নামকরা হিন্দু উকিল বাড়িটি তৈরি করেছিল, বহুদিন তাতে বসবাসও করেছিল। বৃদ্ধ বয়সে সে-উকিলের মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী কলকাতায় চলে গেলে একটি দরিদ্র আত্মীয় পরিবার অনেকটা পাহারাদার হিসেবেই বাড়িটিতে বসবাস করে। তখন সে-বাড়িতে রাতের বেলায় আলো দেখা যেত না, দিনে বা রাতে সেখান থেকে কোনো সাড়াও আসত না। এ-সময়ে অনাদরে প্রেতপুরীসম বাড়িটির বাইরের আস্তর খসে পড়তে শুরু করে; যারা রাতে প্রদীপ জ্বালায় না তারা দেয়ালে কলি ফেরাবে কেন? তবে এ-সময়েই কফিলউদ্দিনের দৃষ্টি পড়ে বাড়িটির ওপর। তখন সে নবীন উকিল, মুখে দাড়ি নেই কিন্তু মস্ত বড় ঝুলে-পড়া কাস্তের মতো বাঁকা গোঁফ, পরে কয়েক বছরের জন্যে যার বিপরীতটাই ঘটে; তার গোঁফ অদৃশ্য হয়ে যায় কিন্তু মস্ত একটি দাড়ি দেখা দেয় বুক জুড়ে। বর্তমানে তার মুখ দাড়িগোঁফ শূন্য। যুবক উকিলের চোখে বাড়িটি প্রাসাদের মতো ঠেকে। তাছাড়া তার মনে হয় বাড়িটির ক্ষুদ্র জানালাগুলি কী গভীর রহস্যের ইঙ্গিত দেয়, স্বল্পপরিসর বারান্দাটির সামনে গোলাকার স্থূল, উত্তুঙ্গ খামগুলিতে যেন আভিজাত্যের পরিচয়, আস্তর খসে পড়লেও দেয়ালের অনাবৃত অংশে অবিনশ্বরতার প্রমাণ। সে-পথে আসতে-যেতে প্রথমে সে কেবল বাড়িটি তাকিয়ে দেখত, ইতিমধ্যে মনের কোথাও অস্ফুট কোনো আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়ে থাকলে তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সাহস পেত না। তারপর একদিন দুস্থ বা কৃপণ পরিবারটির অভিভাবক স্থানীয় একমাত্র পুরুষটির মৃত্যুর পর অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অন্য একটি পরিবার সে-বাড়িতে স্থান পায়। এ-সময়ে সন্ধ্যার পর আলো দেখা যেতে শুরু করে, কখনো-কখনো তার অভ্যন্তর থেকে বীণা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কারও শোনা যেতে থাকে। ততদিনে উকিল কফিলউদ্দিনের মনের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে, পসারও বেশ হতে শুরু করেছে। শীঘ্র তার মনে হয়, বাড়িটির অভ্যন্তর থেকে সন্ধ্যার পর যে-বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার ভেসে আসে তা যেন তাকে উপহাস করে : সুস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাই কি স্বপ্ন চরিতার্থ করার জন্যে যথেষ্ট? সে-উপহাস বেশিদিন সে সহ্য করে নি, একদিন হেমন্তের অপরাহ্ণে বাড়িটির স্বত্বাধিকার ক্রয় করে যে-ছায়াচ্ছন্ন রহস্য বহুদিন ধরে তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে সে-রহস্য ভেদ করে, বাদ্যযন্ত্রটিকেও নীরব করে। বাড়ির সঙ্গে আসবাবপত্রও কিনেছিল—সেকেলে আমলের দুর্জয় গোছের মজবুত কিন্তু অতিশয় ভারি আসবাবপত্র; সে যেন জিদ ধরেছিল সে-বাড়ি থেকে কিছুই হস্তান্তর হতে দেবে না। সব কিছু মিলে বেশ দাম পড়েছিল, কিন্তু সে দ্বিরুক্তি করে নি। হয়তো তার মনে হয়েছিল, বাড়িটি কিনে, তারপর যে-সব আসবাবপত্র সুনামধারী উকিল একদিন ব্যবহার করেছিল সে-আসবাবপত্রের মালিক হয়ে সে-উকিলের যশ-ভাগ্যেরই অংশীদার হচ্ছে। লোকেরা বলে, উকিল কফিলউদ্দিন যখন জটিল কোনো মামলা নিয়ে কিছু মুশকিলে পড়ে, জয়ের পথ খুঁজে পায় না, তখন বাড়িটির প্রাক্তন মালিক যে বহুদিন হল ইহজগৎ ত্যাগ করে গেছে, সে তার স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাকে মন্ত্রণা দেয়, ধারা-উপধারা নজিরি আইন বাতলে দেয়। বাড়ি-আসবাবপত্রের জন্যে সে বেহুদা বেশি দাম দেয় নি।

সে-বাড়ির বৈঠকখানায় নথিপত্রে-ঢাকা টেবিলের ওপর স্থাপিত লণ্ঠনের পশ্চাতে বসে উকিল কফিলউদ্দিন কোনো মামলার জট খোলার চেষ্টায় রত ছিল, মুখে আত্মমগ্ন ভাব, মন স্টিমারঘাট নদনদী থেকে বহুদূরে। ভেতর থেকে হুঁকা আসে—মক্কেলদের জন্যে সাধারণ হুঁকা, তার জন্যে নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি। কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটি হুঁকা-গুড়গুড়ির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে, ক্রমশ ধূমায়িতও হয়ে পড়ে, তার পশ্চাতে মানুষের মুখগুলি অস্পষ্ট দেখায়। পরে পান আসে; বড় পেতলের থালায় করে সাধারণ পান, রূপার পিরিচে সেজে সাচি পান। তারপর কখন উকিল কফিলউদ্দিন কথা বলতে শুরু করে। তবে তার কণ্ঠে যেন ঘুমের আমেজ;

সে-কণ্ঠ অবিরাম গুঞ্জনের মতো শোনায়। তারপর এক সময়ে সহসা সে এমনভাবে কেশে ওঠে যেন কাশিটি পূর্বাভাস না দিয়ে অকস্মাৎ তাকে অভিভূত করে ফেলেছে, এবং মুখে যা উঠে আসে তা নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হঠাৎ পাশে ঝুঁকে টেবিলের পশ্চাতে অদৃশ্য একটি পিক্‌দানিতে সশব্দে থুথু ফেলে। নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য সে-পিক্‌দানি থেকে এবার সচকিত একটি মাছি উঠে এসে অন্ধের মতো নিঃশব্দে ঘুরপাক দিয়ে পশ্চাতের দেয়ালে টাঙ্গানো ফ্রেমে-বাঁধা সোনালি অক্ষরে লিখিত আল্লার নামের এক প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে; হয়তো রূঢ়ভাবে ঘুমে-ব্যাঘাত-পাওয়া ক্ষুদ্র জীবটির কাছে সমগ্র বৈঠকখানার মধ্যে সে-স্থানটিই সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয়। এবার ঘরে যে-আকস্মিক নীরবতা নাবে সে-নীরবতার মধ্যে সবাই দেখতে পায়, উকিল চোখ নিমীলিত করেছে।

উকিল কফিলউদ্দিনের চরিত্র অনেক দিন থেকে পরস্পরবিরোধী, যেন বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তার আসল চরিত্রটি যে কী, বা কোন চরিত্র তার জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত এবং মানানসই—সে-বিষয়ে এখনো মত স্থির করতে পারে নি। কখনো মনে হয় তার মধ্যে হীনতা-নীচতা কল্পনাতীত, এবং সে এমন মানুষ যাকে গভীরভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই কারণ তার দেহের প্রতি অন্ধ্র-রন্ধ্র দিয়ে দয়ামায়া ক্ষমাশীলতাই নিঃসৃত হয়। আবার আকস্মাৎ সে-মানুষের মধ্যেই কুটিলতা-হিংস্রতা উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হয়তো তখন তার সহসা মনে পড়ে মক্কেলরা উকিলের নিকট দয়ামায়া-ক্ষমাশীলতা আশা করে না। তবু মক্কেলদের আশানুযায়ী আচরণের প্রয়োজন বুঝলেও আবার অন্তরে কোথাও মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধার জন্যে একটি তীব্র বাসনাও বোধ করে থাকবে। হয়তো তার চরিত্রের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাবের কারণ এ-দুটির মধ্যে দ্বন্দ্ব। তবে তার চরিত্র যে-রূপই ধারণ করুক না কেন, তার অন্তরে রাতের হাওয়ার মতো গুপ্তভাবে যে-চিন্তা-ধারা প্রবাহিত হয় তার আভাস কদাচিৎ বাইরে ধরা পড়ে, যদি-বা তার গোঙ্গানি শোনা যায় তার চেহারা দেখা যায় না, তার গতিবিধিও বোঝা যায় না। রক্তাক্ত চোখে বিষম ক্রোধ প্রকাশ করলেও সেটি সত্যিকার ক্রোধ না-ও হতে পারে, আবার যখন সে অমায়িকতায় নরম কোমল হয়ে ওঠে সে-সময়ে তার অন্তরে ক্রোধের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলা সম্ভব। হয়তো সবটাই অভিনয়, পরের সুখ-দুঃখ আপনার করে নিয়ে সে-সুখ-দুঃখের কাহিনী আবার ব্যক্ত করে বলে প্রত্যেক উকিলই এক রকমের অভিনেতা।

তবে কফিলউদ্দিন যখন হঠাৎ নীরব হয়ে পড়ে চোখ নিমীলিত করে তখন তা অভিনয় বলে মনে হয় না, বরঞ্চ মনে হয় সহসা বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে সে তার অন্তরের গুপ্ত হাওয়ার আওয়াজ শুনছে। জনবাদ এই যে, সে যখন চোখ নিমীলিত করে এমনিভাবে স্তব্ধ-নীরব হয়ে পড়ে তখন বিপক্ষ দলের উকিল তো বটেই জজ-হাকিমও আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এই কারণে যে তার অন্তরের অদৃশ্য হাওয়া তাকে কী পরাশর্ম দেবে সে-বিষয়ে আগেভাগে নিশ্চিত হওয়া শক্ত।

অনেকক্ষণ উকিল কফিলউদ্দিন নিমীলিত চোখে নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর সে-অবস্থাতেই কী একটি দুর্বোধ্য প্রয়োজনে বা তাড়নায় ধীরে-ধীরে পা দুটি চেয়ারের ওপর তুলে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বসে। এমনিভাবে চেয়ারে পা তুলে বসা তার অভ্যাস; প্রথমে পা ঝুলিয়ে বসেও তারই অজান্তে এক সময়ে সে তার পা দুটি তুলে নেয় চেয়ারের ওপর।

এবার টেবিলের পশ্চাতে লম্বা-চওড়া মানুষটিকে বিশালকায় দেখায়, এবং পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে বসার দরুন দেহটা সামনের দিকে কিছু ঝুঁকে থাকে বলে তার সমগ্র ভঙ্গিতে একটি নিবিড় একাগ্রতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে; নিমীলিত চোখে সে যেন গভীর মনযোগ-সহকারে কিছু পরীক্ষা করে দেখে।

তারপর সহসা সে চোখ উন্মীলিত করে। সে-উন্মীলিত চোখে আকস্মিক ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ।

"কোথায় চড়া পড়েছে, কেই-বা বলেছে চড়া পড়েছে?" সে জিজ্ঞাসা করে।

চৌধুরীদের ছেলেকে দিয়ে লেখানো চিঠিতে যে-কথা তারা জানিয়েছিল বড় চাচী সে-কথারই পুনরাবৃত্তি করলে মুহাম্মদ মুস্তফা প্রথমে বিস্মিত হয়, তারপর বুঝতে পারে যতই অর্থহীন হোক না কেন তা কানে না তুলে উপায় নেই। তবে সে কিছু বলে নি। কী বলবে বুঝে উঠতে পারে নি। সে জানে, বাড়ির লোকেরা মধ্যে-মধ্যে এমন সব কথা বলে থাকে যা বুদ্ধি-যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা যায় না, তবু প্রতিবাদে কিছু বলাও যায় না; বস্তুত যতই উদ্ভট রূপ ধারণ করে তাদের বক্তব্য ততই কিছু বলা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এ-জন্যেই বলা যায় না যে তখন মনে হয় তারা যা বলে তার পশ্চাতে অন্য কী-একটা অর্থ আছে, অন্যকিছু বলা তাদের উদ্দেশ্য, হয়তো সত্য কথা বলার সাহস নেই বলে হেঁয়ালি বা রূপক বাক্যের শরণাপন্ন হয়েছে। কখনো-কখনো মনে হয়, প্রতিবাদ করে লাভ কী, অন্য কেউ কি যথার্থ উত্তর জানে? ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণ তল্লাশের প্রয়াসে তারা যতই গভীর পানিতে তলিয়ে যায় ততই তাদের দৃষ্টি পথে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে ওঠে, কিন্তু যারা ওপরে ভেসে থাকে তারাই-বা কি তাদের চেয়ে বেশি দেখতে পায়? কখনো তারা দুটি সম্বন্ধশূন্য ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ খুঁজে পায়, ভাবে প্রথম ঘটনাটি না-ঘটলে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটত না, কিন্তু দুটির মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই বললেই কি দ্বিতীয় ঘটনাটি কেন ঘটেছিল তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে?

খোদেজার মৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল কে জানে; হয়তো সে ঘাট থেকে বেকায়দায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল আর উঠতে পারে নি, হয়তো পানিতে নাবার পর কোনো রহস্যময় কারণে সহসা তার জীবন-প্রদীপ নিভে গিয়েছিল। তবে মুহাম্মদ মুস্তফার চিঠি আসার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু ঘটেছিল বলে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছে সে-চিঠিই মেয়েটির মৃত্যুর কারণ। মুহাম্মদ মুস্তফা লিখেছিল, তসলিম নামক একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ বন্ধুর ঘটকালিতে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের তৃতীয়া কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ ঠিক হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব হজে রওনা হবেন। তাঁর ঐকান্তিক বাসনা প্রস্থানপূর্বে জাগতিক-পারিবারিক সমস্ত দেনা-পাওনা, দায়-দায়িত্ব চুকিয়ে নেবেন। এই কারণে আগামী জুমাবারেই বিবাহের দিন নির্ধারিত হয়েছে। চিঠিটা এসে পৌঁছায় দুপুরের দিকে। অল্প সময়ের মধ্যে চৌধুরীদের ছেলেটিকে ধরে আনা হয়; সে-দিনও আমি বাড়ি ছিলাম না। তারপর উঠানে দাঁড়িয়ে ছেলেটি সকলের অনুরোধে একবার নয় দু-বার নয় তিন-তিন বার ইস্কুলের পাঠপড়ার ভঙ্গিতে উচ্চস্বরে চিঠিটা পড়ে শোনায় যাতে সকলেই তার বিষয়বস্তু নির্ভুলভাবে শুনবার এবং উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। চিঠির বিষয়বস্তু খোদেজাও শুনেছিল; উত্তর-ঘরের গা-ঘেঁষে-ওঠা বড়ইগাছের তলে সে দাঁড়িয়ে ছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-আবৃত পুকুর অভিমুখে সে রওনা হয়। সে-পুকুর থেকে জীবিত অবস্থায় মেয়েটি ফিরে আসে নি। কিন্তু চিঠির সঙ্গে মেয়েটির মৃত্যুর কোনো সম্বন্ধ থাকবে কেন? নিঃসন্দেহে ধারণাটি নিতান্ত ভিত্তিহীন। তবে এমন একটা ধারণা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তা বললেও মেয়েটির আকস্মিক মৃত্যুর কারণটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে না। বরঞ্চ সে-চিঠিই মৃত্যুর কারণ—তেমন একটি কথা বিশ্বাস করতে পারলে বাড়ির লোকেরা হয়তো দুর্বোধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়ায় সামান্য আলো দেখতে পাবে, একটু সান্ত্বনা পাবে, ভয় বা অসহায়ভাব কিছু লাঘব হবে।

এ-সময়ে প্রতিশ্রুতিটির কথাও কে যেন তোলে। বড় চাচী নয়, অন্য কেউ কথাটি তুলে থাকবে। তার উত্থাপনে মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু চমকিত হয়, এবং তার ফুফু অর্থাৎ মৃত মেয়েটির মা সহসা মুখে আঁচল গুঁজে অদম্যভাবে সমগ্র দেহে থরথর করে কেঁপে কাঁদতে শুরু করলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রতিশ্রুতিটি একটি মহাসত্যের রূপ ধারণ করে, ক্ষণকালের জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফা তার বুকে কোথাও ঈষৎ একটা বেদনাও বোধ করে।

প্রতিশ্রুতিটির কথা অসত্য নয়। বিধবা হয়ে ছয়-সাত বছরের খোদেজাকে নিয়ে ছোট ফুফু যখন উত্তর-ঘরে আশ্রয় নেয় তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বাপ খেদমতুল্লা বোনের দুঃখে দুঃখপরবশ হয়ে স্থির করে মুহাম্মদ মুস্তফা বড় হয়ে খোদেজাকে বিয়ে করবে। তখন ওয়াদা করার বয়স হয় নি মুহাম্মদ মুস্তফার, হলেও তার মতামতের জন্যে কেউ অপেক্ষা করত কিনা সন্দেহ। তবে নিঃসন্দেহে সে-সময়ে বাড়ির লোকেরা গুরুতরভাবেই প্রতিশ্রুতিটি গ্রহণ করেছিল, এবং হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফাও তারই অজান্তে সেটি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটি চুক্তি বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। সে-জন্যেই কি বড় হয়ে প্রতিবার দেশের বাড়িতে আসবার সময়ে খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি উপহার নিয়ে আসত না—একটি রঙিন ফিতা, ছোট একটি আয়না, চিরুনি, সুগন্ধ তেলের শিশি? তবে এ-কথাও সত্য যে খোদেজার জন্যে সে-সব উপহার আনা বন্ধ না করলেও ক্রমশ একটি নীরবতার মধ্যে সে প্রতিশ্রুতি একদিন সারশূন্য উক্তিতে পর্যবসিত হয়ে পড়ে; যা একসময়ে গভীরভাবে ভারি হয়ে মানুষের মনে বিরাজ করেছে, যা অলঙ্ঘনীয়ও মনে হয়েছে—তা সহসা একদিন বাস্তবের উগ্র আলোয় এবং অবস্থান্তরিত সত্যের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিচে বুদ্‌বুদের মতো উড়ে গিয়েছে পশ্চাতে কোনো দীর্ঘশ্বাসের ক্ষীণ রেশও না রেখে। বস্তুত বহুদিন কথাটি কেউ তোলে নি; যে-মানুষ ইতিমধ্যে কী-একটা রহস্যময় উচ্চাশায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের বাড়ির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে উচ্চশিক্ষার্থে দূরে চলে গিয়েছে, সে-মানুষের দিকে তাকিয়ে কথাটি তুলতে কারো হয়তো সাহস হয় নি। কিছুদিন আগেও বড় চাচী খোদেজার বিয়ের কথা তুলেছিল। ঈদের উপলক্ষে পাওয়া চাঁপাফুলের মতো হলদে শাড়ি পরে খোদেজা উঠান অতিক্রম করে দক্ষিণ-ঘরের দিকে যাচ্ছিল, সে-সময়ে তার বড় চাচী সহসা তার বিয়ের কথা পাড়ে। তবে সে-দিনও সে প্রতিশ্রুতিটার কোনো উল্লেখ করে নি। সত্যি, একদিন প্রতিশ্রুতিটার কিছু আর থাকে নি। সেটি সমস্ত অর্থ হারিয়ে না ফেললে মুহাম্মদ মুস্তফা যখন বন্ধু তসলিমের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করে তখন ক্ষণকালের জন্যেও কি দেশের বাড়ির দিকে তার মন ফিরে যেত না, কোনো দায়িত্ববোধের স্মৃতি হঠাৎ জেগে উঠে তাকে ঈষৎ বিচলিত করত না?

কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটি সন্দেহের ছায়া দেখা দেয় : সবাই ভুললেও হয়তো খোদেজা প্রতিশ্রুতিটি ভুলতে পারে নি, বরঞ্চ সমগ্র অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করেছিল এবং তাই মুহাম্মদ মুস্তফা প্রতিশ্রুতি রাখবে না দেখে গভীরভাবে আঘাত পেয়েছিল। সেটা অসম্ভব নয়। তবু সে-জন্যে সে কি আত্মহত্যা করবে? যেখানে তার জন্ম, যে-পরিবেশে সে বড় হয়েছে, সেখানে এমন একটি কাজ কি সম্ভব? না, কাদায় ফুল ফোটে না। তাছাড়া যে-মানুষ আত্মহত্যা করবার ক্ষমতা রাখে সে-মানুষ দশজনের মতো নয়, এবং তেমন মানুষের মন সযত্নে ঢাকা থাকলেও ক্বচিৎ-কখনো বিদ্যুৎঝলকের মতো আত্মপ্রকাশ করে থাকে, যে-বিদ্যুৎঝলক অন্ধের চোখেও ধরা পড়ে। মুহাম্মদ মুস্তফা এমন কোনো বিদ্যুৎঝলক কখনো লক্ষ করে নি। আরেকটি প্রশ্নও তার মনে জাগে। কী জানি, হঠাৎ হয়তো সাময়িকভাবে মেয়েটির মতিভ্রম হয়েছিল। কিন্তু তা-ও কি সম্ভব? উত্তর-ঘর দক্ষিণ-ঘর, ক্ষুদ্র লেপাজোকা উঠান, পশ্চাতে ডোবার মতো ছায়াচ্ছন্ন ছোট পুকুর—এ-সবের মধ্যে যার জীবন সীমাবদ্ধ সে-মানুষ একটি জিনিস কখনো হারায় না : তা মনের সুস্থতা। দুঃখ-দুর্দশা নিরাশা-নিষ্ফলতায় জর্জরিত জীবনে মনের সুস্থতা হারালে বাকি থাকে কী? কখনো-কখনো এমন মেয়ের ঘাড়ে ভূত চাপে, যে-ভূত ওঝা এসে তাড়ায়। তবে ভূত যত বড় হোক না কেন, যতই দিশেহারা করে ফেলার ক্ষমতা রাখুক না কেন, ভূতচাপা মেয়ের বাঁচবার বা আত্মরক্ষার প্রবল ইচ্ছা দমন করতে পারে না। প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে এমন মেয়ের মনে নিদারুণ আঘাতের সৃষ্টি করলেও সে কখনো আত্মহত্যা করবে না।

যারা প্রতিশ্রুতিটির উল্লেখ করেছিল, তারা সে-বিষয়ে শীঘ্র নীরব হয়ে পড়ে। হয়তো তারা বুঝতে পারে, যুক্তিটা এমনই যা নিয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা সহজ নয়। প্রতিশ্রুতি দিলে

প্রতিশ্রুতি রাখতেই হয়, একবার প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভাঙ্গা একটি গর্হিত কাজ—এসব কথা দাবি করতে তাদের সাহস হয় না। এসব দাবি জানালে মানুষের দাবির কি আর অন্ত থাকবে? অতএব প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে মৃত মেয়েটির অন্তর নিয়ে তারা নানাপ্রকারের কিচ্ছাকাহিনীর জাল বুনতে শুরু করে। পরদিন থেকে বৃষ্টি শুরু হয়। কখনো প্রবল ধারায় কখনো টিপটিপ করে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে অবিশ্রান্তভাবে বৃষ্টি পড়ে, নদী-খাল-বিল কানায় কানায় ভরে ওঠে, ঝোপঝাড়-লতাপাতা শোকাপ্লুত কোনো বধূর ছায়াচ্ছন্ন অশ্রুসজল চোখের রূপ ধারণ করে। বৃষ্টির সঙ্গীতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাড়ির মেয়েরা নূতন-নূতন তথ্য আবিষ্কার করে নানাপ্রকারের বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মৃত মেয়েটিকে নিয়ে তাদের কল্পনাপ্রসূত কাহিনীটি অলঙ্কৃত করে। সবাই সেদিন রৌদ্রউত্তপ্ত দুপুরে বরইগাছের তলে দাঁড়িয়ে-থাকা মেয়েটিকে দেখতে পায়। চৌধুরীদের ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফার চিঠি পড়ছে। চিঠির মর্মার্থ বুঝতে মেয়েটির যেন কিছু সময় লাগে, নিষ্ঠুর সত্য গ্রহণ করতে তার মন যেন কিছুতেই রাজি হয় না। তারপর সহসা তার মুখ বজ্রাহত মানুষের মতো নিথর হয়ে পড়ে। তারা মেয়েটিকে পুকুরের দিকে যেতেও দেখে, এবং এত কিছু বুঝে থাকলে বা দেখে থাকলে মেয়েটির গর্ভধারিণীর মনেও কেন ঈষৎ আশঙ্কা জাগে নি—এমন প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করে তারা বলে, মেয়েটি যখন পুকুর অভিমুখে রওনা হয় তখন তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল সে যেন সহসা ইহজগতের সমস্ত মায়া কাটিয়ে উঠেছে, বেঁচে থাকার সাধ আর নেই।

শুধু সে-দিনের কথা নয়, আগের অনেক কথা নিয়ে তাদের কাহিনী ধীরে-ধীরে বিকশিত হতে-থাকা পুষ্পের মতো পুষ্পিত হয়, কণ্টক নিয়ে, সৌরভ নিয়ে। কেবল সে-কণ্টক মুহাম্মদ মুস্তফাকে বিদ্ধ করে না, ব্যথা দেয় না, সে-সৌরভও তাকে মোহিত করে না : কাহিনীটা রূপকথার মতো শোনালেও রূপকথা নয়। কত কথা। মুহাম্মদ মুস্তফা বাড়ি আসছে খবর পেলে খোদেজা অধীর হয়ে দিন গুণত, অকারণে থেকে-থেকে তার দৃষ্টি ছুটে যেত উঠানের প্রান্তে বেড়ার ফাঁকের দিকে। একবার আসবে বলেও না এলে তার চিন্তার অন্ত থাকে নি, বিনিদ্র চোখে কতবার-না বিছানা ছেড়ে মধ্যরাতে উঠানে গিয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা শহরে ফিরে গেলে ক-দিন সে বিরহবেদনায় ম্রিয়মাণ হয়ে থাকত, রাতে গোপন অশ্রুতে বার-বার ভিজে উঠত তার বালিশ। একবার তার অসুখের খবর এলে মেয়েটি আশঙ্কা-দুশ্চিন্তায় এমন দিশেহারা হয়ে পড়ে যে আরোগ্য-সংবাদ না আসা পর্যন্ত মুখে দানা তোলে নি।

এ-সব যে সত্য নয়, সে-বিষয়ে মুহাম্মদ মুস্তফার কোনো সন্দেহ থাকে না। তার প্রতি খোদেজার হৃদয়ে যদি তেমন স্নেহমমতার শতাংশও থেকে থাকত তবে সে কি জানতে পেত না? মেয়েমানুষ মনের কথা লুকাতে পারে সত্য, তবে এমন গভীর স্নেহমমতা যা প্রত্যাখ্যাত হলে মানুষ আত্মহত্যার মতো ভীষণ কাণ্ড করে বসে, তা সম্পূর্ণভাবে লুকানো সম্ভব নয়। সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই খোদেজার আচরণ ভাবভঙ্গি স্মরণ করে দেখে কিন্তু বাড়ির মেয়েমানুষদের কাহিনীর সমর্থনে কিছুই খুঁজে পায় না। প্রতিবার দেশের বাড়িতে ফিরে এলে সকলের মতো খোদেজাও তার সেবাযত্ন করত, সে-ব্যাপারে তার হিস্যা কম ছিল না বেশিও ছিল না। কোনো-কোনো বিষয়ে সে যদি একাই খাতির-যত্নের অধিকার রাখত তার কারণ এই যে, বয়সের জন্যে কারো হাতে কোনো কাজ শোভা পায় কারো হাতে পায় না। সে-জন্যেই হাত-মুখ ধোয়ার সময়ে উঠানে বদনা ধরত বা খাওয়ার সময়ে কোনোদিন হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করত। তবে সে যখন বদনা থেকে পানি ঢালত বা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করত তখন কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও মুহাম্মদ মুস্তফার এ-কথা মনে হয় নি যে সে বেশ একটু আদর করেই পানিটা ঢালছে বা বিশেষ মমতার সঙ্গে হাতপাখাটা নাড়ছে। কোথায় ছিল তার সেই গভীর স্নেহমমতা ভালোবাসার প্রমাণ?

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ঈষৎ ক্রোধভাবের সঞ্চার হয়। আপন

মনে সে বলে, রূপকথার জন্যে সদা ক্ষুধিত মানুষেরা হঠাৎ একটি রূপকথা সৃষ্টি করে ফেলে তার নেশায় এমন নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে সত্যাসত্য ন্যায়-অন্যায় বিচারজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এ-কথা বুঝতে পারছে না যে তারা তাকেই খোদেজার মৃত্যুর জন্যে দায়ী করছে। ক্রোধউষ্ণ মনে এ-সবের মধ্যে সে গূঢ় অভিসন্ধিও খুঁজে পায়। একবার মনে হয়, সে যে তাদের পশ্চাতে ফেলে দূরে কোথাও চলে যাচ্ছে এ-কথা তার মঙ্গল কামনা করলেও তারা গ্রহণ করতে পারছে না বলে একটি বিকৃত উপায়ে তার কাছে তাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছে, এবং এত শ্রম-সাধনার সাহায্যে যে-জীবনের দেহলিতে সে এসে পৌঁছেছে সে-দেহলি যদি তার ফলে ছায়াচ্ছন্ন হয় তাতেও তাদের আপত্তি নেই। আরেকবার মনে হয়, সে যে পিতৃদত্ত প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করে নি সে-কথা জোর গলায় বলবার সাহস না পেলেও সে-জন্যেই তারা তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত। অন্য ধরনের কথাও মনে জাগে। তার মনে হয়, এই কাহিনীতে তার অংশ নিতান্ত নগণ্য, সে একটি উছিলামাত্র। মৃত মেয়েটিই কাহিনীটির উদ্দেশ্য, সেই তাদের লক্ষ্যস্থল, এবং একটি ঘোরালো উপায়ে মৃত মেয়েটিকে জীবিত করার চেষ্টা করছে তারা, মৃত্যুর পর একটি অতিশয় স্নেহশীল দরদী আত্মা সৃষ্টি করার প্রয়াস পাচ্ছে। স্নেহান্ধ লোকেরা কেবল এ-কথা বুঝতে পারছে না যে মেয়েটিকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তাকেই ধ্বংস করছে।

তবে এ-সব মনে-মনেই সে বলে, মুখে কিছু বলা হয়ে ওঠে না। বাড়ির লোকেদের সরল, বিমর্ষ, কাল্পনিক কাহিনীতে আত্মমগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে এ-কথাও বুঝতে পারে যে, মেয়েটি তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে বিশ্বাস করলেও তার বিরুদ্ধে তাদের কোনো অভিযোগ নেই, কোনো ক্রোধও নেই, যেন দোষ তার নয় অন্য কারো, আসল অপরাধী দৃশ্যগত জীবন-মঞ্চের অন্তরালেই কোথাও লুকিয়ে। হয়তো এ-জন্যে সে শেষ পর্যন্ত ক্ষীণতম প্রতিবাদও জানাতে সক্ষম হয় না। তার ক্রোধ পড়ে, সে শ্রান্তও বোধ করে।

তৃতীয় দিন ছাতা মাথায় জুতা বগলে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সে যখন চাঁদবরণঘাট অভিমুখে রওনা হয় তখন সহসা স্থির করে, খোদেজার মৃত্যুর জন্যে বিয়েটা কিছুদিন স্থগিত রাখা শোভনীয় হবে। এ-টুকু না করে যেন পারা যায় না।

তবারক ভুইঞা বলে চলে :

সেদিন উকিল কফিলউদ্দিন সহসা জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় চড়া পড়েছে, কেই-বা বলেছে চড়া পড়েছে? তবে প্রশ্নটি উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে বৈঠকখানায় উপস্থিত লোকেদের মনে বিষম একটা কৌতূহলের সৃষ্টি করলেও সে-প্রশ্নের অর্থ কী তা তখন বলে নি : সে-প্রশ্নের যে-উত্তরটি দেখতে পায় তা হয়তো সে-সময়ে তার নিজের বিশ্বাস হয় নি। তবে কথাটি যতই ভেবে দেখে ততই তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। সত্যি, চড়া যদি পড়ে থাকে, কোথায় সে চড়া? এ-পর্যন্ত কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা স্বচক্ষে কোনো চড়া দেখে নি। চড়ার কথা বলেছে তারা যারা স্টিমার চালায়, যারা সে-স্টিমারের আসা-যাওয়া হঠাৎ বিনা খবরে বন্ধ করে দিয়েছে। পরদিন সে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে, কপালে সুগভীর রেখা, মুখে একাগ্র ভাব, যেন সমস্ত চিন্তাধারা নিয়োজিত করে কী একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান কার্যে রত। তবে সন্ধ্যার দিকে তার মুখ পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

উকিল কফিলউদ্দিন সে-দিন সন্ধ্যার পর তাড়াতাড়ি করে একটি সভা ডাকে এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার, হেকিম-ডাক্তার এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যখন তার বৈঠকখানায় উপস্থিত হয় তখন তার আবিষ্কারের কথাটি তাদের জানাবার জন্যে সে অধৈর্যপ্রায় হয়ে উঠেছে। আজে বাজে কথায় কালক্ষেপ না করে সে সরাসরি আসল কথা পাড়ে।

"বুঝলেন, কথাটি আগাগোড়া একটি ধোঁকা মাত্র। চড়ার কথা বলে তারা আমাদের ধোঁকা দিতে চায়। আসল কথা কী জানেন? কামালপুরের পথে যত পয়সা তত পয়সা এ-পথে নেই,

বিয়ের পর স্ত্রী আন-মারির সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ করাচিতে

তাই এখান থেকে স্টিমার তুলে দিয়ে কামালপুরের পথে চালু করেছে।"

কামালপুর যে একটি বর্ধিষ্ণু শহর তা কুমুরডাঙ্গার লোকেদের অজানা নেই। সে-শহরের নিকটে একটি বড় পাটের কারখানা বসেছে, সে-পথে লোকেদের যাওয়া-আসা এবং আমদানি-রপ্তানিও বেশ বেড়েছে গত কয়েক বছরের মধ্যে।

"ব্যাপারটার গোড়ায় ঐ কথা। কথাটা কামালপুর। তবে সেই কারণে এ-শহর থেকে স্টিমার তুলে দিলে আমরা ক্ষেপে যাব এই ভয়ে স্টিমারের লোকেরা চড়ার কিচ্ছা ফেঁদেছে। চড়া পড়লে মানুষ আর কী করতে পারে?"

কথাটি সকলের বিশ্বাস না হতে পারে এই ভেবে উকিল কফিলউদ্দিন সহসা কিছু আশঙ্কিত হয়ে উঠে একটি মিথ্যা কথা বলবে বলে স্থির করে। কণ্ঠে অত্যধিক গাম্ভীর্য এনে বলে, "খবরটি বিশ্বস্তসূত্রেই জানতে পেয়েছি। কিছুদিন আগে সদর থেকে আমার জামাই লিখেছিল। সে কী করে জানতে পেয়েছিল এমন একটি পরিকল্পনা চলছে। তবে ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ সে-সময়ে মনে পড়ল।"

উকিল কফিলউদ্দিনের কথা সবাইকে স্তম্ভিত করে থাকবে, কারণ ঘরময় একটি নীরবতা দেখা দেয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। নদীতে চড়া পড়েছে, এবং সে-জন্যে স্টিমার-চলাচল বন্ধ হয়েছে—একথা সকলে ইতিমধ্যে মেনে নিয়েছিল, হঠাৎ তাদের মনে বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ উকিল একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে। তবে কি চড়ার কথাটি সত্য নয়, সে কি একটি প্রচণ্ড ধোঁকামাত্র, নিছক ফাঁকি ছাড়া কিছু নয়?

নীরবতা ভঙ্গ করে ডাক্তর বোরহানউদ্দিন অবশেষে সরল কণ্ঠে প্রশ্ন করে,

"এমন ধোঁকা কি সম্ভব?"

ডাক্তার বোরহানউদ্দিন অকালবৃদ্ধ। চল্লিশে পৌঁছেই তার শিড়দাঁড়া বাঁকা হয়ে পড়েছিল, মাথার চুলও অর্ধেক সাদা হয়ে গিয়েছিল। বেশভূষার দিকে তেমন খেয়াল নেই, মুখে সদাসর্বদা নিরানন্দ ভাব, অকালে বার্ধক্যের আক্রমণ সম্বন্ধে তাকে সচেতনও মনে হয় না; যে-বার্ধক্য একদিন অনিবার্য, জীবনপরিক্রমা অসময়ে শেষ না হলে যা এড়ানো যায় না, সে-বার্ধক্য কিছু আগে এসে উপস্থিত হয়েছে বলে আফসোস-আক্ষেপ করা তার কাছে হয়তো অহেতুক মনে হয়। তার মনে কোনো কুটিলতা নেই, এবং সে যখন রোগীর পরীক্ষা শেষ করে কেমন এক দৃষ্টিতে রোগীর দিকে তাকিয়ে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকে তখন সে যে নিতান্ত ভালোমানুষ সে-ধারণাটি আপনা থেকেই মানুষের মনে জেগে ওঠে। তবে রোগীর পরীক্ষা শেষ হলে একদিন যে-সব কথা ভাবত সে-সব কথা আর ভাবে না : রোগীর অবস্থা যে বড় গুরুতর তা তাকে বা তার আত্মীয়-স্বজনকে কী করে বলে, রোগীর ওষুধপথ্য করার সামর্থ আছে কিনা, বা চিকিৎসার উত্তম উপায়টি কী। সে-সব আর ভাবে না, কারণ ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের চিকিৎসক অনেক কিছু ভাবা ছেড়ে দেয় একদিন। সে-সব ভেবে লাভ কী? ক্রমশ একদিন রোগীর আয়ু কিছু বৃদ্ধি করার চেষ্টাও তার কাছে বৃথা মনে হয়। তাতে কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা বাড়ানো হয়, কষ্টের জীবনকে বিলম্বিত করা হয়, শান্তির দিনটি পিছিয়ে দেওয়া হয়। আরেকটি কথাও সে বোঝে। চিকিৎসার অর্থ আজরাইলের সঙ্গে একপক্ষীয় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, যে-যুদ্ধের শেষে পরাজয় নিশ্চিত; রোগীর অবস্থা চিকিৎসার বাইরে চলে গেলেই সচরাচর চিকিৎসকের তলব পড়ে। কোনো চিকিৎসক সাফল্য বা কৃতিত্বের প্রত্যাশাও করতে পারে না, এবং যে-কাজে সাফল্য বা কৃতিত্বের সম্ভাবনা নেই সে-কাজে মানুষের আনন্দও নেই। অতএব ডাক্তার বোরহানউদ্দিন যখন স্টেথেস্কোপ যন্ত্রটি গলায় ঝুলিয়ে ক্ষিপ্রপদে কোনো রোগীর বাড়ি-অভিমুখে রওনা হয় তখন তার পদক্ষেপে একটি বেসুরো ধ্বনি ধরা পড়ে, তার কপালের চিন্তাসূচক রেখাগুলিতে ঈষৎ অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায়। তবে সে-বেসুরো ধ্বনি বা অসামঞ্জস্যতা কেউ লক্ষ্য করে না; গভীর নিরাশাচ্ছন্ন মনে ডাক্তার রোগী দেখতে চলেছে—তেমন কথা কে বিশ্বাস করতে চায়?

উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব এমন একটি প্রশ্নের জন্যে যে প্রস্তুত ছিল না, তা নয়। বস্তুত ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের প্রশ্নটি অন্যায্য নয়। স্টিমার-কোম্পানির কাজটি সত্যিই অবিশ্বাস্য; অর্থলিপ্সায় প্রণোদিত হয়ে মানুষ এতদূর যেতে পারে তা কি বিশ্বাসযোগ্য? তবে অবিশ্বাস্য কথাও সত্য হয়; মানুষের ধাপ্পাবাজি, প্রবঞ্চনা এবং নির্দয়তার অন্ত নেই।

শান্তকণ্ঠে উকিল কফিলউদ্দিন উত্তর দেয়,

"এমন কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তা সত্য।"

এবার উকিল সাহেব ডাক্তার বোরহানউদ্দিন সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে স্টিমারের লোকদের প্রবঞ্চনা যদি কার্যকরী হয় তবে কুমুরডাঙ্গা শহরের কী ভীষণ অবস্থা হবে—তা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করে। ডাক্তার বোরহানউদ্দিন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে তার বক্তৃতা। তবে তার মনটা কোথায় যেন খচখচ করে। স্টিমারঘাট বন্ধ হলে দরিদ্র শহরের কী পরিণতি হবে তা বক্তার নাটকীয় উচ্ছ্বাস বা শব্দালঙ্কার-বিভূষিত ভাষার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও সে বুঝতে পারে; সে-সব দুর্বোধ্য নয়, অসত্যও নয়। তবে পূর্বের উক্তিটি এখনো ঠিক বুঝতে পারে না।

একটু পরে সে নির্বোধের মতো আবার বলে ওঠে, "চড়ার কথাটি কেন সত্য হবে না?"

তখনো উকিল সাহেবের বক্তৃতা শেষ হয় নি। বক্তৃতায় বাধা পড়লে হঠাৎ সে স্তব্ধ হয়ে পড়ে, একটু পরে ঝলক্ দিয়ে মুখে যেন রক্ত চড়ে, তারপর কয়েক মুহূর্ত স্থিরনেত্রে ডাক্তারের দিকে চেয়ে তার মুখাবয়বের সবকিছু যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করে দেখে। ডাক্তারের আধা-পাকা চুলে কদাচিৎ হাজ্জামের হাতের বা চিরুনির স্পর্শ পড়ে বলে সারাদিন এলোমেলো হয়ে থাকে। কানের ওপর, তারপর পশ্চাতে ঘাড় ঢেকে সদাময়লা কুঞ্চিত কলারের ওপর সে-চুল ঝুলে থাকে। তার গোঁফও দীর্ঘ। সে-গোঁফ ওপরের ঠোঁট অতিক্রম করে নিচের স্থূল, চিড়খাওয়া ঠোঁট পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, যার সূচাগ্র প্রান্ত এড়াবার জন্যই যেন সে সামনের মস্ত দাঁতের পাটি উন্মুক্ত করে মুখটা খুলে রাখে। কখনো-কখনো অন্যমনস্কভাবে দাঁত দিয়ে গোঁফের প্রান্ত কাটে, কখনো সহসা জিহ্বা বের করে তা ভিজিয়ে নমনীয় করে তোলে, কিন্তু কখনো ছাঁটে না। মধ্যে-মধ্যে তাতে খাদ্যকণা দেখতে পাওয়া যায় এবং সর্দি লাগলে এখানে-সেখানে জটও বেঁধে যায়। একবার বহুদিন ধরে গোঁফের প্রান্ত অর্ধচন্দ্রের মতো বাঁকা হয়ে ছিল, দেখে মনে হত যেন লম্বা-লম্বা ঘাসে আবৃত চরের মাথায় চাঁদ উঠেছে।

উকিল কফিলউদ্দিন অবশেষে ঘরের অস্পষ্ট আলোতেও দেখতে পায় ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের গোঁফের প্রান্তে ডালের মতো কিছু একটা লেগে রয়েছে; কয়েক মুহূর্ত ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে তারই সন্ধান করেছিল যেন। এবার তা দেখতে পেলে ঘৃণার মধ্যে দিয়ে ডাক্তারের নির্বুদ্ধিতার জন্যে তার প্রতি একটি পরম অবজ্ঞার ভাব দেখা দেয় উকিল কফিলউদ্দিনের মনে।

ঈষৎ তিক্ত-কঠিন স্বরে সে বলে, "চড়ার কথাটি যে নিছক ধোঁকা তা যেন কোনো কারণে ডাক্তার বিশ্বাস করতে পারছেন না।"

কোনো বিষয়ে অনেক চিন্তা করে একবার নিশ্চিত হবার পর কেউ সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে উকিল কফিলউদ্দিনের সহ্য হয় না, তাই তিক্ত উক্তিটি করেও সে মনে শান্তি পায় না। বক্তৃতা শুরু করতে গিয়ে চুপ করে যায়, যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। তারপর সহসা তার চোখে কী যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

এমনভাবে তার চোখ জ্বলে ওঠাও কাছারি-আদালতে সুপরিচিত, তার অর্থও সবাই জানে। এমনটা ঘটলে সবাই বুঝতে পারে উকিল কফিলউদ্দিন সহসা একটি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছে। কায়ক্লেশে আইনের বইপত্র ঘেঁটে সযত্নে-সাজানো যুক্তিতর্কের সাহায্যে নয়, বিদ্যুৎঝলকের ক্ষিপ্রতায় উপলব্ধ তথ্যের সাহায্যেই সে মামলা-মকদ্দমা জিতে থাকে, পাপিষ্ঠ আসামিরও খালাসের ব্যবস্থা করে থাকে। এখন সে বুঝতে পারে ডাক্তার

বোরহানউদ্দিনের নির্বুদ্ধিতার কারণ। ডাক্তার কি সত্যই এমন নির্বোধ হাবাগোবা মানুষ? প্রথমবার সে যখন প্রশ্ন করেছিল তখনই মনে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তবে তখন মনে হয়েছিল স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতি দেখতে পাচ্ছে না বলেই চড়ার কথাটা বিশ্বাস করতে ডাক্তারের আপত্তি নেই, সে ভাবছে, যারা চিকিৎসার জন্যে নৌকায় করে কুমুরডাঙ্গায় আসে তারা পূর্ববৎ তেমনিই আসবে। এখন উকিল কফিলউদ্দিন বুঝতে পারে ব্যাপারটি আরো গভীর, এলোমেলো চুল বেশভূষার বিষয়ে উদাসীন ডাক্তারটি অতিশয় গভীর পানির মানুষ—স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবার মধ্যে সে আর্থিক লাভের সম্ভাবনাই সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। যারা স্টিমারে চড়ে চিকিৎসার জন্যে অন্য কোথাও যেত তাদের অনেকেই কি এবার তার শরণাপন্ন হবে না?

ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বিচিত্র আচরণের রহস্য ভেদ করতে পেরে নিজের চতুরতার নিদর্শন দেখে উকিল সাহেব মনে-মনে তৃপ্তি বোধ করে। উকিল কফিলউদ্দিনের বিশ্বাস, তার কাছে মনের কথা গোপন করতে পারে—এমন মানুষের এখনো জন্ম হয় নি। সে জানে, মানুষের দুই মুখ—একটি বাইরের, অন্যটি ভেতরের। বাইরেরটি সমাজ-ধর্মের নির্দেশ মাফিক সাজানো-বানানো, ভেতরটি নির্ভেজাল স্বার্থে তৈরি, সর্ব মহৎ উদ্দেশ্যবিবর্জিত। প্রথমটি নকল, দ্বিতীয়টি খাঁটি; একটি সুন্দর, অন্যটি কদাকার। অনেকের যেমন তাসবাজি বা মেয়েমানুষ নিয়ে মারাত্মক নেশা, তেমনি কফিলউদ্দিনের ঘোর নেশা মানুষের সে-খাঁটি কদাকার ভেতরের দিকটা উদ্ঘাটন করা। তার এখন সন্দেহ থাকে না, সযত্নে লুকানো ডাক্তরের মনের কথাটি উদ্ঘাটন করতে সে সক্ষম হয়েছে।

"ডাক্তার রোগীর খওয়াব দেখছেন", সে বলে, আস্তে, এত আস্তে যে, উক্তিটি নয়, ঘৃণাবিদ্বেষই কেবল শোনা যায়।

বোরহানউদ্দিন এই কথাটিও ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু তার যে রোগীর প্রয়োজন নেই—সে-কথা সরলচিত্তে বলতে গিয়েও থেমে যায়। সে-কথা কি সবাই জানে না? স্বাধীনতার পর হিন্দু ডাক্তাররা একে-একে দেশছাড়া হয়ে যায়। তখন থেকে সে এত রোগী দেখছে যে রোগীতে তার আর সাধ নেই। সে অনেক বছর হল। সে-অবধি সুস্থ মানুষের চেহারা আর দেখে নি যেন। অবশেষে সে কিছুই বলে না, সে যে রোগী কামনা করে না, রোগীতে সব সাধ মিটেছে—এ-সব সত্য কথাও বলে না। তাছাড়া সে জানে, ঝানু উকিলের সঙ্গে তর্ক করার ক্ষমতা তার নেই; রোগী-হাসপাতাল ওষুধপত্র-চিকিৎসা ইত্যাদির বাইরে যে-জীবন সে-জীবনে আটঘাট বেঁধে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রহাতিয়ার তার সত্যিই নেই। সে-জন্যও সে ভালো মানুষ; সে নিরস্ত্র।

ততক্ষণে উকিল কফিলউদ্দিন স্থির করেছে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনকে উপেক্ষা করবে, তবে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করে। তার কেমন মনে হয়, ডাক্তারের অযথার্থ উক্তি-প্রশ্নে উপস্থিত অন্যান্য লোকদের মনে তার বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে অবিশ্বাস না হলেও কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তার মনে যে-কথাটি এসেছে তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোনোই কারণ দেখতে পায় না। সে জানে, অনেক সময় এমন দুর্বোধ্য কোনো উপায়ে মানুষ সত্য কথা জানতে পারে। মানুষ একা হলেও একা নয়; তার অন্তরে ফেরেশতা-শয়তান দুই-এরই বাস। হয়তো তারাই জানায় সে-সব কথা। তবে দুনিয়ায় মানুষেরা আবার সাক্ষীপ্রমাণ চায়। যে-মানুষ ওকালতি করে সে-মানুষ কথাটি ভালো করে জানে। কখনো-কখনো উকিল কফিলউদ্দিনের মনে হয়, সত্য নয়, সাক্ষীপ্রমাণের আবরণে মানুষ মিথ্যাই কামনা করে।

তবে শীঘ্র সে অস্বস্তি ভাবটি কাটিয়ে ওঠে। সাক্ষীপ্রমাণ সময়মত পাবে; সত্যের জয় নির্ধারিত।

"সার-কথা এই", সে বলে, "বাকাল নদীতে চড়া পড়ে নি, অন্ততপক্ষে এমন চড়া যার

জন্যে স্টিমার-চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। হ্যাঁ, নদীর একধারে কিছু অগভীরতা আছে, কিন্তু কোন্ নদীতে নেই? পদ্মা বলেন মেঘনা বলেন যমুনা বলেন, কোনো নদী আগাগোড়া সুগভীর নয়। সব নদীতে চড়া পড়ে চর জাগে কিন্তু আবার স্টিমার-চলারও উপায় থাকে।" একটু থেমে উকিল সাহেব আবার বলে, "চড়ার উছিলায়ই স্টিমার বন্ধ করা হয়েছে। এ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা যদি প্রতিবাদ না করি, তবে স্থায়ীভাবে স্টিমার বন্ধ হয়ে যাবে।" কনিষ্ঠ উকিল আরবাব খানের প্রতি সে দৃষ্টি দেয়। "তুমি একটা খসড়া তৈরি করো। জোর কলমে সরকারের কাছে পত্র লিখতে হবে। এ-অন্যায় কী করে আমরা সহ্য করতে পারি?"

একটু পরে উকিল সাহেবের একটা কথা স্মরণ হয়। "আপনারা জানেন, কুমুরডাঙ্গার লোকেরা কোম্পানির স্টিমারের কী দশা করেছিল। দেখে নেব কার বাপের সাধ্য এ-ঘাটে স্টিমার চলাচল বন্ধ করে", সে বলে।

মুহাম্মদ মুস্তফার বাল্যজীবনের বিষয়ে ভাবতে গিয়ে তেঁতুলগাছের সামনে সে-ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো পুকুরের ওধারে তেঁতুলগাছটি অতিক্রম করার সাহস কোনো ছেলেরই হত না, কারণ সেখান থেকে কালুগাজির রাজত্ব শুরু হত। কালুগাজিও নাকি সে-সীমানা অতিক্রম করে এদিকে কখনো আসত না। কেন আসত না, তারও একটি আজগুবি উত্তর ছিল। তবে মনে হয় যে-কালুগাজি হাওয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বিদ্যুৎগতিতে মুক্তভাবে চলাফেরার ক্ষমতা রাখত, যে আসলে মানুষ নয় দেহকায়াহীন একটি আত্মাই ছিল, সে-ও যে অনধিকার প্রবেশ করত না, অন্যের এলাকায় পা দিত না—এর মধ্যে সকলের জন্যে একটি অপ্রত্যক্ষ উপদেশ নিহিত থেকে থাকবে। আমাদের গ্রামে কেউ কারো জোতজমির সীমানা-সরহদ্দ মানত না। এ নিয়ে মামলা-মকদ্দমা না হলেও অহর্নিশি ঝগড়া-ফ্যাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হত, কালেভদ্রে একআধটা খুন-জখমও ঘটে যেত।

কালুগাজিকে কেউ কখনো দেখতে পেত না বলে তার চেহারাটি কী রকম সে-বিষয়ে কেউ একমত ছিল না। কেউ বলত সে দশ হাত লম্বা, মুখে তার ঝুরিমূলের মতো দাড়ি, চোখে টাটকা খুন। কেউ আবার বলত, সে অনেকটা সাধারণ ফকির-দরবেশের মতোই দেখতে, তবে এমন ফকির-দরবেশ যে কোনো কারণে সর্ব শান্তি থেকে বঞ্চিত। শান্তি পাওয়ার জন্যে সে কোনো বিচিত্র এবাদতে সর্বক্ষণ আত্মমগ্ন হয়ে থাকত, এবং মানুষের সামনে দেখা দিতে যেমন পছন্দ করত না তেমনি চাইত না মানুষ তার এবাদতে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় বা প্রবৃত্তি তার ছিল না।

কালুগাজির রাজত্ব কতদূর বিস্তৃত বা কত বড় এ-সব বিষয়ে কেউ কখনো নিশ্চিত ছিল না বটে, তবে কারো সন্দেহ ছিল না তা পুকুরের ওধারে যে-তেঁতুলগাছের পাশে সে-রাজত্ব শেষ হত সে-তেঁতুলগাছের তলায়ই সে বসতে ভালোবাসত। মেয়েরা বলত, জায়গাটির ওপর তার মায়া পড়ে গিয়েছে। অতএব একদিন শরৎকালের কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল বেলায় তেঁতুলগাছের দিকে গ্রামের একটি লোকের দৃষ্টি পড়তেই তার অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে ওঠে, কারণ সে দেখতে পায় কে যেন সে-গাছের তলে স্থির নিশ্চল হয়ে বসে। কালুগাজি কি কোনো কারণে সশরীরে দেখা দিয়েছে, অদৃশ্য জগৎ থেকে আবির্ভূত হয়েছে দৃশ্যমান জগতে? অপলক দৃষ্টিতে লোকটি গাছের তলে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ধীরে-ধীরে একটি আকৃতি, একটি চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে : ছোটখাটো মধ্যবয়সী মানুষ, মুখে কিছু দাড়ি, এত শীতেও দেহের উপরাংশ নগ্ন। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর লোকটি স্থির করে, অপরিচিত লোকটি কালুগাজি নয়। ফকির-দরবেশের মতো মনে হলেও সে নিতান্ত মাটির মানুষ, কেবল চোখে-মুখে ক্ষুধার্ত মানুষের শ্রান্ত তীক্ষ্ণতা। কালুগাজি যখন খোশমেজাজে থাকে তখনো তার কপাল থেকে লাঙ্গল-দেয়া জমির মতো গভীর ভ্রূকুটির রেখাগুলি নাকি কখনো

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না, তার চোখের আগুন কখনো স্তিমিত হয় না। কালুগাজি অতিশয় অস্থির প্রকৃতির লোকও, গাছের তলায় এবাদতে বসে স্থির হয়ে থাকলেও তার মধ্যে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের উষ্ণ-তরলতা অস্থিরতা নাকি কখনো শান্ত হয় না। লোকটির মধ্যে কালুগাজির সে-সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনো চিহ্ন ছিল না।

গাছের তলায় বসে অপরিচিত লোকটি কয়েক দিন কাটায়। এ-বাড়ি সে-বাড়ি থেকে লোকেরা খাদ্যবস্তু এনে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করে, পুকুরের সামনে তার উপস্থিতি মেয়েদের গোসলের ব্যাপারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও কেউ তাকে সরে যেতে বলে নি। বয়স্ক লোকেরা দূর থেকে দেখে তাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করত, তবে ছেলেরা বেশ সকালেই তার নিকটে হাজির হয়ে তার চতুষ্পার্শ্বে ঘিরে দাঁড়াত। এত ছেলের মধ্যে কোনো কারণে মুহাম্মদ মুস্তফাকে তার পছন্দ হয়েছিল, এবং মুহাম্মদ মুস্তফা দেখা দিলে বৃক্ষতলে আসনাধীন অপরিচিতি লোকটির চোখ প্রথমে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, তারপর সে-উজ্জ্বলতা ঢেকে যেত স্নেহে, পাতলা পর্দার মতোই যে-স্নেহ নেবে আসত। লোকটি একদিন লক্ষ্য করে, মুহাম্মদ মুস্তফা বা অন্যান্য ছেলেরা সর্বদা যেন একটি অদৃশ্য সীমারেখার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনো তা অতিক্রম করে না। একদিন সে মুহাম্মদ মুস্তফাকে বলে, যাও, যাও ওদিকে, কোনো ভয় নেই। প্রথমে মুহাম্মদ মুস্তফার শিশু-সরল চোখে গভীর ভীতি জাগে, মন-প্রাণ পাথরের মতো জমে শক্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু শীঘ্র সহসা কোথেকে একটা বিচিত্র সাহস দেখা দেয় তার মধ্যে, যে-সীমারেখা সে কখনো অতিক্রম করে নি সে-সীমারেখা অনায়াসে পেরিয়ে যায়।

সে-জন্যেই কি মুহাম্মদ মুস্তফা গ্রামের গণ্ডিতে বন্দী হয়ে থাকে নি, চাঁদবরণঘাটের সামনে বৃহৎ নদীটিও তার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি?

আরেকটি দিনের কথা মনে পড়ে। ভরা বর্ষার দিন। কয়েকটি সমবয়সী ছেলে স্থির করে গ্রাম থেকে কিছু দূরে সুভদ্রা নদীটি সাঁতার কেটে পার হবে। নদী কোথায়, খাল বলাই ভালো; এ-পাড়ে দাঁড়িয়ে ও-পাড়ে স্নানরতা বধূদের হাতের চুড়ি বা সূর্যালোকে ঝিকমিক করতে-থাকা নথ দেখা সম্ভব। সাঁতার কাঁটতে শুরু করে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে এমন সময়ে সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে হয়, নদীটি অতল এবং সে-অতল পানিতে না জানি কত কিম্ভূতকিমাকার হিংস্র দৈত্যদানব। ভয়টি নিতান্ত অহেতুক তা বুঝতে পারলেও সে-ভয় দমন করতে সক্ষম হয় না এবং দেখতে-না-দেখতে তার হাত-পা অবশ হয়ে পড়বার উপক্রম হয়। অপর পাড়টিও হঠাৎ যেন বহু দূরে সরে যায়, সেখানে একটু আগে যে-সব বাড়িঘর বা ঘাটে বাঁধা নৌকা দেখতে পেয়েছিল সে-সব দূরত্বে অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতখানি পথ কি সে অতিক্রম করতে পারবে? তার আগেই কি পানির মধ্যে থেকে একটি বিচিত্র জন্তু তার পা কামড়ে ধরে তাকে অতলে টেনে নিয়ে যাবে না? সে বুঝতে পারে, ফিরে গেলেই হয়তো সে প্রাণে বাঁচবে, উল্‌টো পথ না ধরে উপায় নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফিরে যেতে পারে নি। এ-জন্যে নয় যে অন্যছলেরা, যাদের কেউ-কেউ ততক্ষণে বেশ এগিয়ে গিয়েছে, তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে; অকৃতকার্যতার জন্যে বা তার ভীত মনের পরিচয় পেয়ে কেউ হাসি-ঠাট্টা করলে সে-হাসি-ঠাট্টায় কখনো সে বিব্রত বোধ করত না। ফিরে যায় নি এই কারণে যে, যখন সে উল্‌টো পথ ধরবে তখন তার মনে হয় পেছনের দিকে তাকালে দেখতে পাবে নদীর যে-তীর সবেমাত্র ছেড়ে এসেছে সে-তীরও নিকটে নয়, সামনের তীরের মতো সে-তীরও বহু দূরে সরে গিয়েছে। কে জানে, হয়তো কল্পনার দৈত্যদানবের ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লেও আসলে সে ফিরে যেতে চায় নি। হয়তো একবার চলতে শুরু করলে পেছনের দিকে কখনো তাকায় নি এ-জন্যে যে পেছনে ফিরে যাওয়াই সহজ। মানুষ পেছনের পথ চেনে; পেছনের পথ কখনো দূরের নয়, কঠিনও নয়। তবু বালক বয়সে মুহাম্মদ মুস্তফার ভয়ের সীমা ছিল না। মানুষ মাত্রই ভীতি বোধ করে—যার কখনো কারণ থাকে, কখনো থাকে না। মানুষ দোজখকে ভয় করে,

ভয় করে ভূতপ্রেত দস্যু-ডাকাতকে, ভয় করে রোগব্যাধি শারীরিক যন্ত্রণাকে, মৃত্যুকে, দারিদ্রকে, অপ্রশমিত ক্ষুধাকে। আবার সে ভয় করে কেন ভয় করে সে-কথা না বুঝে, এবং যে-ভয়ের কারণ নেই বা যে ভয়ের কারণ সে বুঝতে পারে না, সে-ভয়ই তাকে সর্বাপেক্ষা ভীত করে। সূর্যালোকের আলোকিত উজ্জ্বল দিনে যখন অবাধে চতুর্দিকে মানুষের দৃষ্টি যায় সেদিনও তার মনে হয় এই স্বচ্ছ প্রখর উজ্জ্বলতার অন্তরালে কোথায় যেন অস্বচ্ছতা, কেমন একটা অন্ধকার। তখন এত আলোর মধ্যেও সে অসহায় বোধ করে কারণ কোথাও আশ্রয় দেখতে পায় না। কিন্তু যেখানে আলো নেই সেখানেও কি সে নিরাপদ বোধ করে?

কারণে-অকারণে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ভয় দেখা দিত। একবার গ্রামের হামজা মিঞা নামক মোল্লা-মৌলভি গোছের একটি লোকের কথায় ভীষণ ভয় দেখা দিয়েছিল তার মনে। লোকটি বলত, ঈমানে মুফাচ্ছাল বাল্যবয়সেই পাকা হওয়া উচিত। একদিন মুহাম্মদ মুস্তফাকে হাতে পেয়ে নিজের শীর্ণ উরুতে বাঘা থাবা মেরে ব্যাঘ্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করেছিল : খোদা ভিন্ন কি মাবুদ আছে, তাঁর সমতুল্য কেউ কি আছে, তাঁর কি কোনো শরিক বা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তার কি নিদ্রা-তন্দ্রা আছে, ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, ক্লান্তি আছে, ক্ষয় আছে? সে-সব প্রশ্নে কী ছিল, বা সে-সব প্রশ্ন বালক-মনে কী চিত্র জাগিয়ে তুলেছিল কে জানে, কিন্তু হামজা মিঞার প্রশ্নের গোলাগুলি শেষ হবার আগেই মুহাম্মদ মুস্তফা অজানা ভয়ে সমগ্র অন্তরে হিমশীতল হয়ে পড়ে, তার মনে হয় আকাশ অন্ধকার করে কেয়ামতি ঝড়-তুফান আসতে দেরি নেই, শীঘ্র কোথাও সহস্রাধিক হিংস্র ক্রুদ্ধ সিংহও কান-বধির-করা আওয়াজে গর্জন শুরু করবে। চোখ বুজে সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে একটি নির্বোধ মেয়েমানুষের কাছে শুনতে পায়, খোদা নাকি দেখতে কলিজার মতো, এবং কলিজার মতো প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপে। কথাটি কী কারণে তাকে আশ্বস্ত করে, এবং যদিও তার মনে হয় আকাশে ভাসমান অদৃশ্য সে-কলিজার কাঁপুনিতে গোটা পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে, তার দুর্বোধ্য ভয়টি কিছু প্রশমিত হয়। আরেকবার একদিন কয়েকজন দুষ্টু ছেলে ষড়্‌যন্ত্র করে সমবয়সী আরেকটি রোগা-গোছের ছেলেকে শক্ত কাছি দিয়ে বেঁধে গাছ থেকে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি তখন তারস্বরে সকলকে এই বলে শাসিয়েছিল যে, তাদের ওপর খোদার গজব পড়বে, বলা দেখা দেবে তাদের জীবনে। দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে থাকলেও মুহাম্মদ মুস্তফা রোগা ছেলেটির নির্যাতনে কোনো অংশ নেয় নি, সে দর্শকই ছিল। তবু তার কথায় সে একটি অব্যক্ত ভয়ে হিমশিম খেয়ে যায়, এবং সে-রাতেই একটি বিচিত্র ধারণা দেখা দেয় তার মনে। ধারণাটি এই যে, কালো মাটির দলার মতো নাক-চোখ-মুখ-কান-শূন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গহীন একটি জন্তু গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে গ্রামের জনশূন্য পথেঘাটে ছুটোছুটি করছে কিসের সন্ধানে। সে-বিচিত্র ভয়াবহ নামহীন জন্তুটি বারবার তার মনে দেখা দিয়ে বেশ কিছুদিন তাকে নিপীড়িত করে। কেবল আমাদের ছোট চাচার দ্বিতীয়া বউটির মৃত্যুর পর হয়তো সে নিদারুণ ভীতির কবল থেকে মুক্তি পায়।

ছোট চাচা বদর শেখ অতিশয় অলস প্রকৃতির লোক ছিল। সে আমাদের উত্তর-ঘরের পাশে থাকত, দু-বাড়ির মধ্যে ছিল একটি বেড়া মাত্র। সংসারের কাজকর্মে মন ছিল না, বাপের মৃত্যুর পর ভাগাভাগি করে যে-সামান্য জমিজমা হাতে পেয়েছিল সে-জমিজমা দেখাশুনা করলে পেটে খেয়ে তার নিশ্চিন্তে দিন কাটত, নুন-তেল তো বটেই কখনো-কখনো পোশাক-আশাকের পয়সাও উঠত। তবে জমিজমার চেয়ে তার আলস্যই ছিল বেশি। অন্যান্য লোকেরা যখন রত্তিপ্রমাণ সামান্য জমি থেকেও শুধু ধান নয়, শাকসবজি সর্ষে খেসারি কলাই তুলত, সে তার জমি থেকে যৎসামান্য ধান পেয়েই সন্তুষ্ট থাকত। অন্য বাড়ির ছাদে সোনালি রঙের মস্তমস্ত চালকুমড়া শোভা পেত, তার ঘরের চাল অভাগিনী নারীর হাতের মতো শূন্যতায় ধু-ধু করত। ঈদের দিনে অন্যের ছেলেমেয়েরা রঙদার কাপড় পরে আনন্দে কলরব করত, তার ঘরের দুটি ছেলে ছেঁড়া কাপড় গায়ে কিছু ঈর্ষান্বিত কিছু অবুঝ চোখে সকলের দিকে চেয়ে

থাকত, আনন্দের কারণ বুঝত না। তারপর একদিন সে যে অলস নয় সে-বিষয়ে সকলকে এবং নিঃসন্দেহে নিজেকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই যেন সহসা দ্বিতীয় বার বিয়ে করে বসে। চাচা বদর শেখের বড়-বড় দাঁত ছিল। ক-দিন ধরে সে-দাঁতগুলি অহর্নিশি উন্মুক্ত হয়ে থাকে একটি নির্বোধ হাসিতে। তবে চাচা বদর শেখ একটি অতিশয় রুগ্‌ণা মেয়েকেই স্ত্রী হিসেবে ঘরে এনেছিল। প্রথম ক-দিন টানা-ঘোমটা এবং লজ্জাশরম-রঙমেহেদির জন্যে তা নজরে পড়ে নি, কিন্তু শীঘ্র তার বীভৎসপ্রায় রুগ্‌ণতার কথা সকলে জানতে পায়, ঘোমটার নিচে সবাই দেখতে পায় একটি মিষ্টি কিন্তু রক্তহীন প্রাণহীন মুখ। দেহের হাড়সর্বস্ব শীর্ণতাও আবিষ্কার করতে দেরি হয় না : শুকিয়ে-যাওয়া নদীর মতোই সে-দেহের রূপ। এবং চোখে জীবনের সাধ তখনো মেটে নি, তবে তাতে আজরাইলের ছায়া। নূতন বউ-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে চাচা বদর শেখ বিশেষ চিন্তিত হয় নি, কারণ তার মনে হয় দু-দিন খেয়েদেয়ে গা-এ হাওয়া লাগিয়ে বেড়ালেই বানের পানির মতো তার দেহে স্বাস্থ্য ফিরে আসবে। তবে ধারণাটি ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়, কারণ দিনে-দিনে নূতন বউ-এর অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে। চাচা বদর শেখ তার চিরদিনের আলস্য বর্জন করে কেমন দিশেহারা মানুষের মতো মেয়েটির চিকিৎসা এবং ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে, চাঁদবরণঘাট থেকে ভালো ডাক্তারও ডেকে আনে। সেবার ভালো ফসল হয় নি, বর্ষার আগেই ধান শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন ধান-চাল কিনে চলেছে, আর ধান-চাল কেনার পয়সা নেই। অতএব চাচা বদর শেখকে কাইন্দাপাড়ার দক্ষিণদিকে ডোবা জমিটাও বিক্রি করতে হয়েছিল।

তবে মেয়েটি বাঁচে নি, বিয়ের মাস তিনেক পরে একদিন ঝোড়ো সন্ধ্যায় অশ্রান্ত হাওয়ার গর্জনের মধ্যে সকলের অলক্ষিতে সে তার শেষনিঃশ্বাস ছাড়ে। কেউ তার জন্যে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলে নি। চাচা বদর শেখ তার জন্যে এত কিছু করলেও তার মৃত্যুর পর কেবল অর্ধেক দিন কেমন স্তম্ভিত হয়ে থাকে, তার চোখেও ঈষৎ সজলতা দেখা যায় নি।

তারপর কেউ বলে, ঘরে বলা এসেছিল, সে-বলা দূর হয়েছে। সেদিন থেকেই যেন মাটির দলার মতো বিচিত্র জন্তুটির ছায়া দূর হয় মুহাম্মদ মুস্তফার মন থেকে।

তবারক ভুইঞা বলছিল : স্টিমার-চলাচল কেন বন্ধ হয়েছে—সে-বিষয়ে গণ্যমান্য উকিল কফিলউদ্দিনের ধারণাটি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা আগ্রহভরেই গ্রহণ করে, এবং দেখতে-না-দেখতে যা প্রথমে সত্য বলে মনে হয়েছিল তা অবিশ্বাস্য একটি কথায় পরিণত হয়, যে-চড়া শুধু নদীতে নয়, শহরবাসীদের বুকেও ভার হয়ে জেগে উঠেছিল, সে-চড়া ভার উত্তোলন করে নিমিষে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি লোক নয় অনেক লোক, অনেক লোক নয় গোটা পাড়া, একটি পাড়া নয় সমস্ত শহর যখন একজোট হয়ে কোনো সত্য অস্বীকার করে এবং সে-সত্যের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য কঠিন ব্যূহ সৃষ্টি করে তখন অবরুদ্ধ দুর্গের বাইরে সত্যটি হাওয়ার মতোই নিষ্ফলভাবে গোঙিয়ে ফেরে, প্রবেশের পথ পায় না। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা সহসা আশান্বিত হয়ে ওঠে : যে-প্রতিবাদপত্র ইতিমধ্যে সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে তার ফলে দু-একদিনের মধ্যেই ঘাটে আবার স্টিমার দেখা দেবে।

কিন্তু শীঘ্র প্রথমে কানাঘুষায়, তারপর সুস্পষ্টভাবে স্টিমার না আসার অন্যান্য কারণও শোনা যেতে থাকে। তবে শহরবাসীরা কি উকিল কফিলউদ্দিনের ধারণাটি অন্তরে-অন্তরে গ্রহণ করে নি? অথবা, তা কি তাদের কাছে আইনজ্ঞের যুক্তিতর্কের মতোই ঠেকেছিল যে-যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিচক্ষণ উকিল আদালতে বিপক্ষদলকে পরাভূত করে, কিন্তু যে-সব যুক্তিতর্কের সত্যাসত্য সম্বন্ধে জনসাধারণ কোনো স্পষ্ট ধারণা করতে সক্ষম হয় না? না, তা ঠিক নয়, কুমুরডাঙ্গার জনসাধারণ উকিল কফিলউদ্দিনের ধারণাটি সত্যিই গ্রহণ করেছিল, কেবল কুমুরডাঙ্গার ঘাট থেকে যে-স্টিমার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-স্টিমার ফিরিয়ে আনবার

জন্যে তারা যে-প্রবল অধীরতা বোধ করে সে-অধীরতার জন্য হয়তো তা যথেষ্ট মনে হয় নি; পড়ন্ত দেয়ালকে রক্ষা করার জন্যে একাধিক ঠেস-পোস্তের প্রয়োজন হয়। অতএব স্টিমার না-আসার যে-কারণ উকিল কফিলউদ্দিনের নিকট জানতে পায় তার ওপর অন্যান্য অনেক কারণও তারা আবিষ্কার করে এবং স্টিমার যে শীঘ্র আবার কুমুরডাঙ্গার ঘাটে দেখা দেবে—এমন একটি বিশ্বাস সুনিশ্চিতকণ্ঠে প্রকাশ করতে থাকে নানাপ্রকারের জনশ্রুতির মধ্যে দিয়ে। কেবল কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা স্টিমারকে ফিরিয়ে আনার অধীরতার জন্যে এ-কথা বুঝতে পারে নি যে জনশ্রুতির বহুলতা স্টিমারকে দূরেই রাখছিল, কাছে আনছিল না। হয়তো ততদিনে যা-সত্য তা তাদেরই অজ্ঞাতসারে তারা মেনে নিয়েছিল, কেবল আশা ছাড়তে পারে নি। মানুষের আশা এক স্তরে পৌছাবার পর যুক্তি বা যথার্থতার ধার ধারে না।

কোথায় তার উৎপত্তি কে-বা চালু করে—তা সঠিকভাবে কখনো জানা সম্ভব না হলেও একবার একটি জনশ্রুতি শোনা গেলে বিদ্যুৎগতিতে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকবার শহরবাসীদের মনে গভীর আশার সঞ্চার করে। কখনো তাদের মনে হয় একটি খবর বিশ্বস্ত সূত্রেই জানতে পেরেছে, পরে অনুসন্ধান করে দেখলে বোঝা যায় সে-সূত্রের পশ্চাতে আরেকটি সূত্র যেন, সে-ও আবার কোথায় যেন শুনেছে খবরটি। কখনো একটি খবরের পশ্চাতে কোনো মুখ দেখতে পায় না, দেখতে পায় কেবল একটি স্থান। যেমন স্টিমার দুটি মেরামতের জন্যে গিয়েছে সে-কথা কে বলেছিল সে-বিষয়ে কেউ নিশ্চিত হতে না পারলেও কোথায় শোনা গিয়েছিল তা নিয়ে তর্কের অবকাশ হয় না : খবরটি শোনা গিয়েছিল কাছারি আদালতের সামনে ধুলাচ্ছন্ন নেড়া মাঠের পর অশ্বথ গাছের তলে নিত্য যে-ভিড় বসে সে-ভিড়ের মধ্যে। শুধু সেই ভিড়—কোনো মুখ নজরে পড়ে না, কোনো কণ্ঠও শোনা যায় না। কিন্তু জনশ্রুতিগুলির উৎসসন্ধানে কেউ কালক্ষেপ করে না, যা শোনে তা অবান্তর মনে না হলেই নির্বিবাদে গ্রহণ করে। তাই স্টিমার দুটি মেরামতে গিয়েছে সে-খবর শোনামাত্র অবিলম্বে তা তারা বিশ্বাস করে নেয়। কথটি নেহাৎ যুক্তিযুক্ত : স্টিমার কলের জিনিস হলেও মানুষের দেহের মতোই তা বিগড়ে যেতে পারে। কতদিন ধরে স্টিমার দুটি এ-পথে আসা যাওয়া করেছে, একদিনের জন্যে না থেমে একটু বিশ্রাম না করে। তবে যারা এই নিশ্চিত বিশ্বাসে অপেক্ষা করতে শুরু করে যে মেরামত শেষ হলেই বংশীধ্বনি করে পূর্বের মতো স্টিমার দুটি ঘাটে এসে উপস্থিত হবে, তাদের বিশ্বাসটি তাদেরই অজান্তে কখন অন্য একটি বিশ্বাসে স্থানান্তরিত হয়; যে-জনশ্রুতির কোথাও কোনো ভিত্তি নেই সে-জনশ্রুতি হাওয়া-তাড়িত মেঘের মতো সদাচঞ্চল, এ-মুহূর্তে এখানে আছে অন্য মুহূর্তে নেই, যা ঘনঘটার রূপ ধারণ করে তা আবার দেখতে-না-দেখতে শূন্য নীলাকাশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবার যে-জনশ্রুতি তাদের বিশ্বাসে শিকড় গাড়ে, তা সর্বপ্রথম চড়ার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে। তবে চড়ার অস্তিত্ব গ্রহণ করলেও সেটি তাদের মনে দুরতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকের রূপ গ্রহণ করে না। তারা বলে, চড়া পড়েছে কথাটা সত্য এবং সে-জন্যেই ঘাটটি বর্তমান স্থান থেকে সরিয়ে শহরের উত্তরদিকে একটি নূতন স্থানে বসানো হবে, কেবল যতদিন পর্যন্ত ঘাটটি সেখানে সরানো না হয় ততদিন পর্যন্ত স্টিমার-চলাচল বন্ধ থাকবে। এ-জনশ্রুতির উদ্ভাবক চড়াটি বর্তমান ঘাটের সামনেই দেখতে পায়। তাই-বা কী করে অবিশ্বাস করা যায়? শহরের বৃদ্ধদের এখনো স্মরণ আছে, কুমুরডাঙ্গায় ঘাট স্থাপিত হবার কয়েক বছরের মধ্যে সে-ঘাট তিনটে বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। প্রথমে কাছারি-আদালতের সামনে ঘাটটি বসানো হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় উকিল কফিলউদ্দিনের বর্তমান বাড়ির কিছু দক্ষিণে। সেখানেও ঘাটটি বেশিদিন টিকে থাকে নি, বছর দুই-তিনেক পরে আবার স্থানচ্যুত হয় সেখান থেকে। তবে তারপর থেকে ঘাটটি আর নড়ে নি, সে-সময়ে ঘাটে ফ্ল্যাটটিরও প্রবর্তন হয়।

নূতন হাওয়া এসে এই জনশ্রুতিও যথাসময়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পশ্চাতে কোনো

আক্ষেপ-আফসোস না রেখে। এবার যে-জনশ্রুতি ওঠে সেটি পূর্ববর্তী জনশ্রুতির একটি পরিবর্তিত সংস্করণ বলে মনে হয়, এবং এটাও চড়ার অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে না। এবার তারা বলে, হ্যাঁ, চড়াটা বেশ বড় রকমেই পড়েছে যে-জন্যে এ-পথে স্টিমারের চলাচল আর সম্ভব নয়, তবে এবার স্টিমারের পরিবর্তে লঞ্চের প্রচলন করা হবে। এ-জনশ্রুতিটাও কেউ অবিশ্বাস করে না।

এ-সব জনশ্রুতি যেমন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের কল্পনাশক্তি বা উদ্ভাবনক্ষমতার পরিচয় দেয় তেমনি তাদের চারিত্রিক সরলতাও প্রকাশ করে, কারণ সরলচিত্ত মানুষের পক্ষেই সে-ধরনের জনশ্রুতি এমন সোৎসাহে এবং গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করা সম্ভব। তবে মনের অতলে সত্য কথাটি থেকে-থেকে উঁকি দিতে চেষ্টা না করলে তাদের কল্পনাশক্তি বা উদ্ভাবনক্ষমতা কি এমন তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেত বা সরলচিত্ত বিশ্বাস এমন গভীর রূপ ধারণ করত? হয়তো নিরাশা-ঢাকা তাদের কাছে নিতান্ত দুরূহ মনে হয়েছিল বলেই তাদের আশা এমন উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এবং সে-জন্যেই হয়তো নানারকমের জনশ্রুতির উদ্ভাবন বা সে-সব জনশ্রুতির বিতরণের মধ্যে কোনো চপলতাও দেখা যায় নি, সে-সব অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গেই তারা গ্রহণ করে। অতএব কোনো জনশ্রুতির ওপর সমস্ত বিশ্বাস স্থাপন করে একটি লোক যদি হাস্যকর কাণ্ড করে বসে তাতে কেউ উপহাসের কিছু দেখতে পায় নি। একদিন বারো বছরের মৃতপ্রায় ছেলেকে কোলে নিয়ে মোক্তার হাবু মিঞা ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টিমারঘাট অভিমুখে রওনা হলে এবং শীঘ্র তাকে অনুসরণ করে অনেক লোক পথে বেরুলে কেউ আমোদিত বোধ করে নি বা হাসে নি—তখনো নয় যখন সমস্ত ব্যাপারটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা জানতে পায়। সকালে হাবু মিঞা নদীতীর থেকে মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল। পথে রতনলাল মুহুরির ছেলে তাকে বলে, খবর এসেছে স্টিমার আজই আসবে। হাবু মিঞা কথাটি বিশ্বাস করে নি। স্টিমার নিশ্চয়ই আসবে, তবে আসতে আরো দিন কয়েক সময় নেবে। স্টিমারের কথা ভুলে গিয়ে দুপুরের দিকে দলিলপত্র নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে এমন সময় সহসা সে সুপরিচিত বংশীধ্বনিটি শুনতে পায়। চমকিত হয়ে সে কান খাড়া করে। না, কানের ভুল নয়, স্টিমারেরই বংশীধ্বনি। এখনো দূরে, তবে স্টিমারটি যেন স্রোতে ভেসে আসছে, বংশীধ্বনিটিও ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারপর কীভাবে সে দৌড়ে বাড়ি গিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে ঘাটে পৌঁছেছিল তা নিজেও বলতে পারবে না।

না, স্টিমার যে শীঘ্র কুমুরডাঙ্গায় ফিরে আসবে তাদের সে-বিশ্বাসের কারণ যা-ই হোক তাতে ফাঁক-ছিদ্র ছিল না, থাকলে সেদিন যারা স্টিমার ধরতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছিল তারা দু-একদিন অপেক্ষা করে যাওয়ার একটা উপায়ের সন্ধান করত—ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা না হলেও অন্ততপক্ষে তারা, যাদের জন্যে যাওয়াটা একান্ত জরুরি। যাওয়ার যে অন্য উপায় রয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই ততদিনে অনেক নৌকা ঘাটে এসে মোতায়েনও হয়েছিল। সে-সব নৌকা রাতারাতি চলে এসেছিল নদী পাড়ি দিয়ে, খাল-বিল অতিক্রম করে, পাল তুলে দাঁড় বেয়ে লগি ঠেলে। কত রকমের নৌকা : ছোট-বড়, ঢঙের-বেঢঙের, এমন নৌকা যা ত্রিশ-চল্লিশজন সোয়ারি নিয়ে নির্ভয়ে পদ্মা-মেঘনা পার হয়ে যেতে পারে ঝড়-তুফান উপেক্ষা করে, আবার তেমন নৌকাও যাতে খাল অতিক্রম করতে ভরসা হয় না; কোনো নৌকা হয়তো পানিতে কাৎ হয়ে ছিল, তাকে তুলে তার গা-এ গাব ঘষে কোনোপ্রকারে ভাসিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, আবার কোনো নৌকা বেশ শক্ত মজবুত, আয়তনেও বড় কিন্তু যা ব্যবসাজীবন্ত লঞ্চ-স্টিমার-নৌকায় সমাকীর্ণ জনসঙ্কুল কোনো ঘাটে-গঞ্জে তীক্ষ্ণ প্রতিযোগিতার দরুণ নিষ্ফল আশায়ই দিন কাটাত। সক্ষম-অক্ষম নৌকার মধ্যে আবার বেমানান নৌকাও কম ছিল না—যে-সব নৌকাদের লালসাই টেনে নিয়ে এসে থাকবে : ঘাস-নৌকা, কুমোর-নৌকা, জন্তুজানোয়ারের নৌকা। তাছাড়া দু-টি বজরাও এসে দলে যোগ দিয়েছিল যার

একটিতে হয়তো অন্য কোনো যুগে শৌখিন লোকেরা বাঈজি-গাইয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমোদবিহারে বের হত। এখন তার রঙ নেই, খড়খড়ির অভাবে একটি জানালা খাঁ খাঁ করে, জোড়াতালি-দেয়া দেহটাও কেমন সৌষ্ঠবহীন। তবে অন্যটি ছোটখাটো ছিপছিপে, গায়ের রঙটাও তাজা। সেটি শ্রী-যৌবনের গরিমায় কিছুটা উদ্ধতভাবে অন্য বজরা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করে।

রাতারাতি সমাগত এ-সব নৌকা-বজরা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের হয়তো শকুনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যে-শকুন সদলবলে এসে মরণোন্মুখ জন্তুর চতুর্দিকে জমা হয়ে তার শেষ-নিঃশ্বাসের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। তবে তারা বিচলিত হয় না। তাদের মনে হয়, শকুন যা জানে নৌকার মাঝিরা তা জানে না : নৌকার মাঝিরা জানে না কুমুরডাঙ্গার ঘাটে স্টিমার ফিরে আসবে।

কিছুদিন আগেও মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুনকে তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তার স্বামীর নাম ছিল খেদমতুল্লা। কখনো সে খেদমতুল্লা শেখ, কখনো-বা কোনো কারণে মুন্সী খেদমতুল্লা বলে নিজের নাম-পরিচয় দিত। তবে আমরা উত্তর-ঘরের ছেলেরা তাকে খেদুচাচা বলে সম্বোধন করতাম।

চাচী আমেনা খাতুনকে খেদুচাচার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই আশায় যে তার সম্বন্ধে বিধবা স্ত্রীর কাছে এমন কিছু শুনতে পাব যা আগে কখনো শুনি নি।

আমেনা খাতুন মধ্যে-মধ্যে তার প্রথম স্বামী আফজল শেখের কথা বলে থাকে যদিও প্রথম স্বামীর স্মৃতিটা আজ তার মনে তেমন উজ্জ্বল নয়। বস্তুত তার নাম নিয়ে যে-সৌম্য চেহারার লম্বা-চওড়া মানুষের দৈহিক আকৃতি বা অশেষ চারিত্রিক গুণের বর্ণনা দেয় সে-মানুষ নিতান্ত কল্পনাপ্রসূত, যার সঙ্গে আসল মানুষটির সাদৃশ্য নেই বললে চলে। সেটা হয়তো অস্বাভাবিক নয়। আফজল শেখের যখন বিয়ে হয় তখন আমেনা খাতুন বালিকামাত্র। তাদের দাম্পত্যজীবনও স্থায়ী হয় নি, কারণ বিয়ের মাস পাঁচেক পরে বসন্তরোগে আফজল শেখের মৃত্যু ঘটে। তবে যে-মানুষের সঙ্গে দীর্ঘ পনেরো বছর বসবাস করেছে সে-মানুষের কথা আমেনা খাতুন কদাচিৎই বলে থাকে। হয়তো মানুষটি এখনো তাকে বিহ্বল করে, হয়তো তার সঙ্গে পনেরো বছরের বসবাসের স্মৃতিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তার সাহস হয় না।

খেদমতুল্লার নাম শুনে আমেনা খাতুন কয়েকমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে ছিল, চোখে ক্ষণকালের জন্যে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছিল। আমেনা খাতুনের চোখ বড়, যাকে এক সময়ে লোকেরা ডাগর-চোখ বলত। তবে অনেকদিন হল তার চোখের মৃত্যু ঘটে গিয়েছে। আমেনা খাতুন চোখ বোজে চোখ খোলে, তার দৃষ্টি এধার-ওধার যায় নড়ে-চড়ে, কিন্তু অন্ধের মতো জ্যোতিহীন সে-চোখে প্রাণের ক্ষীণতম স্পর্শও নেই। আরো মনে হয়, সে-চোখে দশজনের মতো দেখতেও পায় না যদিও তাতে ছানি নেই দুর্বলতা নেই। তাই সে-চোখে সহসা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আশান্বিত হয়েছিলাম। আমেনা খাতুনের পক্ষে মানুষের আচরণ-ব্যবহারের অর্থ বা তার জীবন-উদ্দেশ্য বোঝা সহজ নয়। কিন্তু সহসা সে কি তার দ্বিতীয় স্বামী খেদমতুল্লার আচরণ-ব্যবহারের অর্থ বা তার জীবন-উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে?

আমেনা খাতুনের চোখ শীঘ্র আবার নিথর নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, সে কিছু বলেও নি।

প্রথম স্বামী আফজল শেখের মৃত্যুর পর আমেনা খাতুন শ্বশুরালয়ে কিছুদিন অনাদরে কাটিয়ে সামান্য মনোমালিন্য ঝগড়া-ফ্যাসাদের পর সে-বাড়ির সঙ্গে চিরদিনের জন্যে যোগাযোগ ছিন্ন করে বাপের ভিটেয় ফিরে এলে দিন-কয়েকের মধ্যেই গ্রামের ব্যস্তবাগীশ চিরউৎফুল্ল যুবক খেদমতুল্লার দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। অস্থির প্রকৃতির হলেও প্রাণবন্ত সজীবতা এবং অফুরন্ত রসিকতার জন্যে খেদমতুল্লা তখন সকলের প্রিয়পাত্র। অল্প বয়স থেকে নানাদিকে তার মন, এটা ওটা হবার সখের অন্ত নেই, হবার হয়তো ক্ষমতাও ছিল। গাইয়েদের সঙ্গে ধুয়া

ধরা, কবিওয়ালাদের সঙ্গে ছন্দ মেলানো, ফকির-দরবেশের গন্ধে দেশান্তর হওয়া, আবার ঝোঁক উঠলে চরে গিয়ে লাঠিবাজি করা—কিছুই তার অতীত ছিল না। তারপর সহসা ব্যবসার দিকে তার মন ছোটে। মুখে দাড়িগোঁফ ভালো করে গজাবার আগেই সে সুপারি চালান হতে শুরু করে নৌকা-খাটানো পর্যন্ত নানাপ্রকার ব্যবসায় হাত মক্স করে নিয়েছিল। তবে কোনো ব্যবসায়েই এ-সময়ে কপাল লাগে নি। সে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে আমেনা খাতুনের মুরুব্বির কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় তখন পানের ব্যবসায়ে অকৃতকার্য হয়ে শূন্যহাতে, হয়তো সাময়িকভাবে উজ্জ্বল কোনো পরিকল্পনার অভাবে, ঘরে বসে। তবু সে-প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি কেউ দেখতে পায় নি; বরঞ্চ আত্মীয়স্বজন, মুরুব্বিরা এবং গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সবাই সেটি এককণ্ঠে সমর্থন করে। আমেনা খাতুনের অল্পবয়সে বৈধব্যদশা, ওদিকে ব্যবসায়ে বদনছিবের বদনাম ছাড়া খেদমতুল্লার নাম নিষ্কলঙ্ক। বিয়ের বছরখানেক পরে মুহাম্মদ মুস্তফার জন্ম হয়। তখনো খেদমতুল্লা কোনো ব্যবসায়ে সার্থক হয় নি। সংসারে অনটন, বস্তুত খাদ্যবস্ত্র উভয়েরই কষ্ট। তবু সে-সব কষ্ট নিত্য-হাসিমুখ স্নেহশীল স্বামীর সাহচর্যে আমেনা খাতুন অম্লানবদনেই সহ্য করেছে।

বছর কয়েক পরে হঠাৎ খেদমতুল্লার কপাল খোলে। তখন কাপড়ের কল সস্তা কিন্তু শৌখিন ঢঙের নূতন শাড়ি বাজারে ছেড়েছে। হাটে-বাজারে দু'চারটা শাড়ি বিক্রি করতে শুরু করে দেখতে-না-দেখতে সারা অঞ্চলে কলের কাপড়ের বড় রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসে, তারপর হাতে বেশ পয়সা হলে তিন ক্রোশ দূরে চাঁদবরণঘাটে বাড়ি করে সেখানে সপরিবারে বাসস্থান স্থানান্তরিত করে; সহসা খেদমতুল্লার জীবনে সুদিন দেখা দেয়। কেবল সে-সুদিন স্থায়ী হয় নি।

তখন সে-অঞ্চলে মাড়োয়ারিদের বড় প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাদেরই একজনের দৃষ্টি পড়ে খেদমতুল্লা এবং তার হঠাৎ প্রস্ফুটিত লাভজনক ব্যবসার ওপর এবং বেড়াল যেমন তার নাকের তলেই লম্ফঝম্ফ করতে-থাকা ইঁদুরছানা দেখে যুগপৎ বিস্মিত-আমোদিত বোধ করে তেমনি খেদমতুল্লা এবং তার ব্যবসাটির ওপর নজর পড়লে সে-মাড়োয়ারিও বিস্মিত-আমোদিত বোধ করে থাকে। তারপর আকস্মিকভাবে থাবা নেবে আসে। অতর্কিতভাবে ব্যবসাটি হারিয়ে খেদমতুল্লা হয়তো জীবনে প্রথম একটি গভীর আঘাত বোধ করে, ন্যায়বিচারহীন নিষ্ঠুরতার বিষয়েও সজ্ঞান হয়। কিছুদিন পরে সহসা একটি পরিবর্তন দেখা দেয় তার মধ্যে। প্রথমে কেমন সংসার-পরিবার বিষয়ে উদাসীন হয়ে ওঠে, তারপর ক্রমশ গোপনকারী হয়ে পড়ে। মাস কয়েকের মধ্যে সে রহস্যময় ব্যবসাটিও ধরে। আস্তে-আস্তে সাক্ষী হিসেবে আদালতে তার হাজিরা শুরু হয়ে শীঘ্র সেটি একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। প্রথমে মহকুমার কাছারি-আদালতে, তারপর জেলা-সদরে, পরে আরো দূরে প্রদেশের রাজধানীতেও তার যাতায়াত হতে থাকে। ন্যায়-সুবিচারের মতো উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই এ-মামলায় সে-মামলায় সাক্ষী দিতে শুরু করে নি—সে-কথা একদিন কারো অগোচর থাকে না, বিশেষ করে যখন নানা নির্দোষ পরিবারের ধ্বংসের, পরম দুঃখের এবং অপমান-লাঞ্ছনার কথা প্রচারিত হতে শুরু হয়। তবে তাতে সে দমে নি; একবার শঠতাকে পেশা বলে গ্রহণ করার পর শঠতার অপবাদকে ভয় করলে চলে না। নূতন ব্যবসাটি বিপদজনক হলেও অতিশয় লাভজনক : শঠতা ফলবতী হচ্ছে এ-জ্ঞানে সে গভীর তৃপ্তি লাভ করে। কেবল তৃপ্তিটা কেমন বিচিত্র যেন, কেমন বিষময়ও, কারণ সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে উপভোগ করা সে-তৃপ্তিই তার অন্তরকে বিষমভাবে বিকৃত করে তোলে। ক্রমশ তার চরিত্র থেকে সর্বপ্রকার মনুষ্যত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সে-সবের স্থান নেয় হিংস্রতা, কুটিলতা, হাসি-আনন্দশূন্য উৎকট ধরনের একরোখা ভাব, মানুষের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস এবং অকথ্য কৃপণতা।

অকস্মাৎ কোনো কারণে ভীত হয়ে শেষবারের মতো এক ধনী মানুষের মামলায় দাঁও মেরে বিপদজনক অসৎ ব্যবসাটি ছেড়ে এবার সে পাটের ব্যবসা ধরে। তবে তার চরিত্রের

আর পরিবর্তন হয় না : সে-চরিত্র যেন চিরকালের জন্যে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, স্নেহমমতার কাছ থেকেও চিরবিদায় নিয়েছিল। এ-সময়ে বাঁদি রাখার সখও চাপে তার এবং দ্বিতীয় বার বিয়ে না করে নূতন নূতন যুবতী বাঁদির আমদানি করতে শুরু করে এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে। বাঁদির বসবাসের জন্যে উঠানের পেছনে একটি আলাদা ঘর তুলে নেয়।

পরিবারের প্রতি নিষ্ঠুরতা দেখা দেয় তার মধ্যে চারিত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গেই। আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও অকথ্য কৃপণতার জন্যে স্ত্রী-পুত্রকে কিছু দিতে হাত উঠত না, কী-একটা দুর্বোধ্য হিংস্রতার তাড়নায় কারণে-অকারণে তাদের মারত-ধরতও। খেদমতুল্লার বিশেষ শাস্তিবিধান ছিল কনুই মারা। সে-শাস্তির উপকারিতায় তার অখণ্ড বিশ্বাস জন্মেছিল বলে কনুই মারার কৌশলটি সযত্নে করায়ত্ত করেছিল, হাতবাহু একত্র করে কনুইটা বিদ্যুৎবেগে পিঠে বসিয়ে দিলে তার ক্রোধের পাত্র নিমেষেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। মুছল্লি মানুষের কপালে যেমন গাট্টা পড়ে তেমনি তার কনুইতে গাট্টা পড়েছিল।

সচরাচর মুহাম্মদ মুস্তফার পিঠেই সে-ভীষণ শাস্তিটা নেবে আসত। মুহাম্মদ মুস্তফা নীরবে সহ্য করত সে-শাস্তি এবং বাপের অন্তরে কোথাও পিতৃসুলভ স্নেহমমতা না থেকে পারে না, যা করছে তা অতিশয় নিষ্ঠুর হলেও ছেলের ভালোর জন্যেই করছে—এ-সব যুক্তির ওপর সমস্ত বিশ্বাস ন্যস্ত করে তার মা আমেনা খাতুনও চোখ-কান বুজে সহ্য করত। তবে একদিন হয়তো ব্যাপারটি তার সহ্যাতীত হয়ে পড়ে।

অনেক রাত করে জেলাশহর থেকে ফিরে খেদমতুল্লা দেখতে পায় মুহম্মদ মুস্তফা পেছনের বারান্দায় অন্ধকারের মধ্যে বজ্রাহত মানুষের মতো দাঁড়িয়ে। তখন মুহাম্মদ মুস্তফার বয়স তেরো হবে। বাপকে দেখেও সে না নড়ে পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে থাকলে খেদমতুল্লা এবার রুষ্ট কণ্ঠে তার আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কোনো উত্তর পায় না। বিস্মিত হয়ে ছেলের নিকটে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকায়, ছেলেও তাকায় তার দিকে ভীত হয়ে। তবে সেদিন শীঘ্র তার ভয় কাটে, কারণ তার মনে হয় সে যেন তার বাপের চোখে ক্রোধ নয়, কেমন স্নেহসূচক উৎকণ্ঠাই দেখতে পেয়েছে। কল্পিত বা সত্য সে-স্নেহের আভাস বালককে পরাভূত করে।

"লুঙ্গি ভিজে গিয়েছে", এবার মুহাম্মদ মুস্তফা উত্তর দেয়।

কথাটি বুঝতে দেখমতুল্লার কিছু সময় লাগে। কিন্তু তারপর বিদ্যুৎঝলকের মতো তার অর্থ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে পড়ে। সে বুঝতে পারে, বালক মুহাম্মদ মুস্তফা আর বালক নয়, সে তার জীবনের একটি নূতন অধ্যায় শুরু করেছে। তবে খেদমতুল্লা কেবল সে-কথাই বুঝতে সক্ষম হয়, অজ্ঞানতার জন্যে এবং ঘটনাটির আকস্মিকতার জন্যে বালক মুহাম্মদ মুস্তফা যে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়ে থাকবে, এ-সময়ে সে যে সমবেদনার প্রয়োজন বোধ করতে পারে বা জীবনবিষয়ে অভিজ্ঞ আপনজনদের কাছে তার রহস্যসময় আবিষ্কারের গূঢ় অর্থ জানবার জন্যে গভীর ব্যাকুলতা অনুভব করতে পারে—এ-সব কথা অতর্কিতে জাগ্রত নিদারুণ ক্রোধের জন্যে বুঝতে পারে নি, বুঝবার ক্ষমতাও হয়তো তার ছিল না। নিমেষে একটি সর্বনাশী ক্রোধ খেদমতুল্লাকে গ্রাস করে, কারণ ঘটনাটিতে একটি ভয়ানক পাপ ও অকথ্য কলুষতাই সে দেখতে পায়; বালক-ছেলে তার ক্রোধান্ধ দৃষ্টিতে একটি দুশ্চরিত্র লম্পটের রূপ গ্রহণ করে।

সে-রাতে খেদমতুল্লা ছেলেকে কনুই মারে নি; ঐ নির্মম শাস্তিটিও সে-রাতে তার কাছে হয়তো যথেষ্ট মনে হয় নি। প্রথমে ছেলেকে উঠানে টেনে নিয়ে গিয়ে একটি শক্ত বাঁশ দিয়ে তার দেহের পশ্চাদভাগে মত্ত ক্রোধপ্রসূত প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যে অবিশ্রান্তভাবে প্রহার করে, তারপর কতক্ষণ উন্মত্ত মানুষের মতো অত্রযত্র লাথি মারে। মুহাম্মদ মুস্তফা একটি শব্দ করে নি। তার রহস্যময় অভিজ্ঞতা, তারপর তারাখচিত আকাশের তলে এই নির্দয় প্রহার—সবই তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়ে থাকবে। তার পক্ষে বেশি ভাবাও সম্ভব হয় নি, কারণ বাপের লাথিতে এক সময়ে সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। বাপও এ-সময়ে থামে, সংজ্ঞাহীন ছেলেকে উঠানে ফেলে সে ঘরে উঠে আসে। তবে ফিরে আসতে তার দেরি হয় নি, নূতন এক ক্রোধের

ঢেউ এসে তাকে আচ্ছন্ন করলে সে আবার ক্ষিপ্ত মানুষের মতো বেরিয়ে আসে।

বাকিটা আমেনা খাতুন দেখে নি। খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে সে অন্ধের মতো হাঁটতে শুরু করে অন্ধকার রাত্রির মধ্যে দিয়ে, চোখ অশ্রুহীন, তবে সর্বাঙ্গে অদম্য কম্পন। কোথায় যাচ্ছে সে-বিষয়ে ধারণা নেই, সে চলতেই থাকে। এক সময়ে সহসা কোথেকে একটি পরী এসে উপস্থিত হয়। পরীটি সস্নেহে তার হাত চেপে ধরে, তারপর তাকে নিয়ে একটি গাছের তলে বসে সুমিষ্ট কণ্ঠে তার সঙ্গে কথালাপ করে। বস্তুত দু-জনে অন্তরঙ্গ সখীর মতো গল্পগুজব করে আনন্দেই সময় কাটায়। কেবল খেদমতুল্লা যখন লণ্ঠন নিয়ে গাছের নিচে হাজির হয় তখন সে পরীটিকে দেখতে পায় নি, স্বামীকেও চিনতে তার কষ্ট হয়েছিল।

শত চারিত্রিক অবনতি, নিষ্ঠুরতা এবং পরিবারের প্রতি গভীর উদাসীনতা সত্ত্বেও একটি ব্যাপারে খেদমতুল্লা কখনো সংকল্পবিচ্যুত হয় নি। সংকল্পটি এই যে মুহাম্মদ মুস্তফাকে উচ্চশিক্ষা দেবে। সে নিজে প্রায় অশিক্ষিত ছিল। কাজেই শিক্ষা বস্তুটি কী, বিদ্যার্জনের দীর্ঘ পথের জন্যে কী পাথেয় সামগ্রীর প্রয়োজন—সে-সব বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যা সে পরিষ্কারভাবে বুঝত বা দেখতে পেত, তা সার্থক শিক্ষার ফলাফল, বিদ্যার্জনের পুরস্কার। সে স্থির করেছিল, ছেলে বড় হয়ে উকিল হবে। জজ-হাকিম নয়, উকিল হবে—সেটাই ছিল তার স্বপ্ন। জজ-হাকিমের মান-সম্মান নয়, উকিলের আইন নিয়ে খেলা করার সুযোগই তাকে অধিকতর আকৃষ্ট করত। তার মনে হত, ওকালতিতে মানুষ যতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে জজিয়তি-হাকিমিতে ততটা পারে না; জজ-হাকিম শুধু দিনকে দিন রাতকে রাত প্রমাণ করে, উকিল দিনকে রাত রাতকে দিন করার ক্ষমতা রাখে।

ছেলে উকিল হবে একবার স্থির করলে সে অধৈর্য হয়ে পড়ে; সে ভাবত তাড়াহুড়া করলেই দীর্ঘ পথ সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, সময়কে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে। সে আরো ভাবত, প্রহার দ্বারাই স্মৃতিশক্তির অভাব মেটানো যায়, দৈহিক মানসিক শ্রান্তি দূর করা যায় অতি শ্রমের সাহায্যে। বস্তুত তার ভাবটি ছিল অনেকটা নির্বোধ গাড়োয়ানের মতো, যে-গাড়োয়ান শ্রান্তক্লান্ত মৃতপ্রায় জানোয়ারকে কেবল অঙ্কুশাঘাতেই গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

তবারক ভুইঞা বলে : সেদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হতেই উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব কেমন উৎফুল্ল বোধ করে, কারণ তার কেমন মনে হয় প্রতিবাদপত্রটি কার্যকর হয়েছে, সরকার প্রথমে স্টিমার-কোম্পানির পক্ষ নিলেও অবশেষে বুঝতে পেরেছে এমন দিনে-দুপুরে ডাকাতি ঢাকা যায় না, সমর্থন করাও যায় না।

ততদিনে উকিল সাহেবও কিছু নমনীয়তা দেখিয়েছে; দুনিয়াতে বাস করতে হলে সমঝোতা করতে হয়, নিতে হলে দিতে হয়। সে চড়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। যা-স্বীকার করে নি তা এই যে সে-চড়ার জন্যে স্টিমার-চলাচল বন্ধ করা প্রয়োজন। স্টিমারঘাট সম্বন্ধে যে-সব জনশ্রুতি তার কানে এসে পৌঁছায় তাতে তাই প্রথমে নারাজ না হয়ে পারে নি: কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা কী দুর্বলতা দেখাতে শুরু করেছে? তারা দুর্বল হয়ে পড়লে একা কী করে লড়াই করবে, কাদের জন্যেই-বা লড়াই করবে? তবে সে আশ্বস্ত হয় এই দেখে যে সে-সব জনশ্রুতি যে-রকম রূপ ধারণ করুক না কেন কেউ আর বিশ্বাস করে না স্টিমারঘাট স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। যারা এমন মত প্রকাশ করে তাদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে দ্বিধা করে নি উকিল সাহেব। দুদিন ধরে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের সঙ্গে কথা বন্ধ; ডাক্তারের এখনো যেন বিশ্বাস, কোম্পানি লাচার হয়ে স্টিমার তুলে দিয়েছে। গত পরশুদিন বড় হাকিমের সঙ্গে বেশ উঁচুগলায় কথা বলেছে; বড় হাকিম কোম্পানির সাফাই গাইবার চেষ্টা করেছিল। তার মেজাজটা তখুনি গরম হয়ে ওঠে। সে বলে, চড়া পড়ে নি তেমন কথা সে কোনোদিন দাবি করে নি, শুধু বলেছে সে-চড়া পাশ কাটিয়ে স্টিমার বেশ দিব্যি নির্বিঘ্নে

আসা-যাওয়া করতে পারে এবং কিছু যদি স্টিমারের আসা-যাওয়া বন্ধ করে থাকে তা বালির চড়া নয়, অর্থলালসার চড়া : সে-চড়াই একটি শহরের সুখ-সুবিধা দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে মস্ত প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করেছে।

নিত্যকার মতো সেদিন উকিল কফিলউদ্দিন যখন কয়েকজন মক্কেলের সাথে কাছারি-আদালত অভিমুখে রওনা হয় তখনো সে মনে-মনে উৎফুল্ল বোধ করে, কেবল তা মুখের থমথমে ভাবের তলে আত্মগোপন করে থাকে; বুকে শোকব্যথা বোধ না করলেও সে সর্বসমক্ষে কৃত্রিম অশ্রুসম্পাত করতে সদা প্রস্তুত, কিন্তু কোনো কারণে ভেতরে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হলেও তা প্রকাশ করতে তার দ্বিধা হয়। যা বিরল তা অতি মূল্যবান : তা দেখাতে সঙ্কোচ হয়।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর উকিল কফিলউদ্দিনের আরেকটি খেয়াল হয় যাতে তার মনের উৎফুল্লভাবটা আরো বেড়ে যায় যেন। খেয়ালটা এই যে, প্রতিবাদপত্রটি কার্যকর হয়েছে শুধু তাই নয়, দু-চারদিনের মধ্যেই স্টিমার কুমুরডাঙ্গায় ফিরে আসবে। এমন খেয়ালের যুক্তি-যথার্থতা কী, কীই-বা ভিত্তি? তা বলতে পারবে না, তবে সে জানে এমনভাবে যে-সব খেয়াল মাথায় আসে তা কদাচিৎই ভুল হয়। জীবনে এমনটা অনেকবার হয়েছে : কিছু ঘটবার আগেই কী করে জানতে পেয়েছে তা ঘটবে। তার যেন কী-একটা অদ্ভুত ক্ষমতা, ভবিষ্যতের কথা কী করে জানতে পায় সে। মাসখানেক আগে একদিন হঠাৎ তার খেয়াল হয়, কে যেন আসবে। কারো আসার কথা ছিল না, খেয়ালটি তাই অহেতুক মনে হয়, কিন্তু পরদিন মুটের মাথায় বিছানাপত্র চাপিয়ে তার স্ত্রীর ছোট ভাই আশেক মিঞা অপ্রত্যাশিতভাবে দোরগোড়ায় দেখা দেয়। অপ্রত্যাশিতভাবে অন্যের জন্যে, তার জন্যে নয়। সেদিন স্টিমার ধরতে গিয়েছিল মেয়ে হোসনার সম্বন্ধে মনে কেমন একটা খেয়াল জেগেছিল বলেই। যেতে না পারলে জামাইর কাছে তার পাঠিয়েছিল : কোনো খবর নেই বলে সে চিন্তিত। পরদিন উত্তর পায়, হোসনার সামান্য সর্দি-কাশি হয়েছে, তাছাড়া সব ভালো, চিন্তার কোনো কারণ নেই। মনে-মনে সে বড় তৃপ্ত হয়েছিল এই বুঝে যে তার এমনই ক্ষমতা যে মেয়ের একটু সর্দি-কাশি হলেও কী করে সে খবর পেয়ে যায়।

হঠাৎ পেছনের দিকে অর্ধেক মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করে,

"আজ বিষ্যুৎবার নাকি?"

"হ্যা, আজ বিষ্যুৎবার।" দুটি লোক সমস্বরে বলে ওঠে।

প্রশ্নটি কেন জিজ্ঞাসা করে তার আভাস না দিয়ে সে নীরবে হাঁটতে থাকে। তবে ততক্ষণে সে দিনটা ঠিক করে নিয়েছে : স্টিমার আসবে শনিবার। মন যেন তাই বলছে। তাই যদি হয় তবে রবিবারই সে সদর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়বে। মেয়ে হোসনা সম্বন্ধে মনে আবার কোনো দুশ্চিন্তা দেখা দেয় তা নয়, তবে হঠাৎ তাকে দেখবার জন্যে কেমন অধীরতা বোধ করতে শুরু করে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটির চেহারাও সুস্পষ্টভাবে জেগে ওঠে তার মনশ্চক্ষে। হোসনা চোখের সামনে না থাকলে তার যে-চেহারাটি সে দেখতে পায় তা তার বালিকাবয়সের চেহারা, যেন বাপের চোখে মেয়েটি বড় হয়ে যুবতীতে পরিণত হবার অবকাশ পায় নি, তার বিয়ে হয় নি, একটি ছেলের মাও হয় নি সে। কখনো-কখনো মেয়েটি চোখের সামনে থাকলেও উকিল সাহেব তার বেশ কয়েক বছর আগের চেহারাটিই দেখতে পায় : কোঁকড়ানো চুলের মধ্যে মিষ্টি একটি মুখ, বড় বড় চোখে দাম্ভিকতার ভাব। তখন তার বয়স সাত-আট। সে-বয়সেই মেজাজটা বেশ উগ্রধরনের হয়ে উঠেছিল, কিছু চেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে না পেলে বা কোনো শখ আবদার তৎক্ষণাৎ না মেটালে চোখ কালো হয়ে উঠত ঠোঁট ফুলে উঠত। গোপনে-গোপনে স্ত্রীকে বলত, মেয়েটির মেজাজ শাহজাদির মতো। স্ত্রী উত্তর দিত, বাদশাহ কোথায় যে শাহজাদি হবে? মনে মনে সে উত্তর দিত : কুমুরডাঙ্গার বাদশাহ সে, সে বাদশাহের মেয়ে হল হোসনা।

"আজ বিষ্যুৎবার?" আবার উকিল সাহেব প্রশ্ন করে, যেন সেবার উত্তরটি শুনতে পায় নি।

এবার পশ্চাৎ থেকে চারটি লোক বেশ জোরগলায় বলে,

"হ্যাঁ, আজ বিষ্যুৎবারই উকিল সাহেব।"

তবে মধ্যে একটি মাত্র দিন, তারপর স্টিমার আসবে। এবং দুটি দিন—আজকার এবং সদর অভিমুখে রওনা হওয়ার মধ্যে। একবার তার ইচ্ছা হয় কেন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিল তা মক্কেলদের বলে, কিন্তু শেষপর্যন্ত নীরব থাকাই সমীচীন মনে করে; ইতিমধ্যে মেয়েকে দেখবার জন্যে রবিবারে সদর অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ার পরিকল্পনাটা যদি করে না ফেলত তবে হয়তো বলতে বাধা বোধ করত না।

ততক্ষণে উকিল কফিলউদ্দিন কুমুরডাঙ্গার একমাত্র বাঁধানো সড়কের নিকটে এসে পড়েছে। সড়কটি কাছারি-আদালতের সামনে মাঠের এক পাশ দিয়ে শুরু হয়ে নদীর ধার দিয়ে পোয়া-মাইলখানিক গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। পোয়া-মাইল দীর্ঘ সড়কটির অবস্থা বড়ই শোচনীয়, কারণ অনেকদিন মেরামত হয় নি বলে এখানে-সেখানে নানা আয়তন-গভীরতার গর্ত, আবার যেখানে গর্ত নেই সেখানে ধারালো ইট-কঙ্করের নির্লজ্জ দন্তবিকাশ। বস্তুত, সে-বাঁধানো সড়কে জুতা নিয়েও পা-দেয়া দুষ্কর, এবং বাঁধানো অংশটি এড়িয়ে তার এক পাশে দিয়ে মানুষেরা বাধ্য হয়ে যে পায়ে-হাঁটার পথ করে নিয়েছে সে-পথ ধরেই সবাই হাঁটে। একদা ইংরেজের আমলে কেউ তার নাম দিয়েছিল ই. বি. ক্র্যাংশ রোড—যে-নাম রাস্তার এক প্রান্তে একটি ছায়াশীতল বড় গাছের গুঁড়িতে পোতা কাষ্ঠফলকে এখনো বিরাজমান, যদিও ঝুলে-পড়া লতাপাতার জন্যে তা নজরে পড়ে না, পড়লেও দীর্ঘদিনের রোদবৃষ্টিতে অপাঠ্য-হয়ে-উঠা অক্ষরগুলির অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

ব্যবহারের অযোগ্য সে-সড়কের পাশে পায়ে-হাঁটার পথে উঠেছে এমন সময় কফিলউদ্দিন সাহেব একটি আওয়াজ শুনে চমকিত হয়ে থেমে পড়ে। আওয়াজটি যেন স্টিমারের বাঁশির আওয়াজ। তবে কি স্টিমার ফিরে এসেছে? শনিবারে নয়, আজই এসে পড়েছে? দিনক্ষণের বিষয়ে কিছু ভুল হলেও মনে যে-কথাটি এসে দেখা দিয়েছিল তা তবে সত্য?

"কিসের আওয়াজ শুনলাম যেন।" উকিল কফিলউদ্দিন বলে।

পশ্চাতের মক্কেলরাও দাঁড়িয়ে পড়ে নদীর দিকে তাকিয়ে শুনবার চেষ্টা করছিল। সেখান থেকে স্টিমারঘাট নজরে পড়ে না। শীঘ্র একজন মক্কেল উত্তেজিত ভাবে বলে,

"বোধ হয় স্টিমার এসেছে।"

আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে উকিল কফিলউদ্দিন বাক্‌শক্তি-রহিত মানুষের মতো নীরবে আবার হাঁটতে শুরু করে, কোনো অবস্থাতেই যে-মানুষের ধীর-মন্থর পদক্ষেপে তারতম্য দেখা যায় না তারই পদক্ষেপে যেন ঈষৎ চাঞ্চল্য, কেমন একটু অধীরতা এসে পড়ে।

কাছারি-আদালতের সামনে পৌঁছুলে উকিল কফিলউদ্দিন দেখতে পায়, সামনের মাঠের পথ দিয়ে অসংখ্য লোক দৌড়াচ্ছে। তারা যে ঘাটের দিকেই যাচ্ছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। উকিল সাহেবের একবার ইচ্ছা হয় সেও ঘাটের দিকে পা বাড়ায়, কিন্তু নিজেকে সংযত করে মাঠে নেবে পড়ে। কেবল একবার গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, "স্টিমারই এসেছে।"

তবে পরে উকিল সাহেব আসল খবরটি জানতে পায়।

যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘাটে উপস্থিত হয় তারা স্টিমারের স্থলে ছোটখাটো একটি লঞ্চ দেখতে পেয়ে কিছু নিরাশ বোধ করে কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারে না। তারা ভাবে, তবে স্টিমারের পরিবর্তে লঞ্চই চালু করা হয়েছে বুঝি। অবশ্য লঞ্চের আগমনের কারণ শীঘ্র তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে : সেটি যাত্রী নিয়ে আসে নি, যাত্রী নিতেও আসে নি, এসেছে ঘাট থেকে ফ্ল্যাটটি সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের মধ্যে থেকে দু-চারজন লোক ছুটে এসে উকিল সাহেবকে স্টিমার-কোম্পানির বিশ্বাসঘাতকতার নতুন একটি প্রমাণের খবর দিলে প্রথমে উকিল সাহেবের মনে হয় সে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না : এমন আস্পর্ধার কথা কি সহজে বিশ্বাস হতে চায়? শোনায় যে গলতি হয় নি বা যারা খবরটি নিয়ে

এসেছে তারা যে ভুল করে নি, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হলে সে পুলিশকে এত্তেলা দেবে স্থির করে, তারপর পুলিশরা যে আবার হাকিম-সুবার নির্দেশ ছাড়া নড়ে না তা বুঝে নিজেই বড় হাকিমের এজলাসে হাজির হয়, চোখে সংযত আগুন, কণ্ঠে ভীতিজনক গাম্ভীর্য। তবে ততক্ষণে স্টিমারঘাটে লঞ্চে করে যারা এসেছিল তারা কাজে লেগে গিয়েছে। যে-ফ্ল্যাট বহুদিন ধরে একই স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে স্থাবর রূপ গ্রহণ করেছিল সে-ফ্ল্যাটটি চোখের পলকেই তারা ঘাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। দেখতে-না-দেখতে তারা সামনের এবং পেছনের দুটি নোঙর নদীর নরম বুক থেকে উঠিয়ে নেয়, তারপর এখানে-সেখানে কিছু দড়িদড়া খোলে, অবশেষে তীরের দিকে বালুতে বিঁধে থাকা কাঠের পুলটা তুলে নেয় : সব কিছু অতি সহজে উঠে আসে, কোনো কিছুই বিন্দুমাত্র বাধা প্রদান করে না, একটু আপত্তিও জানায় না। ইতিমধ্যে ফ্ল্যাটটির দেহের তুলনায় হাস্যকরভাবে ছোট কিন্তু চটপটে, ব্যস্তবাগীশ লঞ্চটি ফ্ল্যাগটিকে পাশাপাশিভাবে বেঁধে নিয়েছিল, এবার তার কেবল পথ ধরা বাকি। পথ ধরতে দেরিও করে না, কুমুরডাঙ্গার সঙ্গে ফ্ল্যাটের দীর্ঘ দিনের সম্বন্ধ নিমেষে সমাপ্ত করে তীরের ওপর নীরবে দণ্ডায়মান সে শহরের স্তব্ধ বিমূঢ় শত শত অধিবাসীর চোখের সামনে দিয়ে রওনা হয়ে পড়ে, কেউ তার পথরোধ করবার চেষ্টা করে না।

সে সময়ে এজলাসে বড় হাকিম তার বিরক্তি হাসিতে ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করে বলছিল,

"ফ্ল্যাট ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি স্টিমার চলবে? নদী যদি ঠিক হয় তবে সব ফিরে আসবে। ঘাট ফিরে আসবে, স্টিমার ফিরে আসবে।"

এবার নীরবে উকিল কফিলউদ্দিন এজলাস ত্যাগ করে। কেউ তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায় নি।

সে রাতে কুমুরডাঙ্গা শহরে একটি বিচিত্র নীরবতা নাবে। ঝড়ের আগের নীরবতা নয়, ঝড়-উত্তর সর্বস্বান্ত নিঃস্ব নীরবতা। তবে কুমুরডাঙ্গার পথে স্টিমার-চলাচল সত্যি বন্ধ হয়েছে, সন্দেহের আর কোনো অবকাশ নেই : ঘাটটি হঠাৎ শূন্য হয়ে খাঁ-খাঁ করতে শুরু করে সব সন্দেহ দূর করেছে। কেউ হা-হুতাশ করে না, কিন্তু কেমন নিস্তেজ হয়ে থাকে কী-একটা মনভারে। হয়তো তারা মনে মনে কিছু লজ্জা বোধ করে। সকালের ঘটনাটি কি অপ্রত্যাশিত? সত্য কথা কি তারা জানে না? তা স্বীকার করতে চায় নি বলেই কি ফ্ল্যাটটি অনর্থক ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকবে যেন কিছু হয় নি, কোথাও চড়াও পড়ে নি? হয়তো সহসা অন্য একটি কথা বুঝতে পারে বলে তাদের মনে গভীর ব্যথার সৃষ্টি হয়। সেটি এই যে, তাদের বাকাল নদী স্টিমারের গমনাগমনের জন্যে অনুপযোগী হয়ে পড়েছে শুধু তাই নয়, মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছে। যে-নদীর অপর তীরে শরৎকালীন কাশবনের দিকে তাকিয়ে তারা উদাস হয়, যার বুকে পাল-দেয়া নৌকার চলাচল দেখে অন্তরে সুদূরের আহ্বান শোনে, কখনো তাতে সূর্যাস্তের শোভা দেখে নয়ন তৃপ্ত করে, সে-নদী মরতে বসেছে। হয়তো এ-সময়ে অকস্মাৎ এ-কথাও তাদের মনে পড়ে যে তারা নদীকে ব্যবহার করেছে, ঝড়ের দিনে প্লাবনের সময়ে ভয় করেছে কিন্তু কখনো ভালোবাসে নি। নদীকে ভালোবাসার কথা কেউ বলে না, ভালোবাসতে শেখায়ও না, আবার নিজে থেকেই তার প্রতি একটু ভালোবাসা বোধ করলে সে-ভালোবাসা প্রথম সূর্যের ক্ষীণ উষ্ণতায় শিশিরবিন্দুর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো শীঘ্র অদৃশ্য হয়ে যায়; যা সুন্দর কোমল তা জীবনের স্থূল বাস্তবতায় শীঘ্র বিলীন হয়ে যায়। কোনো না কোনো সময়ে কে না শুনতে পায় হঠাৎ বেজে-ওঠা অদৃশ্য হাতের চুড়ির অস্ফুট শব্দ, কে না দেখতে পায় সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আচম্বিতে দৃশ্যমান হওয়া রহস্যময় হাতছানি, ক্ষণকালের জন্যে হলেও কার বুকে না জাগে অন্তর-নিঃস্ব-করা হাহাকার? তবে সবই অবিলম্বে শেষ হয়, পরে চোখ অন্ধ হয়, কান বধির হয়। হয়তো তারা নদীর প্রতি ভালোবাসা বোধ করে না, তার মৃত্যুর কথায় মানুষের মৃত্যুর কথাই মনে পড়ে বলে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে। নদীটি যেন মানুষের মতো মরতে বসেছে। একদিন তবে মানুষের মতো তার যৌবন ছিল যে-যৌবন আর নেই। পরে প্রৌঢ়বয়সের স্থৈর্য-

গাম্ভীর্যে প্রশান্ত হয়ে উঠেছিল, এক সময়ে সেদিনেরও অবসান ঘটে। তারপর ধীরে-ধীরে বার্ধক্য ঘনিয়ে আসে দিনান্তের মতো, এবং এবার তার আয়ু ফুরিয়ে এলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে; মানুষের জীবনের মতো নদীর জীবনও নশ্বর। সে-কথাই তাদের মন ভারী করে তোলে।

তবে সে-রাতে মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন বিচিত্র কান্নার আওয়াজটি শুনতে পায়।

একদিন তারা গভীর রাতে কামলাতলা বিল থেকে খেদমতুল্লার লাশটি উদ্ধার করে চাঁদবরণঘাটের বাড়িতে নিয়ে আসে। আমেনা খাতুন বা মুহাম্মদ মুস্তফা লাশটি প্রথমে শনাক্ত করতে পারেনি, কারণ দা-এর নির্মম আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড মাথা-মুখের শনাক্তযোগ্য অবস্থা ছিল না। তারপর আমেনা খাতুনের চোখ পড়ে আঙটির ওপর এবং সে-আঙটি দেখেই রাতের নীরবতা বিদীর্ণ করে সে আর্তনাদ করে ওঠে; বেশ কয়েক বছর আগে ব্যবসায়ে সর্বপ্রথম কপাল খুললে সদর শহরে এক জহুরীর দোকান থেকে বড় শখ করে খেদমতুল্লা লালপাথর বসানো সোনার আঙটিটি কিনেছিল।

আমি তখন চাঁদবরণঘাটে বেড়াতে এসেছিলাম। আমেনা খাতুনের আকস্মিক আর্তনাদ নিঃসন্দেহে আমার নিদ্রা-অবশ কানে পৌঁছেছিল, কিন্তু সে-আর্তনাদ জেগে উঠেই থেমে গিয়েছিল বলে ঘুমটা ভাঙে নি, আর্তনাদটিও আমার স্বপ্নের রহস্যময় গুহাগহ্বরে বার-কয়েক প্রতিধ্বনিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকবে। তারপর হয়তো গভীর নীরবতার জন্যে এক সময়ে বুঝতে পারি কোথাও অসাধারণ কোনো ঘটনা ঘটেছে; এ-সব ঘটনা শুধু শব্দের মধ্যে দিয়ে নয়, নিঃশব্দতার মধ্যে দিয়েও আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

আমি যখন ভেতরের বারান্দায় উপস্থিত হই ততোক্ষণে যারা খেদমতুল্লার মৃতদেহটি বহন করে নিয়ে এসেছিল তারা একটি সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহটি ঢেকে লণ্ঠন হাতে চাঁদহীন অন্ধকার রাতের মধ্যে দিয়ে ফিরতি-পথ ধরেছে। প্রথমে মাতা-পুত্রকে দেখতে পাই। বারান্দার মধ্যখানে একটি লণ্ঠন জ্বলছিল। সে-আলোতে দেখতে পাই আমেনা খাতুন একটি পিঁড়ির ওপর নিশ্চল হয়ে বসে, মুখে স্তব্ধভাব কিন্তু বেদনা বা আঘাতের কোনো আভাস নেই, চোখে অশ্রু নেই। অদূরে হাঁটু তুলে পায়ের ওপর ভর দিয়ে চৌদ্দ বছরের ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফাও বসে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। তারপর বাঁদিটিকেও দেখতে পাই। রান্নাঘরের পাশে তার ঘর থেকে উঠে এসে বারান্দার প্রান্তে সে পা ঝুলিয়ে বসেছে। শুধু তারই দৃষ্টি মৃতদেহটির ওপর : চোখে বিহ্বলতা, যে-বিহ্বলতা কেমন যেন জমে গিয়েছে কারণ বোধ-বুদ্ধির স্রোত কোথাও সহসা থেমে পড়েছে। এবার আমার নজর পড়ে দেয়াল-ঘেঁষে-রাখা সাদা চাদরে আবৃত লাশটির ওপর। তবু তখনো সবটা বুঝি নি। চাদরের নিচে নিথর দেহ-মুখের অস্ফুট রেখাগুলির অর্থোদ্ধার করবার চেষ্টা করছি এমন সময় দূরে কোথাও একটি হুতুম পাখির ডাক শুনতে পাই। হুতুম পাখি নিত্যই ডাকে, তবে আমার সহসা কেমন মনে হয় সে-ডাক কখনও শুনি নি। হয়তো মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়ে থাকবে : হুতুম পাখি ডাকছে কেন? তারপর এক সময়ে কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে বৃষ্টি নাবে, যে-বৃষ্টির আওয়াজও চিনতে কষ্ট হয়; বৃষ্টিটা যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে নয়, রাত্রির অন্ধকার থেকেই ঝরছিল, পানি নয়, উপছে-পড়া পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। বাঁদি মেয়েটি না নড়ে বারান্দার প্রান্তে বসে থাকে, শীঘ্র তার মুখ, তার নগ্ন হাত-বাহু এবং শাড়ি ভিজে ওঠে। ক্রমশ সবই আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে : মাতা-পুত্রের এবং বাঁদিটির নিশ্চল হয়ে বসে থাকা, প্রায় অদৃশ্যভাবে ঝরতে-থাকা বৃষ্টি। রহস্যভেদ করবার জন্যেই যেন সাদা চাদরে আবৃত মৃতদেহটির দিকে আরেকবার দৃষ্টি দেই। এবার কী করে চাদরের মধ্যে দিয়ে জেগে-থাকা নিথর মুখের অস্ফুট রেখাগুলি একটা অর্থ গ্রহণ করে, যদিও কিছু দেখা সম্ভব হয় না তবু বুঝতে পারি খেদমতুল্লা আর হুঙ্কার দেবে না; যে-হুঙ্কার গত ক-বছরে পশুর আর্তনাদের মতো হয়ে উঠেছিল, মানুষের মনে অকথ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করত,

সে-হুঙ্কার আর কেউ শুনতে পাবে না।

তারপর ধীরে-ধীরে পূর্বাকাশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে, একটি নূতন দিন শুরু হয়।

সেদিনই মুহাম্মদ মুস্তফা উক্তিটি শুনতে পায় । কেউ বলে, "বদলোকের নছিবে অপঘাতে মৃত্যুই বরাদ্দ থাকে।"

কেবল সেদিন কথাটি সে বুঝতে পারে নি। পরে ধীরে-ধীরে, খণ্ড-খণ্ডভাবে সব জানতে পায়। সে জানতে পায়, তার বাপ অতিশয় দুর্বৃত্ত মানুষ ছিল। সে জানতে পায়, অনেক মানুষকে তার বাপ ধ্বংসের পথে বসিয়েছিল, হক-দাবি-প্রাপ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করেছিল, নিরপরাধ শিশুদের জীবনের জন্যে দণ্ডিত করেছিল। কখনো ইঙ্গিতে বলা কোনো কথায়, কখনো নির্দয়ভাবে দেয়া বৃত্তান্তসমৃদ্ধ বিবরণে, কখনো তীব্র ঘৃণাভরা কণ্ঠে নিক্ষিপ্ত অভিযোগে, কখনো আবার স্পষ্টতই পরস্পরবিরোধী বিবৃতিতে—এ-সবে মিলে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ক্রমশ যে-মানুষের চিত্র স্পষ্টাকার রূপ ধারণ করে সে-মানুষকে সে যে চিনতে পারে তা নয়, তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করতেও সাহস হয় না তার। কখনো-কখনো তার মনে হয় সে যেন এমন একটি মানুষের কথা শুনছে জীবনে যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ঘোর পাপিষ্ঠ মানুষেরও জীবনে উদ্দেশ্য থাকে; লোভ হিংসা হীনতা নীচতা নিষ্ঠুরতার দ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইলেও সে উদ্দেশ্যহীন নয়। উদ্দেশ্যহীন মানুষ আর মানুষ নয়, সে অমানুষ। তার বাপ খেদমতুল্লা কি অমানুষ ছিল? তবে এই প্রশ্নটিও স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করতে তার সাহস হয় নি। সে শুনে যায়, এবং হয়তো প্রত্যেক কথাই গ্রহণ করে বিনা প্রশ্নে, তা যতই নিষ্ঠুর বা বেদনাদায়ক হোক না কেন। হয়তো তার জন্মদাতার বিষয়ে যা সে শোনে তার সত্যাসত্য বিচার করার প্রয়োজনও দেখে না : বাপ খেদমতুল্লা দুর্বৃত্ত লোক ছিল তা একবার গ্রহণ করে নেবার পর কোথায় কে একটু অতিরঞ্জন করেছে বা কোথায়-বা ঈষৎ বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে—এ-সবের বাছাই-ছাঁটাই অবান্তর মনে হয় তার কাছে। বাপের শাস্তিটা অপরাধের তুলনায় যে মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে তেমন কথা মনে হয়ে থাকলে আবার হয়তো ভেবেছে, সে-বিষয়ে চুলচেরা বিচার অর্থহীন এই কারণে যে একটি বিশেষ স্তর পেরিয়ে যাবার পর মানুষের পাপ-দুষ্কর্ম আইনের দাঁড়িপাল্লায় হয়তো ওজন করা যায় কিন্তু অন্তরের দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা যায় না। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাকে উপদেশ দেয়, যে বা যারা কামলাতলা বিলে জঘন্য কাজটি করেছে তার বা তাদের যথাবিধি শাস্তি বিধান হওয়া উচিত, কারণ খেদমতুল্লা সৎলোক ছিল না বটে কিন্তু তার খুনের কথা নির্বিবাদে গ্রহণ করা যায় না। তবে এই উপদেশটি তাকে বিস্মিত করে, যেন খেদমতুল্লার দুর্বৃত্ত চরিত্রের কথা গ্রহণ করে নিলেও কেউ যে তাকে নির্মমভাবে খুন করে থাকবে, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি। হয়তো ছেলের পক্ষে তার বাপ সম্বন্ধে প্রথম কথার চেয়ে দ্বিতীয় কথাই গ্রহণ করা দুষ্কর। লোকেরা তাকে এ-কথাও বলে, যে বা যারা নিষ্ঠুর হত্যার জন্যে দায়ী তার বা তাদের সন্ধান পাওয়া তেমন কঠিন কাজ নয়; বস্তুত একটি নাম সকলেই কানাঘুষায় শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু সে-বিষয়েও সে কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নি।

তখন মুহাম্মদ মুস্তফা নাবালক। তবে সাবালক হওয়ার পরেও কোনো ঔৎসুক্য দেখায় নি।

মুহাম্মদ মুস্তফার মনোভাব থেকে-থেকে অনেকদিন আমাকে কেমন বিচলিত করেছিল। সে কোনো-প্রকার জিঘাংসা বোধ করে নি বলে নয়, অতি সহজে বিনাবাক্যে তার জন্মদাতার দুর্বৃত্তচরিত্রের কথা মেনে নিয়েছিল বলে এবং কে যে তার খুনী সে-বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে নি বলে অন্তরে কী-একটা বিহ্বলতা, কী একটা ব্যথা অনুভব করতাম। মনে হত তার আচরণ রক্তসম্বন্ধশূন্য মানুষের মতো যেন। বাপ অতিশয় দুর্বৃত্ত লোক—সে-কথা ছেলে হয়েও অনাত্মীয় মানুষের মতো স্বীকার করে নিয়েছে, অনাত্মীয় মানুষের মতো অপরাধীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার জন্যে কোনো বিশেষ আগ্রহ বোধ করে নি, এমনকি তাদের মতোই

যেন বিশ্বাস করে কেউ যদি খেদমতুল্লার দুষ্কৃতির বদলা নেবার জন্যে তাকে খুন করে থাকে তবে খুনীর দোষটা তেমন গুরুতর নয়। তবে আমি আমার কিছু বিহ্বল কিছু বিচলিত মনকে প্রবোধ দেই এই বলে যে, মুহাম্মদ মুস্তফার চরিত্রটা তেমনই : ছোট-বড় সাধারণ-অসাধারণ সব কথা সে সহজে বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নেয়।

খেদমতুল্লার মৃত্যুর কিছুদিন পরে চাঁদবরণঘাটের বাসাবাড়িটা পানির দরে বিক্রি করে মাতা-পুত্র গ্রামের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে। কিছুদিন মনে-প্রাণে নিঝুম হয়ে থাকার পর মুহাম্মদ মুস্তফা একটি বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প হয়; সে পড়াশুনা বন্ধ করবে না, যেমন করে হোক স্কুল শেষ করবে, তারপর সম্ভব হলে কলেজে এবং আরো পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে। শীঘ্র সংকল্পটি সে কার্যে পরিণত করতে উদ্যত হয়। তারপর ধীরে-ধীরে, পায়ে-পায়ে সে এগিয়ে যায়, কোথাও যে যাচ্ছে সে-কথা না ভেবে, একে-একে সব প্রতিবন্ধক যে পেরিয়ে যাচ্ছে সে বিষয়ে সচেতন না হয়ে। প্রথমে তেমন আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় নি। তবে শীঘ্র তা বিষম সমস্যায় পরিণত হয়। এত শঠতা অসৎ কলাকৌশল সত্ত্বেও খেদমতুল্লা কেবল সামান্য কিছু জমিজমাই রেখে গিয়েছিল। সে-জমিজমাও ধরে রাখা সম্ভব হয় নি, রাখার চেষ্টাও সে করে নি; অসৎ মানুষ যদি সদুপায়ে কিছু সংগ্রহ করে থকে তাও কলঙ্কময় এবং না-জায়েজ মনে হয়। কঠোর পরিশ্রম এবং একনিষ্ঠতার দ্বারা সর্ব প্রতিবন্ধক সকল প্রকারের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে সক্ষম হয় মুহাম্মদ মুস্তফা।

ধীরে-ধীরে মুহাম্মদ মুস্তফার মধ্যে কেমন পরিবর্তন এসে যায়। সে মাত্রাতিরিক্তভাবে নিরীহ নম্রভদ্র হয়ে পড়ে। তবে সে-নিরীহতা নম্রতা ভদ্রতা এমনই যে সে-সব তাকে যেন কেমন নিশ্চিহ্ন করে ফেলে; মানুষের পরিবর্তে সে একটি ছায়ায় পরিণত হয়। সে যে অসামাজিক হয়ে ওঠে বা অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে বা আলাদা হয়ে থাকে তা নয়, বরঞ্চ বেশ নিয়মিতভাবে সামাজিক বা মাজহাবি জামাতে-বৈঠকে হাজির হতে থাকে। তবে এ-সামাজিকতার আসল উদ্দেশ্য যেন তার বিষয়ে সমাজের কৌতূহল এড়ানোই; সে যেন বুঝতে পারে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করার, এমনকি গা-ঢাকা দিয়ে থাকার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা। এ-সময়ে মজলিস-মাহফিলে উপস্থিত হলে তার উপস্থিতির বিষয়ে কদাচিৎ মানুষেরা সজ্ঞান হত এবং কখনো তার কণ্ঠস্বর শোনা গেলেও সে যা বলত তা মানুষেরা পরমুহূর্তেই ভুলে যেত কারণ কথা বলেও সে কখনো বিশেষ কিছু বলত না : যেন ক্বচিৎ-কখনো সে মুখ খুলত কেবল তার হাজিরা ঘোষণা করার জন্যে। হাসিও তেমন দেখা যেত না তার মুখে। যদি-বা কখনো ক্ষীণভাবে হাসত সে-হাসির মধ্যে কখনো কোনো তারতম্য ধরা পড়ত না, একই হাসির সাহায্যে সে প্রভূত মনোভাব ব্যক্ত করত : কৃতজ্ঞতা, আনন্দ, লজ্জা, বিস্ময়, সম্মতি-অসম্মতি। দুর্লভ ঈষৎ হাসিটির ব্যাখ্যার ভার পড়ত দর্শকের ওপর। তবে তা ব্যাখ্যা করে দেখার আগ্রহ কেউ তেমন বোধ করত কিনা সন্দেহ। বস্তুত, মুহাম্মদ মুস্তফা এমনভাবে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম হয় যে চোখের সামনে সে বসে থাকলেও অনেক সময়ে কেউ সহসা বলে উঠত, কোথায় গেল মুহাম্মদ মুস্তফা?

কখনো-কখনো আমার মনে হত, এ-সবের মধ্যে কোথায় যেন একটি গূঢ় অর্থ। মুহাম্মদ মুস্তফা অনেক কথাই বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছে, যে-সব ছেলের পক্ষে অতিশয় দুর্বিষহ। তার বাপ খেদমতুল্লা দুর্বৃত্ত লোক ছিল; তার দুষ্কৃতির শাস্তিও অনিবার্য, সে-শাস্তি মানুষই দিক আর খোদাই দিক; এবং যারা তাকে শাস্তি দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পোষণ করাও অন্যায়, কারণ অভিযোগের অধিকার কারো যদি থেকে থাকে তা তাদেরই ছিল। তবু দুর্বৃত্ত বাপের প্রতিও ছেলের কি কোনো দায়িত্ব নেই? হয়তো সে-দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত; পিতা-পুত্রের মধ্যে দায়িত্বের ব্যাপার তাদের রক্তসম্বন্ধের মতোই রহস্যময় যা সাধারণ বুদ্ধির বহির্গত। কেবল সে-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্মৃত

হওয়া কোনো ছেলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে-দায়িত্বের কথা ভুলে ছেলে যদি তার জীবন গড়ার চেষ্টা করে এবং গড়ে তুলতে সক্ষমও হয়, তার জীবন কি চোরাবালির ওপরই গড়া হবে না, তার সঙ্গে কি একটি অবাস্তবতা একটি অসত্যতা চিরদিনই জড়িত থাকবে না? যে-দায়িত্ব প্রতি মুহূর্তে রক্তের স্রোতে অশান্তির ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে, সর্বদা কী-একটা অস্বস্তিকর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো কী-করে এই কথা বুঝে সে স্থির করে, নিজের সততা সচ্চরিত্রতার সাহায্যে বাপের কলঙ্ক দুর্নাম মুছে ফেলবে, নিজের নিরীহতা সজ্জনতার দ্বারা তার দুর্বৃত্ত চরিত্রের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দেবে : সন্তানের সুচরিত্র পিতার দুশ্চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলবে একদিন। হয়তো এই জন্যেই তার চরিত্রে এমন একটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

তবে তেমন কথা ভাবতে ভালো লাগলেও জানতাম, আসলে জীবন সম্বন্ধে কী-একটা নিদারুণ ভীতিই তাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এমন মানুষ নিজের কণ্ঠস্বরেও আতঙ্কিত হয়। এরাই নিজেদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

তবারক ভুইঞা বলছিল : যেদিন ঘাট থেকে ফ্ল্যাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন রাতেই মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পায়। তখন হয়তো গভীর রাত, কী কারণে ঘুমটা হাল্কা হয়ে উঠেছিল। আওয়াজটি শুনতে পেলে সে সম্পূর্ণভাবে জেগে ওঠে। কিন্তু শীঘ্র আওয়াজটি সহসা থেমে যায়। তারপর সে-ও আবার নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

সকিনা খাতুন মেয়েদের মাইনর স্কুলে মাস্টারনীগিরি করে। পরদিন সকালে সে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে এমন সময়ে আবার আওয়াজটি শুনতে পায় : কোথায় একটি নারী কাঁদছে। কে কাঁদে, কোথায়ই-বা কাঁদে? তবে স্কুলের তাড়াতাড়িতে সে-বিষয়ে তখন বিশেষ ভাবা হয়ে ওঠে নি, সারা দিন কথাটি মনেও পড়ে নি। সন্ধ্যার পর আবার আওয়াজটি শুনতে পায়। এবার বেশ স্পষ্টভাবেই শুনতে পায়। নিঃসন্দেহে কণ্ঠটি কোনো নারীর, আওয়াজটা যেন নদীর দিক থেকে আসছে।

তারপর থেকে সময়ে-অসময়ে সে কান্নাটি শুনতে পায়—যে কান্না কখনো আচমকা ঝড়ের মতো কখনো ধীরে-ধীরে বিলম্বিত বিলাপের মতো শুরু হয়। কী কারণে কান্নাটির কথা প্রথমে অন্যদের কাছ থেকে গোপন করে রাখে, যেন ব্যাপারটি বুঝতে পারে না বলে সে-বিষয়ে চুপ থাকা বুদ্ধিসঙ্গত মনে করে। কান্নাটি যেন কেমন। তাছাড়া যখন-তখন শুনতে পেলেও যখন তা শুনতে পায় না তখন ভাবে, সত্যিই সে কি কিছু শুনতে পায়? গোপন রেখে এ-ও তার মনে হয়, বালিকাবয়সে যেমন ছড়ার কথা গোপন করে রাখত তেমনি কিছু করছে। ছড়ার কথা কখনো কাউকে বলে নি। তার ঠোঁটের নিঃশব্দ সঞ্চালন লক্ষ্য করে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত সে কী বলছে, সে নির্বিকারভাবে উত্তর দিত, কিছু না। সে-সময়ে থেকে-থেকে নিঃশব্দে ঠোঁট সঞ্চালন করে সে একটি ছড়া আবৃত্তি করত। ছড়াটি এখনো তার মনে পড়ে : ক-এ কলাগাছ আর কচুরিপাতা কলমিশাক খাই, কঞ্চি আনো কলমকাঠি ক লিখিরে ভাই। ছড়াটি আবৃত্তি করার কোনো অর্থ ছিল না, কেবল তা এমনি একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যে কখন শব্দগুলি অন্তরের কোন্ নিভৃত কক্ষ থেকে উঠে এসে তার ঠোঁটে নিঃশব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করত নিজেই বলতে পারত না। কোনো-কোনোদিন তার মায়ের মুখে-চোখে গভীর আশঙ্কা দেখা দিত। মা জিজ্ঞাসা করত, কী বিড়বিড় করছিস? মায়ের মুখে-চোখে আশঙ্কা অনুমান করে তার দৃষ্টি এড়িয়ে সে-দিন রাগতভাবে বলত, কোথায় বিড়বিড় করছি? মধ্যে-মধ্যে সহসা মুখে লজ্জার ঝাঁজও ধরত, মুদ্রাদোষটির সত্যি কোনো অর্থ নেই। তবু ছড়ার কথা কোনোদিন কাউকে বলে নি, জারুনার মা নামক মেয়েলোকটির নামও তোলে নি যদিও মেয়েলোকটির কথা ছড়ার মতোই সে-সময়ে অহরহ মনে জাগত, তার

মুখটিও মানসচোখে ভেসে উঠত, বিশেষ করে তার ফোঁকলা দাঁত এবং আকর্ণ দিলখোলা হাসিটি। সেই সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা মেয়েলোকটির কাছেই ছড়াটা শিখেছিল। মেয়েলোকটি বলত, মনের কথা কখনো ফাঁস করতে নেই। সকিনা খাতুনও মনের কথা গোপন করত, করে একটি গভীর তৃপ্তি অনুভব করত এই ভেবে যে সে নিজস্ব একটি গোপন জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে-জগতে কারো প্রবেশের অধিকার নেই। জারুনার মার কাছে একটি নয়, অনেক ছড়া শিখেছিল, যার একটি বলতে গেলে ছুঁচে বিঁধেই তার অন্তরে স্থান নিয়েছিল। সে-দিন জারুনার মা জাদুকরের হাত-সাফাইর ভঙ্গিতে ধাঁ করে তার দুটি কানের তুলতুলে নরম প্রান্ত ছেঁদা করে দিয়েছিল। ব্যাপারটা বোঝার পর পিঁড়িতে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে আস্তে হাত তুলে কান স্পর্শ করে দেখে সেখানে না ঝুমকো না কোনো দুল, কেবল দুটি ক্ষুদ্র কাঠির মতো কী যেন সদ্য-ফুটানো ছিদ্র দুটি দখল করে রয়েছে। পরে সেখানে ঘায়ের মতো হয়, একটু ব্যথা-ব্যথা করে, এবং কান ছেঁদার উপলক্ষে তার বাপ সরু আংটির মতো একজোড়া যে-সোনার অলঙ্কার তাকে এনে দিয়েছিল তা বেশ কিছুদিন পরতে পারে নি। কেন পরতে পারে নি সে-কথাও তার মাকে বলে নি।

কান ছেঁদা করবার সময়ে হয়তো তার মন ভুলাবার জন্যে জারুনার মা সুর করে নূতন একটা ছড়া কেটেছিল : পোড়া কপাল জোড়া লাগে না, কালো জামাই ভালো লাগে না। অনেক সন্তান-সন্ততির গর্ভধারিণী জারুনার মার স্বামীকে সকিনা খাতুন কখনো দেখে নি। সে ভাবে, স্বামীটি বিদ্‌ঘুটে কালো হবে। তার ভবিষ্যৎ স্বামীর কথাও একবার ভাবে এবং ক্ষুদ্র যে অলঙ্কারটি সে পেয়েছিল তারই রঙে কল্পনার স্বামীর রঙও সোনাবরণ রূপ ধারণ করে। তবে কল্পনার স্বামীর কথাও কাউকে বলে নি; তা গোপন রেখে সে পুলকিত বোধ করে। তারপর বকরিদের সময় দশম কি দ্বাদশ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে জারুনার মার মৃত্যু ঘটে। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে অব্যর্থভাবে কয়েকদিনের জন্যে সে অদৃশ্য হয়ে যেত। কোনোবার লিক্‌লিকে হাড়সম্বল নবজাত একটি শিশু কোলে নিয়ে, কোনোবার মৃতপ্রসূত শিশুকে কবর দিয়ে শূন্যকোলে প্রত্যাবর্তন করত, মুখটা কিছু ফ্যাকাসে, কিছু শীর্ণ, ঠোঁটটা নীরস, ফাটা-ফাটা। সেবার সে আর ফিরে আসে নি। আগে প্রসব ঘরের কথা ভাবলেই সকিনা খাতুন কেবল জারুনার মার হাসিমুখটি দেখতে পেত। যে-প্রসবঘরে আজরাইল দেখা দিয়েছিল তার জান নেবার জন্যে, সে-প্রসবঘরেও সুপরিচিত হাসিটি দেখতে পায়—আকর্ণ হাসি, যে-হাসির বেগে কখনো-কখনো বুক থেকে শাড়ির আঁচল সরে গেলে পালান-সদৃশ মস্ত দুটি স্তন প্রকাশ পেত; কবরে নয়, মাটির ওপরে সূর্যালোকের নিচে ঘাসফুলের মতো বিস্তৃত হয়ে সে-হাসি খেলা করছিল যেন। তারপর কখন তার হাঁটার ভঙ্গিতে ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ভাব আত্মপ্রকাশ করে, হাড়গোড় না বাড়লেও দ্বিতীয়া চাঁদের মতো অতি সঙ্গোপনে যৌবনও এসে দেখা দেয়, অবশেষে একদিন দেখতে পায় নানাবিধ রোগব্যাধিতে তার মা বার বার শয্যাশায়িনী হতে শুরু করেছে বলে সংসারের কাজ-কর্মে গভীরভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছে সে : ঘাটে খেয়ানৌকা এসে ভিড়লে যাত্রী যেমন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠে আপন পথে চলতে শুরু করে তেমনি সহসা এবং সহজেই সে সাংসারিক জীবনে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কেবল একটা কাঠের পুতুল বেশ কিছুদিন সঙ্গ ছাড়তে চায় নি। ততদিনে পুতুলটির রঙ উঠে এমন দশা যে চোখ-মুখ বলে আর কিছু নেই, বিবর্ণ দেহটি অক্ষতও নয়। একদিন সেটিও হারিয়ে যায় ছড়াগুলির মতো, তার মনের গোপন কুঠুরির মতো, এবং তার অভাব বোধ করে না বলে সেটির সন্ধানও করে না। সন্ধান করার সময়-বা কোথায়? দিনগুলি ঘূর্ণাবর্তের মতো হয়ে উঠেছে, যে-ঘূর্ণাবর্ত প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে-সাথে দেখা দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘিরে থাকে এবং যা ভেদ করে পশ্চাতে বা সম্মুখে তাকানো সম্ভব হলেও তাকাবার সাধ আর হয় না। হয়তো তাকালে কিছু দেখতেও পাবে না, যেমন কুয়াশার দিনে নদীর মধ্যখানে পৌঁছুলে পেছনের তীর সম্মুখের তীর উভয়ই আর চোখে পড়ে না। তখন থেকে মায়ের কাছে লুকাবার মতো তেমন কিছু দেখতে পায় নি। লুকাবার

কিছু নেই, লুকাবার সময়ও নেই। তার কাজ কি কখনো শেষ হয়? সারা দিন স্কুলে পড়ানো, মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করা, ঘরদোর সাফ করা, সন্ধ্যার আগে বাপের জন্যে ভেতরের বারান্দার প্রান্তে বদনা ভরে অজুর পানি রাখা, সকলের অলক্ষে ঘরের কোণে আবছা অন্ধকারে নামাজটাও পড়ে নেওয়া, পরে উঠানের শেষে তিনদিক-খোলা গোয়ালঘরে মধুবিবি নামক গাইটিকে দানা-পানি দেওয়া, সময় করে ছোট ভাইবোনদের পড়াটা দেখিয়ে দেওয়া, সকলের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা, আরো পরে বাসন-পাতিল ঘষে-মেজে সাফ করা—অনেক তার কাজ যা সে নিত্য নিঃশব্দে একটির পর একটি করে যায়। অনেক রাত করে সে যখন শুতে যায় তখন বিছানায় আশ্রয় নেবা মাত্র ঘুমটা ঝট্ করে এসে যায়। প্রথমে সহসা সমস্ত দেহে যে-গভীর অবসাদ বোধ করে সে-অবসাদের সঙ্গে মিশে ভেতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা হয়ে ওঠে, দৈনন্দিন সাংসারিক কথা বা স্কুলের চুটিচাটি কথা হাল্কা মেঘের মতো তার মনের সীমানায় কয়েক মুহূর্ত উড়ে বেড়ায় কোথাও ছায়া না ফেলে, তারপর সে-সব কথা কখন স্বপ্নের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছায়, আবার স্বপ্ন গভীর নিদ্রায় অন্তর্হিত হলে নিদ্রার নিরাকার বিস্মৃতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কেবল ক্বচিৎ কখনো ঘুম আসতে ঈষৎ দেরি হলে অদৃশ্য নিশাচর পাখির মতো রাতের অন্ধকার থেকে উড়ে এসে অন্যান্য কথা মনে নিঃশব্দে ডানা ঝাপটায় : জীবন-মৃত্যুর কথা, বেহেস্ত-দোজখের কথা, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রের রহস্যের কথা, মানুষের কথা। সে-সব সে ভাবেই কেবল, কোনো উত্তর সন্ধান করে না : উন্মুক্ত মাঠের শেষে দিগন্তের দিকে গ্রাম্যবধ যেমন অস্ফুট কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে তেমনি তার মনও আস্তে-আস্তে চোখ মেলে সে-সব রহস্যময় কথাগুলির বিষয়ে ভাবে মনে একটু ভয় বা বিহ্বলতা বোধ না করে, যেন যে-দুর্বোধ্য দিগন্তের দিকে তাকায় সেখানে যদি ভয়ের বা বিহ্বলতার কিছু থেকে থাকে তা তাকে স্পর্শ করবে না : সে-সব বিষয়ে কোনো কারণে জরায়ুস্থিত জীবের মতোই সে নিরাপদ বোধ করে। সে কখনো কোনো অভাব বোধ করে না, কিছু কামনাও করে না। তার ঈষৎ কৌতূহলও যখন শেষ হয় তখন সে রাতের আওয়াজ শোনে : কোথাও ইঁদুরের সাবধানী সঞ্চারণ, রাতপাখির ডাক, কাঠের ক্ষীণ আকস্মিক আর্তনাদ। সে-সব আওয়াজ শুনতে-শুনতে কোনো-কোনোদিন তার মনে প্রশ্ন জাগে, মৃত্যুর পরে যে-জীবন সে-জীবনের না জানি কী রকম আওয়াজ। গভীর রাতে ঘুমন্ত মানুষেরা অতর্কিতভাবে আর্তনাদ করে ওঠে তীক্ষ্ণ, নিঃসঙ্গ কণ্ঠে, কী-একটা অজানা বিস্ময়ে। সে-জীবনের আওয়াজ কী সে-রকম? কখনো হাওয়া যেমন বেচইন হয়ে গোঙ্গাতে শুরু করে। তেমনই কি তার আওয়াজ? কখনো হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ বুকের পিঞ্জর থেকে বেরিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, সর্বত্র তারপর ধক্‌ধক্ করে প্রচণ্ড আওয়াজে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। অজানা জগতের আওয়াজটি কি তেমনি কিছু? তবে সকিনার এ-কৌতূহলও স্থায়ী হয় না; এ-জীবনই তাকে তেমন কৌতূহলী করে না, সে-অজানা জীবন কেন তাকে কৌতূহলী করবে? তাছাড়া রাত শীঘ্র সুগভীর নদীর মতো অতল হয়ে ওঠে যাতে সে দ্রুতগতিতে নিমজ্জিত হতে থাকে, যাতে তার ক্ষীণখর্ব দেহটি সহসা ভারী হয়ে তলিয়ে যায়। এমনিভাবে সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে, বুকের দিকে মাথা গুঁজে হাঁটু দুটি তুলে সে-বুকের দিকে টেনে একত্র করা দুটি হাত উরুর মধ্যে স্থাপন করে, মুখটা ঈষৎ খুলে। কোনো-কোনোদিন দেহটি অবশ হয়ে পড়ার আগে অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় কানে আঙ্গুল দিয়ে সে-আঙ্গুলটি বিষমভাবে কিছুক্ষণ নাড়ে; রাতের বেলায় কানের খলি কখনো-কখনো সুড়সুড় করে। হয়তো মনে যে-সব অবান্তর কথা জাগে, তাদেরই তাড়ায়।

অকস্মাৎ একদিন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শোনার পরও সকিনা খাতুনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না বা তার নিত্যনৈমিত্তিক কর্মজীবনে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না : পূর্বের মতো সে যথাবিধি স্কুলে পড়িয়ে যায়, বিবিধ সাংসারিক দায়িত্ব নিপুণহস্তে নির্বাহ করে চলে, যেন যে-কান্নার ধ্বনি থেকে-থেকে শুনতে পায় তা হাওয়ার গোঙ্গানি মাত্র; হাওয়ার গোঙ্গানি মানুষের জীবনধারায় টোল ফেলে না, তার পদক্ষেপ মুহূর্তের জন্যেও শ্লথ করে না।

কখনো-কখনো নিজেই বুঝতে পারে, বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাটির জন্যে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মানুষ তারই অজান্তে অলক্ষিতে কত সময়ে কত কিছুর জন্যে অপেক্ষা করে : মেঘসঞ্চারের জন্যে, গাছের চূড়ায় মর্মরধ্বনির জন্যে, যে-ফিরিওয়ালার কাছে কিছু কেনবার নেই সে-ফেরিওয়ালারও ডাকের জন্যে, অকস্মাৎ কোথাও একটি হাসি বা শুধুমাত্র একটি কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে। তারপর আপদ-বিপদের জন্যে অপেক্ষা করে : রোগব্যাধি দুঃখ-কষ্টের জন্যে, বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর জন্যে, সর্বস্বান্ত-করা অগ্নিকাণ্ডের জন্যে মৃত্যুর জন্যে কেয়ামতের জন্যে। দুনিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত চক্রে আবর্তিত হয় জেনেও যে-সব ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় সে-সব ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করে : বিনামেঘে বজ্রাঘাত, কবর থেকে মৃতদের পুনরুত্থান, পাখিতে মানুষের রূপান্তরপ্রাপ্তি, এমন দিন যেদিন সকালে সূর্য উঠবে না। সচেতন-অচেতনভাবে জেনে-না-জেনে সম্ভব-অসম্ভব কত কিছুর জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে, সকিনা খাতুন কান্নাটির জন্যে অপেক্ষা করবে তা বিচিত্র কী। তবে শীঘ্র সে বুঝতে পারে কিছু ভয়-আশঙ্কার সঙ্গেই যেন অপেক্ষা করে, যে-কান্না সাধারণের গণ্ডিতে এবং সম্ভাব্যের বেড়িতে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে, সে-কান্না যেন আর সাধারণ ব্যাপার বলে মনে হয় না। কান্নাটি যে অন্য কেউ শুনতে পায় না, তা তার বুঝতে দেরি হয় নি। কিন্তু অন্য কেউ কেন শোনে না? কুমুরডাঙ্গা একটি ক্ষুদ্র শহর হলেও কত লোক সে-শহরে, তবু বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাটি শোনার জন্যে একমাত্র সে-ই কেন নির্বাচিত হয়েছে, কেন সে-ই এই অদ্ভুত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হয়েছে? যে-অধিকার অনন্যসুলভ, যাতে একজন বিশেষ মানুষ ছাড়া আর কারো হিস্‌সা নেই, যা থেকে আর সবাই বঞ্চিত, সে-অধিকার কঠিন অধিকার। কিন্তু বিচিত্র কান্নাটির অর্থ কী, কোথায়-বা তার উৎস? এ প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। না-ভেবেই সে বুঝতে পারে, কোথাও সহসা কান্না শুনলে কে কাঁদছে কেন কাঁদছে এমন যে-সব প্রশ্ন মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবে জেগে ওঠে, সে-সব প্রশ্ন বিচিত্র কান্নাটির বিষয়ে আপন মনেও জিজ্ঞাসা করা সম্ভব নয়, যেন জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্নটি এ-ঘর থেকে সে-ঘর, ঘর থেকে পথ, পথ থেকে মাঠ পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাবে না, হয়তো নিক্ষিপ্ত হবে মহাশূন্যে যেখান থেকে কিছু ফিরে আসে না, ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও নয়। তাছাড়া সে-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলে বা একটু ভাবলে সে হয়তো ভয়ানকভাবে বিস্মিত হয়ে পড়বে, যে-বিস্ময়ের ধাক্কায় সে তখন ধন্ধবৎ গুহাগহ্বরের মধ্যে দিয়ে এমন কোনো স্থানে উপস্থিত হবে যেখানে তার জরায়ুস্থিত নিরাপত্তার অবসান ঘটবে, যেখানে সুপরিচিত ছেঁড়া কাঁথার সোঁদালো গন্ধ বা মুখভাঙ্গা কলসিটা নেই, বাপের খড়ম-পরা পায়ের উচ্চ-কঠিন আওয়াজও শোনা যায় না। কান্নাটি সত্যি বিচিত্র। কেউ কোথায় অপরিচিত কণ্ঠে কাঁদছে শুনলে আপনা থেকেই মানুষের মন আর্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বিচিত্র কান্নাটি তেমন কোনো আর্দ্রতা সৃষ্টি করে না, যেন বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু গাছের শাখা-পল্লব অসিক্ত রয়ে গিয়েছে। সে-জন্যেই কি কান্নাটি শুনলেও ক-দিন ধরে ঠিক শোনে না, কেমন যেন কানেই ঠেকিয়ে রাখে, অন্তরে প্রবেশ করতে দেয় না?

তারপর একদিন তার মা জিজ্ঞাসা করে, "থেকে থেকে মনে হয় কেমন যেন কান পেতে থাকিস, যেন কি শুনছিস। কী শুনিস?"

মা সে-দিন ভালোই বোধ করেছিল। বারান্দায় বেরিয়ে একটি মাদুর পেতে বসেছিল। চমকিতভাবে সকিনা খাতুন একবার মায়ের দিকে দৃষ্টি দেয়, তারপর কোনো উত্তর না দিয়ে উঠানটি অতিক্রম করে যায়। কেবল উঠানের শেষপ্রান্তে পৌঁছাবার পর সহসা সে বুঝতে পারে বিচিত্র কান্নার কথা আর গোপন করে রাখার শক্তি তার নেই। মায়ের দিকে না তাকিয়ে সে বলে, রাতদিন কী যেন সে শুনতে পায়, কে যেন কোথাও সর্বক্ষণ কাঁদে।

তবে বছর দুই আগে একটি ঘটনা ঘটে। ছুটির দিন বলে মুহাম্মদ মুস্তফা দেশের বাড়িতে। একদিন অপরাহ্ণের দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে শুরু করে, পরনে বোতাম-খোলা

সাদা কোর্তা এবং হাল্কা রঙের লুঙ্গি। গ্রাম ছেড়েও সে হাঁটতে থাকে, উদ্দেশ্যহীনভাবে তবু দ্রুত পদে যেন সহসা হাঁটার নেশা ধরেছে তার। সে অকারণে বড় একটা হাঁটে না, তবু কালেভদ্রে একবার হাঁটতে শুরু করলে অনেকক্ষণ হাঁটতে পারে। দুই ক্রোশের মতো অতিক্রম করার পর একবার পূর্বদিকে তাকালে সে দেখতে পায় দিগন্তের কাছাকাছি মেঘ জমতে শুরু করেছে কিন্তু তবু তার পদক্ষেপ শ্লথ হয় না, যেন সে হাঁটতে শুরু করেছে বলে প্রয়োজন হলে মেঘই তার পথের সামনে থেকে সরে যাবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে এমন সময় তাল-সুপারি গাছপালা বেষ্টিত একটি গ্রাম সহসা তার পথ আগলে দাঁড়ায়। সামনে শুধু গ্রাম নয়, একটি খালও। সরু খাল, তবে পায়ে হেঁটে পার হবার মতো অগভীর নয়। এবার কী করবে তাই ভাবছে মুহাম্মদ মুস্তফা, এমন সময় সহসা ঝড় শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরে খালের পানিতে স্থানে-স্থানে রোলার-চাপা মসৃণতা, আবার কোথাও ঢেউ জাগিয়ে প্রবল বেগে হাওয়া বইতে থাকে যেন পশ্চাদ্‌ধাবী দুরন্ত কালো মেঘের আলিঙ্গন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সে-হাওয়ার অধীরতার শেষ নেই। তবে দ্রুতগামী মেঘ শীঘ্র তাকে ধরে ফেলে, এবং তারপর হাওয়া আর মেঘে হাতাহাতি হয় বলে বিশৃঙ্খল ধরনের বৃষ্টি নাবে। অবশেষে তাদের মধ্যে সন্ধি হলে, অথবা মেঘের কাছে হাওয়া হার মানলে নির্বাধায় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়, হঠাৎ থেমে-যাওয়া হাওয়া আর বাধা সৃষ্টি করে না। সে-বৃষ্টির মধ্যে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মুহাম্মদ মুস্তফা অবশেষে নদী পশ্চাতে রেখে সরু খালের পাড় দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে অনেকটা অন্ধের মতো, কারণ ততক্ষণে সূর্যাস্ত ঘটেছে, চারিদিকে বেশ অন্ধকারও হয়ে উঠেছে। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর সে হাতলিয়া নামক গ্রামে এসে পৌঁছায়। এবার সে-গ্রাম ছেড়ে কারো ক্ষেতের পাশ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথ ধরে চলতে থাকে। শীঘ্র সে গরুর গাড়ির পথের মতো একটা দো-নালা সড়কে এসে উপস্থিত হয়। অন্ধকার ততক্ষণে বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বৃষ্টির ধারাও শ্লথ হয় নি, তবু সে বুঝতে পারে সে-সড়কটা অতিক্রম করে ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলে চোখ বুজে কুমুরডাঙ্গায় ফিরতে পারবে। পথটি অতিক্রম করে একটা আইল ধরে আবার সে অগ্রসর হয়; পায়ের কাছে লুঙ্গিটা কাদায়-পানিতে সপ্-সপ্ করে, গায়ের লম্বা সাদা পাঞ্জাবিটা ভিজে একাকার।

আবার বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর সহসা সে দেখতে পায় অন্ধকারের মধ্যে সামনে বৃহৎ ঘন-কালো কিছু একটা দাঁড়িয়ে : কালোর ওপর কালোর প্রলেপ—এমন কালো যার চেয়ে আর কালো কল্পনা করা যায় না। তবে বস্তুটি তার চিনতে দেরি হয় না। সেটি মুক্তাগাছি গ্রামের প্রসিদ্ধ বটগাছ। চাঁদবরণঘাটে বাস করার সময় সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে দুই ক্রোশ পথ হেঁটে ঐ গাছটি দেখতে আসত। গাছটি যে প্রকাণ্ড শুধু তাই নয়, লোকদের ধারণা তার বয়স কয়েক শত বছরের কম নয় : কত রাজরাজ্যের উত্থানপতন হয়েছে, কত নদী পুরাতন খাত ছেড়ে নূতন খাতে ধারা স্থানান্তরিত করেছে, কত ঝড়ঝঞ্ঝা তুফান বয়ে গিয়েছে, সে-গাছটির কিছু হয় নি, সময়কাল উপক্ষো করে দাঁড়িয়ে থেকেছে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। গাছটির প্রাচীনতাই ছেলেদের আকর্ষণের কারণ ছিল। স্কুলে পঞ্চম কি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকে পড়েছিল, গাছপালা-উদ্ভিদ জড়পদার্থ নয়, তাদের প্রাণ আছে, তারা জীবজন্তুর মতো ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধ করে, নিবৃত্ত করে, নিদ্রা যায়, নিঃশ্বাস নেয়। মুহাম্মদ মুস্তফা এবং অন্যান্য ছেলেদের মনে হত, গাছপালার চোখ-কানও থেকে থাকবে, এবং ঘনপল্লবের আব্রুর ভেতর থেকে তারা নীরবে সব কিছু দেখে, শোনে। যে গাছ শত শত বছর ধরে জীবিত সে-গাছ যুগে-যুগে কত কিছু না দেখেছে শুনেছে। বৃহৎ বটগাছটির স্নিগ্ধশীতল গভীর ছায়ার নিচে এসে দাঁড়ালে তাদের মন নিমেষে সুদূর অতীতে চলে যেত, ঘনপাতার অস্ফুট মর্মরধ্বনির মধ্যে শুনতে পেত সে-সব মানুষের হাসি-কান্না যারা কবে কোন কুজ্ঝটিকাময় রঙ আকারহীন দিনে জীবনের খেলা সাঙ্গ করে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তারপর গাছটি দেখার সুযোগ হয় নি,

কারণ বাপ খেদমতুল্লার মৃত্যুর পর চাঁদবরণঘাট ছেড়ে চলে গিয়েছিল বলে এ-পথে আর আসে নি। তবু অনেকদিন সেটি তার মনে কেমন ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল।

বৃষ্টি তখনো থামে নি, তবে ধারাটি মিহিন হয়ে উঠেছে। হয়তো বটগাছটি তাকে তার বাল্যজীবনের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় বলে অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো গাছটির দিকে এগিয়ে যায়, তারপর তার তলায় পৌঁছে অল্প সময়ের জন্যে সেখানে দাঁড়াবার লোভ সম্বরণ করতে পারে না বলে একটু ইতস্তত করে দাঁড়িয়ে পড়ে, এ-সময় ভিজে কাপড়চোপড় সহসা ক্ষিপ্রগতিতে যতখানি সম্ভব নিঙড়েও নেয়।

কয়েক মুহূর্ত এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সহসা একটি কথা তার মনে পড়ে, যে-কথা তাকে প্রচণ্ড আঘাতই দেয়। তবে সে কি কালু মিঞার বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয় নি? বটগাছটি, তারপর পাঁচ-কোণা পানিতে টুইটুম্বর পুকুরটি, ওপাশে যে-বাহিরঘর এবং তার পশ্চাতে যে-আটচালা অন্দরঘর এবার অন্ধকারের মধ্যেও পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়, সে-সব কি কালু মিঞার সম্পত্তি নয় যে-কালু মিঞার নাম বাপ খেদমতুল্লার মৃত্যুর পর প্রায়ই শুনতে পেত? লোকেরা, বিশেষ করে বাড়ির লোকেরা বলত কালু মিঞাই বাপ খেদমতুল্লাকে খুন করেছিল এই কারণে যে লোকটি কলাকৌশলে অসদুপায়ে অন্যায়ভাবে যে-সব জায়দাদ-জোতজমি আত্মসাৎ করেছিল সে-সব জায়দাদ-জোতজমি থেকে তাকে বঞ্চিত করতে উদ্যত হয়েছিল বাপ খেদমতুল্লা।

মুহাম্মদ মুস্তফা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে, তার মনে হয় কিছুই যেন বুঝতে পারেছ না। তবে সে কি তারই অজান্তে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল? সে যে ভেবেছিল ঠিক পথেই হাঁটছে, এমন-কি এক-সময়ে হাতলিয়া গ্রামটিও চিনতে পেরেছে—সবই কি ভুল? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে সে। না, নিঃসন্দেহে সে ঘোর ঝড়-বৃষ্টিতে এবং দ্রুতাগত রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল, কারণ কালু মিঞার বাড়িঘর পুকুর সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও সমগ্র অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ বটগাছটি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দ্বিধা অনিশ্চিয়তার অবকাশ নেই।

আরো কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু প্রকৃতিস্থ হয়, এবং তখন একথাও বুঝতে পারে যে সে স্থানে এমনভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন হবে না। চতুর্দিকে নীরবতা, বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। এবার ভেজা মাটির ভেজা ঘাস লতাপাতার সোঁদালো গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। সে সহসা সজোরে একবার নিঃশ্বাস নেয়।

বটগাছের আশ্রয় ত্যাগ করবে এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পায়। কখন তারই অজান্তে সে পুকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যেন ওপাশে বাড়িঘরের দিকে তাকাবার সাহস নেই। এবার সভয়ে ওপাশে তাকালে প্রথমে অন্ধকারের মধ্যে শূন্য মাঠে আলেয়ার মতো কিছু দেখতে পায়, তারপর মানুষের মূর্তির মতো অস্পষ্ট কী-একটা ছায়াও নজরে পড়ে। ততক্ষণে আকাশটা কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠে থাকবে, কারণ আকাশের মধ্যখানে কতকগুলি ঝক্‌মকে তারা দেখা দিয়েছে যেন। তবে নীরবতা মাত্রাতিরিক্তভাবে গভীর হয়ে উছেছে। মুহাম্মদ মুস্তফা সে-নীরবতার মধ্যে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শূন্য মাঠে আলেয়ার দিকে, মানুষের মূর্তির মতো ছায়াটির দিকে। হয়তো বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটে; আলেয়াটি এবং ছায়াটি নিশ্চল। তারপর এক সময়ে সে বুঝতে পারে সামনে কোনো শূন্য মাঠ নেই। এবার কালু মিঞার বাহিরঘর, পশ্চাতে মস্ত আটচালা বাড়ি—সে-সব সহসা অতি নিকটেই মনে হয়। আলেয়াটি আলেয়াও নয়, কুপি মাত্র, এবং কুপিটি ধরে একটি লোক দাঁড়িয়ে ।

শীঘ্র কুপির আলো নড়ে ওঠে, মানুষটিও আর নিশ্চল থাকে না। সে যেন বটগাছের দিকেই আসছে। লোকটি আরেকটু এগিয়ে এলে বাহিরঘরের আলোয় প্রথমে তার দেহের মধ্যদেশ, তারপর সমস্ত দেহ নির্দিষ্ট আকৃতি ধারণ করে। সে কি বাহিরঘরের খোলা দরজার

কাছে এসে দাঁড়িয়েছে? নিঃসন্দেহে বাহিরঘরটি নির্জন হয়।

লোকটি কিন্তু সে-ঘরে ঢোকে না, ঘরের ভেতরে কোনো লোক থাকলে তার সঙ্গেও কথা বলে না; গভীর নীরবতা অক্ষুণ্ন থাকে। তবে এবার মুহাম্মদ মুস্তফা চমকে ওঠে, কারণ সে বুঝতে পারে বাহিরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটি তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাহলে লোকটি তাকে দেখতে পেয়েছে। চাঁদশূন্য রাত হলেও তাকে দেখতে পাওয়া শক্ত নয়। দূরত্বটা মন্দ নয়, কিন্তু ভিজে একাকার হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার পরনে সাদা কোর্তা, লুঙ্গিটাও হাল্কা রঙের। বটগাছের তলে তাকে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটি বিস্মিত হয়ে থাকবে। ঝড়-বাদলে পথিকের পক্ষে গাছের তলায় আশ্রয় নেয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এখন ঝড় নেই, বৃষ্টিও থেমে গিয়েছে। তাকে চোর-ডাকাত বলে কেউ ভুল করবে তাও সম্ভব নয়; এমন সাদা ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে চোর-ডাকাত চুরিচামারি বা ডাকাতি করতে বের হয় না। হয়তো সে-জন্যে লোকটি কেবল বিস্মিতই হয়েছে, ভয় পায় নি।

লোকটি আবার হাঁটতে শুরু করে, ধীরে-ধীরে, সন্তর্পণে, তবু নিশ্চিত পদে। সে কি এবার তার দিকেই আসছে? তাই মনে হয়। সে ধরা পড়ে গিয়েছে, পালাতে চাইলেও পালানো সম্ভব নয়, পা-দুটিও যেন গাছের গুঁড়ির মতো অনড় হয়ে পড়েছে। এবার মুহাম্মদ মুস্তফার মনে নিদারুণ ভয় জেগে উঠে তাকে প্রায় অসাড় করে ফেলে, হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ড আওয়াজে ধক্‌ধক্ করে বুকের মধ্যে বাড়ি খেতে থাকে, গলার ভেতরটা রোদে ঝল্‌সানো জ্যৈষ্ঠ-মাসের জমির মতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করে, এবং সচল মূর্তিটির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বলে মূর্তিটি তার চোখের সঙ্গে যেন খেলা করে; কখনো তা দেখতে পায় কখনো পায় না। তারপর একবার মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে অদৃশ্য থাকে, এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মুহাম্মদ মুস্তফার ভীতবিহ্বল মস্তিষ্ক অবশেষে বুঝতে পারে কুপিটাও অন্ধকারের মধ্যে সহসা মিশে গিয়েছে। তবে লোকটি বাড়ির ভেতরে চলে গিয়েছে কি?

মুহাম্মদ মুস্তফার সমগ্র দেহ টানা-ধনুকের মতো শক্ত-কঠিন হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ এবার শিথিল হয়ে পড়ে, সঙ্গে-সঙ্গে পা-দুটিতে অপরিসীম দুর্বলতা দেখা দেয়। তবে সে মনে-মনে বলে, আর বিলম্ব নয়, এবার পথ ধরা উচিত। সে বিলম্বও করে না। কেবল পা বাড়িয়েছে কি অমনি আবার একটি আওয়াজ শুনতে পেলে দ্বিতীয়বার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে দেখতে পায় কালু মিঞার বাহিরঘরের পাশে কুপি নিয়ে নয়, লণ্ঠন নিয়ে কে দাঁড়িয়ে, পাশে আরেকটি লোক। হয়তো দ্বিতীয় লোকটি আগের লোকই, কেবল তার হাতে এখন কুপিটি নেই। লোক দুটি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে তাদের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। কয়েক মুহূর্ত এমনি কাটে, যেন কিছু ঘটবে না। তবে মুহাম্মদ মুস্তফা এবার অপেক্ষাকৃতভাবে শান্ত বোধ করে; তার মনের ভয় যেন কিছু কমেছে, যেন অদূরে লোক দুটি বা তাদের পেছনে গভীর অন্ধকারে-ঢাকা কালু মিঞার বাড়িঘর তাকে আর ভীত করে না।

তারপর একটি বিকট কণ্ঠ রাত্রির নীরবতাকে খণ্ডবিখণ্ড করে।

"বটতলায় কে?"

হয়তো লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটি কথাটা জিজ্ঞাসা করে। সে কালু মিঞার বাড়ির মিঞামানুষ হবে। অন্য লোকটি হয়তো রাখাল মানুষ। প্রশ্নকারীর বিকট কণ্ঠের অন্তরালে কেমন ভয়ের আভাস। হয়তো ভূতে তার গভীর বিশ্বাস, এবং তাই সে নিশ্চিত হতে পারে না বটগাছের তলে মূর্তিটি রক্তমাংসের মানুষ না ভূতপ্রেত কিছু। হয়তো তার এই ভয় হয়, মূর্তিটি সহসা উত্তর দেবে সে অমুক মানুষের আত্মা তমুক গাছে বাস করে, যে-উত্তর নিঃসন্দেহে সচক্ষে ভূত দেখার চেয়েও অধিকতর ভীতিজনক শোনাবে।

মুহাম্মদ মুস্তফা বুঝতে পারে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু উত্তর দেওয়া কি সহজ? কী বলবে সে? আত্মপরিচয় দেওয়া যে এত শক্ত তা পূর্বে কখনো জানত না।

অবশেষে সে উত্তর দেয়। গলার স্বর যেন বুকের গহ্বরে কোথাও আশ্রয় নিয়েছিল, সেখান থেকে কণ্ঠনালী দিয়ে বেরিয়ে আসতে কিছু সময় নেয়।

"আমি মুহাম্মদ মুস্তফা।"

একটু নীরবতা। লণ্ঠন হাতে লোকটি নিশ্চল। লণ্ঠনের আলোয় তার চৌকা নক্‌শার লাল লুঙ্গিটি স্পষ্টভাবে নজরে পড়ে।

"কে মুহাম্মদ মুস্তফা?"

লোকটি পূর্ববৎ বিকট কণ্ঠেই আবার জিজ্ঞাসা করে, তবে এখন তার কণ্ঠে ভয় নয়, কী একটা ভাব। হয়তো ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা কে তা সে বুঝে নিয়েছে, কেবল কথাটি তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়।

মুহাম্মদ মুস্তফা কী উত্তর দেবে? কে সে? বাপ খেদমুতুল্লার পরিচয় ছাড়া তার কি স্বতন্ত্র কোনো পরিচয় আছে?

"আমি খেদমতুল্লার ছেলে মুহাম্মদ মুস্তফা।"

আবার গভীর নীরবতা নাবে—এমন নীরবতা যে তাতে কণ্ঠস্বর সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে কি সত্যিই কোনো উত্তর দিয়েছিল? সে নিশ্চিত হতে পারে না। সে অপেক্ষা করে। নিকটে কোথাও একদল কোলাব্যাঙ উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করে। পুকুরের পাড়ে কোথাও তারা মজলিশ বসিয়েছে। আকাশের মধ্যস্থলে অনেকখানি মেঘমুক্ত হয়ে পড়েছে বলে সেখানে অজস্র তারা দেখা দিয়েছে; তারাগুলি বৃষ্টিধৌত আকাশে নির্মল উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে।

মুহাম্মদ মুস্তফা অবশেষে বুঝতে পারে, উত্তরটি সত্যিই দিয়েছিল, এবং বেশ উচ্চকণ্ঠেই; লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটির গভীর নীরবতা তার প্রমাণ। বটগাছের তলা থেকে বেরিয়ে সে যখন কালু মিঞার বাড়িঘর পশ্চাতে রেখে পুকুরের পাড় দিয়ে উল্টো পথ ধরে, তখনো লোকটি কিছু বলে না। মুহাম্মদ মুস্তফা ধীরস্থিরভাবে হাঁটে, পায়ের ভেজা জুতায় ভস্‌ভস্‌ আওয়াজ হয়।

তবারক ভুইঞা মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুনের কথা বলছিল।

মেয়েটি যখন স্কুলে যায় বা স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে তখন দু-পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট থেকে অনেক লোক তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে; সেটি তাদের একটি নিত্যকার অভ্যাস। তবে সে-দিন যেভাবে তার দিকে তাকায় সেভাবে কখনো তাকায় নি।

প্রতিদিন বেলা সাড়ে ন'টার দিকে নদীর ধারের বাড়ি থেকে সকিনা খাতুন বেরিয়ে আসে। মাথায় কালো ছাতা, পিঠের কাছাকাছি বেণীর শেষাংশে জীর্ণ কালো ফিতার প্রজাপতি-বন্ধন, পরনে সাদা শাড়ি যে-শাড়ির পাড় কোনোদিন লাল কোনোদিন পিঙ্গল হলেও কখনো নূতনত্বের ধবধবে চেহারা গ্রহণ করে না; পায়ে স্যাণ্ডেল যা শুষ্কদিনে ক্রমশ ধুলাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দিনে শীঘ্র কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। তার হাঁটার ধরনটি ধীর-মন্থর, কেমন একটু মাজা-ভাঙ্গাও। খোঁড়া ন্যাংড়া নয়, হাঁটার একটা ঢঙ কেবল। হয়তো শরীরের গঠনের দোষ, বা লোকসমক্ষে দেহে-মনে গভীর লজ্জা দেখা দেয় বলে তারই অজান্তে হাঁটার ঢঙটা ঐ রকম হয়ে পড়ে। তবে নিত্য যারা তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে তারাও ঠিক বলতে পারবে না মেয়েটির চেহারা কী রকম, সে খাটো, লম্বা, কি মাঝারি ধরনের। কেবল দূর থেকে যাকে দেখতে পাওয়া যায়, তার মুখের ধরন বা উচ্চতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কি কখনো সম্ভব? এমন মানুষ যার হাল্কা-পাতলা অস্থিতে মাস-মাংস বলে কিছু নেই, তাকে দূর থেকে রোগা মনে না-ও হতে পারে, অন্য কেউ রোগা না-হলেও কোথায় সে যেন তার স্থূলতা লুকিয়ে রাখে, দূরত্বে তা ধরা পড়ে না। আবার দূর থেকে যাকে বেশ লম্বা দেখায় সে হয়তো লম্বা নয়, যাকে খাটো মনে হয় সে পাশাপাশি এসে দাঁড়ালে বোঝা যায় তার উচ্চতার বিষয়ে ধারণাটি চোখের ভুল মাত্র। দূর থেকে মানুষের মুখ সম্বন্ধেও কখনো-কখনো তেমনি ভ্রম হতে পারে। কোনো মুখ দূরত্বের

অস্পষ্টতায় আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, আবার কোনো মুখ যৌবন-লাবণ্য বা সতেজ স্বাস্থ্যের জন্যে নিকটে সুশ্রী মনে হলেও দূরে গিয়ে রেখাসর্বস্ব হয়ে পড়লে সে-মুখের গরঠিক, অসুন্দর রেখাই ধরা পড়ে কেবল। তবে সকিনা খাতুনের মুখ কদাচিৎ দেখা যায়, কারণ সে-মুখ বরাবর একটি বড় ধরনের ছাতার তলে অদৃশ্য হয়ে থাকে। ছাতাটি তার জন্যে পর্দার মতো, তাই মেঘাচ্ছন্ন আকাশ নিবর্ষণে গুমোট মেরে থাকলেও বা শীতের দিনে রোদটা মিঠেমিঠে হয়ে উঠলেও মাথা থেকে ছাতাটি কখনো সে নাবায় না। কোনোদিকে সে তাকায়ও না। হয়তো একরকমের চক্ষুহীন মাছের মতো ছায়া দেখে সামনের বাধা-প্রতিবন্ধক এড়িয়ে চলে। অথবা তার ধারণা হয়তো এই যে, তাকে দেখতে পাওয়া, তারপর তার জন্যে পথ করে সরে যাওয়া—এসব দায়িত্ব অন্যদের, তার নয়। গলি থেকে বেরিয়ে নদীর ধারের পথটি ধরে সকিনা খাতুন তার স্বাভাবিক ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ধীর-মন্থর গতিতে হাঁটতে শুরু করলে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা তাকে সর্বপ্রথম দেখতে পায়। বৃদ্ধ মানুষটি তখন সকালের দীর্ঘ এবাদতের পর কাষ্ঠবৎ নিশ্চলতার মধ্যে কাকনিদ্রা সম্পন্ন করে শিক্-দেয়া জানালার ভেতর দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে বসেছে : আধাপাকা ঝুলে-পড়া ভ্রূর নিচে তার জ্যোতিহীন চোখ ছায়াচ্ছন্ন, ভাবশূন্য। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি যখন তার দৃষ্টিপথে দেখা দেয় তখন সে কেবল একটি নিরাকার শুভ্র ছায়াই দেখতে পায়, যে-ছায়া নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সে অনুসরণ করে এবং তা অদৃশ্য হয়ে গেলে এবার বেদনাদায়ক অনিপুণতার সঙ্গে দেহবস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে কম্পিতহস্তে একটি জেব-ঘড়ি বের করে সময়টা যাচাই করে নেয়; সে বুঝতে পারে ঘরে-তৈরি দুটি সন্দেশের সঙ্গে একটি দাওয়াই খাবার সময় হয়েছে। তার জীবনটা নিয়মানুবর্তিতার দাস, ছেলে ডাক্তার বলে যার কড়াকড়িটা বেশ মাত্রাতিরিক্ত; বৃদ্ধ বাপের দীর্ঘ জীবনটা দীর্ঘতর করার জন্যে ডাক্তার-ছেলের চেষ্টার অন্ত নেই। এবং সকিনা খাতুন তাকে দাওয়াইর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ডাক্তার-ছেলের পরিকল্পনায় সাহায্য করে যেন।

সেদিন বৃদ্ধের চোখে মেয়েটি সহসা একটি স্পষ্ট আকার ধারণ করে, সে দেখা দিলে বৃদ্ধের চোখে অতিশয় বিরল একটি সচেতন-ভাবও জাগে, তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেলে জেব-ঘড়িটা বের করতেও তার দেরি হয়।

ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বৃদ্ধ-পিতার চোখের বাইরে যাবার আগেই সকিনা খাতুন আরেকটি মানুষের দৃষ্টিপথে ধরা দেয় : সে-মানুষ ডাক্তার-প্রতিবেশী উকিল আফতাব খানের বাড়িতে আশ্রিত খয়রাত মৌলভি। নিত্য এ-সময়ে ঘরের বারান্দায় বসে বাড়ির দুটি ছোট মেয়েকে সে কোরানপাঠ শেখায়, এবং সকিনা খাতুনকে যখন নিষ্পলক দৃষ্টিতে অনুসরণ করে তখন তার চোখে এমন একটি ভাব দেখা দেয় যেন এতদিন দেখেও মেয়েটির বেপর্দা-বিচরণ অনুমোদন করতে সক্ষম হয় নি। কিন্তু হয়তো সে বিস্মিতই হয়। বিস্মিত হয় এই কারণে যে তার মনে যুবতী-নারীর বেপর্দা বিচরণের বিরুদ্ধে যে-নিষেধাজ্ঞার কঠিন প্রাচীর তার পটভূমিতে মেয়েটিকে এত নিরীহ এত অনলোভনীয় মনে হয় যে সে-নিষেধাজ্ঞার প্রাচীরই সশব্দে ভেঙ্গে পড়ে। নিঃসন্দেহে সে-আওয়াজ তাকে চমকিত করে। তবে সেদিন মনে হয় খয়রাত মৌলভি অবশেষে সরল উন্মুক্ত দৃষ্টিতে মেয়েটির প্রতি তাকাতে সক্ষম হয়েছে। তার মুখটা খুলে থাকলেও তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ থেমে যায়; সে নিষ্পলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে।

উকিলের বাড়ির পাশে গাছপালা-ঢাকা পড়োজমি। তার পশ্চাতে কাছারির নাজির রহমত মিঞার কাঁচা বাড়িটি পথ থেকে কেবল আলিঝালি নজরে পড়ে। নাজিরের অল্পবয়স্কা পুত্রবধূ তাহেরা বানু স্নেহশীলা শ্বাশুড়ির হাতে সাংসারিক কাজকর্ম ছেড়ে যখন-তখন বাড়ির খিড়কিপথে—বাড়িটির মুখ নদীর দিকে নয়—এসে দাঁড়ায় গাছপালার মধ্যে দিয়ে পথে লোকচলাচল, অদূরে নদী বা খোলা আকাশে রঙের খেলা দেখবার জন্যে। তাহেরা স্বামীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত, কারণ তার স্বামী শিক্ষার্থে অন্যত্র বাস করে এবং কেবল ছুটিছাটাতে বাড়ি

আসে। তাহেরা বানুও মোক্তারের শিক্ষয়িত্রী মেয়েটিকে নিত্য চেয়ে-চেয়ে দেখে, স্বাধীনভাবে যে-মেয়ে চলাফেরা করে তার প্রতি একটি ঈর্ষাজনিত কৌতূহল বোধ করে সে। তবে সেদিন সহসা সে-কৌতূহলের রূপটা যেন ঘোরতরভাবে বদলে যায়; দূর থেকে দেখা মেয়েটির অস্পষ্ট ক্ষীণতনুটি অকস্মাৎ যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে—যে-রহস্য যুগপৎ আকর্ষণ করে এবং মনে কেমন একটা ভয়ও জাগায়। বস্তুত পথের মেয়েটিকে দেখলে দুর্বোধ্য কারণে তাহেরা বানুর বুকটা দুরদুর করে কেঁপে ওঠে।

মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে তারপর ছেলেদের হাই ইস্কুলের সামনে উপস্থিত হয়। লম্বা ধরনের মাঠের শেষে লম্বা ধরনেরই টিনবাঁশের স্কুল-বাড়ি যেখানে সে-সময়ে ছাত্রদের না হলেও দু-একজন শিক্ষকের বিশেষ করে তরুণ শিক্ষক সুলতানের আগমন হয়ে থাকে; নিকটে কোথাও একটি গৃহস্থ পরিবারের বাহিরঘরে সুলতানের আস্তানা। সে-জন্যে শুধু নয়, অন্য এক কারণে সে সকালে-সকালে এসে স্কুলে উপস্থিত হয়। কারণটি সকিনা খাতুন। মেয়েটির প্রতি তার আকর্ষণটি হয়তো স্বাভাবিক নয়, কারণ মেয়েটি তার মনে কোনো মোহ বা ভাবাবেগ সৃষ্টি করে না। বস্তুত তরুণ বয়সেও নারীর প্রতি তার কোনো মোহ নেই এবং অত্যাশ্চর্য স্বচ্ছতার সঙ্গেই সে তাদের পানে তাকাতে পারে, ভালো-মন্দ যা দেখবার তাও প্রথমদৃষ্টিতে নির্ভুলভাবে দেখে নেয়। সে জানে সকিনা খাতুনের চেহারায় বা দৈহিক গঠনে দেখবার তেমন কিছু নেই, বস্তুত কল্পনার আদর্শ রূপবতী নারীর তুলনায় তার দোষঘাট অজস্র। তবে তাতে দুঃখের কিছু সে দেখতে পায় না; কখনো এ-কথা তার মনে জাগে নি যে মেয়েটিকে সে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে একদিন ঘরে নিয়ে আসবে। যে-কারণে নিত্য তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে সেটা তাই ঠিক আকর্ষণ নয়, বরঞ্চ বলা যেতে পারে এক রকমের গবেষণা; সকিনা খাতুন তার গবেষণার পাত্রী। তার বিশ্বাস একদিন মেয়েটির মধ্যে সহসা এমন কিছু সে দেখতে পাবে যার সাহায্যে তার প্রশ্নের উত্তর পাবে। প্রশ্নটি এই : যে-মেয়ে নিত্য একাকী পথে বের হয় সে-মেয়ে এখনো অক্ষতদেহ কুমারী কিনা। কৌতূহলটা যে নিতান্ত অশ্লীল তা নিজেই বোঝে এবং সে-জন্যেই গবেষণাটি একরকমের ভয়ানক নেশার মতো তাকে পেয়ে বসেছে।

তবে সেদিন গবেষণাটি সহসা অন্য, এবং নিতান্ত শ্লীল রূপ ধারণ করে। পূর্বের মতোই মেয়েটির আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখে তবে তার মধ্যে অন্য এক প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে, এবং কোনো উত্তর খুঁজে না পেলেও শীঘ্র একটু আশ্বস্ত হয়; মেয়েটির মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখতে পায় না।

শীঘ্র সকিনা খাতুন দুই রাস্তার সংযোগস্থলে এসে উপস্থিত হয়। সোজা পথটি যায় কাছারি-আদালতের দিকে। যেটি মোড় নেয় ডান দিকে নদীকে পশ্চাতে রেখে সেটি শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সকিনা খাতুন দ্বিতীয় পথটি ধরে। সামনে দোকানপাট; পথটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরের প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে যায়। প্রথমে পড়ে সারিবাঁধা চার-পাঁচটি হোটেল যে-সব হোটেলে ব্যবসা-মামলা-মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমুরডাঙ্গায় এসে গ্রামবাসীরা দু-এক রাতের জন্যে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে। এত বেলাতেও সে-সব হোটেলে কেউ-না-কেউ অলসভঙ্গিতে এবং নির্বিকারচিত্তে গড়াগড়ি দেয়। অপরিচিত অজানা লোকেদের সান্নিধ্য যতটা সম্ভব এড়াবার জন্যে সকিনা খাতুন হোটেলগুলির সামনে পৌঁছাবার আগে রাস্তাটা অতিক্রম করে ওপাশে চলে যায়, এ-সময়ে অজ্ঞাতসারেই বুকের কাপড়টা আরো টেনে নেয়, পদক্ষেপটা একটু দ্রুত করে তোলে; দোকানপাটের লোকদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও তারা একই শহরের বাসিন্দা বলে তাদের তেমন লজ্জা হয় না, কিন্তু হোটেলের মক্কেলদের সামনে বড় লজ্জা হয়। তাছাড়া একদিন একটি হোটেলে একজোড়া চোখ দেখতে পেয়েছিল : পাথরের মতো নিশ্চল নিথর চোখ। সে-চোখে সে কী দেখেছিল জানে না, কিন্তু তখন থেকে হোটেলগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে তার পিঠটা যেন শিরশির করে ওঠে।

হোটেলগুলির পরে আসে মুদিখানা, যেখান থেকে চাল-ডাল রশুন-পেঁয়াজের ঝাঁজালো-মধুর গন্ধ ভেসে আসে। সে-দোকান থেকে পাল্লায় চাল-ডাল ওজন করতে-করতে দোকানের মালিক ফনু মিঞা তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়, কয়েক মুহূর্ত শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়েই আপন কাজে মনোনিবেশ করে। তবু সে-সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কালো ছাতার নিচে চিবুক হতে শুরু করে পা পর্যন্ত মেয়েটির সর্বাঙ্গ দেখে নেয়। মেয়েটিকে নিত্য তাকিয়ে দেখা যাদের অভ্যাস তাদের মধ্যে মুদিখানার মালিকই তার ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ধরনের হাঁটার কারণ সন্ধান করে। চাল-ডালের ব্যবসা করে বলে সকলের বাড়ির হাঁড়ির খবর সে রাখে। সে জানে, দেশের বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের দাবি-দাওয়ায় সদা উত্ত্যক্ত অনেক সন্তান-সন্ততির বাপ মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের আর্থিক অবস্থা আদৌ সচ্ছল নয়। মেয়েটা তাই মাইনর স্কুলে ছাত্রী পড়িয়ে সামান্য পয়সা কামিয়ে সংসারের অনটন কিছু লাঘব করার চেষ্টা করে, নিজে প্রায় অনাহারে থেকে বিশ্রাম না নিয়ে। মুদির বিশ্বাস, মেয়েটির মাজা-ভাঙ্গা ধরনের হাঁটার কারণ তার শারীরিক দুর্বলতা। তবে আজ সে সকিনা খাতুনকে দেখতে পেলে সে তার স্বাস্থ্যের কথা ভাবে না, অন্যদিনের মতো তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়েও নেয় না, বরঞ্চ তার দিকে তাকিয়ে প্রস্তরবৎ নিশ্চল হয়ে থাকে।

মুদিখানার কিছু দূরে পথের ডান ধারে সে-পথের একমাত্র ঔষধালয় দেখা যায়। নানা রঙের রহস্যময় পানিতে ভরা বড়-বড় কতগুলি কাচের পাত্র, দাওয়াইর শিশি-প্যাকেট ইত্যাদিতে সজ্জিত পুরানো কয়েকটা আলমারি, দেয়ালে বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন—একটি বিবর্ণ ঈষৎ ছেঁড়া বিজ্ঞাপনে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিদেশিনী নারী দাঁত বের করে হাসছে আজ ক-বছর ধরে তার ইয়ত্তা নেই—এবং সে-সবের মধ্যে বসে যুগপৎ কম্পাউণ্ডার-ওষুধবিক্রেতা রুকুনুদ্দিন শেখ সকিনার দিকে যখন তাকায় তখন কখনো-কখনো তার কথা নয় তার মায়ের কথা সে ভাবে; মুদি যেমন মানুষের হাঁড়ির খবর রাখে সে তেমনি মানুষের নাড়ির খবর রাখে। সে জানে মেয়েটির মায়ের শরীর বড়ই খারাপ, পায়ে ভর দিয়ে একদিন উঠে দাঁড়ায় তো তিন দিন শয্যাশায়িনী হয়। ইদানীং সে-বাড়ি থেকে ওষুধপত্রের জন্যে কেউ আসে নি। মোক্তারের স্ত্রীর চিকিৎসার অবহেলাই হয়ে থাকবে। সে যে সহসা আরোগ্য লাভ করেছে তা সম্ভব নয়; তার ব্যাধি একটি নয়, এবং সর্দিকাশির মতো তুচ্ছ জিনিসও নয়; কোনো-কোনোদিন মুদির দোকানের মালিকের মতো সে সকিনা খাতুনের স্বাস্থ্যের কথাও ভাবে, তবে তার মাজা-ভাঙ্গা ধরনের হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে দোষের কিছু দেখতে পায় না। সে জানে দৈহিক গঠনের ওপর মানুষের হাঁটার ভঙ্গি নির্ভর করে, কিন্তু মেয়েটি যেভাবে ধীরে-ধীরে নিস্তেজভাবে হাঁটে তাই দেখে তার ধারণা হয়, এখনো সে সুস্থতার বাহ্যিক রূপ নিয়ে চলাফেরা করলেও সহসা একদিন তার স্বল্পপুঁজি স্বাস্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তখন তার মায়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে তেমনি নানাপ্রকার রোগব্যাধি দ্বিরুক্তি না করে তাকে আক্রমণ করবে।

তবে সেদিন রুকুনুদ্দিন মেয়েটির স্বাস্থ্যের কথা বা তার অসুস্থ মায়ের কথা ভাবে না, বস্তুত ঔষধালয়ে বসে থাকলেও মানুষের জীবন-মরণ ব্যাধি-যন্ত্রণার কথা তার স্মরণ হয় না, কারণ সহসা এমনই স্থানে তার মন নিক্ষিপ্ত হয় যেখানে সবই যেন দুর্বোধ্য, যেখানে কোথাও কুলকিনারাও নজরে পড়ে না।

কুমুরডাঙ্গার একটি লোকই গভীর স্নেহমমতার সঙ্গে সকিনা খাতুনের প্রতি তাকায় : সে মোহনচাঁদ। চা-মিষ্টির দোকানের পর রতন নামক বোবা লোকটির কাঠগোলার পাশে কাপড়ের দোকানগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটি, সেটি মোহনচাঁদের। অনেক দিন আগে ইংরেজ-হিন্দুদের আধিপত্যের সময়ে পশ্চিমের কোনো অঞ্চল থেকে তার পূর্বপুরুষ এ-মফস্বল শহরে এসে গুড়ের ব্যবসা খুলেছিল যা পরে কী-করে থানকাপড়ের ব্যবসায় পরিণত হয়। বংশানুক্রমে তাদের ভাষা স্থানীয় জবানের সঙ্গে এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়েছে যে আজ তা না-দেশী না-বিদেশী, না-বাঙলা না-বিহারি-মাড়োয়ারী। তবে ভাষাটা জগাখিচুড়ির মতো

হলেও মোহনচাঁদ যখন হাঁপর-হাসি হেসে শ্লেষ্মাঘনকণ্ঠে কিছু বলে তখন তার মনোভাব বুঝতে কারো বেগ পেতে হয় না এই কারণে যে প্রতিটি শব্দ যেন গোলাবারুদের মতোই নিঃসৃত হয় তার মুখ থেকে। যে-মানুষের পিতা-পিতামহ হরি-হরি করে ভজন গান ধরে সকালে দোকান খুলত, তাদেরই বংশধর কোনো-কোনোদিন সে-গানের সুরে বা কথায় কোনো পরিবর্তন না এনে কেবল হরির স্থলে খোদার নাম বসিয়ে শুভকাজ শুরু করে। সেদিন তার উদাত্ত কণ্ঠ দোকানপাটের রাস্তার এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত শোনা যায়। মধ্যে-মধ্যে মস্ত-মস্ত ফোকলা দাঁত দেখিয়ে দিলদরিয়াভাবে হেসে সে বলে, লোকেরা যেন তাকে মোহনচাঁদ নয়, মামুনচাঁদ বলেই ডাকে। কিন্তু সে-নাম কারো মুখে আসে না : লোকটির বিশাল দৈহিক আকারে এবং তার মুখের খাঁজে-খাঁজে যে-শাশ্বত প্রাচীনতা অপনেয়ভাবে লিখিত—তা উপেক্ষা করা সহজ নয়।

সকিনা খাতুন যখন দোকানের সামনে দেখা দেয়, তার ঘণ্টাকয়েক আগেই মোহনচাঁদ লোহার বেড়ি-দেয়া কাঠের মস্ত দরজা খুলে বহুব্যবহৃত শীতলপাটিতে আবৃত প্রশস্ত চৌকিতে আসনাধীন হয়ে বসেছে। মধ্যে-মধ্যে বেশ সকালেই তার দোকানে খদ্দেররা এসে উপস্থিত হয়; মামলা-মকদ্দমার জন্যে শহরে উপস্থিত গ্রামবাসীদের অনেকে আদালত বসার আগে কেনাকাটা করে ফেলতে চায়। তবে খদ্দের-পরিবেষ্টিত থাকলেও সকিনা খাতুন থানকাপড়ের দোকানের মালিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। দেড় বছর আগে মেয়েটি যখন প্রথম এ-পথে দেখা দেয় তখন মোহনচাঁদের মনে হয়েছিল, সে যেন ইঁদুরের ছা, এবং পরদিন মোহনচাঁদ যখন জানতে পারে সে স্কুলে পড়তে না গিয়ে পড়াতে যায় তখন তার বিস্ময়ের অবধি থাকে নি। কথাটি সে যথাসময়ে তার স্ত্রীকেও বলেছিল, এবং দোতলা-বাড়ির ওপর তলার জালি-ঢাকা জানলা থেকে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে তার স্ত্রীও বিস্মিত না হয়ে পারে নি, হয়তো স্বামীর মতো মেয়েটির প্রতি একটা দরদভাবও সে বোধ করে তখন। মোহনচাঁদের স্ত্রী তার স্বামীর মতো বিশালকায় নারী; তার উচ্চপ্রশস্ত কাঠামোর ওপর নিয়মিতভাবে অকৃপণ মাত্রায় মেদের সঞ্চার চলছে বলতে গেলে আজন্ম থেকে, যার মাত্রা যৌবনোত্তরকালে আরো বেড়ে যায়। তার বিশাল নরম দেহে কিন্তু স্নেহের অন্ত নেই।

একদিন মোহনচাঁদ স্থির করে মেয়েটিকে একটি শাড়ি উপহার দেবে। মধ্যে-মধ্যে শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের দু-একটা শাড়ি বা কিছু থানকাপড় দিয়ে থাকে। কখনো সরাসরিভাবে উপহার হিসেবে দেয়, কখনো আবার বাকিতে দিয়ে পয়সার কথা আর তোলে না; কোনো-কোনো মানুষের বিবেকের জন্যে শেষোক্ত উপায়ে উপহার গ্রহণ করা সহজ। একদিন মোহনচাঁদ সকিনা খাতুনের জন্যে একটি টুকটুকে লাল শাড়ি তুলে রাখে এবং বিনা মতলবে নিঃস্বার্থভাবে কাউকে কিছু উপহার দেবে এ-কথায় গোপনে-গোপনে বেশ পুলকিত বোধ করে। তবে কীভাবে মনস্কামনাটি পূর্ণ করে তা বুঝতে না পারলে শেষ পর্যন্ত শাড়িটা দেওয়া হয় নি। মেয়েটা যদি কিছু মনে করে, বা ফিরিয়ে দেয়? অকারণে উপহার দেওয়া যেন শক্ত কাজই। কারণ যে নেই তা নয়, কিন্তু কারণটা বলা যেন কঠিন : মেয়েটিকে এ-পথ দিয়ে যেতে দেখি প্রতিদিন। আহা, ছোট এইটুকু মেয়ে মাষ্টারনিগিরি করে, কেমন মায়া হয়। তারপর গ্রাম থেকে এক জোতদার এসে শাড়িটা কিনে নিয়ে গেলে সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়। তবে সাময়িকভাবে, কারণ সম্প্রতি আবার খেয়ালটা ফিরে এসেছে। একটা শাড়িও হাতে পেয়েছে যা মেয়েটির কথা মনে করে খদ্দেরের সামনে বের করে নি এখনো : মিহিন সুতার শাড়ি, হাল্কা নীল রঙ, রক্তজবার মতো লাল পাড়।

সেদিন মেয়েটি পথে দেখা দিলে মোহনচাঁদ কিন্তু শাড়ির কথা ভুলে অস্পষ্ট কৌতূহলের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেলে হঠাৎ কেমন লজ্জিত বোধ করলে আপন মনে স্থির করে, হরি খোদা বলে আজই পাঠিয়ে দেবে শাড়িটা।

কাপড়ের দোকানগুলি শেষ হলে এবার পড়ে দুটি মনোহারী দোকান যে-দোকান দুটির

দিকে তাকালে মনে হয়, তারা জোর করে গা-ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুটির কোনোটাতেই সামগ্রী বিশেষ কিছু নেই, খদ্দেরও তেমন নেই বলে বেচাকেনাও বিশেষ হয় না।

তারপর সাইকেলের দোকান, যে-দোকানের ঝাঁপ উঠলে নিত্য কয়েকটি সাইকেল আত্মপ্রকাশ করে। এ-শহরে সাইকেল-ক্রেতা বিরল, তাই দীর্ঘদিন ক্রেতার আশায় দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে দোকানের সাইকেলগুলি এতদিনে বেশ রঙচটা হয়ে উঠেছে। তবে সে-বিষয়ে দোকানের মালিকের অবজ্ঞা ভিন্ন কিছু নেই। দোকানদার ছলিম মিঞাও মোটা সোটা ধরনের মানুষ, যেন ব্যবসায়ের দরিদ্র অবস্থার সঙ্গে স্বাস্থ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। আকেরটি ব্যাপারেও একটু অসামঞ্জস্যতা দেখা যায়। সেটি দোকানদারের মেজাজ, কারণ স্থূল মানুষ সম্বন্ধে সদা হাসিখুশি মেজাজের প্রচলিত জনমতকে মিথ্যা প্রমাণ করে লোকটি সর্বদা রুক্ষ মেজাজ প্রকাশ করে থাকে। তার কপাল জুড়ে বিরক্তি-ভাব কয়েকটি গভীর রেখায় স্থায়ীভাবে অঙ্কিত, চোখে সমগ্র জগতের প্রতি অবিশ্বাস-বিদ্রূপ, এবং কখনো যদি মুখে হাসি ফোটে সে-হাসি ব্যঙ্গমূলক মুখব্যাদানের মতো দেখায়। ধূলাচ্ছন্ন দোকানটিতে পরিচিত কেউ দু-দণ্ড কথালাপের জন্যে এসে হাজির হলে মধ্যে-মধ্যে সে কটূক্তি বা মুখবিকৃতি করে তিক্তরসসিঞ্চিত মতামত প্রকাশ করা ব্যতীত অধিকাংশ সময়ে ভ্রূকুটি-সহকারে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে থাকে; সে ফালতু কথালাপের পক্ষপাতী নয়। সকিনা খাতুন যখন তার দোকানের সামনে দেখা দেয় তখন সে ভ্রূকুটি-সহকারেই তার দিকে তাকায়। তবে কখনো এক পলকের বেশি নয়। দেখামাত্র চোখ সরিয়ে নেয়, যেন প্রতিদিন তার দিকে একবার তাকানো একটি অভ্যাস হলেও অভ্যাসটি তার নিজেরই মনঃপূত নয়, মেয়েটির প্রতি তার কোনো কৌতূহলও নেই। তবে সেদিন মেয়েটি তার দোকানের সামনে দেখা দিলে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, ভ্রূকুটিটা তেমন সুস্পষ্ট মনে হয় না।

দোকানপাট শেষ হলে অল্পক্ষণের মধ্যে জাঙ্গার-পড়া তারের বেড়া এবং সারি বাঁধা গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটি জায়গা পড়ে। ভেতরে লম্বা-লম্বা ঘাস, বনকাঁটা-ঝোপঝাড়, এক কোণে কলাবাগান। স্থানটি পতিতজমি বলে মনে হয়। গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে তাকালে পেছনে একটি পরিত্যক্ত দালানবাড়ির মতো নজরে পড়ে, কিন্তু ভালো করে তাকালে বোঝা যায় সেটি দালানবাড়ি নয়, কারণ সেটি এত ছোট যে তা মানুষের বাসস্থানের যোগ্য হতে পারে না। বস্তুত সেটি কুমুরডাঙ্গার সরকারি শবঘর।

শবঘর পেরিয়ে গেলে এবার একটি খোলামেলা মাঠের মতো পড়ে, তারপর দেখা দেয় কুমুরডাঙ্গার ক্ষুদ্র হাসপাতাল। হাসপাতালটির সামনের শবঘরের মতো অনেকটা জায়গা, তবে সেখানে কোনো গাছপালা-ঝোপঝাড় নেই। হাসপাতাল থেকে ডাক্তার নার্সরা অবাধেই তাকায় তার দিকে। আজ তারা যেন জটলা করে তাকায় তার দিকে।

হাসপাতাল পেরিয়ে তারই পাশ দিয়ে একটি গলি ধরে সকিনা খাতুন অগ্রসর হয়। কিছুক্ষণ বাড়িঘর পড়ে না; হাসপাতালটি ক্ষুদ্র হলেও তার সামনে-পেছনে বিস্তর জায়গা। হাসপাতালের সীমানা শেষ হলে একটি নিঃসঙ্গ তালগাছের পর দরিদ্র-পাড়া শুরু হয়। সেখান থেকে এবার আবার অনেক চোখ কৌতূহলের সঙ্গে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখে।

দরিদ্র-পাড়াটি একপাশে রেখে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে ভুঁই ফুড়েই যেন গরুগাড়ির চাকায় সুগভীরভাবে অঙ্কিত একটি পথ জেগে ওঠে যে-পথের আগামাথা নেই বলে মনে হয়।

শীঘ্র সকিনা খাতুনের পথ শেষ হয়। গরুগাড়ির চক্রাঙ্কিত পথটি রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে দু-পাশে দু-চারটে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাড়িঘর আত্মপ্রকাশ করে যার একটি কারো বসতবাটি নয়; সেটি কুমুরডাঙ্গা শহরের মেয়েদের মাইনর স্কুল।

সচরাচর সকিনা খাতুনের আগেই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী করিমুন্নেসা বানু স্কুলের এসে পৌঁছায়। করিমুন্নেসা বানু বহুসমস্যা-জর্জরিত বিধবা মানুষ, শিক্ষয়িত্রী বা ছাত্রীর ওপর তার

সদা-বিষণ্ন দৃষ্টি কদাচিৎ পড়ে থাকে। তবে সেদিন স্কুলে প্রবেশ করতেই সকিনা খাতুন করিমুন্নেসা বানুর কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। "এই যে তুমি এসে গিয়েছ", প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলে। হয়তো স্বভাববিরুদ্ধ ধরনের অভ্যর্থনা জানিয়েছে বুঝে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে কী বলবে তা স্থির করতে পারে না। এ-সময়ে সকিনা খাতুন আরো দু-একজন শিক্ষয়িত্রীকে দেখতে পায়। তারা প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে তারই দিকে কেমন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে, যেন তাকে আগে কখনো দেখে নি বা সে যেন কোনো প্রকারের গুরুতর অপরাধ করেছে। কয়েক মুহূর্তব্যাপী কেমন অস্বস্তিকর নীরবতার পর প্রধান শিক্ষয়িত্রী সকিনা খাতুনের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রশ্ন করে,

"তুমি নাকি কী-একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পাও?"

সকিনা খাতুন উত্তর দিতে একটু দেরি করে। অবশেষে শুষ্ককণ্ঠে আস্তে বলে,

"হ্যাঁ।"

তারপর তাদের দিকে তাকাতে সাহস হয় না বলে সে নতদৃষ্টিতে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

বৃহৎ বটগাছটির পাশে কালু মিঞার বাড়ির সামনে যেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা দেখা দিয়েছিল তার দু-দিন পরে জুমার নামাজের সময় একজন মধ্যবয়সী জামাই আর একজন চাকরের কোলে চড়ে কালু মিঞা গ্রামের মসজিদে হাজির হয়। বৃদ্ধ কালু মিঞাকে বছর কয়েক যাবৎ বাইরে কেউ দেখে নি; অগ্রহায়ণ মাসের এক ভরা দুপুরে কী একটা নিদারুণ রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লে তার বাইরে আসা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে পড়ে।

কালু মিঞার চেহারা দেখে মসজিদে সমবেত গ্রামবাসীরা বিস্মিত হয়। একদিন যে দরাজগলা কর্মব্যস্ত স্বাস্থ্যবান লোক ছিল, বলবতী ধারার মতো যার মধ্য দিয়ে অফুরন্ত জীবনশক্তি প্রবাহিত হত, তাকে চেনাই দুষ্কর। ভ্রূ-দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছে, কোটরাগত চোখ অন্ধের চোখের মতো জ্যোতিহীন, অস্বচ্ছ, অস্থিচর্মাবিশেষ মুখ শত বলিরেখায় কুঞ্চিত। জামাই এবং ভৃত্যটি তার অথর্ব, হাড়সম্বল হাল্কা দেহটি সামনের সারিতে বসিয়ে দিলে দুর্বল মেরুদণ্ডের ধনুকসম বক্রতা নিমেষে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে, মুখটাও এমনভাবে বুকের ওপর ঝুলে পড়ে যে মনে হয় তা তুলে রাখার ক্ষমতা তার নেই, এবং শীঘ্র আরো মনে হয় দেয়াল-ফুটে-গজানো গাছের মতো সেটি যেন তার ধসে-পড়া বুক ভেদ করেই উঠেছে। তার কোটরাগত চোখ এ-সময়ে অদৃশ্য হয়ে পড়ে। হয়তো সে-চোখ শ্রান্তিতে নিমীলিত হয়ে পড়ে, হয়তো তাতে তন্দ্রা নেবে আসে; বর্ষার দিনে মেঘের মতো অতি অনায়াসে বৃদ্ধ মানুষের চোখে ঘুমতন্দ্রা আসা-যাওয়া করে।

কালু মিঞার চেহারা নামাজিদের মনে একটি বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে, তাদের আকস্মিক দীর্ঘশ্বাসে ছোট মসজিদ-ঘর বার-বার প্রতিধ্বনিত হয়; তার চেহারা নিঃসন্দেহে কালের নির্দয়তার কথাই তাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। একদা আপন চেষ্টায় কত কিছু না করেছে লোকটি : বিস্তর জোতজমি বিষয়আশয়, পুকুরের ধারে মস্ত আটচালা বাড়ি, ফলমূলের বাগান। ধীরে-ধীরে আশেপাশে এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হয় যে সকলে তাকে মাতব্বর হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে; লোকেরা নানা ব্যাপারে উপদেশ-পরামর্শ চাইতে তার কাছে আসত, তার অনুমতি বিনা বিয়ে-শাদি বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করত না। দুঃস্থ মানুষেরাও তার সাহায্যপ্রত্যাশী হয়ে পড়ে, সে-ও তাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে কখনো-কখনো মুক্তহস্তে তাদের ধান-চাল-পয়সা দিত, ধার-কর্জ হলে তা পরিশোধ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করত না। তবে নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ হয়তো কখনো সম্ভব নয়, কারণ আলো যেমন পতঙ্গ আকর্ষণ করে তেমনি মানুষের সৌভাগ্য হিংসুকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই একদিন খেদমতুল্লা নামক একটি লোকের ছায়া এসে পড়ে কালু মিঞার সুখ স্বচ্ছন্দপরিপূর্ণ জীবনের প্রাঙ্গণে। সহসা সবাই জানতে পায় যে একখণ্ড পৈতৃক জমি ছাড়া

অন্যান্য জোতজমির ওপর কালু মিঞার কোনো স্বত্বাধিকার নেই, দলিলপত্র জাল করে একটি সঙ্গতিপন্না কিন্তু মূর্খ নির্বোধ বিধবা এবং তার নাবালক সন্তান-সন্ততিদের ঠকিয়ে সে-সব সে নাকি আত্মসাৎ করেছে। বিধবা নারীটিকে পরামর্শ দিয়ে হক্ দাবিদাওয়া সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে কালু মিঞার হাত থেকে অন্যায়ভাবে কবলিত সে-সব সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয় খেদমতুল্লা। প্রতিদানে সে কী আশা করেছিল কে জানে, তবে তার অন্তরে অর্থলোভের চেয়ে ঈর্ষাই ছিল বেশি; পরের সুখে তার অন্তরে অর্থলোভের চেয়ে সর্বনাশী আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠত। গ্রামবাসীরা বুঝে উঠতে পারে নি কার পক্ষ নেবে—কালু মিঞার, না খেদমতুল্লার। কালু মিঞার প্রতি আনুগত্য দেখালেও এবং সময়ে-অসময়ে তার সুখের অংশীদার হলেও তারাও কি তার উন্নতিতে গোপনে-গোপনে ঈর্ষাবোধ করে নি? সকলের অন্তরেই ঈর্ষা থাকে। প্রতিবেশীর ক্ষেতে ভালো ফসল হয়েছে দেখে কার না ইচ্ছা হয় গরুটা ছেড়ে বা আইলটা কেটে সে-ফসল নষ্ট করে? ঈর্ষান্বিত হয়ে কেউ পরের ক্ষতি করে কেউ করে না, কিন্তু পরের ক্ষতিতে সবাই খুশি হয়। তাই কী হবে তা দেখবার জন্যে তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে শুরু করে।

তবে সে-দফা কালু মিঞা রক্ষা পায়, কারণ যার মনে প্রচণ্ড ঈর্ষা দেখা দিয়েছিল এবং যে তার বিষম ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছিল, সে-ই নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ হারায়। হয়তো অদৃশ্য বিচারের খড়্গ সদা খাড়া, সদা প্রস্তুত, কখন এবং কেন কার মাথায় নেবে আসে তা সব সময়ে বোঝা সম্ভব নয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কালু মিঞা বলেছিল, খোদার দুনিয়ায় সুবিচারের অভাব নেই, হিংসাত্মক হয়ে যে নির্দোষ মানুষের ধ্বংস করতে চায় সে-ই ধ্বংস হয়। তবে লোকেরা অবিলম্বে একটি কথা শুনতে পায়। সেটি এই যে, খেদমতুল্লার মৃত্যুতে কালু মিঞার নাকি হাত ছিল। হয়তো ছিল, হয়তো ছিল না : বিচারের খড়্গ কখন কার হাতে গিয়ে ওঠে কে জানে। গ্রামবাসীরা সব সময়ে সে-সব কথা জানতে চায় না। অতএব সে যে নির্দোষ তা জানাবার জন্যে কালুমিঞা যে-কথাটি প্রচার করেছিল সে-কথা বিশ্বাস করে নি, অবিশ্বাসও করে নি, শুধু শুনে গিয়েছিল। নিঃসন্দেহে কথাটি আজগুবি, তবু তারা যা স্বচক্ষে দেখে নি তার সত্যাসত্য নিয়ে কী করে মতামত প্রকাশ করে? তাছাড়া খেদমতুল্লা আর বেঁচে নেই, ওদিকে কালু মিঞার জীবন জোতজমি প্রভাবপ্রতিপত্তি সবই অক্ষত অক্ষুণ্ন। মানুষের আত্মরক্ষার প্রয়োজনও তারা বোঝে না? শত উপায়ে মানুষকে আত্মরক্ষা করতে হয়, কখনো সত্য বলে কখনো মিথ্যা বলে। এবং কখনো সত্য অবিশ্বাস্য মনে হয় আবার কখনো জলজ্যান্ত মিথ্যা বিচারকের ঘরেও অখণ্ডনীয় সত্য বলে গৃহীত হয়। কথাটি না বলে কালু মিঞার উপায়ই-বা কী ছিল। যে-স্থানে খেদমতুল্লার মৃত্যু ঘটে তার নিকটে মীরন শেখ নামক কালু মিঞার একজন বিশ্বস্ত লোককে কি দেখা যায় নি?

কালু মিঞা বলেছিল, সিন্দুরগাঁ-এ নিঃসন্দেহে কোনো নিরপরাধ পরিবারের ধ্বংসের মতলব এঁটে খেদমতুল্লা যখন কামলাতলা বিলের পাশ দিয়ে চাঁদবরণঘাট অভিমুখে যাচ্ছিল তখন সে-পথ দিয়ে মীরন শেখও বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যা হয়-হয়। মীরন শেখ সহসা দেখতে পায় খেদমতুল্লাকে, বগলে ছাতা নিয়ে লুঙ্গিটা একহাত দিয়ে কিছু তুলে ধরে নত মাথায় হন্‌হন্ করে তীব্র বেগে সে হেঁটে আসছে। খেদমতুল্লা বেশ কাছে এসে পড়েছে এমন সময়ে হঠাৎ সে সচকিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মীরন শেখ প্রথমে ভাবে খেদমতুল্লা তাকে দেখেই এমনভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু শীঘ্র বুঝতে পারে খেদমতুল্লার দৃষ্টি অন্য কোথাও, তাছাড়া তার মুখে বিস্ময়াভিভূত নিথর ভাব। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এবার মীরন শেখ ভীষণাকার দৈত্যের মতো একটি মূর্তি দেখতে পায়। ভীষণাকার হলেও মূর্তিটি যেন রক্তমাংসের নয়, সেটি যেন শূন্যের মধ্যে ধুঁয়ার মতো জেগে উঠেছে। তবে আচম্বিতে খাপ থেকে তলোয়ার খোলার মতো বিদ্যুৎঝলকের মতো হঠাৎ, আকস্মিকভাবে। তারপর নিমেষে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে : আবছা মূর্তিটি ঘি-ঢালা আগুনের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠে সন্ধ্যাকাশ আলোকিত করে

তোলে, সঙ্গে-সঙ্গে সুগম্ভীর কণ্ঠের গর্জন শোনা যায়, পায়ের তলে জমি কাঁপতে শুরু করে থরথর করে। মীরন শেখের পক্ষে আর তাকানো সম্ভব হয় নি। একটু পরে সে যখন আবার তাকাতে সক্ষম হয় ততক্ষণে চোখ-ধাঁধানো আলোটা নিভে গিয়েছে, পায়ের তলে জমিও স্থির হয়ে পড়েছে, কোথাও দৈত্যের মতো মূর্তিটির বা খেদমতুল্লার কোনো চিহ্ন নেই। মীরন শেখ প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দৌড়াতে-দৌড়াতে কোনোমতে বাড়ি ফিরে আসে।

কথাটি নিঃসন্দেহে অতিশয় বিচিত্র, হয়তো তা তাদের বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু কী সে-আগুন যা দপ্ করে জ্বলে উঠে সন্ধ্যাকাশ আলোকিত করে তুলেছিল, বিদ্যুৎঝলকের মতো আবির্ভূত হওয়া সে-দৈত্যটাই-বা কী—তা কি তারা বুঝতে পারে নি? সে-আগুনের উত্তাপ সে-দৈত্যের ছায়া তারাও কি কখনো-কখনো তাদের অন্তরে অনুভব করে না? হয়তো তাই তেমন অবিশ্বাস্য কথাটি আবার বিশ্বাসও হয়েছে। সে-জন্যে কালু মিঞাকে মিথ্যাবাদী বলে নি, এবং হয়তো মনে-মনেও তাকে দোষান্বিত করে নি।

দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই বলে কালু মিঞা বসে-বসে নামাজ পড়ে, তারপর নামাজ শেষ হলে উঠবার চেষ্টা না করে পূর্ববৎ নত মাথায় বসে থাকে। হাতটা একটু কাঁপে, যেন তসবি পড়ে, কিন্তু হাতে তসবি নেই।

সে-দিন নামাজিরা অন্যদিনের মতো নামাজের শেষে যে-যার পথে চলে না গিয়ে অপেক্ষা করে, তাদের কৌতূহলী দৃষ্টি কালু মিঞার ওপর নিবদ্ধ। ইমামও ঘুরে বসে। নামাজ-খোতবা শেষ হয়েছে বলে তাকে অসহায় দেখায়; কী করবে বুঝে উঠতে পারে না বলে সে শূন্য চোখে নিঃশব্দে দোয়াদরুদ পড়ে। কে জিজ্ঞাসা করবে কেন কালু মিঞা তার অক্ষম অথর্ব দেহটি মসজিদে টেনে নিয়ে এসেছে? কৌতূহলটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলে নামাজিরা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে, তবে কালু মিঞার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো প্রশ্ন করতে তাদের সাহস হয় না। তাদের কেমন মনে হয়, সে যদি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদে এসে থাকে সে-উদ্দেশ্যেরই কোনো বিশেষ আকার নেই : বৃদ্ধ মানুষটি তার জীবনের এমন একটি স্তরে এসে উপনীত হয়েছে যেখানে তার উদ্দেশ্য ইহজগতের মানদণ্ডে মাপা আর সম্ভব নয়। উপরন্তু, তার অন্তরে যেন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, ঘৃণা-বিদ্বেষ নেই, ভয়-আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, নিরাশাও নেই। যদি কিছু থেকে থাকে তা দুঃখ, কারণ সব কিছুর শেষ হলেও দুঃখের শেষ হয় না, অবশেষে দুনিয়ার সব কিছুই অটুট দুঃখে পরিণত হয় ; মানুষ যখন তার কবরস্থান অভিমুখে রওনা হয় তখন কেবল দুঃখেই তার প্রাণহীন দেহ জমাট হয়ে থাকে।

অবশেষে ইমাম প্রশ্ন করে। "কিছু বলবেন কালু মিঞা?"

নিঃশব্দ মসজিদ-ঘরে আকস্মিক প্রশ্নটি বৃদ্ধ কালু মিঞাকে চমকিত করে। হয়তো সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ইমামের প্রশ্নে তার নিদ্রাভঙ্গ হয়। ঈষৎ বিহ্বলভাবে মুখটি কিছু তোলে, কয়েকমুহূর্তের জন্যে তার কোটরাগত চোখের খানিকটা দেখা যায়। তবে শীঘ্র সে-মুখ আবার বুকের ওপর ঝুলে পড়ে, যেন বুকের মধ্যেই তার মুখ আশ্রয় সন্ধান করে; যে-বুকের মধ্যে একদিন কত আশা-নিরাশা আলোছায়ার মতো খেলা করেছে, কত ভালো-মন্দ বাসনা-কামনা ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেছে, সে-বুকে এখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি কারণ সেখানে সমস্ত আলোছায়ার খেলা সব ঝড়ঝঞ্ঝার অবসান ঘটেছে। তারপর মনে হয় বৃদ্ধ মানুষটি কাঁদতে শুরু করেছে; তার শীর্ণ দেহটি থরথর করে কাঁপে। কেবল চোখে অশ্রু দেখা দিয়ে থাকলেও সময়কাল-কর্ষিত চিবুকে কোনো সজলতার আভাস দেখা যায় না।

"বলেন কালু মিঞা", ইমামটি দরদীকণ্ঠে বৃদ্ধকে আবার বলে।

কালু মিঞা নিজেকে সংযত করে, অথবা যে-ভাবাবেগ তার দেহে সহসা কম্পন সৃষ্টি করেছিল সে-ভাবাবেগ নিঃশেষ হয়ে যায়; তার দেহ ধীরে-ধীরে স্থির হয়ে পড়ে। কেবল হাত-দুটি পূর্ববৎ কেঁপে চলে। এবার সে কী-যেন বলে, কিন্তু তার ক্ষীণকণ্ঠ মুখ হতে বেরিয়ে

এসে পিপীলিকার মতো শুভ্র দাড়ি বেয়ে বস্ত্রের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে যায়, সে-কণ্ঠ কারো কান পর্যন্ত পৌছায় না।

ইমাম নয়, অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কিছু বললেন কালু মিঞা?"

কালু মিঞার কণ্ঠ দ্বিতীয় বার শোনা যায় না। একটু অপেক্ষার পর কালু মিঞার জামাই শ্বশুরের পক্ষে বলে, "তিনি বললেন—খেদমতুল্লাকে খুন করেন নাই, করানও নাই।"

তবে, এ-কথা বলবার জন্যেই বৃদ্ধ কালু মিঞা দুটি মানুষের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মসজিদে এসেছে। মসজিদে কেউ মিথ্যা বলে না; সেখানে মিথ্যা বললে যে-গুনাহ্ হয় সে-গুনাহ্র মাফ নেই।

ঘরময় সহসা গভীর নীরবতা নাবে, সবাই শ্বাসরুদ্ধ করে অপেক্ষা করে। হয়তো তাদের মনে হয় হঠাৎ অতি অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটবে, কোথাও একটি বিশাল হাওয়াই তারাবাজি সমগ্র দুনিয়া আলোকিত করে বিকট আওয়াজে ফেটে পড়বে, পায়ের তলে অতল গহ্বর সৃষ্টি করে ধরণী দ্বিধাকৃত হয়ে পড়বে। তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে। এমন সময়ে মানুষের কিছু করতে নেই : নাইওরে যেতে নেই, বরাতে শরিক হতে নেই, কাস্তে-কোদাল হাতে নিতে নেই, খাজনা-খেসারত দিতে নেই, দাখিলি জমা করতে নেই, গঞ্জে গিয়ে দাদন দিতে নেই, প্রসূতির স্তনে ঠোন্কা জাগলে অধীর হতে নেই।

তবে কিছুই ঘটে না। এক সময়ে তারা দেখতে পায় জামাই আর ভৃত্যটি হাতে-হাত মিলিয়ে যে-আসন তৈরি করেছে, সে-আসনে বসে বৃদ্ধ কালু মিঞা মসজিদ ত্যাগ করছে। মসজিদ-ঘরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটি অতিক্রম করে দরজার নিকটে পৌঁছুলে আকস্মিক আলোতে বৃদ্ধের চোখ দুটি মিটমিট করে ওঠে, অন্ধের চোখে যেন প্রাণ সঞ্চার হয়, এবং সে-আলোয় তার শুভ্র দাড়ি তার মুখমণ্ডল শীতল তারার শুদ্ধ নির্মল রূপ ধারণ করে।

কালু মিঞা নিরাপদে মসজিদ ত্যাগ করে।

তবারক ভুইঞা বাজারে সাইকেলের দোকানের মালিক ছলিম মিঞার কথা বলছিল। ছলিম মিঞা জনপ্রিয় মানুষ নয়। বরঞ্চ বদমেজাজি জন্তু-জানোয়ারকে মানুষ যেমন এড়িয়ে চলে তেমনি লোকেরা তাকে এড়িয়ে চলে, অকারণে বড় একটা তার নিকটে আসে না। তবু সকলে গোপনে-গোপনে তাকে সমীহ না করে পারে না। মানুষের তুচ্ছতম দোষ-ত্রুটিও তার সহ্য হয় না, কিছু পছন্দ না হলে পরিষ্কারভাবে বলে ফেলে, তবে নীচমনা কুৎসা-পরনিন্দায় তার প্রবৃত্তি নেই। এবং দুনিয়ায় কোথাও সে ভালো কিছু দেখতে না পেলে মনে হয় সত্যিই কোথাও ভালো কিছু নেই। মানুষের চরিত্র-আচরণ-ব্যবহারে অনেক কিছু সে দেখতেও পায় যা অন্যদের চোখে ধরা পড়ে না। অনেকদিন আগে স্টিমারঘাটের বাদশা মিঞা যখন প্রথমবার খৈনিমুখে বাজারের পথে দেখা দিয়েছিল তখন সে-ই তার চোয়ালের অস্ফুট সঞ্চালন লক্ষ করেছিল। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গভীর বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে বলেছিল : "কাকের ময়ূর হবার সখ, কুচকাঁটার কদলীগাছ হবার সাধ।" তবু লোকটি নির্দয় নয়। ঘাট বন্ধ হবার পর যখন জানা যায় বাদশা মিঞা চাকুরি হারিয়েছে তখন উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, "ঐ যে ব্যাটাটা খৈনি খায়, উড়ে-বিহারি ভাব দেখায়—এবার কী হবে তার?" ছলিম মিঞার খিটখিটে মেজাজের পশ্চাতে কোথায় যেন ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়ে গভীর সচেতনতা।

মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যে একটি বিচিত্র কান্না শুনতে পায় সে-খবর শোনার পর ছলিম মিঞা প্রথমে কিছু বলে নি, কেউ প্রশ্ন করলে সবেগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরব হয়ে থেকেছে যেন অবান্তর কথার ওপর কোনো উক্তি করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয় তার কাছে। তবে সেদিন রাতে স্ত্রীর মুখে কথাটি শুনলে সহসা রাগান্বিত হয়ে পড়ে।

বেশ রাত করে দোকানে ঝাঁপ দিয়ে বাড়ি প্রত্যাবর্তন করে হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসেছে এমন সময়ে তার স্ত্রী করিমন কথাটি তোলে। করিমন বলে,

"আমার কেমন মনে হয় কিছু একটা হবে। সেদিন থেকে মধ্যে-মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব যেন বুকের ভিতর।"

ছলিম মিঞা নীরবেই শোনে, কিন্তু অবান্তর কথাটির উত্থাপনে অসন্তুষ্ট হয় বলে খাওয়ার ভঙ্গিতে ক্ষিপ্রতা এসে পড়ে। বস্তুত, কথাটি কখনো তাকে প্রীত করে নি। মেয়েটি কী শোনে কে জানে। তাছাড়া কিছু শুনতে পায় তাই-বা কী করে বলা যায়। হয়তো সেটি তার কল্পনা, বা কানের ভুল। যা ছলিম মিঞাকে আরো অসন্তুষ্ট করে তা এই যে, মেয়েটি কিছু শুনে থাকলেও লোকেরা এমন শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়বে কেন? জীবনে কখনো কান্না শোনে নি তারা?

তবু ছলিম মিঞা রাগান্বিত হত না যদি তার স্ত্রী সহসা একটি অদ্ভুত কথা না বলত। স্বামীর অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করলেও করিমন নিরস্ত হয় না। করিমন সাদাসিধে মানুষ, কথাও তেমন বলে না, তবে কৃচিৎ কখনো কিসে তাকে যেন পেয়ে বসে, অকস্মাৎ কথা বলতে শুরু করে। তখন তার শ্রোতার প্রয়োজন হয় না, অনেক সময়ে শ্রোতা থাকেও না। এ-সময়ে তার মুখে-চোখে কেমন একটা ভাব জেগে ওঠে, যেন বুকের মধ্যে থেকে যে-সব কথা উদ্বেলিত হয়ে শব্দাকারে দেখা দিয়েছে তারই আওয়াজে সে সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। জীবনের দুঃখ-দুর্দশা নিয়েই সে কথা বলে এবং কোনো ঘটনা অনেকদিন আগে ঘটে থাকলেও এমনভাবে তার অবতারণা করে যে মনে হয় তা সম্প্রতি ঘটেছে, এবং তা তার বুকে যে আঘাতের সৃষ্টি করেছিল সে-আঘাত সবেমাত্র কাটিয়ে উঠেছে। কখনো-কখনো তার কথায় ছলিম মিঞা বিস্মিত হয়, কারণ তার স্ত্রী অকস্মাৎ এমন কথা পাড়ে যা আগে কখনো শোনে নি। কোত্থেকে আসে, কোথাই-বা দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে রাখে সে-সব কথা? তবে ছলিম মিঞার বিশ্বাস, যা তার স্ত্রী বলে তার অধিকাংশই অসত্য। সে যে সজ্ঞানে মিথ্যা বলে তা নয়; তার মস্তিষ্কটি এমনই যে সেখানে সময়কাল, সত্য-অসত্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভীতি-আশঙ্কা—এসব কী-করে গোলতাল পাকিয়ে যায়। এ-জন্যে সচরাচর স্ত্রীর কথায় বড় একটা কান দেয় না, কেবল তা অসহ্য রকমের ঘ্যানঘ্যানানিতে পরিণত হলে বা অসম্ভবের সীমানা ছাড়িয়ে গেলে ধমকে বলে, "চুপ করো।" ধমক খেয়ে করিমন চুপ করে, সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তব জগতেও প্রত্যাবর্তন করে।

মনের অসন্তুষ্টি চেপে ছলিম মিঞা আপন ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়েছে এমন সময়ে সহসা সকর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ সে শুনতে পায় মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ের কথা বলতে-বলতে তার স্ত্রী অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। পনেরো-বিশ বছর আগে একবার কুমুরডাঙ্গায় যে-বসন্ত রোগের মহামারী লেগেছিল, কোনো কারণে সে-মহামারীর কথাই তুলেছে। প্রথমে ছলিম মিঞা ভাবে, অবশেষে তার স্ত্রী সকিনা খাতুনের কথা ভুলেছে। কিন্তু শীঘ্র তার ভ্রান্তি দূর হয়।

করিমন বলে, "তখনো মড়ক লাগে নি, সহসা আমি কী একটা কান্না শুনতে শুরু করি সকিনা খাতুনের মতোই। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করি, কোনো কান্না শুনতে পাও? সবাই আমার দিকে অবাক হয়ে তাকায় যেন, আমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমি অবশেষে বুঝতে পারি কোথাও কেউ যদি কেঁদে থাকে সে-কান্না আমিই কেবল শুনতে পাই। তারপর মড়ক লাগে। কত লোক মারা গেল সেবার!" একটু থেমে আবার বলে, "মড়ক লাগবে বলেই অন্তরে কান্নাটি শুনতে পেতাম। অন্তর অনেক সময়ে অনেক কিছু জানতে পায়।"

কথাটি শোনামাত্র ছলিম মিঞা বুঝতে পারে তাতে একরত্তি সত্য নেই, এবং খুব সম্ভব পূর্বে তেমন কথা তার স্ত্রীর মনে কখনো দেখা দেয় নি; কী-করে মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ের কথায় তেমন একটি ধারণা মাথায় এসে সহসা সত্যের রূপ ধারণ করেছে।

এবার ভাত-মাখা হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছলিম মিঞা ব্যগ্রকণ্ঠে বলে,

"চুপ করো, চুপ করো বলছি।"

শীঘ্র খাওয়া শেষ করে নিত্যকার মতো ভেতরের উঠানের পাশে হুঁকা নিয়ে সে বসে, তবে হুঁকায় স্বাদ পায় না। তার মনে হয় বিষম ক্রোধে তার সমস্ত অন্তর যেন কুঁকড়ে রয়েছে।

পরদিন ছলিম মিঞা যখন দোকানে যাবার আগে অন্যদিনের মতো বাড়ির পেছনে আতাফলের গাছগুলি দেখতে যায় তখনো তার রাগ পড়ে নি, মুখে থমথমে ভাব। আতাফলের গাছগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেদিন তার আনন্দ হয় না যদিও নিত্য এ-সময়ে গাছগুলির ওপর চোখ পড়তেই তার চোখ তৃপ্তিতে নরম হয়ে ওঠে। গাছগুলি শ্রমের ফল, বড় শখেরও জিনিস। চার বছর আগে বৈশাখ মাসে চারা লাগানোর পর থেকে স্নেহভরে তাদের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে এসেছে, নিচে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি জমে না যায় আবার শুষ্কতাও দেখা না দেয় বা গোড়াতে আগাছা না জন্মায়—এসব বিষয়ে সতর্কতারও সীমা থাকে নি। চার বছরের যত্ন-সতর্কতার ফলে গাছগুলি বড় হয়ে উঠেছে, কিছু ফলও ধরেছে। তবে প্রথম ফল কখনো ভালো হয় না। তার বিশ্বাস দু-এক মাসের মধ্যে বর্ষাটা ভালো করে নাবলে বেশ উত্তম ফল ধরবে এবং এক-এক গাছ থেকে দুই-শ আড়াই-শ ফলও পাবে। ফলমূলের গাছ করার ব্যাপারে তার বড় উৎসাহ এবং নিজের হাতে যা লাগায় তা ভালোও হয়। কেবল বেশি কিছু করার সুযোগ নেই। ঐ তো ছোট জমিটা, বাড়ির পেছনে। তবু সেখানে কত কিছুই না করে : আলু পটল মটর হতে শুরু করে লেবু লিচু, এবং এখন আতাফল। বাল্যকালে ছলিম মিঞা এতিম হবার পর লোকেরা বলত বড় হয়ে সে ভাগ্যবান হবে। ভাগ্যের নমুনা এখনো দেখে নি, তবে কখনো-কখনো তার মনে হয় অল্প বয়সে পিতা-মাতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত মানুষটির প্রতি গাছ-লতাপাতা যেন কিছু করুণা বোধ করে।

প্রিয় গাছগুলির দিকে প্রায় না তাকিয়েই ছলিম মিঞা দোকান অভিমুখে রওনা হয়। দোকানে পৌঁছে ঝাঁপ তুলে নির্দিষ্ট স্থানে বসে, মুখের থমথমে ভাব তখনো কাটে নি। শেষরাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। সামনের সাদা মাটির পথটি এখনো সিক্ত, এখানে-সেখানে জমা পানি। সে-পথের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছলিম মিঞা যেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে স্থির হয়ে থাকে, ঠোঁটের প্রান্তে বক্র রেখায় মানুষের নির্বুদ্ধিতার প্রতি গভীর বিতৃষ্ণার ভাব। একটু পরে একটা খরিদ্দার আসে। সাইকেলের খরিদ্দার নয়; সাইকেলের খরিদ্দার কালেভদ্রে আসে। ছলিম মিঞা তার দোকানে অন্যান্য জিনিসও মজুত রাখে : পেরেক বল্টু লোহা-লক্কড় সুচ-সুতা—এই ধরনের নানাপ্রকারের চুটিচাটি জিনিস। খরিদ্দারটি কিছ বলে, কিন্তু তার কথা ঠিক তার কর্ণগোচর হয় না, কারণ সহসা পথে একটি ছায়া জেগে উঠলে সেদিকে তার দৃষ্টি ছুটে যায়। ছায়াটি মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুনের রূপ ধারণ করে : অন্যদিনের মতো কালো ছাতা মাথায় সকিনা খাতুন বাজারের পথ দিয়ে স্কুল অভিমুখে চলেছে। নুয়ে-থাকা ছাতার জন্যে মুখের নিম্নাংশ শুধু চোখে পড়ে, এবং সে-অংশটিও ছায়াচ্ছন্ন বলে তেমন পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। অন্যদিনের মতো ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ভঙ্গিতে ধীর-মন্থর গতিতে সে হাঁটে, তবে পথের এখানে-সেখানে জমে-থাকা পানির জন্যে আজ তাকে এঁকেবেঁকে চলতে হয়।

ছলিম মিঞা প্রথমে নিথর দৃষ্টিতে সকিনা খাতুনের দিকে তাকিয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত এমনি কাটে। তারপর কী যেন ঘটে, সহসা কোথায় যেন একটি শিরা ফেটে যায়, তার চোখ দুটি নিমেষে রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে, কী একটা দুর্বোধ্য ক্রোধে তার নাসারন্ধ্র কাঁপতে শুরু করে। এবার ক্ষিপ্রবেগে উঠে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত পশুর মতো দোকান থেকে পথে নেবে সকিনা খাতুনের পথরুদ্ধ করে দাঁড়ায়, আসবার সময়ে পানি জমা স্থানে পা পড়লে ছলাৎ করে কিছু পানি যে তার লুঙ্গি ভিজিয়ে দেয় তা লক্ষ্য করে না।

এবার একটি তীক্ষ্ণ আর্তনাদে পথের এ-মাথা ও-মাথা যেন কেঁপে ওঠে।
"কী কান্না শোনেন, কোথায় কান্না শোনেন?"

মুহাম্মদ মুস্তফা অতিশয় সাবধানী মানুষ; জ্ঞানবুদ্ধি হবার পর থেকে অসাবধান হয়ে কখনো কিছু করে নি, অসতর্কভাবে কখনো এক পা-ও নেয় নি। আমার মনে হয়, বাল্যবয়সে তার মধ্যে যে-উচ্চাশা দেখা দিয়েছিল (উচ্চাশা ছাড়া অশিক্ষিত প্রায় দরিদ্র পরিবারের ছেলে অতদূর কি যেতে পারত?) সে-উচ্চাশার বিষয়ে কখনো আপন মনেও স্পষ্টভাবে ভাবতে সাহস করে নি এই ভয়ে যে তা নিয়ে উচ্চবাক্য করলে কোথাও কোনো হিংসাত্মক শক্তি তাকে ধ্বংস করার জন্যে খড়্গহস্ত হবে। তার অগ্রসর হওয়ার পথে কোনো বাধাবিপত্তি দেখলে তার বহর খাটো করে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে নি, মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে নি, বরঞ্চ ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার চেষ্টা করেছে এবং দুর্জয় শত্রু নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে নিদ্রাভিভূত হলে সুযোগ বুঝে আস্তে সরে পড়েছে। ছুটিছাটাতে দেশের বাড়ির পথ ধরলে তার মনে যে-ভাবটি দেখা দিত তাও তার সাবধানী চরিত্রের পরিচায়ক। চাঁদবরণঘাটে স্টিমার থেকে নেবে খালের পথ ধরলে সহসা তার কেমন মনে হত সে যেন কখনো ইস্কুলে কলেজে পড়ে নি বড়বড় পরীক্ষা পাস দেয় নি, এমনকি যে-গ্রাম যে-জীবন থেকে নিস্তার পাবার জন্যেই এত শ্রম-অধ্যবসায়, সে-গ্রাম বা জীবন ছেড়েও কখনো কোথাও যায় নি। দেশের বাড়ির পথে চৈত্র মাসের বৃক্ষপল্লবের মতো তার সমস্ত তালিম-শিক্ষা নিঃশব্দে ঝরে-পড়া, তারপর গ্রামের সামীপ্যে উপস্থিত হলে পদক্ষেপে জড়তা মুখে-জবানে ঊনবুদ্ধি ঢিলেমি দেখা দেয়া—এ-সবের কারণ এই নয় যে দরিদ্র অশিক্ষিত গ্রাম এত দুর্বল এত অসহায় যে সেখানে শিক্ষাদীক্ষার ঈষৎ চিহ্নপ্রদর্শনও অন্যায়, সাবধানতাই ঐ ভাবটির আসল কারণ : দন্তহীন নিরীহ জন্তুকেও উস্‌কাতে নেই, কোনো আপদ-বিপদ চোখে দেখা না গেলেও নিরাপদ বোধ করা অনুচিত। এ-ধরনের সাবধানতার আসল উপাদান হল ভীতি এবং সে-কথা নিজে বুঝলেও মুহাম্মদ মুস্তফা কখনো লজ্জা বোধ করে নি, বরঞ্চ নিরাপত্তার জন্যে ভীতি একান্ত আবশ্যকীয়—এমন একটি দৃঢ়বিশ্বাসে সচেতনভাবে সে-ভীতি লালিত-পালিত করে তাকে তার চিন্তাধারা আচরণ-ব্যবহারের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নেয়; ভীত মানুষ কখনো বেপরওয়া হয়ে হঠকারী কাজ করে বসে না, তেমন কাজের পরিণামও তাকে ভোগ করতে হয় না। এমন মানুষ কি সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হবে? তবে সজ্ঞানে না হোক, তারই অজানিত কোনো দুর্বোধ্য তাড়নায় সেখানে উপস্থিত হয়ে থাকবে—এমন একটি সন্দেহ মুহাম্মদ মুস্তফার মনে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করতে তার দেরি লাগে নি। তাও-বা কী করে সম্ভব? তার বিশ্বাস মানুষ তার নিজের মনের মতিগতি বুঝতে পারবে না তা হতে পারে না। অন্যের কাছে একটি মানুষের মন দুর্বোধ্য বা রহস্যময় মনে হতে পারে যার কারণ শুধুমাত্র এই যে, সমাজে বাস করতে হলে মানুষকে পরের কাছ থেকে অনেক কিছু ঢাকতে হয়, ছলনা-কৌশলের শরণাপন্ন হতে হয়, যে-পথ ধরে সে-পথও সকল সময়ে সোজা চলে না। কিন্তু নিজের কাছে মানুষের মন দিবালোকের মতো সদাস্বচ্ছ সুস্পষ্ট, সেখানে অজানার ছায়া বা গুহাপথের রহস্যের অবকাশ নেই। এ কি সম্ভব যে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কালু মিঞার বাড়ির সামনে দেখা দেবে অথচ সে-উদ্দেশ্য তার কাছেই অজ্ঞাত থাকবে?

তবে মুহাম্মদ মুস্তফা যে পথভ্রষ্ট হয়ে কালু মিয়ার বাড়ির সামনে প্রাচীন বটগাছটির নিকট হাজির হয়েছিল এবং বাল্যকালের স্মৃতি স্মরণ করেই তার তলায় একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিল—এ-সব কথা বাড়ির লোকদের বিশ্বাস হয় নি। সে-অবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে একটি আশা, কেমন একটা উত্তেজনাও, ধীরে-ধীরে তাদের গ্রাস করে, এবং সত্য বলতে কী, আমিও কিছু আশান্বিত কিছু উত্তেজিত হয়ে উঠি। সবারই মনে হয়, এবার মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে। তার বাপের মৃত্যুর পর অলসপ্রকৃতির ছোট চাচা হঠাৎ কী কারণে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

করেছিল এই মর্মে যে এখন মুহাম্মদ মুস্তফা নাবালক, কিন্তু তাকে বড় হতে দাও, তখন দেখবে। সহসা সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি সকলের মনে পড়ে। মুহাম্মদ মুস্তফা আর নাবালক নয়, ইতিমধ্যে অনেক পাস-পরীক্ষাও দিয়েছে, যে-দিনের জন্যে ছোট চাচা অপেক্ষা করতে বলেছিল সেদিন হয়তো এসেছে।

আমরা যে আমাদের আশা-উত্তেজনার কারণ বা স্বরূপ ঠিক বুঝতে পারি তা নয়। দিনটা এসে থাকলেও কিসের জন্যে সে-দিন এসেছে, কীই-বা করবে মুহাম্মদ মুস্তফা? তবু আশাটি একবার দেখা দিলে সেটা নূতনও মনে হয় নি; একদিন মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে সে-বিশ্বাস খেদমতুল্লার মৃত্যুর পরেই কি আমাদের মনে দেখা দেয় নি?

খেদমতুল্লার মৃত্যুর পর তার প্রতি আমাদের মনোভাবের বিষম পরিবর্তন ঘটে। তার জীবনের শেষ দিকে সে আর বাড়ির লোকেদের স্নেহমমতার পাত্র ছিল না। বলতে গেলে, খেদমতুল্লাই সমস্ত স্নেহের বন্ধন নিজ হাতে ছিন্ন করেছিল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের প্রতি তার উদাসীনতা স্বার্থপরতা অবিবেচনার ফলে সকলের মনে গভীর বিরূপ ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তার অবিবেচনা সহ্য করতে না পেরে ছোট চাচা তার নাম মুখে নেয়া বন্ধ করেছিল, বাপজান একবার বড় অর্থকষ্টে পড়লে তার কাছে সামান্য সাহায্য চেয়ে সাহায্য না পেলে স্থির করেছিল হৃদয়হীন ভাই-এর মুখ কখনো দেখবে না। দেখাদেখির অবকাশও ছিল না। চাঁদবরণঘাটে বসবাস শুরু করার পর খেদমতুল্লা দেশের বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছিল, এমনকি ঈদের দিনে কম ভাগ্যবান ভাইবোনের ছেলেমেয়েদের স্মরণ করে কখনো একটা ছিটের জামাও পাঠিয়ে দিত না। তবু তার অপঘাতে মৃত্যুর পর ভাইদের মন থেকে সমস্ত বিরূপতা অদৃশ্য হয়ে যায়, তার বিধবা স্ত্রী এবং পিতৃহারা অল্পবয়স্ক ছেলেকেও তারা সাদরে বাড়িতে গ্রহণ করে। খেদমতুল্লা নিষ্ঠুরপ্রাণ দুর্বৃত্ত লোক ছিল, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের দিকে মুখ ফিরেও তাকাত না, তবু সে এ-বাড়িরই কারো ভাই কারো চাচা-জেঠা ছিল, তাদের সবাইকে উপেক্ষা করে অন্যত্র চলে গেলেও এ-বাড়িতেই তার জন্ম হয়েছিল। তবে কে জানে, যদি স্বাভাবিক কোনো কারণে খেদমতুল্লার মৃত্যু ঘটত তবে হয়তো এমন ভাবান্তর ঘটত না। হয়তো খেদমতুল্লার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে জবাই-করা গরুর নিথর নিস্তেজ দেহের মতো যে-অসহায়তা প্রকাশ পায় সে-অসহায়তা, তারপর অন্যায়ের বিচার দেখার যে-বাসনা স্বভাবতই জেগে ওঠে তাদের মনে সে-বাসনা—এ সবের তলে মৃত লোকটির দোষঘাট নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তবে তখন তারা কিছু করতে পারে নি, সামান্য আস্ফালন করে নিরস্ত হয়। তারা জানত, সরকার বা পুলিশ কিছ করবে না, সুবিচারের আশা দুরাশা মাত্র। কালু মিঞার তখন সমগ্র অঞ্চলে প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তি; কালু মিঞাই যে খেদমতুল্লার হত্যার জন্যে দায়ী সে-বিষয়ে কারো কাছে জলজ্যান্ত সাক্ষি-প্রমাণ থাকলেও সে-সাক্ষি-প্রমাণ নিয়ে এগিয়ে আসবে না—তাও জানত। বস্তুত, কেউ একবার বেফাঁসে একটি কথা বলে ফেলে মুখে যে খিল দিয়েছিল আর টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে নি; একটি মানুষের ঘাড়ে ক'টাই-বা মাথা?

তবে যারা কিছু করতে পারে নি তাদের মনে সে-সময়েই আশাটির জন্ম হয় : বড় হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে। তাই তার বাপের মৃত্যুর পর সে যখন পড়াশুনা করে যাবে বলে দৃঢ়সংকল্প হয় তখন সে-সংকল্পের মধ্যে একটি অর্থই দেখতে পায় সবাই—একদিন কিছু করতে চায় বলে সে পড়াশুনা করে প্রথমে মানুষ হতে চায়। তার চরিত্রগত সাবধানতা-সতর্কতার মধ্যেও তার সেই অনুচ্চারিত উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত দেখতে পায় : একবার মানুষ হয়ে শক্তি-সামর্থের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে চলা সমীচীন নয় কি? তারা কেউ বিশ্বাস করে নি খেদমতুল্লা অতিশয় দুর্বৃত্ত চরিত্রের লোক ছিল বা নিদারুণ শাস্তিটা তার প্রাপ্য ছিল—এ-সব মুহাম্মদ মুস্তফা নির্বিবাদে গ্রহণ করে নিয়েছে। তা কী করে সম্ভব? বাপ-মায়ের বিষয়ে কোনো সন্তানের হৃদয় লৌহগঠিত নয়। তাছাড়া তা বিশ্বাস করলে জীবনে আর থাকে কী? এমন একটা ধারণাতেই কোথাও সমস্ত কিছু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় না কি?

মুহাম্মদ মুস্তফা যে দৈবক্রমে কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয় নি—তা প্রথমে তার মুখের ওপর বলতে আমাদের সাহস হয় নি; ততদিনে প্রায়-গ্রামছাড়া উচ্চশিক্ষার্থী মুহাম্মদ মুস্তফা সকলের অজান্তেই দূরে, কিছু ঊর্ধ্বেও চলে গিয়েছে, এবং স্নেহমমতা বা শুভাকাঙ্ক্ষার কমতি না হলেও তার এবং বাড়ির মধ্যে ইতিমধ্যে একটি অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছিল বলে সম্পর্কে পূর্বের সরলতা বা স্বচ্ছন্দতা ছিল না। তবে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, স্ব-ইচ্ছায় সজ্ঞানেই মুহাম্মদ মুস্তফা কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সেখানে তার আবির্ভাব এবং একদিন কালু মিঞার সম্বন্ধে লোকেরা যা বলাবলি করত এ-দুটির মধ্যে সম্বন্ধ না থেকে পারে না। পথ ভুল হয় কী করে? যারা নিয়মিতভাবে গ্রামে বসবাস করে তাদের মতো সময়-অসময়ের ধুলা উড়িয়ে বা কাদা ভেঙ্গে সে আর সারা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় না, হয়তো অঞ্চলটি তেমন আর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেও না, কারণ কয়েক বছর যাবৎ ছুটিছাটাতে বাড়ি এলে সচরাচর বই-খাতাপত্রেই ডুবে থাকে, বাইরে গেলেও সামনের মাঠ ধরে কিছু বেড়িয়ে ফিরে আসে। তবু সে বিদেশী নয়। ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি হোক, চোখে দেখা-যায়-না এমন অন্ধকারে পরিচিত নিশানা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্, কোনো কারণে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড় ক, তবু পথ-হারানো সত্যি অসম্ভব।

প্রথমে বাড়িতে একটা গম্ভীর ভাব নেবে আসে, গোপনে-গোপনে আমরা মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণ লক্ষ্য করে দেখতে শুরু করি যদি তার মধ্যে তার পরবর্তী চালের বা তার পরিকল্পনার কোনো ইঙ্গিত দেখতে পাই। তার মা আমেনা খাতুন হঠাৎ তার জন্যে ভাপা পিঠা বানাতে বসে। সে-পিঠা মুহাম্মদ মুস্তফার বড়ই প্রিয়। উত্তর-বাড়ি থেকে মা-জান এবং খোদেজা ছুটে আসে আমেনা খাতুনকে সাহায্য করবার জন্যে। এক সময়ে আমেনা খাতুনের চোখ ছাপিয়ে সহসা অশ্রু দেখা দেয়। তবে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সে সংযত করে এই ভয়ে যে কেন কাঁদছে তা কেউ জিজ্ঞাসা করলে কী উত্তর দেবে? হয়তো সবাই যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এই ভেবে যে মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে তখন মায়ের প্রাণেই কেবল একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল : কালু মিঞাই কি তার বাপকে খুন করে নি?

সেদিন অপরাহ্নবেলায় মা-জান উত্তর-ঘরের ছায়ায় উঠানে বসে খোদেজার চুলে বেণী বাঁধছিল এমন সময় বাইরে থেকে আমার বাপজানের গলা শোনা যায় : ক-দিন ধরে বিকল-হয়ে-থাকা ঢেঁকিটি সারাবার জন্যে বাপজান ছুতার মিস্ত্রি ডেকে নিয়ে এসেছে এবং মেয়েদের উঠান থেকে সরে যেতে বলছে। মেয়েরা অদৃশ্য হয়ে গেলে ছুতার মিস্ত্রিকে নিয়ে ভেতরে এসে উঠান অতিক্রম করছে এমন সময়ে আমরা শুনতে পাই বাপজান লোকটিকে কালু মিঞার বাড়ির সামনে মুহাম্মদ মুস্তফার আবির্ভাবের কথা বলছে। বাপজানের গলা বেশ চড়া। ছুতার মিস্ত্রির সঙ্গে ঢেঁকির ঘরে ঢোকার পরেও তার উচ্চকণ্ঠ উত্তর-ঘরে দক্ষিণ-ঘরে, হয়তো বেড়ার ওপাশে ছোট চাচার ঘরেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তার কণ্ঠে গর্বের ভাব, যেন মুহাম্মদ মুস্তফা এমন একটি কাজ করেছে যার দরুন লজ্জিত অপমানিত পরিবারের সম্মান রক্ষা হয়েছে বা হতে যাচ্ছে। বিবরণে কিছু অতিরঞ্জনও। নিঃসন্দেহে ছুতার মিস্ত্রির এই ধারণা হয় যে মুহাম্মদ মুস্তফা কালু মিঞার সঙ্গে দেখা করেছিল, তাকে শাসিয়েছিলও, না হলে গৃহস্বামীর মুখ ভয়ে এমন সাদা হয়ে উঠেছিল তা মুহাম্মদ মুস্তফা কী করে জানবে?

এ-সময়ে আমার বুকটা দুরুদুরু করে ওঠে। আমি জানতাম, দক্ষিণ-ঘরে চৌকিতে হাঁটু তুলে ঝুঁকে বসে মুহাম্মদ মুস্তফা পড়ছিল; বাপজানের উচ্চকণ্ঠ তার কর্ণগোচর হয়ে থাকবে। ছুতার মিস্ত্রি ঢেঁকিঘরে বলে এবার মা-জান এবং খোদেজা বেরিয়ে আসে; চুলবিনুনির বাকি কাজ ঘরেই শেষ হয়েছে। খোদেজা কলসি হাতে বাড়ির পেছনে পুকুরের দিকে রওনা হয়, তবে মা-জান উঠানে দাঁড়িয়ে থাকে—কানটা ঢেঁকিঘরে কিন্তু চোখ দক্ষিণ-ঘরে অদৃশ্য মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে। তখনো ঢেঁকিঘরে বাপজান মুহাম্মদ মুস্তফার কথা বার-বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছিল, এবং একই কথার পুনরাবৃত্তিতে অতিরঞ্জনটাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। হয়তো আমার মতো

মা-জানের মনেও এই ভয় দেখা দেয় যে মুহাম্মদ মুস্তফা সহসা দক্ষিণ-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাপজানের কথা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে আমাদের আশা-উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটাবে।

তবে মুহাম্মদ মুস্তফা বেরিয়ে আসে নি, তার কোনো সাড়াও পাই নি। আমাদের মনে যদি কিছু সন্দেহ বাকি ছিল সে-সন্দেহ এবার দূর হয়, এবং তখন থেকে বাড়ির সকলে নিতান্ত খোলাখুলিভাবে সেদিনের ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে শুরু করে, মুহাম্মদ মুস্তফা নিকটে থাকলেও দমিত হয় না। মুহাম্মদ মুস্তফা নীরব হয়েই থাকে, মুখে আত্মমগ্নভাব, হয়তো ঈষৎ বিহ্বলতা, যেন বাড়ির লোকেদের কথায় তার মনে সন্দেহ জেগেছে সে সত্যি দৈবচক্রেই কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়েছিল কিনা সে-বিষয়ে। এ-সময়ে বাড়ির লোকেরা খেদমতুল্লার স্মৃতি স্মরণ করে নানাভাবে মৃত ব্যক্তিটির গুণ গাইতে শুরু করে। এটা নূতন নয়, তবে এমন উচ্ছ্বসিতভাবে সমস্বরে তার গুণকীর্তন কখনো করে নি। সে নয়, সমাজই অসৎ নির্দয় নির্মম ন্যায়বিচারজ্ঞানশূন্য—যে-সমাজ তাকে সর্বপ্রকারে নিপীড়িত করেছিল। সে যদি অমানুষিক পরিশ্রম করে স্ত্রী-পুত্রের কথা ভেবে সৎ উপায়ে দুটি দানার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিল, দয়াহীন পাষণ্ড মানুষেরা সে-দুটি দানা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে দ্বিধা করে নি। এমন একটি সময় আসে যখন অন্যায়-অবিচার সহ্যাতীত হয়ে পড়ে। যে-সাপ কারো কোনো ক্ষতি করতে চায় না তাকে অযথা অকারণে মারতে গেলে সে যেমন ফণা তুলে ফুঁসে দাঁড়ায়, তার মুখে বিষ চড়ে—তেমনি একদিন খেদমতুল্লাও রুখে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখে প্রতিহিংসার বিষ এসে গিয়েছিল। তার হৃদয় ছিল মহৎ, উদার, পরার্থপর; সে-হৃদয় হিংসাত্মক লোকেরা পদদলিত করেছিল। সে দুর্বলের রক্ষক ছিল, প্রতারিত উৎপীড়িত অসহায় মানুষের জন্যে তার দরদী মন কাঁদত। অন্যায়ভাবে জোতজমি দখল করে কালু মিঞা যে স্বামীহারা অবলা নারীকে ঠকিয়েছিল সে-নারীকে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল যাতে যা তার হক তা সে ফিরে পায়। এবং সে-জন্যেই তাকে প্রাণ দিতে হয়।

এ-সবও মুহাম্মদ মুস্তফা নীরবে শোনে।

তারপর চতুর্থ দিনে খবরটি আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছায়। খবরটি এই যে, অথর্ব কালু মিঞা মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করেছে সে নির্দোষ।

খবরটি বাড়ির সবাইকে স্তম্ভিত করে। বস্তুত কিছু সময়ের জন্যে সকলে কেমন বাক্‌শূন্য হয়ে পড়ে। তাদের মনে হয়, মসজিদ-ঘরে কথাটি বলে ধূর্ত কালু মিঞা আমাদের সঙ্গে বড়ই শয়তানি করেছে, যেন যাকে আমরা প্রায় ধরে ফেলেছিলাম সে হাত থেকে ফস্কে গিয়ে একটি দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। দুর্গটি সাধারণ দুর্গও নয়, সেটি আকায়িদ-ঈমানে তৈরি দুর্গ।

বাপজান অবশেষে কালু মিঞার কারসাজির বিষয়ে তার মত প্রদান করে। উঠানে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির গিঁট খুলে আবার শক্ত করে বাঁধতে-বাঁধতে (কোনো কারণে ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হয়ে পড়লে বাপজান অমনি লুঙ্গির গিঁট খুলে আবার শক্ত করে বাঁধে) উচ্চস্বরে বলে, "যে-মানুষ খোদার বান্দাকে খুন করতে ভয় পায় না সে-মানুষ খোদার ঘরে মিথ্যা বলতে ভয় পাবে কেন?"

সে-রাতে বাপজান মুহাম্মদ মুস্তফাকে সরাসরি প্রশ্ন করে, "কী করতে চাও, বাবা?"

মুহাম্মদ মুস্তফা কোন উত্তর দেয় নি। সেদিন তাকে সত্যি বড় বিহ্বল মনে হয়, যেন যে-মানুষ কোনো প্রকারের দ্বিধা-সংশয় পছন্দ করে না সে-ই নিদারুণ একটি দ্বিধা-সংশয়ের কবলে পড়ে প্রায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে।

তার মানসিক অবস্থার কারণ পরদিন জানতে পাই।

মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু করবে—এমন একটা আশায় আমরা যখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম সে-সময়ে অন্য একটি কথায় সে ভাবিত হয়ে পড়ে। সেটি এই যে, কালু মিঞার বাড়ির সামনে তার আবির্ভাব গৃহস্বামীকে সন্দিগ্ধ, হয়তো-বা সন্ত্রস্তই করে থাকবে। তারপর বৃদ্ধ লোকটি মসজিদে গিয়েছে সে নির্দোষ সে-কথা বলতে—তা জানার পর মুহাম্মদ মুস্তফা দেখতে

পায় তার সন্দেহটি অযথার্থ ছিল না : সত্যি, অথর্ব অক্ষম রোগব্যাধি জর্জরিত লোকটি ভয়ানকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছে। কালু মিঞা দোষী হোক্ নির্দোষ হোক্, মুহাম্মদ মুস্তফা সেদিন কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে তার বাড়ির সামনে দেখা দেয় নি। সে-কথা তাকে জানানো এবার তার কর্তব্য বলে মনে হয়।

কালু মিঞাকে কথাটি জানানোর দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। আমি একটু বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালে সে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে বাপজানের কথা যেন শোনে নি এমনিভাবে শুধু বলে, "মসজিদে কেউ মিথ্যা কথা বলে না।"

অল্পক্ষণের মধ্যে খালি পায়ে ছাতাবগলে আমি মুক্তাগাছি গ্রাম অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ি এবং বাড়ির গভীরভাবে নিরাশ হওয়া ক্ষুব্ধ প্রবঞ্চিত লোকেদের বিষয়ে না ভেবে বা মুহাম্মদ মুস্তফার আচরণের অর্থ বুঝবার চেষ্টা না করে সজোরে পদসঞ্চালন করে এগিয়ে চলি। যে-কথা দুর্বোধ্য মনে হয় সে-বিষয়ে ভাবতে আমার ভালো লাগে না।

কী কারণে তবারক ভুইঞা থামে। বাইরে, রাতের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে, নদীর বিক্ষুব্ধ অশ্রান্ত পানি আর্তনাদ করে। সে-আওয়াজই সহসা কানে এসে লাগে। শ্রোতাদের মধ্যে একজনের চোখ নিমীলিত হয়ে পড়েছে, মুখটা ঈষৎ খুলে সোজা হয়ে বসে সে ঘুমায়। শান্ত মুখ, তাতে ঘুমের কোনো ছায়া নেই। তাই মনে হয় সে বুঝি জেগেই চোখ বুজে রয়েছে, অথবা সে অন্ধ।

তারপর আবার তবারক ভুইঞার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

সে বলে : সেদিন সকালে ক্রোধোন্মত্ত পশুর মতো ছুটে গিয়ে সকিনা খাতুনের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ভীষণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেও সম্বিৎ ফিরে পেতে ছলিম মিঞার দেরি হয় নি। তারপর মেয়েটির ভীতবিহ্বল মুখ দেখতে পেলে সে গভীরভাবে লজ্জিত বোধ করে এবং এ-সময়ে কেউ এসে তার হাত ধরলে সে বশীভূত পশুর মতো মেয়েটির পথ ছেড়ে দোকানে ফিরে আসে, তার রাগের কারণটি সহসা নিজেই যেন বুঝতে পারে না।

তবে শহরবাসীরা তার রাগের কারণটা অবিলম্বে বুঝতে পারে। নিঃসন্দেহে ছলিম মিঞা একটু বাড়াবাড়ি করেছে, কিন্তু তার মতো তারাও কি জানতে চায় না মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন কী শোনে, কোথায় শোনে, তার অর্থই-বা কী? কান্নার কথাটি সকলের মনে কী-একটা আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে যেন। সে-আশঙ্কাই ছলিম মিঞার আকস্মিক ক্রোধের কারণ। লোকটির আত্মসংযম নেই, ঝট্ করে তার মাথায় রক্ত চড়ে যায়, একবার রক্ত চড়লে সে যেন চৈতন্য হারিয়ে ফেলে। তবু আশঙ্কাটি অহেতুক নয়। শহরবাসীরা কেন, মোক্তার মোছলেহউদ্দিনও বুঝতে পারে ছলিম মিঞার আচরণটি অন্যায্য নয়। বাজারের পথে তার মেয়ে অপমানিত হয়েছে খবর পেয়ে প্রথমে তার রাগের সীমা থাকে নি, সাইকেলের দোকানের বদমেজাজি মালিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে বলে শাসায়। সকিনা খাতুন যদি কিছু একটা শুনে থাকে তবে তাদের কী? সে কারো ক্ষতি করে নি, সমাজ বা নীতিবিরুদ্ধ কোনো কাজও করে নি, তারা তাকে পথে-ঘাটে অপমান করতে শুরু করবে কেন? তবে এক সময়ে তার রাগ পড়ে এবং রাগের স্থলে চিন্তা দেখা দেয়। বিচিত্র কান্নাটির কথায় অন্যেরা যদি বিচলিত হয়ে পড়ে থাকে, তাদের মনে অস্ফুট একটি আশঙ্কার ছায়া দেখা দিয়ে থাকে, বা তারা জানতে চায় কী সে-কান্না যা মেয়েটি শুনতে পায়, তবে তাদের সত্যি দোষ দেয়া যায় না। সে-ও কি মনে-মনে কেমন বিচলিত বোধ করতে শুরু করে নি, সে-ও কি কান্নাটির রহস্যভেদ করতে চায় না? প্রথমে স্ত্রীর মুখে কথাটি জানতে পারলে তাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নি এবং নিজেই বিচিত্র খবরটি সবিস্তারে বলে বেড়িয়েছে। হয়তো তখন অন্যদের বললেও তা তার আবার কেমন বিশ্বাস হয় নি, বিশ্বাস হলেও ভেবেছে তার পশ্চাতে ধরাছোঁয়া যায় এমন কোনো কারণ থেকে থাকবে : হয়তো কোথাও একটি মেয়েলোক কাঁদে,

হয়তো-বা কোনো জীবজন্তুই কাঁদে এমনভাবে; যা অস্বাভাবিক তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তবে একদিন খট্‌কা লাগে। তাই যদি হয় তবে শুধু মেয়েটিই কেন তা শুনতে পাবে? সে-কথা যেদিন বুঝতে পারে সে-দিন মনে সহসা দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। তারপর মেয়েকে বারবার জিজ্ঞাসা করে কিন্তু মেয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারে নি। কেবল এই বিষয়ে তাকে নিশ্চিত মনে হয় যে থেকে-থেকে একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় সে, নারীকণ্ঠে কে যেন কোথায় কাঁদে নদীর দিক থেকে, কিন্তু জানে না কে কাঁদে, কেন কাঁদে, কেনই-বা তার আওয়াজ অন্য কারো কর্ণগোচর হয় না।

ছলিম মিঞা সকিনা খাতুনের প্রতি অযথা অন্যায় ব্যবহার করেছে বা আশঙ্কাটি অহেতুক—এমন ধারণা কারো মনে থেকে থাকলে তা তখন দূর হয় যখন সবাই স্ত্রী করিমনের অদ্ভুত কথাটি শুনতে পায়। স্বামীর আচরণের কারণ বোঝাবার চেষ্টায় বা হঠাৎ যা আবিষ্কার করেছে তা বলার লোভ সামলাতে পারে না বলে করিমন সকলকে কথাটি বলে বেড়ায়, সাইকেলের দোকানে কর্মরত স্বামী তাকে বাধা দিতে পারে না। তারপর অন্যদের পক্ষেও আশঙ্কাটি আর চেপে রাখা দায় হয়ে পড়ে।

সেদিন সন্ধ্যার পর নবীন উকিল আরবাব খান, ইস্কুলের থার্ড-মাস্টার মোদাব্বের, মুহুরি হবু মিঞা এবং আরো দু-একজন শহরবাসীদের স্ত্রীরা বিচিত্র কান্নাটির রহস্যভেদ করার চেষ্টায় মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। স্ত্রীরা আসে, কারণ ইস্কুলের চাকরির খাতিরে পথে বেরুতে হয় বটে তবে সকিনা খাতুন কেমন পর্দাও করে, বাইরে বৈঠকখানায় পরপুরুষের সামনে দেখা দেয় না।

স্ত্রীর দল সরাসরি অন্দরে এসে অযথা কালক্ষেপ না করে সকিনা খাতুনকে জেরা করতে উদ্যত হয়। নবীন উকিল আরবাব খানের স্ত্রী আয়েষাই জেরা-কার্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আয়েষার মধ্যে বংশের একটু দেমাগ। আজ তার বাপদাদার অবস্থা তেমন সুবিধাজনক না হলেও এককালে তারা যে বড় জমিদার ছিল, তারই দেমাগ। স্বামীর পেশাজনিত সার্থকতার জোরে তার দেহে গহনা-অলঙ্কারের ছড়াছড়িও, যে-গহনা অলঙ্কারের দীপ্তি এবং ঝঙ্কারের সঙ্গে নূতন শাড়ির খসখস শব্দ, কণ্ঠের নাকী উচ্চ সুর, ধনুকের মতো বাঁকা ভ্রূর ওঠা-নাবা, ঠোঁটের পাশে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের আভাস, কটকটে চোখ—এসব মিলে যে-একটি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় তা অনেকের মনে যুগপৎ ঈর্ষা এবং আনুগত্যের ভাবের সৃষ্টি করে।

সামনে সকিনা আড়ষ্ট হয়ে বসলে সে প্রথমে কটকটে চোখে নয়, নরম চোখেই মেয়েটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, দেখে তার শীর্ণ লাবণ্যহীন চেহারা, হাসিশূন্য মুখ। সকিনা খাতুনের জন্মদাগটিও লক্ষ করে দেখে। জন্মদাগটি তেমন স্পষ্ট নয়, শ্যামল রঙের ওপর আরেকটু শ্যামল একটা ছাপ যা মুখের নিম্নাংশ থেকে শুরু হয়ে গলা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। তারপর সে দেখে তার কণ্ঠাস্থি, অলঙ্কারশূন্য বুকের উপরাংশ, প্রায় সমতল বুক। অবশেষে সে মিষ্টি কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে,

"সত্যি কিছু শুনতে পান নাকি?"

এমনভাবেই সে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে যেন কান্নার কথা সে বিশ্বাস করে না, বা তা সত্য নয় সে-কথা মেয়েটিকে বলার সুযোগ দেওয়াই তার ইচ্ছা।

সকিনা খাতুন একটু ভাবে, যেন সঠিক উত্তর সে জানে না। বস্তুত, আয়েষার নরম দৃষ্টি এবং মিষ্টি কথা তাকে হঠাৎ কেমন নিরস্ত্র করে ফেলে, সদলবলে এতজন মেয়েলোকের আকস্মিক আবির্ভাবে মনে যে-কোণঠাসা ভাব দেখা দিয়েছিল সে-ভাবটি দূর হয়। হয়তো একবার ভাবে, যদি সে বলতে পারত কিছুই সে শোনে না, কী কারণে তেমন একটা খেয়াল হয়েছিল গত কয়েকদিন কিন্তু সে-খেয়াল কেটে গিয়েছে, তবে স্বস্তিই পেত। কিন্তু সে জানে তা সত্য নয়। প্রথমে কান্নাটি শুনতে পেলে মনে হত, সত্যি কি কিছু শুনতে পায়? এখন তা-ও মনে হয় না, যখন কিছু শুনতে পায় না তখনও কান্নার রেশটি অন্তরে কোথাও যেন ঘোরাঘুরি করে।

"না, একটা কান্নার শব্দ থেকে-থেকে শুনতে পাই।" অবশেষে ক্ষীণকণ্ঠে সে বলে।

"শুধু আপনিই শোনেন, আর কেউ শুনতে পায় না—তা কী করে সম্ভব?"

এ-প্রশ্নের কী উত্তর দেবে সকিনা খাতুন? সে জানে সে-ই কেবল শুনতে পায়, আর কেউ শুনতে পায় না। কেন, তা বলতে পারবে না। অনেক সময় কান্নার আওয়াজটি এমন সশব্দে ফেটে পড়ে যে তার মনে হয় শহরের অন্য প্রান্তে পর্যন্ত সে-আওয়াজ পৌঁছানো উচিত, কিন্তু কেউ এক হাত দূরে বসে থাকলেও কিছু শুনতে পায় না।

সকিনা নীরব হয়েই থাকে। একটু অপেক্ষা করে আয়েষা আবার জিজ্ঞাসা করে,

"কান্নার আওয়াজটা কেমন ধরনের?"

এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত নয়। কান্নার আওয়াজটা কেমন ধরনের? নিঃসন্দেহে গলাটা কোনো মেয়েলোকের। অজানা মেয়েলোকটি কখনো কাঁদে করুণ গলায়, কখনো বিলাপের ভঙ্গিতে, কখনো গুমরে-গুমরে, কখনো মরণকান্নার ঢঙে। কখনো মনে হয় কাছে কোথাও কাঁদছে, কখনো আবার মনে হয় আওয়াজটি বেশ দূরে সরে গিয়েছে। কখনো কাঁদে উচ্চ তীক্ষ্ণকণ্ঠে, কখনো অস্ফুটভাবে নিম্নকণ্ঠে।

"তবে আওয়াজটা সব সময়ে একদিক থেকেই আসে।"

"কোন্‌দিক থেকে?"

"নদীর দিক থেকে।"

"কান্নাটি শুনলে ভয় করে না?"

সকিনা আবার একটু ভাবে। কান্নাটি শুনলে সে কি ভয় পায়? হয়তো আগে যেমন ভয় পেত তেমন ভয় আর পায় না, সে যেন কেমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, কে কাঁদে কেন কাঁদে তা জানে না বটে কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। কণ্ঠস্বরটি কেমন চিনেও ফেলেছে। সে-কণ্ঠের বিভিন্ন খাদ, বিভিন্ন সুর—সবই চিনে ফেলেছে এবং এমনও মনে হয় যে, যে কাঁদে তার সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

"না, ভয় করে না।"

না, সত্যি ভয় করে না আর। যে-কণ্ঠস্বর এত পরিচিত মনে হয়, সে-কণ্ঠস্বরে ভয় হবে কেন? এমনকি তার কেমন মনে হয়, কণ্ঠস্বর যেন জারুনার মা নামক মেয়েমানুষটির যার নিকট বালিকাবয়সে কতগুলি ছড়া শিখেছিল। তবে তার কণ্ঠস্বর চিনতে কষ্ট হয় কারণ তাকে কখনো কাঁদতে শোনে নি। সে সর্বদা হাসত, কখনো কাঁদত না। কিন্তু জারুনার মা কাঁদবে কেন? এই দুনিয়ায় যে কোনোদিন কাঁদে নি দুনিয়া ত্যাগ করার পর, সমস্ত দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর সে কাঁদবে কেন? কখনো কখনো মনে হয় : জীবিতকালে না কেঁদে হেসে গিয়েছিল বলে, হাসির তলে সব ব্যথাবেদনা লুকিয়ে রেখেছিল বলে এখন সে কাঁদছে, এখন তার পক্ষে কান্না ঢাকা সম্ভব নয়; মৃত্যুর পর যা সত্য তা কেউ ঢাকতে পারে না, কারণ দেহহীন হবার পর কিছু ঢাকার শক্তিও বিলোপ পায়।

আয়েষা কয়েক মুহূর্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সকিনা খাতুনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর সহসা তার চোখে কটকটে ভাবটি ফিরে আসে। সে ভাবে, সকিনা খাতুন ভয় পায় না তবে মানুষের মনে আশঙ্কার ভাব দেখা দিয়েছে কেন, সকালে ছলিম মিঞা ক্রোধে এমন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেফিল কেন, সকিনা খাতুনের চোখের নিচে এমন কালচে দাগ পড়েছে কেন?

"মন খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে বুঝি?" বিদ্রূপের স্বরে আয়েষা বলে।

সকিনা খাতুন তার উক্তিটি ঠিক শুনতে পায় না, কারণ সহসা সে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সে ভাবে, না, জারুনার মা কাঁদবে কেন? তাছাড়া তার কান্না কখনো শোনে নি বটে কিন্তু সে কাঁদলেও তার কণ্ঠস্বর নির্ভুলভাবে চিনতে পারবে; হাসির কণ্ঠে এবং কান্নার কণ্ঠে তেমন আর কী প্রভেদ? না, গতকাল থেকে একটি বিচিত্র কথাই বারবার মনে দেখা দিচ্ছে। হয়তো কান্নাটি কোনো মানুষের নয়, কোনো জীবজন্তুরও নয়, জীবিতের নয় মৃতেরও নয়, অন্য

কারো। কে জানে, কান্নাটি হয়তো নদীরই, হয়তো তাদের মরণোন্মুখ বাকাল নদীই কাঁদে।

"কী, কান্নার আওয়াজ শুনলে মন বুঝি খুশিতে ভরে ওঠে?" আয়েষা আবার বলে। আয়েষার কথা না হলেও তার কণ্ঠের রুক্ষতা এবার সকিনা খাতুনের কানে পৌঁছায়। চকিত দৃষ্টিতে সে উকিলের স্ত্রীর দিকে তাকায়, তার চোখের কটকটে ভাবটি লক্ষ্য করে, সহসা সাইকেলের দোকানের মালিকের রক্তাক্ত চোখের কথাও একবার তার স্মরণ হয়। সে কি বলবে কথাটি? হয়তো বলাই উচিত হবে। দৃষ্টি সরিয়ে সকিনা খাতুন কয়েক মুহূর্ত লণ্ঠনের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকে; সে-আলো তার চোখে প্রতিফলিত হয় বলে মনে হয় সহসা তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"ভয় হত, তবে আর হয় না। নদীর কান্নায় ভয় কী? নদী কাঁদে, বাকাল নদী কাঁদে।"

সেদিন কিন্তু শেষপর্যন্ত মুক্তাগাছি গ্রামে কালু মিঞার বাড়ি যাই নি। যেতে পারি নি। যে-দায়িত্বের ভার গ্রহণ করেছিলাম সে-দায়িত্ব অক্ষরে-অক্ষরে পালন করব এমন একটি সংকল্প নিয়েই পথ ধরেছিলাম, তবে ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করার পর কী কারণে আমার পদক্ষেপ মন্থর হয়ে ওঠে, তারপর কখন একেবারে থেমে পড়ে। নিকটে একটি হিজল গাছ দেখতে পাই। ভাবি, একটু বিশ্রাম করি। তারপর গাছের তলে বসে অদূরে একটি ক্ষেতে কার্যরত লোকেদের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। তখন রোদটা বেশ চড়ে উঠেছে, শুষ্ক-হয়ে-ওঠা হাওয়ায় চড়চড়ে ভাব দেখা দিয়েছে। নিকটে কোথাও একটি ভ্রমর গুনগুন করে শব্দ করে, দূর আকাশে একটি চিল শ্লথগতিতে কালো বিন্দুর মতো ভাসে, তারপর কোথেকে একটি ফড়িং এসে কিছুক্ষণ লাফালাফি করে আমার দৃষ্টিপথে। হয়তো অনেকক্ষণ এমনি বসেছিলাম। তারপর এক সময়ে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ক্ষেতের লোকেদের সন্ধান করি, দেখতে পাই তারা ক্ষেতের ওপাশে আরেকটি গাছের তলে মধ্যাহ্নের রোদ থেকে আশ্রয় নিয়েছে। এবার উঠে পড়ে আবার পথ ধরি। তবে সে-পথ মুক্তাগাছি গ্রাম বা আমাদের বাড়ির দিকে আমাকে নিয়ে যায় নি, সময় কাটাবার জন্যে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে বুঝে নিয়েছিলাম, কালু মিঞার বাড়ি যাওয়া সম্ভব নয়। তবু কিছুক্ষণ মনটা কেমন খচ্‌খচ্ করে। মুহাম্মদ মুস্তফা যদি জানতে পায়? অবশেষে মনকে এই বলে প্রবোধ দেই যে সে কখনো জানতে পারবে না, কারণ কালু মিঞা বা সে-বাড়ির কোনো লোকের সঙ্গে তার আর কখনো মোকাবিলা হবে না। কালু মিঞা কি মসজিদে গিয়ে বলে নি সে নির্দোষ?

তবে ক-দিন আগে মুহাম্মদ মুস্তফা পথ ভুলে মুক্তাগাছি গ্রামে কালু মিঞার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে ভীমরুলের চাকে কাঠি দেয়ার মতো কিছু করেছিল—তা যদি তখন বুঝতে পারতাম তবে প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে-কাজ করার ভার পড়েছিল আমার ওপর, সে-কাজটি করতাম। কেবল করলে কোনো ফল হত কিনা জানি না। ভীমরুলের চাকে একবার কাঠি দিলে রোষান্বিত ভীমরুলদের বশ মানানো সহজ নয়।

পরদিন দুপুরের দিকে কালু মিঞার জামাই দুটি ষণ্ডাগোছের লোক এবং একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে সঙ্গে করে আমাদের বাড়ির সামনে দেখা দেয়। বাপজানই বোধ হয় প্রথম তাদের দেখতে পায়। একটু পরে কেমন বিচলিত হয়ে বাপজান ভেতরে আসে এবং দক্ষিণ-ঘর থেকে মুহাম্মদ মুস্তফাকে ডেকে নিয়ে আবার বাইরে যায়।

সেদিনের কথা মনে পড়লে আকাশের ঘনঘটা, এবং অঝোরে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বৃষ্টি পড়ার কথাই মনে পড়ে। সেদিন এক মুহূর্তের জন্যেও যেন বৃষ্টি থামে নি, কখনো-কখনো ধারাটা কিছু ক্ষীণ হয়েছে তবে আবার মুষলধারায় নেবে আসতে দেরি হয় নি। স্তরে-স্তরে সজ্জিত পুঞ্জীভূত মেঘের তলেও দিনটা হয়তো তেমন অন্ধকার ছিল না, কিন্তু স্মৃতিতে কেবল কী একটা বিষাদভরা সুনিবিড় তমসাচ্ছন্ন দিনই দেখতে পাই। যে-বৃষ্টি অঝোরে ঝরেছিল

ক্লান্তিহীনভাবে সে-বৃষ্টিতে, যে-ঘনীভূত অন্ধকারে দিনটা সন্ধ্যার মতো হয়ে উঠেছিল সে-অন্ধকারে সব কিছু মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি কেন? যে-কথা সত্য নয় কিন্তু অতিশয় জঘন্য, সে-কথাই-বা কেন শুনতে হয়েছিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির উচ্চ শব্দের তলে তা ঢাকা পড়ে যায় নি কেন?

বাহিরঘরে পৌঁছুতে আমার দেরি হয় নি। আমাদের বাহিরঘরটি নামেই বাহিরঘর, আসলে সেটি গোয়ালঘর। একপাশে শুধু নিচু করে তৈরি বাঁশের মাচার মত; সে-মাচায় রাখাল লোক রাত্রিযাপন করে। সে-ঘরে উপস্থিত হলে দেখতে পাই কালু মিঞার জামাই এবং ষণ্ডাগোছের লোকদুটি মাচার ওপর বসে। দরজার কাছে বাপজান, পাশে দাঁড়িয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা। তারপর মাচার পশ্চাতে আবছা অন্ধকারের মধ্যে ছেলেটিকে দেখতে পাই। আবছা অন্ধকারে তার চেহারা ভালো করে দেখতে না পেলেও কেমন চমকে উঠি, কারণ, মনে হয় ছেলেটি যেন খেদমতুল্লার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ : একই মুখের আকৃতি, একই নাক, একই থুতনি, একই ধরনের কেমন ছড়ানো কান। তারপর ছেলেটি আমার দিকে ক্ষণকালের জন্যে তাকালে তার চোখে যে-রুক্ষতা দেখতে পাই সে-রুক্ষতাও অবিকল মুহাম্মদ মুস্তফার জন্মদাতার চোখেরই রুক্ষতা; খেদমতুল্লার চোখে এমন একটি ভাব ছিল যে মনে হত নিদ্রা বলে কোনো জিনিস সে জানত না।

বাপজান বড় উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল। হয়তো আসলে সে তখন উত্তেজনার চেয়ে ক্রোধ-আক্রোশই বেশি বোধ করছিল, কিন্তু যা সে সবেমাত্র শুনতে পেয়েছে তাতে সে এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে ক্রোধ-আক্রোশ প্রকাশ করার ক্ষমতা তার ছিল না। বাপজান কী বলছে তা প্রথমে বুঝতে পারি নি; বাপজান বোধগম্য ভাষায় কিছু বলার ক্ষমতাও সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে থাকবে। থেকে-থেকে একটি মেয়েলোকের নাম শুনতে পাই, কিন্তু বাপজান তার বিষয়ে কিছু জানে বলে মনে হয় না। সে কে, তা আমিও গোড়াতে ধরতে পারি নি। তারপর সহসা একটি মুখ ভেসে ওঠে মনশ্চক্ষে। একটু পরে ভালোভাবেই মনে পড়ে তার কথা : খেদমতুল্লা তার জীবনের শেষভাগে কী দুর্বোধ্য তাড়নায় একটি-একটি করে যে-কয়েকজন বাঁদি ঘরে আমদানি করেছিল সে তাদেরই একজন। গ্রাম্য মেয়ে, নাক ভোঁতা, চোখ কুতকুতে, রঙ বেশ কালো। তবে মুখে-চোখে আবার কালো মিছরির মিষ্টতা। সুযোগ পেলেই হাতমুখ নেড়ে কাচের চুড়িতে ঝঙ্কার তুলে সে সোনাপুর গ্রামের মস্ত বিলের কথা বলত, ছোটবেলায় ভাইবোনে মিলে রাতের অন্ধকারে সে-বিলে নাকি মাছ ধরত। অমনি করে অনেকে মাছ ধরে, পরে ভুলেও যায়, বা সে-বিষয়ে কিছু বলার কোনো কারণ দেখতে পায় না। কিন্তু কোনো কারণে বিলে মাছ-ধরার কথা ভুলতে পারে নি সে। হয়তো মাছ ধরা নয়, যা ভুলতে পারে নি তা বিলের স্মৃতি : যে-বিলের পানি একদিন তার অন্তরে বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল সে-পানি তখনো হয়তো নেবে যায় নি, সে-পানিতে তখনো তার অন্তর মাছের মতো খেলা করত। হয়তো বিলের কথা এমনভাবে তার মনে পড়ত কারণ খেদমতুল্লার সংসারে সে জাওলা মাছের মতোই বোধ করত।

মেয়েটির নাম কেন বারে-বারে শুনতে পাই তা এবার বুঝি। এবার ছেলেটির দিকেও আবার তাকাই। সাদৃশ্যটা অত্যাশ্চর্য : মৃতলোকটি যেন বালকরূপে ফিরে এসেছে। তবে মুখটা এবার ভালো করে দেখতে পাই না। কী কারণে হঠাৎ সে লজ্জা বোধ করতে শুরু করেছে বলে তার মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর, কাঁধটা উঠে এসেছে। নতমুখে সে পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে থাকে।

তবে বাপজানের কণ্ঠস্বর ততক্ষণে অতিশয় উচ্চ হয়ে উঠেছে, যে-ক্রোধ-আক্রোশ এতক্ষণ প্রকাশের পথ খুঁজে পায় নি তা দুর্বার বেগে ফেটে পড়েছে। জামাইটি একবার এক পলকের জন্যে বাপজানের দিকে তাকায়, ভাবভঙ্গি অবিচল, কেবল মনে হয় সে বাপজানের প্রচণ্ড ক্রোধ-আক্রোশের কোনো কারণ দেখতে পায় না। বস্তুত তখন আমিও ঠিক দেখতে পাই নি।

সে-সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফার ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে। দেখতে পাই চোখ বুজে সে কেমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারপর আরেকটি জিনিস নজরে পড়ে। তার ঠোঁট কাঁপছে, প্রচণ্ড শীতে ঠিরঠির করে কাঁপার মতো। একটু পরে বুঝতে পারি, ঠোঁট দুটি কাঁপছে না, সে নিঃশব্দে দ্রুতগতিতে কী বলছে, সে যেন দোয়াদরুদ পড়ছে। হয়তো তার ঠোঁটের নিঃশব্দ কম্পন দেখেই সহসা সব কিছু পরিষ্কার হয়ে ওঠে, বাপজানের কথা যা হেঁয়ালির মতো মনে হয়েছিল তা বোধগম্য হয়ে ওঠে, সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরটা কেমন শীতল হয়ে পড়ে। তখন মেঘের ভারে নুয়ে-পড়া আকাশ থেকে উচ্চ শব্দে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু হয়তো কিছুক্ষণ সে-শব্দ কানে পৌঁছায় নি, হয়তো-বা কিছুক্ষণ কিছু দেখতেও পায় নি। মনে বারবার একটি প্রশ্নই জাগে : এ কী-ধরনের কথা বলতে এসেছে লোকটি? তারপর সহসা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় মুষলধারে ঝরতে-থাকা বৃষ্টির শব্দ নয়, মহাপ্লাবনের গর্জন শুনছি, কোথাও মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে যে-মহাপ্লাবনে ষণ্ডাগোছের লোকটি সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ভেসে যাবে। তারপর তাদের দেখতে পাই : প্রথমে ষণ্ডাগোছের লোক দুটিকে। তারা কেমন নিশ্চল ভঙ্গিতে বসে। তারপর দৃষ্টি যায় কালু মিঞার জামাই-এর দিকে। এবার তার মুখে হয়তো অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাব ভেবেছিলাম কিন্তু তাতে অস্বাভাবিক কিছু নজরে না পড়লে বিস্মিত হই : অতি সাধারণ মধ্যবয়সী একটি চেহারা, চ্যাপটা ধরনের মাথা, ঈষৎ ভারী চোয়াল, কানের প্রান্তে মোটা কর্কশ লোম। মুখে কেমন বেজার ভাব, যেন কারো অন্যায় আচরণে সে অসন্তুষ্ট, তাছাড়া সে-মুখে কোনো অস্বাভাবিকতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই। তবু সে-ই কথাটি বলেছে, সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দুটি ষণ্ডাগোছের লোক এবং বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে যে খেদমতুল্লার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ছেলেটি হয়তো খেদমতুল্লারই ঔরসজাত সন্তান, তারই রক্তমাংস এবং লালসায় সৃষ্ট : তা বিশ্বাস্য। কিন্তু তা না বলে এমন একটি অবিশ্বাস্য কথা বলছে কেন? ছেলেটির মা যদি বলেই থাকে খেদমতুল্লা নয় মুহাম্মদ মুস্তফাই তার বাপ—তা কেউ বিশ্বাস করবে কেন? সে-কথাই বাপজান বারবার চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করছিল। একটু পরে জামাইটির মুখের অসন্তুষ্টির ভাবটি একটু গাঢ় হয়েছিল কেবল, তার আত্মসংযমে টোল পড়ে নি। সে শান্ত অনুচ্চ গলায় বলেছিল, সে কেবল একটি অসহায়া অবলা নারীর কথা বহন করে এনেছে। সে-ই বলে খেদমতুল্লা নয়, মুহাম্মদ মুস্তফা ছেলেটির জন্মদাতা। সত্যাসত্য বিচারালয়ে নির্ধারিত হবে, কারণ ছেলেটির মা মনস্থির করেছে ছেলেটির জন্মদাতা সন্তানের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করলে উকিল সঙ্গে নিয়ে আদালতে হাজির হবে। অনেক ন্যায়পরায়ণ দরদবান লোক তাকে সাহায্য করতেও প্রস্তুত। কিন্তু এতদিন পরে কেন, কোথায়-বা ছেলেটিকে লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন? লোকটি উত্তরে বলেছিল, এতদিন ছেলেটির এক মামা দয়াপরবশ হয়ে তার দেখাশুনা করছিল, কিন্তু কিছুদিন হল রক্তবমি করে সে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছে, তার দেখাশুনা করার আর কেউ নেই। তাছাড়া এতদিন কারো রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবার ক্ষমতা ছিল না মুহাম্মদ মুস্তফার, এখন সেয়ানা হয়েছে, অনেক পড়াশুনা করে লায়েক হয়েছে।

বাপজান আইনকানুনের কথা বিশেষ জানত না, তবু প্রথমে আইনকানুনের কথাই সে ভাবে। যা জলজ্যান্ত মিথ্যা তা মিথ্যাই, সে-বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই—তা বুঝতে পারলেও আদালতের কথা বার-বার তার মনে আসে যেন লোকটি ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সে ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিল যে সেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা মুক্তাগাছি গ্রামে প্রাচীন বটগাছটির তলে দেখা দিয়েছিল বলেই ছেলেটিকে খুঁজে বের করে কালু মিঞার জামাই আমাদের বাড়ি উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু খেদমতুল্লাকে নয় তার সন্তানকে কেন ছেলেটির জন্মদাতায় পরিণত করার চেষ্টা করছে তা বুঝতে পারে নি। সে ভাবে, বাপ বেঁচে নেই বলে সৎভাইকে জন্মদাতায় রূপান্তরিত করলে ভরণপোষণ আদায় করা হয়তো সহজ এবং এমন ধরনের রূপান্তর যে অতিশয় জঘন্য তা হয়তো নীচ প্রকৃতির লোকেদের পক্ষে

উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে সহসা সে বুঝতে পারে। সে বুঝতে পারে, কথাটি আদৌ ভরণপোষণের কথা নয়, যুক্তিতর্ক নিয়েও তারা আসে নি।

বজ্রাহত মানুষের মতো বাপজান কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকে, তারপর তার দৃষ্টি যায় মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে। ততক্ষণে বাপজানের চোখে খুন চড়েছে। উন্মাদের মত চিৎকার করে সে বলে, "চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তুমি মরদ না মাগী, বুকে একটু হিম্মত নাই?"

হয়তো কালু মিঞার জামাই এসে আমাদের যা বলে তা মুহাম্মদ মুস্তফাও প্রথমে সম্যকভাবে বোঝে নি; এমন কথা ছেলে কী করে বোঝে? তবে বাপজানের উক্তির পর না বুঝে উপায় থাকে না। কয়েক মুহূর্ত সে পূর্ববৎ নিমীলিত চোখে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পূর্ববৎ দোয়াদরুদ পড়ে চলে, যেন বাপজানের কথা শোনে নি। তারপর সহসা সে চোখ খুলে লোকটির দিকে তাকায়। এ-সময়ে ষণ্ডাগোছের দুটি সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও লোকটি ঈষৎ ভীত হয়ে থাকবে, কারণ আড়চোখে সে মুহাম্মদ মুস্তফার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে থাকে। কয়েক মুহূর্ত কাটে।

তারপর মুহাম্মদ মুস্তফা বমি করতে শুরু করে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই সে বসে পড়ে দেহের অভ্যন্তরে কী-একটা ভীষণ শব্দ করে-করে বমি করতে থাকে। দুপুরের আগে যা খেয়েছিল তা তখনো হজম হয় নি, সে-সব খণ্ড-খণ্ড হয়ে বেরিয়ে আসে, ন্যাক্কারজনক একটি দুর্গন্ধ ঘরে ভারি-হয়ে-থাকা গো-দেহ এবং গোবরের গন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, এতক্ষণ নিঃশব্দে সে যে-সব দোয়াদরুদ পড়ছিল সে-সব দোয়াদরুদ বেরিয়ে আসছে। সে-সব কোথাও পৌঁছায় নি।

এর কিছুক্ষণ পরে ষণ্ডাগোছের দুটি লোক এবং ছেলেটিকে নিয়ে কালু মিঞার জামাই বমি-ছড়ানো স্থানটি এড়িয়ে ঘরত্যাগ করে বাড়িমুখো হয়। তখন বৃষ্টি কিছু ধরেছে।

তারপর বাপজান কিছু বলে নি। বস্তুত সহসা তার মুখের কথা শুকিয়ে যায় যেন কিছুই আর বলার নেই। এ-ও মনে হয় হঠাৎ তার মধ্যে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার কিছু আগে মুহাম্মদ মুস্তফা প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেলে সে কোনো কৌতূহলও দেখায় নি।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে অপেক্ষা করি, কোথায় গিয়েছে কেন গিয়েছে কী করছে—এ-সব বিষয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করতে সাহস হয় নি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে। দক্ষিণ-ঘরে উত্তর-ঘরে যে যার বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করে, কেবল মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুন উত্তর-ঘরে এসে খোদেজাকে নিয়ে টিপটিপ করে জ্বলতে থাকা একটি পিদিমের আলোয় কাঁথা সেলাই করতে বসে। একসময়ে তাদের দিকে দৃষ্টি গিয়েছে এমন সময়ে দেখতে পাই আমেনা খাতুন তার বুক উন্মুক্ত করে খোদেজাকে নিম্নকণ্ঠে বলছে, সে-বুকের দুধ দিয়েই সে একদিন শিশু মুহাম্মদ মুস্তফার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর করত। খোদেজা ঘুম জড়ানো চোখে অনেকটা নির্বোধের মতো আমেনা খাতুনের বুকের দিকে নয়, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত।

মুহাম্মদ মুস্তফা যখন ফিরে আসে তখনো বৃষ্টি থামে নি। তবে সে-সময়ে তাকে দেখি নি; দক্ষিণ-ঘরে কে যেন অনুচ্চ স্বরে কথা বলে উঠলে বুঝতে পারি সে ফিরে এসেছে। ততক্ষণে আমেনা খাতুন দক্ষিণ-ঘরে ফিরে গিয়েছিল।

সে-রাতে মুহাম্মদ মুস্তফা কোথায় গিয়েছিল, কার সঙ্গে দেখা করেছিল, দেখা করে কী বলেছিল—এ-সব কথা কখনো সে না বললেও আমরা ঠিক অনুমান করতে পেরেছিলাম। তারপর মুক্তাগাছি গ্রামের কালু মিঞার বাড়ির দিকে থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া না গেলে, এবং বাপজান তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলে অনুমানটি নিশ্চিত জ্ঞানে পরিণত হয়।

তবারক ভুইঞার মুখে একটি হাসির আভাস দেখা দিয়েছে যেন। হয়তো এতদিন পর কুমুরডাঙ্গা নামক মহকুমা শহরের মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মাস্টারনি মেয়ে সকিনা

খাতুনের অদ্ভুত ধারণাটির কথা মনে পড়ায় তার একটু হাসি পেয়েছে। শ্রোতাদের মধ্যে সহসা কেউ সশব্দে হেসে ওঠে। হাসি ঠিক নয়, নাকে একটা আওয়াজ হয়, যে-আওয়াজ নাকে জেগে-উঠে নাকেই থেমে যায়। ততক্ষণে তবারক ভুইঞার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে।

"অদ্ভুত ধারণা, তবু তা শোনার পর কী যেন হয়, যাদের মনে মেয়েটির প্রতি ধিকিধিকি করে একটা রাগ জ্বলতে শুরু করেছিল, তাদেরই কেউ-কেউ এবার কী-যেন শুনতে শুরু করে," তবারক ভুইঞা বলে।

মিহির মণ্ডল বলে একটি লোক একদিন সকালে বলে, গভীর রাতে কী কারণে ঘুম ভেঙ্গেছে এমন সময়ে সে শুনতে পায় নদীর দিকে একটি মেয়েলোক যেন আর্তস্বরে কাঁদছে। মিহির মণ্ডল কাপড়ের ব্যবসায়ী মোহনচাঁদের গদিতে কাজ করে; সাবধানী হুঁশিয়ার লোক, সত্যবাদী বলেও সুনাম। তবে মোহনচাঁদ তার স্বাভাবিক শ্লেষ্মাঘন কণ্ঠে হাপর-হাসি হেসে—বক্তব্যের বিষয় যাই হোক, হাসিছাড়া মোহনচাঁদকে কল্পনা করা যায় না—বলে, মানুষের জীবনে আপদ-বিপদ অসময়েই আসে, অসময়েও তাকে পথ ধরতে হয়। কে জানে, কোনো মর্মান্তিক দুঃসংবাদ শুনে একটি মেয়েলোক নিশীথ রাতে নৌকায় সওয়ার হয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সে-মেয়েলোকের বুকফাটা কান্নাই তার কর্মচারীটি শুনে থাকবে।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত, নিতান্ত বিশ্বাসযোগ্যও বটে, কিন্তু ক-দিন ধরে মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুনও কি তেমন একটা কান্না শুনতে পায় বলে দাবি করে না?

পরদিন আরেকটি খবর শোনা যায়। সেটি এই যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধ ঈমান মিঞা যে অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর ঘর থেকে বের হয় নি, সে-ও একটি বিচিত্র কান্না শুনতে পেয়েছে। এত বয়সেও কানে তার দোষ-দুর্বলতা নেই, বরঞ্চ নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই বলে তার শ্রবণশক্তিটা অতি প্রখর হয়ে উঠেছে, বিড়ালের পদধ্বনিও সে শুনতে পায়। তাছাড়া, তার বাড়ি নদীর ধারে; বাড়ি এবং নদীর মধ্যে কেবল একটি কাঁঠালগাছ এবং সরু একটি পথ। নদীর কলতান, ঝড়ের সময়ে তার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের আর্তনাদ, কখনো-কখনো তার নীরবতাও সে শুনতে পায়; মধ্যে-মধ্যে নদীও জন্তুর মতো নিথর হয়ে ঘুমায়। তারপর নদীর বুক থেকে মাঝিদের কণ্ঠধ্বনি শোনে, যে-কণ্ঠধ্বনি স্থলের মানুষের কণ্ঠধ্বনির মতো নয় : দুটি কণ্ঠ ভিন্ন ধরনের। তবে নদী থেকে কখনো কোনো কান্না শোনে নি, এবং সে-জন্যে সেদিক থেকে কান্নার শব্দটি শুনতে পেলে সে বড় বিস্মিত হয়েছিল। কেউ জিজ্ঞাসা করে, কান্নাটি কেমন? কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বৃদ্ধ ঈমান মিঞার পক্ষে সহজ নয়। উত্তর দেবার চেষ্টায় তার ঠোঁট কিছুক্ষণ নড়ে, হয়তো অন্য বৃদ্ধ মানুষের মতো বর্তমান সময়ের কোনো ঘটনার বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে তার মন সুদূর অতীতে উপনীত হয় বলে চোখে দূরত্বের ভাব জাগে, কিন্তু প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারে না। অবশেষে ঈমান মিঞা বলে, না, কান্নাটি কী রকম সে জানে না, কেবল জানে কণ্ঠটা কোনো মেয়েমানুষের, এবং আওয়াজটা নদীর দিকে থেকেই এসেছিল।

কান্নার কথাটি অবিশ্বাস করার আর যেন উপায় থাকে না; একজন নয়, দুজন নয়, তিন-তিনটে লোক শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা শুনতে পেয়েছে। সহসা কুমুরডাঙ্গার অনেকে এবার ঘোরতরভাবে শঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কে কাঁদে, কেন কাঁদে, এ কান্নার অর্থই-বা কী? এ-সময়ে কান্নাটি শুনবার জন্যে কারো-কারো মনে একটি প্রবল কৌতূহলও দেখা দেয়। হয়তো তারা ভাবে, কোথাও যদি সত্যিই কিছু শোনা যায় তবে তা নিজের কানে শুনতে পেলে তার রহস্যভেদ করতে সক্ষম হবে। অন্যের অগোচরে তারা কান্নাটি শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে শুরু করে, একা হলে একাগ্রমনা সকর্ণতার মধ্যে দিয়ে, মানুষের কণ্ঠস্বর-মুখরিত স্থানে কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকলে থেকে-থেকে সমগ্র অন্তরে নিথর-নীরব হয়ে পড়ে, রাতে শুতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুম ঠেকিয়ে নিশ্চলভাবে জেগে থাকে।

তাদের এই শোনার চেষ্টা বা তাদের এই অপেক্ষা ব্যর্থ হয় না, কারণ শীঘ্র একে-একে তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে হয় তারাও কান্নাটি শুনতে পেয়েছে।

ওষুধের দোকানের রুকুনুদ্দিন বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল এমন সময়ে তার স্ত্রী সচকিতকণ্ঠে তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে সে কিছু শুনতে পাচ্ছে কিনা। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পেছনের দেয়ালের পাশে কাঁঠালগাছে অসংখ্য পাখি কলরব তুলে হয়তো সারাদিনের খবরাখবর আদান-প্রদান করতে শুরু করেছে, দূরে রাস্তায় কোনো গরুগাড়ি চাকায় ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ করে বাড়ির পথ ধরেছে, তাছাড়া চতুর্দিকে গভীর নীরবতা, কোথাও কোনো শব্দ নেই। রুকুনুদ্দিন কিছু শুনতে না পেলেও তার স্ত্রী গভীর বিস্ময়ে কী যেন শুনে চলে। তারপর আওয়াজটি আর শুনতে না পেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কেমন এক গলায় বলে, সে যেন কী-একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল।

বাজারের পথে তার দোকানে বসে মুদিখানার মালিক ফনু মিঞা ছাদ থেকে ঝোলানো লণ্ঠনের পল্‌তেটা একটু উস্‌কিয়ে দিতে যাবে এমন সময়ে সহসা সে চমকে ওঠে। প্রথমে তার মনে হয়, কোথাও একটা সাঁ-সাঁ আওয়াজ উঠেছে। কিন্তু একটু কান পেতে শোনার পর বুঝতে পারে, আওয়াজটি যেন তীক্ষ্ণ বিলম্বিত নারীকণ্ঠের কান্নার মতো যে-আওয়াজ ক্রমশ নিকটে আসছে বা হয়তো কেবল উচ্চতর হয়ে উঠছে। অবশেষে আওয়াজটি থামলে মুদিখানার মালিক লণ্ঠনের কথা ভুলে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে থাকে।

শহরের অন্য পাড়ায় হবু মিঞা মুহুরির স্ত্রী জয়তুনবিবি কঙ্কালসার অসুস্থ ছেলের মুখে দাওয়াই দেবার চেষ্টা করছিল। ছেলের মুখে দাওয়াই দেয়া সহজ নয়; চামচ-ভরা ওষুধ নিয়ে অনুনয়-মিনতি করছে এমন সময়ে মুহুরির স্ত্রী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কারণ হঠাৎ সে শুনতে পায় অদূরে কে যেন বাঁশি বাজাতে শুরু করেছে : কেমন মন উদাস-করা করুণ সুর, তেমন উঁচু নয়। মধ্যে-মধ্যে দূরে কেউ বাঁশি বাজায়, তবে বেশ রাত হলেই বাজায়, তাও সচরাচর চাঁদনি-রাতে। মুহুরির স্ত্রী শীঘ্র বুঝতে পারে আওয়াজটা ঠিক বাঁশির মতো নয়, তাতে সপ্তস্বরের খেলা নেই, কোনো সুর নেই, বাঁশি হলেও উচ্চ একটি স্বরে যেন থেমে রয়েছে। তারপর সে চমকে ওঠে, বুকের ভেতরটা সহসা থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। তবে সে কি বিচিত্র কান্নাটি শুনছে? হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন আরো দ্রুততর হয়ে উঠে তারপর সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়ে, মনে কী-যেন একটা দুর্বোধ্য আলোড়ন উপস্থিত হয়। তবু যা সে শুনতে পায় তা স্পষ্টভাবেই শুনতে পায়, যা বাঁশির আওয়াজ নয় নারীর-কণ্ঠের কান্নার ধ্বনি : তীক্ষ্ণ কিন্তু করুণ স্বর, গলাছাড়া আর্তনাদের মতো হলেও আবার গোপন-কান্নার মতো সংযত, অশ্রুহীন হাহাকার হলেও আবার বর্ষাসিঞ্চিত হাওয়ার মতো সজল।

সে-সন্ধ্যায় হয়তো কান্নাটি আর কেউ শোনে নি। তবে ততক্ষণে দুর্বোধ্য ব্যাখ্যাতীত কান্নাটি কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের অন্তরে পৌঁছে গিয়েছে, তা আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয় যেন। ধীরে-ধীরে অনেকে সময়ে-অসময়ে সে-কান্না শুনতে পায়, যে-কান্না কখনো বাঁশঝাড়ে হাওয়ার মর্মরের মতো শোনায়, কখনো-বা বাঁশির রব ধরে, কখনো আবার রাতের অন্ধকারে পাখি-শাবকের কাতর আর্তনাদের মতো শুরু হয়ে অবশেষে বিলম্বিত রোদনে পরিণত হয়।

দু-দিন পরে কাছারি-আদালতের নিকটে এক-কামরার বার-লাইব্রেরিতে মধ্যবয়সী উকিল সুরত মিঞা বসেছিল। এ-ঘরে বসে কুমুরডাঙ্গার কতিপয় উকিলের মামলা-যুদ্ধের ফন্দি-কাররবাই-এর সন্ধান করে, গল্পগুজব করে, চা-সিগারেট পান করে, গা-ঢালা নিস্পন্দতায় চুপ করে থেকে আরাম করে, অথবা চতুষ্পার্শ্বের কলরব বা সামনের মাঠ থেকে জনতার যে-অশ্রান্ত গুঞ্জন ভেসে আসে সে-গুঞ্জন অগ্রাহ্য করে নিদ্রা দেয়। ঘরের এক কোণে একটি আলমারিতে ঠাসা ইংরেজ-হিন্দুদের আমলের পুরাতন আইনের বই। তবে আলমারির কাচের দরজা অনেকদিন হল ভেঙে গিয়েছে বলে সে-সব বইতে ধুলার প্রলেপ : সামনের

ঘাসশূন্য, শুষ্ক মাঠ থেকে নিরন্তর যে-ধুলা ভেসে আসে সে-ধুলা ছোট ঘরটির সর্বত্র অবাধে বিচরণ করে একটি ঘন আবরণ ছড়িয়ে রাখে। কখনো-কখনো কেউ চৌকিদারকে ডেকে নিজের কুর্সিটা ঝেড়ে নিয়ে ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করে, ঘরের অন্যত্র দৃষ্টি দেয় না; যে-সমস্যা সর্বব্যাপী তার বিষয়ে উদাসীনতাই হয়তো বুদ্ধিসঙ্গত।

তবে সেদিন সুরত মিঞার দৃষ্টি যেন পড়ে ঘরের ধুলার দিকে। তার চোখ ঘুরতে থাকে চতুর্দিকে : মেঝে, বইঠাসা কাচশূন্য আলমারি, বিবর্ণ দেয়াল, কোণে স্থাপিত সুরাহি—কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। এ-ধরনের অনুসন্ধান তার চরিত্রবিরুদ্ধ বলে শীঘ্র তা উপস্থিত সহযোগীদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে; পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে তো বটেই, জীবন সম্বন্ধেও সুরত মিঞা সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ—যে-জন্যে কদাচিৎ মক্কেল তার শরণাপন্ন হয়।

"কী দেখছেন?" কেউ প্রশ্ন করে।

সে উত্তর দেয় না; তার চোখ পূর্ববৎ ঘুরতে থাকে। বস্তুত সে কিছু দেখবার চেষ্টা করে না, শুনবারই চেষ্টা করে; হঠাৎ সে যে-অস্বাভাবিক একটি শব্দ শুনতে পায় তা কোথেকে আসছে তাই বুঝবার চেষ্টা করে চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। হয়তো ঘরের কোণে একটা ডানা-ভাঙ্গা পাখি এসে পড়েছে। বা ইঁদুর কি? কিন্তু আওয়াজটা যেন কেমন। ক্রমশ সুরত মিঞার চোখে-মুখে বিস্ময়াভিভূত ভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারপর তাতে দেখা দেয় উপলব্ধির স্বচ্ছতা : এবার তার দৃষ্টি ধুলাচ্ছন্ন ছোট ঘরটি ত্যাগ করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘাসশূন্য মাঠ অতিক্রম করে নদীর দিকে যায়, কারণ সে-দিক থেকেই আওয়াজটি যেন আসে। সে আর দেখে না, শুধু শোনে, কী একটা কান্না শোনে। ঘরময় ততক্ষণে গভীর নীরবতা নেবেছে, যেন অন্যেরাও কান্নাটি শুনতে পেয়েছে।

এ-সময়ে কেউ আবার জিজ্ঞাসা করে,

"কী হল সুরত মিঞা?"

সুরত মিঞার চমক ভাঙে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থেকে সজোরে মাথা নেড়ে বলে, "কিছু না।"

ডাক্তার বোরহানউদ্দিন নদীর তীরে বাস করলেও কান্নাটি নিজের কানে শোনে নি, তবে একদিন রাতের বেলায় তারই সামনে স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার তা বেশ স্পষ্টভাবে শুনতে পায়। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের উৎকট চিন্তা এবং প্রয়াশ নানাপ্রকার কল্পিত বা কিছু সত্য ব্যাধির দরুন গভীর মানসিক অশান্তিতে ভুগে থাকে। সে-রাতে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার দুর্বোধ্য ব্যাধির বিভিন্ন লক্ষণের সুদীর্ঘ বিবরণ দিচ্ছে—এমন সময়ে সহসা অস্বাভাবিকভাবে সে নীরব হয়ে পড়ে। প্রথমে তার মনে হয় কানে বুঝি ঝাঁ-ঝাঁ ধরেছে; সেটি তার রোগের একটি নূতন লক্ষণ হবে। একটু অপেক্ষা করে কানে আঙ্গুল দিয়ে সে-আঙ্গুল ভীষণভাবে ঝাঁকে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয় না, ঝাঁ-ঝাঁ রবটি থামে না।

তারপর সহসা সে বুঝতে পারে।

এ কি সম্ভব? তারও কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে? ঘোর অবিশ্বাস সত্ত্বেও সে কিন্তু নিশ্চল হয়ে থাকে, ক্ষীণদেহ মানুষটির বড় ধরনের চোখ বিস্ফারিত হয়ে আরো বড় হয়ে ওঠে। তবে বিস্ময়ে নয়, ক্রোধে, কারণ সে-ও কান্নাটি শুনতে পেয়েছে মনে হলে নিজের ওপর তার ভয়ানক ক্রোধ হয়।

বোরহানউদ্দিনের দৃষ্টি লক্ষ্য করে অবশেষে ঈষৎ লজ্জা-লাল মুখে বলে, "কানেও ঝাঁ-ঝাঁ ধরে মধ্যে-মধ্যে।"

একদিন তবারক ভুইঞা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রী আমিরুনকে জিজ্ঞাসা করে, "কী শুনছ?"

আমিরুন মাথা হেলিয়ে শোনার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে ছিল, সচকিত হয়ে বলে, "না, কিছু শুনছি না। তবে লোকেরা যে কী কান্না শুনতে পায়, সে-কথা ভাবছিলাম।

"ওসব বাজে কথায় কান দিয়ো না।" স্ত্রী আমিরুনকে সে ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলে।

"কিন্তু এত লোক শুনতে পায় যে।"
"কোনো রকমের কানের ভুল বা খেয়াল হবে।"
কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আমিরুন উত্তর দেয়,
"তবু কথাটায় মনটা কেমন-কেমন করে যেন।"

লোকটির দিকে একবার আড়চোখে তাকাই এবং একদা তার চেহারার যে-বর্ণনা শুনেছিলাম সে-বর্ণনার সঙ্গে তার মুখটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করি। তবে বহুদিন আগে শোনা বর্ণনা থেকে একটি মানুষকে চেনা সহজ নয় : কারো চরিত্র বা মুখের চেহারা বহুদিন এক থাকে না, কালের স্পর্শ পড়ে দুটিতেই। তাছাড়া একদিন তার চেহারা-চরিত্রের যে-বর্ণনা শুনেছিলাম সে-সবের সঙ্গে সে-দিনই আসল লোকটির তেমন সাদৃশ্য ছিল কিনা কে জানে। যাকে কখনো দেখি নি যার কণ্ঠস্বর শুনি নি যার চলনভঙ্গি মুখভঙ্গি বা মুদ্রাদোষ লক্ষ্য করার সুযোগও পাই নি, পরের মুখে তার কথা শুনলে আমরা তাকে সাধারণত মনে সদা-মওজুদ মানুষ-চরিত্র সম্বন্ধে ছাঁচে-ঢালা নির্দিষ্ট কতকগুলি নকশার একটির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে লোকটি কেমন তা বুঝবার চেষ্টা করি। আমাদের সকলের মনে এমন কতকগুলি নকশা থাকে—মানুষ-চরিত্রের বিভিন্ন নিদর্শন নানাপ্রকার দোষ-গুণের প্রতীক, যা আসলে মানবজাতি সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা-মতামত ছাড়া আর কিছু নয় : আমরা কেউ মানবজাতির দিকে তাকাই আশার চোখে, কেউ নিরাশার, কেউ বিশ্বাসের চোখে, কেউ অবিশ্বাসের, কেউ প্রেমের চোখে, কেউ ঘৃণা-বিদ্বেষের; আমরা কখনো তাতে সর্বপ্রকারের দুষ্ট প্রবৃত্তি, কখনো আবার নিষ্কলঙ্ক ফেরেশতার গুণাবলি আরোপ করি। অতএব যার কথা শুনি ঠিক তাকে নয়, তার নামে আমাদের নিজস্ব মতামতই বলিষ্ঠ করি, মুষ্টিমেয় কয়েকটি নিদর্শনের মধ্যে যে সর্বচরিত্র সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে তা ভুলে গিয়ে মানুষ-চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের কিছু অনবগত নেই—সে-গর্বকে তুষ্ট করে আত্মতৃপ্তি লাভ করি। অজানা-অপরিচিত লোকটির কথা যে বলে তার বর্ণনাও দোষমুক্ত নয়, কারণ যে-মানুষ তার অন্তরপথে ঘুরে আবার বাইরে প্রকাশ পায় সে-মানুষ তার দৃষ্টিরঙে রঞ্জিত হয়ে পড়ে, নিঃস্বার্থ নিরপেক্ষ সততাও সে-রঞ্জন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কেউ যখন কারো কথা বলে তখন সে কেবল তার কথাই বলে না, দশজনের কথা এবং নিজের কথাও বলে; কাউকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে বিচার করা সম্ভব নয়। বিস্ময় কী যে, যার বিষয়ে পরের মুখে শুনেছি তাকে যখন স্বচক্ষে দেখার সুযোগ হয় তখন দেখতে পাই কল্পনার লোকটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য তেমন নেই, দুজন যেন ভিন্ন মানুষ।

তবে সন্দেহটি কেন আবার দেখা দিয়েছে, তা বুঝতে পারি। চেহারা বা চরিত্রের জন্যে নয়, সন্দেহ জাগে এই কারণে যে, সে এখনো একবারও মুহাম্মদ মুস্তফার নাম নেয় নি। তবে সে কি তবারক ভুইঞা নয়?

অল্পক্ষণ সন্দেহের দোলায় দুলে সে যে তবারক ভুইঞাই হবে—সে-বিশ্বাসটি আবার দৃঢ়বদ্ধ হয় আমার মনে। সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়টিও বাড়ে। কেন তবারক ভুইঞা মুহাম্মদ মুস্তফার নাম নেবে না তা আমার বোধগম্য হয় না। অথচ যখন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে চরা পড়ে থাকলেও স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবার কারণ নেই এবং শীঘ্র স্টিমার ফিরে আসবে, তখন শহরবাসীদের নির্বুদ্ধিতার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করতে প্রায়ই মুহাম্মদ মুস্তফার সঙ্গে সে দেখা করতে আসত। স্টিমারঘাট বন্ধ বলে তখন সে বেকার। তার বাড়িটা ছিল মুহাম্মদ মুস্তফার সরকারি বাংলোর পশ্চাতে, সুযোগ পেলে কারণে-অকারণে এসে হাজির হত। তারপর শহরবাসীরা কী-একটা বিচিত্র কান্না শুনতে শুরু করার পর তার আসা-যাওয়াটা যেন বেড়ে যায়। ততদিনে সে মুহাম্মদ মুস্তফার চিত্ত জয় করে নিয়েছে; হাসি-খুশি সরলচিত্ত সশ্রদ্ধ, তার সুখসুবিধার বিষয়ে সদা সজাগ লোকটির প্রতি মুহাম্মদ মুস্তফার মনে কেমন একটা স্নেহভাব জেগে উঠেছিল। মনে হত তার খেদমত করার শখের অন্ত নেই যেন তবারক

ভুইঞার। বস্তুত, একটি ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কি অমনি তা পূর্ণ করার জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যেত, কোনো-কোনো সময়ে তার কী দরকার তা নিজেই লক্ষ্য করে দেখে যথাবিধি ব্যবস্থা করত।

এ-সময়ে শ্যাওলা-আবৃত ক্ষুদ্র পুকুরে খোদেজার মৃত্যুর কথা কেউ উল্লেখ করত না—না তবারক ভুইঞা না মুহাম্মদ মুস্তফা। মুহাম্মদ মুস্তফা ধরে নিয়েছিল যে খোদেজার মৃত্যু সম্বন্ধে বাড়ির লোকেদের আজগুবি কথাটা তবারক ভুইঞা বিশ্বাস করে না। তেমন কথা বিশ্বাস করা কি সহজ? কে না জানে আপন হাতে নিজের প্রাণ নেওয়া কত কঠিন। একমাত্র সন্তান হারালেও অত্যন্ত স্নেহশীলা মাতা আত্মহত্যা করে না, জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে দিয়ে মর্মান্তিক শোক সহ্য করে নেয় কারণ জীবনের মায়ার চেয়ে বড় মায়া নেই, যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ প্রতিকার বা ক্ষতিপূরণের আশারও শেষ নেই। সে যদি বিশ্বাস করে খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল—তাতেই-বা আপত্তি করা যায় কি? বাড়ির লোকেরাও কি তেমন একটি কথা বিশ্বাস করে না? তাছাড়া, বিশ্বাস করলেও অবাক হবার কিছু নেই। আত্মহত্যার চেয়ে অপঘাতে মৃত্যুর কথা গ্রহণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও মানুষের পক্ষে আপন প্রাণ নেয়া অত্যন্ত কঠিন বলে তা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি চমকপ্রদ, অনেক বেশি চাঞ্চল্যকর। আত্মহত্যার মধ্যে মানুষ সর্বপ্রধান, কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর মধ্যে সে কোরবানির গরু-ছাগলের মতো অসহায়। বিকৃত কোনো মানসিক অবস্থার সাহায্যে হলেও কেউ সেই চরম নিঃসহায়তার ঊর্ধ্বে উঠেছে—এমন কথা মনে আঘাত করলেও আবার চিত্তাকর্ষক। খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তা যদি সে বিশ্বাস করে, তবে সে-জন্যেই করে।

তারপর একদিন সহসা মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেই কথাটি তোলে কোনো কারণ ছাড়া। সে বলে, "বাড়ির লোকেদের কথাটি ভাবছিলাম। কী করে তারা তেমন একটা কথা ভাবতে পারে বুঝি না।"

তখন বেশ রাত হয়েছে। নিত্যকার মতো শুতে যাওয়ার আগে তবারক ভুইঞা নদীর ধারে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল, এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফাকে দেখতে পেয়ে দু-দণ্ড আলাপ করবার জন্যে বারান্দার প্রান্তে এসে বসেছে, সিঁড়ির ধাপে পা। সহসা উত্তর না পেলে মুহাম্মদ মুস্তফা তার দিকে দৃষ্টি দেয়। অন্ধকারে তার চেহারা স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু মনে হয় উক্তিটি তার চোখে কী-একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, যেন পানির গভীরে একটা বড় গোছের মাছ সন্ত্রস্তভাবে লেজ সঞ্চালন করাতে তার সামান্য আভাস দেখা দিয়েছে পানির বুকে।

তারপর হঠাৎ তবারক ভুইঞা মাথা নিচু করে, তার চোখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

"আমিও তাই ভাবি।"

এবার দু-জনেই নীরব হয়ে থাকে। একবার অল্প সময়ের জন্যে একটু হাওয়া ভেসে আসে নিঃস্পন্দ রাতের বুক থেকে, তার পালক-হাল্কা স্পর্শ লাগে মুখে-চোখে, রাস্তার পাশে নিমগাছের পাতায় মর্মরধ্বনি জাগে; সে-মর্মরধ্বনি যেন কিসের প্রতিধ্বনি। একটু পরে মুহাম্মদ মুস্তফা অন্ধকারের মধ্যে আবার তবারক ভুইঞার দিকে তাকায়। লোকটি তখন দূরে কোথাও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নিথর হয়ে বসে। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটি বিচিত্র কথা দেখা দেয়। তার মনে হয়, সে জানে তবারক ভুইঞার দৃষ্টি কোথায়, জানে সে-দৃষ্টি কী দেখছে তাকিয়ে-তাকিয়ে। তার দৃষ্টি একটি পুকুরের ওপর নিবদ্ধ। পুকুরটি শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ ডোবার মতো, যে-পুকুরে একটি মেয়ে ধীরে-ধীরে নাবছে। পাড় থেকে ধাপ-কাটা একটি নারকেলগাছের গুঁড়ির যে-সিঁড়ি পানির দিকে চলে গিয়েছে, সেটা বেয়ে নাবছে। এক ধাপ, দুই ধাপ—পাশাপাশি করে রাখা দুটি পায়ে সন্তর্পণে কিন্তু অনায়াসে সে নেবে যাচ্ছে অনেকদিনের অভ্যাসের ফলে। এবার তৃতীয় ধাপ। সে-ধাপের পরে কালো পানি, নিস্তরঙ্গ বদ্ধ পানি। মেয়েটি নেবেই চলে। প্রথমে হাঁটুপানি—তারপর কোমরপানি, অবশেষে বুক পর্যন্ত ওঠে সে-পানি। এবার মেয়েটি আর না নড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, দৃষ্টি কালো

পানির দিকে। যেন তার মধ্যে দ্বিধা-সংশয় দেখা দিয়েছে, যেন এবার কী করবে তা সে ঠিক বুঝতে পারছে না, তার গাঢ় শ্যামল ক্ষুদ্র মুখাবয়বে নিথর ভাব। তারপর হঠাৎ সে এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেন পেছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে, মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ নিঃসৃত হয়। শীঘ্র তার মাথা, মাথার উপরাংশ, তারপর মাথার যে-চুল পানিতে ছড়িয়ে পড়েছিল সে-চুল অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু আবার তাকে দেখা যায়, কারণ সে ভেসে ওঠে। হয়তো অল্পক্ষণ সে ভয়ানকভাবে হাত-পা নাড়ে, ভেসে থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু ক্রমশ তার দেহ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, কাঠের মতো, তারপর পাথরের মতো। এবং একবার তার দেহ পাথরে পরিণত হলে চোখের পলকে সে শ্যাওলা-আবৃত বদ্ধ পানিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। এ-ভাবেই কি মানুষ পানিতে ডুবে মরে?

মুহাম্মদ মুস্তফা নিজেকে সংযত করে। তবে তার মনে হয় সহসা তার তন্দ্রাভঙ্গ হয়েছে। সে কি তার অগোচরে ঘুমিয়ে পড়েছিল? রাত্রি পূর্ববৎ নীরব, কেউ কোথাও নেই, সিঁড়ির ধাপে পা রেখে যে-লোকটি বসে—সে-ও যেন নেই। সচকিত হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকালে সে তাকে দেখতে পায়। সেখানে শুধু যে বসে তা নয়, কেমন একটা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। সহসা মুহাম্মদ মুস্তফা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে।

"যাই, শুয়ে পড়ি গিয়ে।" আড়মোড়া ভেঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফা বলে, তৎক্ষণাৎ উঠেও পড়ে।

তবে সে-রাতে ঘুমোতে গিয়েও মুহাম্মদ মুস্তফা সহজে ঘুমাতে পারে না। বার-বার তবারক ভুইঞার কথাই তার মনে আসে। সে যে-কথা বলেছিল তা যে সত্য নয় তা বলামাত্রই বুঝেছিল, তা অপ্রত্যাশিতও মনে হয় নি। তবু সে-কথা তাকে কেমন নিপীড়িত করে যেন।

অনেকক্ষণ ঘুমের প্রতীক্ষায় নিশ্চল হয়ে-থাকার পর মুহাম্মদ মুস্তফা উঠে পড়ে। ঘরের কোণে সুরাহি থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে তা নিঃশেষ করে গ্লাসটি দেয়ালের পাশে ছোট একটি টেবিলে রেখে তার ওপর অকারণে তবারক ভুইঞার স্ত্রীর হাতে তৈরি পুঁতি ঝোলানো জালিটি রাখে, পুঁতিগুলি গ্লাসের গায়ে বাড়ি খেয়ে একটু বেজে ওঠে। হয়তো সে-অস্ফুট ঝঙ্কার তাকে কী একটি কথা মনে করিয়ে দেয় সহসা। আলোর তেজ বাড়িয়ে সে বিছানায় ফিরে আসে এবং মশারির ভেতর থেকে পুঁতি-ঝোলানো জালিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। জালিটির প্রান্তদেশ ঢেউ-খেলানো, যার ধার দিয়ে সবুজ সুতার রেখা; সেখান থেকে পুঁতিগুলি ঝোলে। জালিটি যে সযত্নে তৈরি করেছে তার কথা মুহাম্মদ মুস্তফা ভাবতে চেষ্টা করে, তবে যাকে দেখে নি তার বিষয়ে বেশি ভাবা সম্ভব হয় না। হয়তো একজোড়া কার্যনিযুক্ত হাত দেখতে পায় যে-হাত কোনো নির্দিষ্ট মানুষের নয়, হয়তো একটা ইচ্ছা বা একাগ্রতাও অনুভব করে কিন্তু সে-ইচ্ছা বা একাগ্রতা কোনো বিশেষ আকার ধারণ করে না। তাছাড়া জালিটি যে তৈরি করেছিল তার মুখ নয়, আরেকজনের মুখই সে দেখতে পায়। মুখটি তবারক ভুইঞার; তবারক ভুইঞাই জালিটি বহন করে এনে তাকে দিয়েছিল। তেমন কিছু না, ক্ষুদ্র একটি উপহার, শ্রদ্ধা-সম্মানের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন, সহৃদয়তার প্রমাণ। তাছাড়া তখন মুহাম্মদ মুস্তফা বেশ জ্বরে পড়েছে। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবহীন অবিবাহিত নিঃসঙ্গ প্রতিবেশী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবাযত্নের ইচ্ছাটি স্বাভাবিকভাবেই জাগে। বিছানার পাশে পানি থাকলে রোগীর সুবিধা হয়, জালি ঢাকা পাত্রে কীটপতঙ্গ পড়ে না—এই মনে করে সেটি সে এনে দিয়েছিল। জিনিসটাই-বা কী! মণিমুক্তা নয়, পুঁতির মালা দিয়ে ঘেরা হাতের তালুর আকারের একটি জালি যা তৈরি করতে আধমণ সুতার প্রয়োজন হয় নি। ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা এ-কথাও বুঝে নিয়েছিল যে একটি শহরের হাকিম হলে তাকে অনেক লোক অনেক কিছু দিতে চায়। এ-সবের পেছনে কখনো মোসাহেবি-তোষামুদির ভাব বা মতলব-দুরভিসন্ধি থাকে, কখনো থাকে না : কেউ সরলচিত্তে নিঃস্বার্থভাবে পদমর্যদার প্রতি সম্মান দেখায়, কেউ-বা শুধুমাত্র সামাজিক প্রথা পালন করে; হাকিম হলেও বর্তমানে সে কুমুরডাঙ্গার সমাজের একজন।

কারো বাড়িতে গ্রাম থেকে ঝুড়িভরা আম লিচু এসেছে, কারো ঘরে ছেলের খাৎনা উপলক্ষে মিঠাই-মণ্ডা তৈরি হয়েছে, কেউ আবার বিশেষ কোনো কারণে গরু-বকরি জবাই করেছে—এ-সব বাড়ি-বাড়ি বিতরণ করা সামাজিক প্রথা। সুখে-দুঃখে একটি মানুষ আরেকটি মানুষকে স্মরণ করে—এই তো সমাজ। তাই ক্ষুদ্র জালিটির মধ্যে সে অন্যায়জনক কিছু দেখতে পায় নি। তবে এখন পুঁতির মালা দিয়ে ঘেরা জালিটির দিকে তাকাবার সঙ্গে-সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার মনশ্চক্ষে যে-মুখটি জেগে ওঠে সে-মুখটি হাসিখুশি সরলচিত্ত সহৃদয় তবারক ভুইঞার হলেও সহসা একটি কথা তার মনে আসে : তার সুখ-সুবিধার জন্যে লোকটির এত উদ্বিগ্নতা সেবা-যত্নের জন্যে এত তৎপরতা—এ-সবের পশ্চাতে যেন গূঢ় অভিসন্ধি। সে যেন কিছু জানতে চায়, সরলতা সহৃদয়তার মধ্যেও কোথাও এক জোড়া চোখ সর্বক্ষণ তার ওপর নিবদ্ধ যে-চোখ তার অন্তরটা তছনছ করে খুঁজে দেখে। তার মধ্যে কী সে সন্ধান করে এমন করে? নিঃসন্দেহে সে দেখতে চায় মুহাম্মদ মুস্তফা বাড়ির লোকেদের কথা বিশ্বাস করেছে কিনা, এ-কথা মেনে নিয়েছে কিনা যে খোদেজা আত্মহত্যাই করেছিল, তারপর তার মনে অনুতাপ-অনুশোচনা দেখা দিয়েছে কিনা।

সে-রাতে সর্বপ্রথম তবারক ভুইঞার মনোভাব তাকে ভয়ানকভাবে ভাবিত করে, একটি অনাত্মীয় মানুষকে ঘরের কথা বলেছে বলে নিজের ওপর রাগও হয় তার। কেন বলেছিল কথাটি, বলরার দরকারই-বা কী ছিল? মনে হয় মুখ থেকে এমনিই বেরিয়ে এসেছিল, পশ্চাতে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তবে সেটি সত্য নয়, ঠিক এমনিতে বেরিয়ে আসে নি, জ্বরঘোরে বলে থাকলেও বিলাপ বকেছিল তা নয়, যদিও জ্বরে না-পড়লে হয়তো বলতে পারত না। বলেছিল এই জন্যে যে সমস্ত ব্যাপার শোনার পর তবারক ভুইঞা কী বলে তা জানার ইচ্ছা হয়েছিল হঠাৎ। সে বাড়ির লোক নয়, এ-ধারে ও-ধারে কোনোদিকে তার টান নেই, নিঃসন্দেহে সে নিরপেক্ষ মত দেবে। মতটি যে কী হবে—সে-বিষয়েও তার সন্দেহ ছিল না, কারণ তার মনে হয়েছিল নিমেষের মধ্যেই কী সত্য কী অসত্য তা সে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। কিন্তু তা হয় নি, সব শুনেও সে বাড়ির লোকেদের পক্ষ নিয়েছে। কেন? সত্যের চেয়ে অসত্যের শক্তি কি বেশি?

তবারক ভুইঞার মনোভাব তার নিকট সর্বযুক্তিবিরুদ্ধ বলে মনে হয়। বাড়ির লোকেদের নিতান্ত ভিত্তিহীন কথাটি কেন তার বিশ্বাস হবে? অথচ সব কিছুই সে শুনেছে; সে তাকে সব কিছু খুলে বলেছে, কিছু ঢেকে রাখে নি। সে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছে কেন বাড়ির লোকেদের ধারণাটি সত্য হতে পারে না, কেন খোদেজার পক্ষে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। মানুষ কত কথা বলে—দায়িত্বহীন কথা, উদ্ভট অবান্তর কথা। যা প্রথমে সুনিয়ন্ত্রিত ধারার মতো শুরু হয় তা-ও এক সময়ে সহসা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বন্যার পানির মতো দু-কূল ছাপিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সত্যের ক্ষেত্র ছেড়ে অসত্যের ক্ষেত্রে চলে যায়, বাস্তবের যুক্তিসঙ্গত সীমানা ত্যাগ করে অবাস্তবের উচ্ছৃঙ্খল অর্থহীনতার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলে; প্রথমে গুঁড়ি বেয়ে শাখায় ওঠে, তারপর এ-শাখা থেকে সে-শাখা এ-ডাল থেকে সে-ডাল করে আচম্বিতে লাফিয়ে অন্য গাছে চলে যায়। মানুষের কথা কোণাকুণিভাবে চলে, ছোটে তির্যকগতিতে, যেহেতু শীঘ্র যাত্রার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে বা উদ্দেশ্যটি আর দেখতে পায় না সেহেতু কোথাও পৌঁছুতে পারে না এবং পৌঁছুতে পারে না বলে থামতেও পারে না : মানুষের কথায় যতি নেই। বিষয়বস্তু যা-ই হোক, মানুষ তার নিজের কথার বানে ভেসে যায়, কোনো ঘাটে পৌঁছুলেও কোথাও পৌঁছায় না, কারণ যেখানে থামে সেটি তার গন্তব্যস্থল নয়।

তবারক ভুইঞা কিছু বোঝে নি। কেন বোঝে নি?

তবে শেষরাতের দিকে মুহাম্মদ মুস্তফা তন্দ্রার মতো বোধ করে এবং তার অর্ধঘুমন্ত মনে অকস্মাৎ একটি প্রশ্ন দেখা দেয় : হয়তো তবারক ভুইঞা বাড়ির লোকেদের কথা বিশ্বাস করেছে কারণ সেটিই সত্য, খোদেজা আত্মহত্যাই করেছিল। চমকিত হয়ে জেগে উঠলে সহসা

সে শুনতে পায় পাখিরা কলতান করতে শুরু করেছে। কিন্তু তা যে পাখিরই কলতান তা তার বিস্ময়াভিভূত মন অনেকক্ষণ বুঝতে পারে নি।

তবারক ভুইঞা তখনো বিচিত্র কান্নার কথাই বলছিল। সে বলছিল, তার মতো অনেকেই ভেবেছিল কান্নাটি কানের ভুল বা কোনোরকমের খেয়াল হবে কিন্তু সে-কান্না যারা শুনতে পায় তাদের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি কান্নার আওয়াজও দিনদিন স্পষ্টতর, উচ্চতর হয়ে ওঠে। একদিন উকিল কফিলউদ্দিন আর চুপ করে থাকতে পারে না। প্রথমে কথাটি কানে তোলে নি; আজে-বাজে কথা সহজে সে কানে তোলে না। তাছাড়া স্টিমারের সর্বশেষ চিহ্ন অদৃশ্য হয়ে যাবার পর সহসা সে এমন একটি গভীর নিরাশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যে অন্যান্য কথায় মন দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি; ক-দিন সে কেমন নিস্পৃহ নিস্তেজ হয়ে থাকে, মুখে-চোখে বার্ধক্যের এবং পরাজয়ের গভীর শ্রান্তি।

বিচিত্র কথাটি সম্যকভাবে বুঝতে পারলে সে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। শহরের লোকেরা কি মতিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে? তারপর হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহ দেখা দেয়। ওটা স্টিমারের লোকেদের কারসাজি নয় তো? যতই ভেবে দেখে ততই সন্দেহটা ঘনীভূত হয়। হয়তো তারা ধ্বনি-বিবর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে কোনো গুপ্তস্থান থেকে একটা কান্নার শব্দ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত করার ব্যবস্থা করেছে। যন্ত্রটন্ত্র না হলেও হয়তো ঘুষ দিয়ে কাউকে সে-কাজে লাগিয়েছে। তারা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের বিশ্বাস করাতে চায় যে বাকাল নদীটি সত্যই মরতে বসেছে এবং সে-জন্যে ঘাট তুলতে তারা বাধ্য হয়েছে, তারা নির্দোষ।

গম্ভীর কণ্ঠে উকিল কফিলউদ্দিন বার-লাইব্রেরিতে ঘোষণা করে, "ওদেরই কাজ হবে। তারা হাড়ে-হাড়ে শয়তান, নেমকহারামের দল।"

স্টিমারের লোকেরা কান্নার জন্যে দায়ী তা কেউ বিশ্বাস করেছিল কিনা কে জানে, তবে সেটা যে কোনো মানুষের দুষ্টামি নয় সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য স্বয়ং দারোগার নেতৃত্বে একদল লোক শহরের অলিগলি ঝোপঝাপ তন্ন তন্ন করে তালাশ করে দেখেছিল, কিন্তু কোথাও কিছু খুঁজে পায় নি।

এবার শহরের মোল্লা-মৌলভিরাও কান্নার বিষয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শুরু করে। আজগুবি কথাটি যেন সর্বমাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। খোদার দুনিয়ায় নানা প্রকারের শব্দ হয়, কিন্তু সে-সব শব্দ কারো অজানা নেই, কেয়ামতের সময় যে-ভীষণ আওয়াজ একদিন সবাই শুনতে পাবে তা তাদের ভয়ানকভাবে ভীত করলেও বিস্মিত করবে না কারণ তার কথাও কেতাবে লিখিত। বস্তুত, খোদার দুনিয়ায় রহস্যের অন্ত না থাকলেও সে-রহস্যের আবার সীমা রয়েছে এবং যেখানে সে-সীমারেখা অতিক্রান্ত হয় সেখানে যা ন্যায্য বা সঙ্গত, জায়েজ বা অনুমোদিত—সে-সবেরও শেষ হয়। মানুষ যে-কান্নার সাহায্যে তার শোক-দুঃখ প্রকাশ করে থাকে, সে-কান্নার অনুরূপ যে-শব্দ শোনা যায় তার অর্থ কী, কোথেকেই-বা তা আসে? কিছু সভা-মজলিস আলাপ-আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কান্নাটি শয়তানের কারসাজি হবে : শয়তান বহুরূপী। তার স্থির করে কিছু একটা করতেই হবে যাতে কান্নাটির হাত থেকে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা মুক্তি পায়। তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে ক্ষীণতম দ্বিধাও দূর হয় তাদের মন থেকে যখন তোবারক আলী মুন্সীর ঘোর পর্দানশীন স্ত্রী জয়নাব খাতুনের বিস্ময়কর আচরণের খবর শুনতে পায়। যে-জয়নাব খাতুন জীবনে কখনো বাইরের দরজার চৌকাঠ অতিক্রম করে নি সে-ই নাকি মধ্যরাতে বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মন্ত্রমুগ্ধ মানুষের মতো নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল। মোল্লা-মৌলভিরা এবার রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়ে, আর বিলম্ব করে না। তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে আজানের ব্যবস্থা করে যাতে তার আওয়াজ শহরের সর্বত্র পৌঁছায়, প্রত্যেক শহরবাসীর কর্ণগোচর হয়। সঙ্গে-সঙ্গে মিলাদ পড়ানো বা ছদকা-শিরনি দেয়ার ব্যবস্থা করে। একদিন

রাতে মসজিদে অনেক রাত পর্যন্ত বিশেষ নামাজেরও আয়োজন করে। তাতে শরিক হলে বিচিত্র কান্নার আওয়াজ বন্ধ হবে—এই বিশ্বাসে অসংখ্য লোক জড়ো হয় মসজিদে, অনেক রাত পর্যন্ত নামাজিদের সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠধ্বনিতে রাতের আকাশ খণ্ডবিখণ্ড হয়।

তবে এ-সবের কোনো ফল হয় নি, এমনকি সেদিন রাতে নামাজে মগ্ন লোকেরাও দুর্বোধ্য, অত্যাশ্চর্য কান্নাটি ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি, প্রবল ঢেউয়ের মতো তা বার-বার এসে তাদের হৃদয়-তটে আছড়ে পড়েছিল। বিস্ময়-বিমূঢ় একজন নামাজি বলেছিল, এত মানুষের কণ্ঠধ্বনিও সে আওয়াজ ঢেকে রাখতে পারে নি।

নিঃসন্দেহে কোথাও কে যেন কাঁদে—তা কি আর অবিশ্বাস করা যায়? অবিশ্বাসটি ধীরে-ধীরে কমজোর হয়ে ওঠে, অবিশ্বাসীদের কণ্ঠস্বর সন্দেহের দোলায় দুর্বল হয়ে পড়ে, কেউ-কেউ আবার তা নীরবেই সহ্য করতে শুরু করে যেমন দুঃখকষ্টে মতিভ্রষ্ট মানুষের যুক্তিহীন বিলাপ অসহ্য মনে হলেও অনেকে নীরবে সহ্য না -করে পারে না। হয়তো তাদের মনে হয়, রহস্যময় দুনিয়ার সব কিছু তারা জানে না। হয়তো সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে সব মানুষের মনে একটি আশা লুকিয়ে থাকে যে হঠাৎ একদিন অলৌকিক কিছু দেখতে বা শুনতে পাবে; সে-আশাটিই হঠাৎ জেগে ওঠে। কাল্পনিক খাদ্যে মানুষের যেমন পেট ভরে না, তেমনি যা ধরতে পারে না ছুঁতে পারে না চোখ দিয়ে দেখতে সক্ষম হয় না—তাতে বিশ্বাস রেখেও মানুষের চিত্ত ভরে না।

যে-কান্না এত মানুষ শুনতে পায় সে-কান্নার কথা সত্যি অবিশ্বাস করা আর সম্ভব নয়; সে-কান্না সত্যের রূপই গ্রহণ করে—এমন একটি সত্য যা ব্যাখা করা যায় না। অবিশ্বাস করা যায় না বলে ভয়টিও বাড়ে, মনের গভীর আশঙ্কাটি ঘনীভূত হয়। কে কাঁদে? মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যে-বিস্ময়কর কথাটি বলেছিল তা সবাই যথাসময়ে শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু তা কী করে সম্ভব হয়, নদী কী করে কাঁদে? এমন কথা বিশ্বাস্য কি অবিশ্বাস্য তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলাই নিছক বোকামির মতো মনে হয়। মানুষের মতো যৌবনকাল, তারপর প্রৌঢ়বয়স বার্ধক্য অতিক্রম করে একটি নদী মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে কিন্তু মানুষের মতো কাঁদবার ক্ষমতা রাখে না, ব্যথা, বেদনা প্রকাশ করতে পারে না, মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হলেও ক্ষীণতম প্রতিবাদ জানাতে পারে না, যে-দুটি তীরের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছে অবিচ্ছিন্ন একাত্ম ঘনিষ্ঠতায় সে-দুটি তীরের দিকে তাকিয়ে বিদায়কালে অস্ফুট নিঃশ্বাসও ত্যাগ করতে পারে না; নদীর পক্ষে কাঁদা সত্যি সম্ভব নয়। কিন্তু কে কাঁদে, কোথায় সে-কান্নার উৎপত্তি, কোন ব্যথাক্লিষ্ট খিদ্যমান হৃদয় থেকেই-বা তা ধ্বনিত হয়? এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বুকের ভেতরটা শীতল হয়েই-বা ওঠে কেন? তা যদি শয়তানের কারসাজি হয়ে থাকে তবে খোদার নামও তার বিচিত্র ধ্বনি স্তব্ধ করতে পারে নি কেন? একদিন কারো মনে ভয়ঙ্কর একটি কথা এসে দেখা দেয়। প্রথমে মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় নি, অবশেষে সহ্য করতে না পারলে সে বলেই ফেলে। বিস্ফারিত নেত্রে অস্ফুটকণ্ঠে বলে, হয়তো খোদাই কাঁদেন তাঁর বান্দার জন্যে। কিন্তু তেমন কথাতেই-বা কেউ শান্তি পাবে কেন? যিনি বিশ্বচরাচর চাঁদ সূর্য তারা পাহাড়-পর্বত সাগর-সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, তিনিই যদি কাঁদতে শুরু করেন তবে মানুষের কী হবে, কোথায়-বা সে শক্তি পাবে?

হয়তো সকিনা খাতুনের বিচিত্র কথাটি বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না শেষপর্যন্ত। যে-প্রশ্নের উত্তর পায় না, দুর্বোধ্য কান্নার চেয়ে সে-প্রশ্নই অবশেষে তাদের নিকট অধিকতর ভয়জনক মনে হতে শুরু করে, তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার অন্য কোনো পথ তারা দেখতে পায় না, এবং মরিয়া হয়ে তারা অসম্ভব কথাটিই গ্রহণ করে : নদী কাঁদে, যে-কান্না শুনতে পায় তারা সে-কান্না মরণোন্মুখ নদীর বেদনার্ত শোকাচ্ছন্ন অন্তর থেকেই জাগে। এমন একটি কথা বিশ্বাস করা দোষণীয় হতে যাবে কেন? মানুষ কত কিছুতে বিশ্বাস করে, প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কত কিছু সে বিনাপ্রশ্নে সত্য বলে গ্রহণ করে। বিশ্বাসের সীমা-সীমান্ত নেই।

"মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে ঠিকই বলে। কে আর কাঁদবে, নদীই কাঁদে। নদী মরতে বসেছে না?" কাছারি-আদালতের সামনে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় চা-এর দোকানের সামনে একটি টুলে বসে টাউট মনিরুদ্দিন সহসা অনেকটা আপন মনে বলে ওঠে। পেটের দায়ে টাউটগিরি করলেও লোকটি পরহেজগার মানুষ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, দিন গুণে রোজা রাখে। কথাটি স্বাভাবিকভাবে বলে এবং শোনামাত্র স্বাভাবিক মনে হয়। তাইতো, কে আর কাঁদবে অমনভাবে? এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে বাকাল নদীটি মরতে বসেছে। মরণোন্মুখ নদীটিই কাঁদে রাতদিন। এই সাধারণ কথা এতদিন তারা বিশ্বাস করতে চায় নি কেন?

যে-প্রশ্ন কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মনে অজানা ভয়ের সৃষ্টি করত তার একটি উত্তর পেয়ে তারা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, সহসা তাদের মনে হয় যে-বিচিত্র কান্নাটি তারা শুনতে পায় তার পশ্চাতে ভয়াবহ কিছু নেই। যে-নদীর দিকে কখনো তাকায় নি সে-নদী এবার তার অশ্রুতে তাদের অন্তর ভাসিয়ে দেয় প্রবল বন্যার মতো, মনে-প্রাণে যে-গভীর স্বস্তি বোধ করে তা নদীর ব্যথায় আর্দ্র হয়ে ওঠে, অকস্মাৎ তাদের এ-ও মনে হয় তারা এমনই একটি দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে যার তুলনায় মানুষের দুঃখ নিতান্ত তুচ্ছ : যে-নদী দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সময়-কাল উপেক্ষা করে যুগযুগ ধরে প্রবাহিত হয়েছে সে-নদীর ব্যথা-বেদনার সামনে মানুষের নিদারুণ দুঃখও এক ফোঁটা অশ্রুমাত্র, একটি অশ্রাব্যপ্রায় দীর্ঘশ্বাস কেবল।

এবার আরেকটি বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে। যে-কান্নার শব্দ এক সময়ে তাদের ভয়ানক ভীত করত সে-শব্দেই তারা অপরূপ ভাববেগে অভিভূত হয়ে পড়তে শুরু করে।

একদিন দর্জি করিম বক্স বেশ রাত করে লণ্ঠনের আলোয় পুরাতন সেলাই-এর কলে ঘরঘর আওয়াজ তুলে সীবনকর্মে নিয়োজিত ছিল এমন সময়ে তার মনে হয় কোথাও যেন একটি বাণবিদ্ধ পাখি তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করছে। সেলাই-কাজ বন্ধ করে সে মনোযোগ দিয়ে শোনে, কারণ আওয়াজটি যে পাখির আর্তনাদ নয় তা বুঝতে তার দেরি হয় না। আওয়াজটি অবশেষে থামে, আহত পাখিটি যেন ডানা মেলে উড়ে গিয়ে দূর আকাশে চলে যায়। তার রেশটি কানের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে কি অমনি অত্যাশ্চর্য ধরনের অনুভূতিতে দর্জি করিম বক্সের মন-প্রাণ আপ্লুত হয়ে পড়ে। তার মনে হয়, দীর্ঘদিনের নির্বর্ষণের ফলে শুষ্ক উত্তপ্ত হয়ে-ওঠা জমির মতো প্রাণে স্নিগ্ধশীতল পানি এসে পৌঁছেছে যে-পানি ধীরে-ধীরে সমগ্র অন্তরে প্রবাহিত হয়ে তৃষ্ণা তো দূর করছেই, সমস্ত ময়লা-আবর্জনাও ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে কুচিন্তা হিংসাবিদ্বেষ ক্ষোভদুঃখ আফসোস।

যা শুনতে চাইত না, শুনলে ভয় পেত, তা-ই শুনবার জন্যে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা অধীর হয়ে ওঠে সহসা। এমনকি, অনেকের কাছে তা শুনতে পাওয়া এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে হয় এবং অধীরচিত্তে শুনবার জন্যে অপেক্ষা করার পরও কিছু শুনতে না পেলে তাদের এই ধারণা হয় যে কোনো অজানা কারণে তা শোনার যোগ্য নয় তারা। অনেকে আবার তা শোনে নি স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করে বলে শুনেছে বলেই দাবি জানাতে শুরু করে বিবরণে কিছু রঙ লাগিয়ে; তাদের ভয় হয় অলঙ্কারশূন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণে দাবিটির সত্যতা সম্বন্ধে শ্রোতার মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। ফলে বিচিত্র কান্নার রূপ যেমন ক্রমশ বিচিত্রতর হয়ে ওঠে তেমনি কে শুনেছে কে শোনে নি—এ-বিষয়ে আর নিশ্চিত হওয়া যায় না। তবে কারো দাবি সত্য নয় মনে হলেও কেউ প্রশ্ন করে না : কান্নাটি যেন এমনই এক স্তরে উপনীত হয়েছে যেখানে মানুষের বিশ্বাস অসীমের সঙ্গে মিশে যায়, দিক্‌চক্রবাল পেরিয়ে নির্ভয়ে অজানার সন্ধান করে কিন্তু পশ্চাতে দৃষ্টি দেয় না। বস্তুত কান্নাটি এক রকমের বিশ্বাসে পরিণত হয়; বিশ্বাসীর বিশ্বাসে সন্দেহ বা প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

নদীর দিক থেকে কী-একটা কান্না শুনতে পায়—তা কল্পনা হোক, কোনো প্রকারের ভ্রম হোক, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এ-সময়ে শহরবাসীদের মধ্যে একটি বিষম পরিবর্তন এসে

গিয়েছিল। দারোগা-পুলিশ হাকিম-সুবারা পরিবর্তনটি লক্ষ্য করেছিল, লক্ষ্য করে গভীরভাবে বিস্মিতও হয়েছিল, কারণ এ-সময়ে চুরি-ডাকাতি কমে গিয়েছিল, কাছারি-আদালতের সামনে ঘাঘু মামলাবাজদের ভিড়টাও পাতলা হয়ে উঠেছিল, এমন কি দু-একজন লোক সহসা বিপক্ষদলকে ক্ষমা করে বহুদিনের পুরানো মামলা পর্যন্ত তুলে নিয়েছিল। শত্রুরা তাদের শত্রুতা ভুলে গিয়েছিল, মানুষের মধ্যে অচিন্তনীয় ধরনের স্নেহপ্রীতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল বা লম্পট-চরিত্র মানুষের দুরাত্মপনায় ভাটা পড়েছিল—এ-সব সত্য, কল্পনা নয়। এ-সময়ে মানুষেরা সুখের কথাও ভাবতে পারে নি। দু-একটি পরিবার তাদের সন্তানসন্ততির বিয়ের পাকা ব্যবস্থা পর্যন্ত ভেঙ্গে দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে নদীর দুঃখের সময়ে সন্তানসন্ততির সুখের কথা ভাবা অন্যায়।

"এ-সব সত্যিই ঘটেছিল", তবারক ভুইঞা বলে।

মুহাম্মদ মুস্তফার কী হয়েছিল জানি না। হয়তো বাড়ির লোকেরা যা বলেছিল তা বিষের মতো দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ধীরে-ধীরে তার বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনাশক্তি দুর্বল করে ফেলেছিল, হয়তো শত সাক্ষ্যপ্রমাণ সত্ত্বেও কোনো বিষয়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হতে পারে না বলে দশজন যা বলেছিল তাই অবশেষে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল সে। অথবা খোদেজা নয়, অন্য কোনো কারণ ছিল যা তার অতীত জীবনের গহ্বরে লুক্কায়িত ছিল। এবং যা সে-ও বোঝে নি, আমিও বুঝি নি। কারণ যাই হোক, নানা অকাট্য যুক্তি দিয়ে গঠিত সুরক্ষিত যে-বাঁধের সাহায্যে বাড়ির লোকেদের ভিত্তিহীন ধারণাটি ঠেকিয়ে রেখেছিল তা তারই অগোচরে ক্রমশ হীনবল হয়ে উঠে থাকবে এবং তবারক ভুইঞার ন্যায় নেহাৎ পরিচিত একটি লোকও বাড়ির লোকেদের মত পোষণ করে এই ধারণা হলে বালুর তৈরি জিনিসের মতো সেটি অতি সহজে ধসে পড়ে : যা এতদিন একেবারে অসত্য মনে হয়েছিল তা-ই সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার চোখে অবিসংবাদিত সত্যের রূপ গ্রহণ করে।

খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল—তা আমি কখনো বিশ্বাস করি নি। এ-কথা সত্য যে মেজো চাচা খেদমতুল্লা একদিন একটি ওয়াদা করেছিল, কিন্তু মানুষ কত সময়ে কত কিছু-না ওয়াদা করে। করে, কারণ সামনের পথ সে দেখতে পায় না, জানে না অদৃশ্য ভবিষ্যতে কার জীবন কী রূপ নেবে, কোন খাতে প্রবাহিত হবে। কল্পনায় সুদূর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখালেও সে-ভবিষ্যতের দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না, খরধার স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে-থাকা নৌকা যেমন হঠাৎ পেছন-মুখো হয়ে ঘুরে যায় তেমনি তার দৃষ্টি পশ্চাতের দিকে ফিরে আসে। ততদিনে খেদমতুল্লার মনে ছেলের বিষয়ে একটি উচ্চাশা দেখা দিয়ে থাকলেও তার পক্ষে ভবিষ্যৎটি পরিষ্কারভাবে দেখা সম্ভব ছিল না, সে ভাবতে পারে নি যে বাড়ির অন্যান্য ছেলেদের মতো মুহাম্মদ মুস্তফা গ্রাম্যজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে সত্যিই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। তেমনটা কি অসম্ভব ছিল? আমার বড় ভাই সোনা মিঞা কী করেছে? চাঁদবরণঘাটে গিয়ে মুড়িমুড়কির দোকান দিয়েছে। সে মুহাম্মদ মুস্তফারই সমবয়সী। ছোট চাচার একমাত্র সন্তান এবং নয়নের মণি হাতেম অলস বাপের পদাঙ্কানুসরণ করে জাত-আল্‌সেতে পরিণত হয়েছে, অন্নচিন্তাও তার কাছে শ্রমসাধ্য মনে হয়। আমিও অসময়ে পড়াশুনা বন্ধ করতে বাধ্য হই, যদিও দুই ক্রোশ হেঁটে পুকুরের ধারে দি মোসলেম খান হাই স্কুল নামক বিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর যাতায়াত করেছিলাম এবং আরেকবার চেষ্টা করলে হয়তো ম্যাট্রিক পাস দিতে পারতাম। ইচ্ছা ছিল, হয়ে ওঠে নি। মনে হয় দরিদ্র পরিবারে যাদের জন্ম তাদের জন্যে আর্থিক বিপত্তির চেয়ে আরেকটি জিনিস বিষম অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনকে পশ্চাতে ফেলে যাওয়ার বিষয়ে দ্বিধা। জন্মদাতা যা পড়ে নি বা দেখে-শোনে নি তা পড়তে বা দেখতে-শুনতে দ্বিধাই হয় এবং একদিন ঘরে ফিরে দেখবে জন্মদাতা একটি নেহাৎ অজ্ঞমূর্খ মানুষ—তা ভাবতেই কোথাও যাবার সাধ নিমেষে স্তিমিত হয়। হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফাও তেমন

একটি বাধা বোধ করেছিল। যদি সে সে-বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং একমনা দৃঢ়সংকল্প নিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে বহুদূরে চলে গিয়ে থাকে, তার কারণ ছিল; দলবদ্ধ নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে থেকে সহসা একটি নক্ষত্র যদি ছিটকে অন্য কোথাও চলে যায় তার পশ্চাতে কোনো একটা কারণ থাকেই। তার ক্ষেত্রে কারণটি ছিল তার বাপ খেদমতুল্লা যার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ছায়া থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যেই এমন করে সে ধেয়ে চলে গিয়েছিল। হয়তো সে কোনো একটা পণও করেছিল—যে-পণ এমনভাবে তার সমস্ত চিন্তাধারা সমস্ত জীবন গ্রাস করেছিল যে একদিন তার বাপ সদ্য স্বামীহারা বোনের দুঃখে দুঃখিত হয়ে কী বলেছিল তা স্মরণ করে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। এবং সঙ্কল্প-দৃঢ় একাগ্রচিত্ত অনন্যমনা মুহাম্মদ মুস্তফার মুখের দিকে তাকিয়ে এক সময় অন্যেরা, এমনকি খোদেজাও সে-বিষয়ে আর ভাবতে সাহস পায় নি। একসময়ে আমারও মনে হত, বাইরে দেখা না গেলেও হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফা এবং খোদেজার মধ্যে বুঝি একটি স্নেহমমতার বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, হয়তো তারা কী-একটা অদৃশ্য কিন্তু গভীর যোগাযোগ বোধ করে। কিন্তু একদিন নিজেই বুঝতে পারি ধারণাটি সত্য নয়।

তবে সে-সময়ে আরেকটি কথাও বুঝতে পারি যা আমাকে বড় বিস্মিত করে। হয়তো আসলে সে জন্যেই খোদেজা যে মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে আত্মহত্যা করেছিল তা কখনো বিশ্বাস করতে পারি নি।

তখন ভরা গ্রীষ্ম, মুহাম্মদ মুস্তফা ছুটি উপলক্ষে বাড়ি এসেছে। সে-সময়ে আর্থিক সমস্যায় বাপজান বড় বিব্রত, তার ওপর গ্রামের ছদু শেখ নামক সমবয়সী একটি লোক বেশ পয়সার গরম দেখাতে শুরু করেলে হিংসা বা ব্যর্থতাবোধের দরুন তার মনে সুখ ছিল না। কোনো প্রকারের সমস্যা-বিপত্তির সম্মুখীন হলে বাপজানের মেজাজ তিরিক্ষি ধরনের হয়ে ওঠে, খেদমতুল্লার মৃত্যুর পূর্বে কয়েক বছর ধরে যে নিদারুণ মেজাজ তার চরিত্রগত হয়ে পড়েছিল অনেকটা সে-রকম হয়ে ওঠে বাপজানের মেজাজ। তখন পান থেকে চুন খসলে সে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে, নির্দোষীর সরল চেহারাও তার সহ্য হয় না, কেউ সামনে এলে ধমক খায়, আড়ালে গেলেও রেহাই পায় না। বস্তুত তার দাপটে-হুঙ্কারে-তর্জনে বাড়ির সকলের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম ঘটে। কী কারণে, খুব সম্ভব অকারণেই, একদিন দ্বিপ্রহরে বাপজান সর্বসমক্ষে খোদেজাকে ভয়ানক বকাবকি করে অবশেষে তার চুল ধরে টেনে দু-চারটে চড়-থাপড়ও লাগায়, এবং তারপর ভরা দুপুরে রোদ-মাথায় কোথাও বেরিয়ে যায়। প্রথমে খোদেজা টুঁ শব্দ করে নি, তবে বাপজান বেরিয়ে গেলে বাড়ির পশ্চাতে লেবুগাছটার তলে বসে কাঁদতে শুরু করে চিকন কণ্ঠে, কী-একটা নিঃসঙ্গ ব্যথায়। তখন খোদেজার বয়স পনেরো কি ষোলো। গায়ের রঙ গাঢ় শ্যামল, মাথাভরা চুল। মুখটা যেন কদাচিৎই দেখা যেত, কারণ সব সময়ে সে এ-কাজে সে-কাজে নুয়ে থাকত। যা চোখে পড়ত তা তার সিঁথি যা কখনো ভাঙ্গত না অসংযত হত না যদিও তাতে চিরুনির স্পর্শ লাগত না তেমন; লম্বা ধরনের মাথায় পেছন থেকে শুরু হয়ে সে-সিঁথি নৌকার ছই-এর মতো বাঁকা হাল্কা কেশগুচ্ছবেষ্টিত ছোট কপালে এসে শেষ হত। কথাও তেমন বলত না। শুধু সে-সময়ে তার কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যেত যখন সে উঠানের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া হাঁস-মোরগ-মুরগিদের ডাকত, তাঁর মিহি গলায় স্নেহমিশ্রিত অন্তরঙ্গতার ভাব; হাঁস-মোরগ-মুরগির সঙ্গে সে একটি গভীর মিতালি বোধ করত। ক্বচিৎ কখনো পিতৃহীনা মেয়েটি মুখ তুলে তাকালে তার ঈষৎ অসমান চোখদুটির বিষাদছায়া নজরে পড়ত; দুঃখের কোনো প্রতিকার নেই—আপনা থেকে জেগে ওঠা এমন একটি জ্ঞান থেকে সৃষ্টি সে-বিষাদ অল্পবয়সেই তার চোখে স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছিল।

খোদেজা কাঁদতেই থাকে : অনুচ্চকণ্ঠের কান্নার আওয়াজ দ্বিপ্রহরের স্তব্ধতার মধ্যে একটি বিষণ্ন সুরের সৃষ্টি করে। আমি কিছুটা বিস্মিত হই, কারণ বাড়ির মেয়েরা যেমন গোস্বা-আহ্লাদ করে না তেমনি এমনভাবে কাঁদেও না। এ-সব কেউ সহ্য করে না, এ-সবের

সময়ও নেই। দুনিয়া বড় কঠিন জায়গা। নানা প্রকারের দায়িত্ব এবং দুঃখকষ্টে নিপীড়িত বিড়ম্বিত মুরুব্বিরা কখনো হঠাৎ রাগের মাথায় বকাবকি বা মারধর করে কারো মনে যদি দুঃখের সৃষ্টি করে তা গাছের পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতোই ক্ষণস্থায়ী হয়; সে-সব কেউ মনে ধরে রাখে না, অন্তর্বেদনার বিষয়ে বিস্মৃত হয়ে অন্তহীন সাংসারিক কাজকর্মে পুনরায় মনোনিবেশ করতে দেরিও করে না। তবে সহসা আমার মনে হয়, খোদেজার অস্বাভাবিক আচরণের কারণ বুঝতে পেরেছি। মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যেই আড়ালে গিয়ে অমনভাবে কাঁদছে সে, তাকেই তার ব্যথা-অপমানের কথা জানাচ্ছে। তাকে না জানিয়ে কাকে জানাবে, কেই-বা তাকে সান্ত্বনা দেবে, তার চোখের পানি মুছে দেবে?

মানুষের কল্পনা বিচিত্র জিনিস, একবার তা লাগাম হারালে পথে-বিপথে কোথায় যে চলে যায় তার ঠিক নেই। আমার এবার মনে হয় : খোদেজার প্রতি যতই উদাসীন হোক না কেন, বাগদত্তা মেয়েটির কান্নায় তার অন্তরে কোথাও সুপ্ত স্নেহমমতা নিশ্চয়ই উথলে উঠেছে, এবং শীঘ্র সে বেরিয়ে আসবে, তারপর উঠান অতিক্রম করে বাড়ির পেছনে গিয়ে স্নেহভরে খোদেজাকে প্রবোধ দেবে, মিষ্টি কথা বলে ব্যথা-বেদনা দূর করবে। মুহাম্মদ মুস্তফা ততক্ষণে দক্ষিণ-ঘরে গিয়ে কঞ্চি দিয়ে ঠেলে অর্ধউন্মুক্ত করে রাখা জানালার পাশে তার বিছানার ওপর বই-খাতাপত্র নিয়ে বসেছে। সে-ঘরের জানালার দিকে নয়, দরজার দিকে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, বুকটা কেমন দুরুদুরু করে কাঁপে। আমার আরো মনে হয়, বাড়ির সবাই আমারই মতো অপেক্ষা করছে, তারাও জানে মুহাম্মদ মুস্তফা চুপ করে খোদেজার কান্না শুনে যাবে না। মুহাম্মদ মুস্তফা বেরিয়ে আসছে না কেন? বাড়ির সবাই যে রুদ্ধশ্বাসে চোখ খুলে কান পেতে অপেক্ষা করছে—তা বুঝতে পেরে হয়তো সে সঙ্কোচবোধ করতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু সে বেরিয়ে আসবে, তার অন্তরে খোদেজার জন্যে যে-স্নেহমমতা উথলে উঠেছে তাতে সে-সামান্য সঙ্কোচ ভেসে যাবে।

মুহাম্মদ মুস্তফা বেরিয়ে আসে নি।

তারপর কী কারণে জানি না আমিই সহসা যন্ত্রচালিতের মতো হাঁটতে শুরু করি এবং শীঘ্র উঠান অতিক্রম করে বাড়ির পশ্চাতে গিয়ে হাজির হই। বাড়ির পশ্চাদ্‌দেশ স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে থাকা বাতাবি লেবুগাছটির তলে হাঁটুতে মাথা গুঁজে খোদেজা তখনো কাঁদছিল। বালিকা বয়সে সে-গাছের তলে বসে খোদেজা একা-একা খেলত। হয়তো সেখানে কল্পনার প্রাসাদ তৈরি করত, যে-প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে কত রাজপুত্র সখা-সখী এসে ভিড় করত। লেবুগাছের তলে ক্ষুদ্র একটি স্থান লেপেমুছে সাফ করে নিয়েছিল। স্থানটি এখনো যেন তকতক করে।

ঝোঁকের মাথায়, কী করছি তা না বুঝে খোদেজার সামনে উপস্থিত হলেও কয়েক মুহূর্ত কেমন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর কিছু বলেছিলাম। কী বলেছিলাম তা মনে নেই। হয়তো বলেছিলাম, আর কেঁদো না, ঘরে চলো। আমার কণ্ঠস্বর শুনে খোদেজা সহসা মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

সে-সময়েই বুঝেছিলাম। কখনো অতি সাধারণ কথা বুঝতে মানুষের কষ্ট হয়, আবার কখনো একটি বেশ দুর্বোধ্য কথা কী-কারণে নিমেষেই বুঝে ফেলে। তার জন্যে এক পলকের দৃষ্টি, ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘশ্বাস, ঈষৎ একটি মুখভঙ্গিই যথেষ্ট। হয়তো বুঝতে পেরেছিলাম অন্য একটি কারণে। বাল্যকাল অবধি আমিও কি খোদেজার প্রতি একটা বিশেষ স্নেহমমতা অনুভব করতাম না?

আমরা কখনো অন্যায়জনক কিছু করি নি। বস্তুত, তার দিকে তাকাতে আমার সাহসও হত না। সে উঠান দিয়ে যাচ্ছে বা কিছু করছে—তা কী করে জানতাম, তাকাতাম না। এ-ও জানতাম, না তাকিয়ে খোদেজাও জানে আমি কোথায়, কী করছি। বাড়ি থেকে কোথাও গেলে বুকটা কেমন করত, তবে কী একটা তৃপ্তিই পেতাম এই নিশ্চিত জ্ঞানে যে, আমি বাড়ি নেই

বলে সে সুখী নয়। পরে বাড়ি ফেরবার জন্যে অধীর হয়ে পড়তাম এবং বাড়ি ফিরলে কী করে বুঝতে পেতাম সে-ও আমার প্রত্যাবর্তনের জন্যে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করেছিল। আমি প্রতিশ্রুতিটির কথাও কখনো ভুলতে পারতাম না; হয়তো প্রতিশ্রুতিটি কেবল আমার মনেই মহাসত্যের রূপে বিরাজ করত। ভাবতাম, মুহাম্মদ মুস্তফা খোদেজার প্রতি উদাসীন হলেও যথাসময়ে তাকে বিয়ে করবে, উপযুক্ত সময়ে যা তার প্রাপ্য তা দাবি করবে। তাদের একদিন বিয়ে হবে না—তা যেমন ভাবতাম, তেমন চাইতামও না।

মুহাম্মদ মুস্তফার উদাসীনতার কথা ভালোভাবে জানলেও মধ্যে-মধ্যে খোদেজার বিষয়ে একটি সন্দেহ জাগত মনে। বাগদত্তা মেয়ের মনের কথা কি বলা সহজ? হয়তো সে মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি গোপনে-গোপনে কী একটা ভাব পোষণ করে যা ছেলেখেলার জিনিস নয়, যা অন্তঃসলিলার মতো অদৃশ্য। তবে তার মৃত্যুর মাসকয়েক পূর্বে খোদেজা কিছু বলে যার পর বুঝতে পারি সে-ধারণাটিও অহেতুক।

তখন অগ্রহায়ণ মাস, কাটা-ধান মাড়ানো-ধানের গন্ধে বাড়ি-ঘর, মাঠ-ক্ষেত মাতোয়ারা। সেদিন সন্ধ্যায় পেছনের পুকুরের পাড় দিয়ে ঘরে ফিরছিলাম, এমন সময়ে কাচের চুড়ির মৃদু ঝঙ্কার শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। দেখি, খোদেজা। অনুচ্চ, বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, "কী করছ এখানে?"

ততক্ষণে নিজেই বুঝে ফেলেছিলাম যে গতকাল থেকে যে-সাদা মুরগিটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে সে-মুরগিটি খুঁজতে এসেছে পুকুরের পাড়ে। সেখানে বুনো ফুলের বন, কিছু ঝোপঝাড়। তার বিশ্বাস বন-ঝোপঝাড়েই মুরগিটি লুকিয়ে রয়েছে কিসের ভয়ে। আমিও একটু খুঁজে দেখি, কিন্তু কোথায় মুরগি? বলি, "শেয়ালে খেয়েছে।"

হঠাৎ খোদেজা হাতে মুখ ঢেকে একটু শব্দ না-করে কাঁদতে শুরু করে। আমি কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, তারপর সহসা কী যেন ঘটে। হয়তো শীতের সন্ধ্যার গন্ধ নাকে এসে লাগলে মনে কী-একটা ভাবের সৃষ্টি হয়, হয়তো আবছা অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া মুরগির ব্যথায় ব্যথিত মেয়েটির জন্যে বুকে বেদনা বোধ করি বা বাড়ির এত কাছে হলেও নির্জন পুকুরের পাড়ে সহসা মনে হয় খোদেজা এবং আমি ছাড়া সমগ্র দুনিয়ায় কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ তার হাত ধরে তাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি, কিন্তু নিজেই সহসা কী-একটা উত্তাল ভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি। খোদেজাও এবার অসংযতভাবে কাঁদতে শুরু করে। এবারও কান্নার আওয়াজ শোনা যায় না, তার মুখও দেখা যায় না, কেবল সমগ্র দেহে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

তারপর কথাটি বলে। প্রথমে বুঝতে পারি নি, তার মুখের শব্দ তার কান্না এবং দেহ-কম্পনের মধ্যে কেমন হারিয়ে গিয়েছিল।

'কী বললে?'

"মুস্তফা ভাইকে বড় ভয় করে।"

আমি বড় বিস্মিত হই : সাদা রঙের অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া মুরগি এবং মুহাম্মদ মুস্তফা তার মনে যে-ভাব জাগায়, এ-দুটির মধ্যে কী সম্বন্ধ? তারপর মনে হয়, যা বলেছে তা নয়, অন্য কোনো কথা আমাকে জানানো তার উদ্দেশ্য, কারণ মুহাম্মদ মুস্তফাকে ভয় করার কোনো কারণ নেই। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করি,

"আমাকে ভয় করে না?"

সজোরে মাথা নেড়ে সে উত্তর দেয়,

"না।"

অনেক কথা হয়তো তাকে জিজ্ঞাসা করার বা বলার বাসনা জেগেছিল তখন, তবে আমি নির্বাকভাবে প্রস্তরবৎ মূর্তির মতো নিথর হয়ে থাকি, শুধু কোথাও কিছু ভয়ানকভাবে বাড়ি খেতে থাকে। হয়তো বুকচাপা কথা, হয়তো হৃৎপিণ্ড—কে জানে। গভীর নীরবতার মধ্যে

পুকুরে কী-একটা অশ্রান্ত মাছ ঘাই দেয়।

তারপর বলি, "যাও।" ভয় হয়, কখন কেউ এসে পড়বে।

খোদেজা চলে গেলে বাড়িতে না-ঢুকে পুকুরের ওপারে গিয়ে অনেকক্ষণ তেঁতুল গাছের নিচে বসে থাকি। যখন উঠি তখন টুপটুপ করে শিশির ঝরতে শুরু করেছে।

খোদেজা মুহাম্মদ মুস্তফার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—তেমন কথা কী করে আমি বিশ্বাস করি?

অথচ সে-কথাই মুহাম্মদ মুস্তফার সহসা সত্য বলে মনে হয়, বিনিদ্র চোখে রাত কাটাবার পর সকালের দিকে তাতেই তার বিশ্বাস জন্মে।

পরদিন সে বড় বিষণ্ন বোধ করে, কী-একটা অস্থিরতাও তাকে থেকে-থেকে নিপীড়িত করে। তার মনে হয়, বাড়ির লোকদের কথাটি অস্বীকার করার সত্যি আর কোনো উপায় নেই। কী করে অস্বীকার করে তাদের কথা? প্রথমত, একজোট হয়ে সকলে একটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছে তা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এও সম্ভব নয় যে মেয়েটি যতই গোপনকারী হোক না কেন, যারা রাতদিন তার সঙ্গে বসবাস করেছে তারা তার মনের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। বস্তুত মুহাম্মদ মুস্তফা কিছু লক্ষ্য না করলেও তারা সব লক্ষ্য করেছিল, সব জানতে পেরেছিল। মেয়েটি যে প্রতিশ্রুতির কথা ভোলে নি শুধু তাই নয়, তাতে সমস্ত আস্থা-ভরসা স্থাপন করেছিল। মানুষের মন অবুঝ। পিতৃহীনা, আশ্রিতা মেয়েটির সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সব স্বপ্ন স্নেহমমতা পরজীবী উদ্ভিদের মতো মুহাম্মদ মুস্তফাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছিল, তাকে জড়িয়েই বেঁচেছিল, সে মুহাম্মদ মুস্তফার যোগ্য কিনা বা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে তার প্রতি কোন স্নেহমমতা ছিল কিনা—সে-সব প্রশ্ন একবারও তার মনে জাগে নি। সরলমনা মানুষ কিছুতে একবার বিশ্বাস করলে সে-বিশ্বাসে কোনো প্রশ্নের ক্ষীণতম তরঙ্গও জাগে না; সে-বিশ্বাস নিরেট, নিশ্ছিদ্র।

অনেক কথা সহজে সে বুঝতে সক্ষম হয়। বাড়ির লোকেরা যা লক্ষ্য করেছিল বা জানতে পেরেছিল—তা সে লক্ষ্য করে নি কেন, জানতে পারে নি কেন? কারণটা আর কিছু নয় : সে লক্ষ্য করতে চায় নি, জানতে চায় নি, ইচ্ছা করেই চোখ বুজেছিল সে। মেয়েটির দিকে কখনো তাকায় নি এই ভয়ে যে তার চোখে অনুচ্চারিত বিশ্বাসটি দেখতে পাবে, স্নেহমমতার আভাস নজরে পড়বে। প্রতিশ্রুতিটির কথা স্মরণ করতে সাহস পায় নি এই কারণে যে সে জানত প্রতিশ্রুতিটি কখনো রক্ষা করবে না। তবে হয়তো সে-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। সেজন্যে বাড়ি আসবার সময় প্রতিবার খোদেজার জন্যে সে টুকিটাকি জিনিস নিয়ে আসত যেন প্রতিশ্রুতির কথা সে ভোলে নি, যথাসময়ে তা রক্ষাও করবে। তাই প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করত না—তা সত্য নয়। তবে স্মরণ করত এ-জন্যে যে কীভাবে তা ভাঙ্গতে পারে, কী করে তার হাত থেকে নিস্তার পেতে পারে—এসব নিয়ে তার চিন্তার অবধি ছিল না। তেমনি খোদেজার দিকে কখনো তাকাত না—তা-ও সত্য নয়। সে তাকাত, তবে তাকাত স্নেহমমতা নিয়ে নয়, কোনো আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়, শুধু এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে যে অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়েটি সত্যি তার জীবন-সঙ্গিনী হবার যোগ্য নয়; তার অযোগ্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হবার জন্যেই মধ্যে-মধ্যে চকিতে আড়চোখে তার দিকে দৃষ্টি দিত, এবং অযোগ্যতা সন্ধান করত বলে তার অগোচরেই সর্বপ্রকার দোষঘাট দেখতে পেত হয়তো খোদেজার মধ্যে।

মুহাম্মদ মুস্তফার মনে হয়, সবকিছুই সে সহসা বুঝতে পেরেছে।

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ সহসা জিজ্ঞাসা করে,

"আপনি নিজের কানে কিছু শুনেছিলেন?"

তবারক ভুইঞা উত্তর দিতে ঈষৎ দ্বিধা করে, তারপর বলে, "না, আমি নিজে কিছু

শুনি নি। তবে অনেকের সত্যিই মনে হয়েছিল তারা কিছু শুনতে পায়।" একটু থেমে সে আবার বলে, "কিন্তু কানে শোনাই কি বড় কথা?"

"তারপর কী হয়েছিল?" লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করে।

"উকিল কফিলউদ্দিনই গোলমাল বাধায়।"

একদিন উকিল কফিলউদ্দিন স্থির করে, তার পক্ষে কুমুরডাঙ্গায় বাস করা আর সম্ভব নয়। তার মনে হয়, যে-শহরে আজীবন বসবাস করেছে সে-শহরই যেন তার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অথচ একদিন কত-না আশা-ভরসা নিয়ে এই শহরে ওকালতি শুরু করেছিল। তারপর কঠিন শ্রম-অধ্যবসায়ের ফলে ধীরে-ধীরে পেশায় নাম-যশ করতে সক্ষম হয়, সমাজের শীর্ষেও একটি বিশেষ স্থান দখল করে। সে-সময়ে এই আশাটিও দেখা দেয় যে একদিন কুমুরডাঙ্গারও উন্নতি হবে, সুনাম হবে। হয়তো আশাটি একেবারে নিঃস্বার্থ ছিল তা নয়, কিন্তু একটি মানুষ যে-স্থান তার কৃতকার্যতার পটভূমি বলে গ্রহণ করে নেয় তার জন্যে সে-স্থান কি অনেকটা আত্মীয়স্বজনের মতো নয়? একটি মানুষের কৃতকার্যতা যতই চমকপ্রদ হোক-না কেন, আত্মীয়-স্বজন দারিদ্র বা বিফলতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকলে তার কৃতকার্যতা সম্পূর্ণ হয় না, বরঞ্চ তা তাদের অসার্থকতায় নিয়ত ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অকৃতকার্য আত্মীয়-স্বজন কৃতকার্য মানুষের সম্মান রক্ষা করতে পারে না যেমন মাটির ভোজনপাত্র মোঘলাই খানার মর্যাদা দিতে পারে না। তবে কারণ যাই হোক, কুমুরডাঙ্গা শহরের উন্নতির জন্যে আগ্রহ-উদ্যম-সহকারে সে কত কিছু-না করেছে। তারই উদ্যোগে শহরে মিনারগম্বুজ শোভিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ উঠেছে, মেয়েদের জন্যে একটি মাইনর স্কুল বসেছে, কাছারি-আদালতের সামনে একটি ক্লাব-ঘরের পত্তন হয়েছে যেখানে শহরের শিক্ষিত সম্প্রদায় সন্ধ্যার পর তাস দাবা খেলে গল্পগুজব করে সংবাদপত্র-মাসিকপত্র নেড়েচেড়ে সময় কাটাতে পারে। সে-ই খেলাধুলার প্রতি শহরবাসীদের মন আকৃষ্ট করেছে এবং মরহুম ওয়ালেদের নামে যে-ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রচলন করেছে তাতে প্রতিবছর আশেপাশের নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন খেলোয়াড় দল এসে সোৎসাহে যোগদান করে। এ-অঞ্চলে প্রতি বছর মড়ক লেগে গৃহপালিত জীবজন্তু পালে-পালে ধ্বংস হত। সে-ই সরকারের কাছে জোরদার দাবি জানিয়ে কুমুরডাঙ্গায় পশু-ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছে। তবে এ-সব নয়, যা নিয়ে সত্যি সে গর্ব করতে পারে তা এই যে, তারই কড়া দৃষ্টির জন্যে শহরের নৈতিক চরিত্রের যেমন উন্নতি হয়েছে তেমনি সর্বপ্রকারের অনাচার-অনিয়ম শাসনে থেকেছে। কোনো সরকারি ডাক্তার বা দারোগা উৎকোচ-গ্রহণের ঈষৎ দুর্বলতা দেখাবামাত্র সে কুমুরডাঙ্গা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে, কোনো হাকিম-মুনসেফের ন্যায়জ্ঞান বা নিরপেক্ষতা আদর্শনীয় মনে না-হলে সে-ও এ-শহরে বেশিদিন টিকতে পারে নি। তবে এত কিছু করেও একটি জিনিস উকিল কফিলউদ্দিন ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয় নি : কুমুরডাঙ্গার অবনতি। তার চোখের সামনে ধীরে-ধীরে অনিবার্যভাবে শহরটি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। হয়তো একবার কোনো শহরের ভিতে ঘুণ ধরলে ফুটবল খেলে স্কুল-ক্লাব বসিয়ে অবনতির মারাত্মক কীটের ক্রম-অগ্রসর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তবু সে কখনো আশা ছাড়ে নি, চতুর্দিকে অবনতির স্পষ্ট প্রমাণ দেখতে পেলেও এই দৃঢ়বিশ্বাসে দিন কাটিয়েছে যে কোনো অত্যাশ্চর্য উপায়ে শহরটি সহসা জীবিত হয়ে উঠবে, তার ভাটা-পড়া স্রোতে জোয়ার আসবে, কোনো যাদু-যষ্টির স্পর্শে রূপকথার ঘুমন্তপুরীর মতো অকস্মাৎ জেগে উঠবে। সে-সব কিছু হয় নি, বরঞ্চ যে-টুকু অবশিষ্ট ছিল তা-ও শেষ হয়েছে এবং কুমুরডাঙ্গা এবার যেন মধ্যযুগে প্রত্যাবর্তন করেছে। এমন শহরে যশ-সুনামের মূল্য কী, সার্থকতারই-বা অর্থ কী?

তবে উকিল কফিলউদ্দিন সাহেব নিজেই বুঝতে পারে, এ-কারণেই যে সে স্থির করেছে কুমুরডাঙ্গায় আর থাকা সম্ভব নয়—তা নয়। আসল কারণ অন্য কিছু। সে-টি এই যে, হঠাৎ যদি মওতের ডাক এসে পৌঁছায় তবে তার আদুরে মেয়ে হোসনার মুখ না-দেখেই তাকে

শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে। মৃত্যুর কথা সে ভাবতে ভালোবাসে না, তবু তার মনে হয় এবার না ভেবে উপায় নেই, এবং একবার তা ভাবতে শুরু করলে হোসনার স্নেহময় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করার সম্ভাবনা সহসা তাকে ভয়ানকভাবে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তারপর অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত মানুষ যেমন সে-দ্বীপ ত্যাগ করার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে তেমনি কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে চলে যাবার জন্যে উকিল সাহেব অধীর হয়ে ওঠে।

কফিলউদ্দিন ঝোঁকের মানুষ : একবার কিছু ঠিক করলে ভালো-মন্দ বড় একটা ভাবে না। তাছাড়া যে-শহরে সে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে, যে-শহর তার জন্মস্থান—সে-শহর ছেড়ে যাওয়ার পথে কোনো বাধাও দেখতে পায় না। কিসের বাধা? সে ভাবে, সে উকিল, যেখানে সে যাক-না কেন তার সঙ্গে যাবে আইনের বিষয়ে তার গভীর জ্ঞান, ওকালতির ক্ষেত্রে তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। সে আর যুবক নয়, যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য নেই, কিন্তু সে-সবের বদলে পেয়েছে জ্ঞান অভিজ্ঞতা। সুনামও-বা কম কী—যে-সুনাম কুমুরডাঙ্গাতেই সীমাবদ্ধ নয়; সদরেও লোকেরা তাকে চেনে। সেখানে একবার গিয়ে বসলে দেখতে-না-দেখতে তার পসার গড়ে উঠবে। পসার না হলেও ক্ষতি কী? সাংসারিক সব দায়িত্ব শেষ হয়েছে ভালোভাবেই। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, ছেলে দুটিও আর তার মুখাপেক্ষী নয়। এক ছেলে ঢাকায় ডাক্তারি করে, আরেক ছেলে ভালো সরকারি চাকরি নিয়ে এ-স্থানে সে-স্থানে ঘুরে বেড়ায়। তারা দুটি মাত্র মানুষ, সে এবং তার স্ত্রী, তাদের পসার বা পয়সার কোনোটারই প্রয়োজন নেই। তাছাড়া তাদের দু-জনেরই জীবন দিগন্তের দিকে হেলে পড়েছে : বাকি কয়েকটি দিনের জন্যে অত ভাবনা কী?

একবার দ্রুতসঞ্চারী একখণ্ড মেঘের ছায়ার মতো একটি কথা দেখা দেয় তার মনে। সে-টি এই যে, কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের প্রতি তার কি কোনো দায়িত্ব নেই? কিন্তু কথাটি মনে আসতেই সে আপন মনে রেগে ওঠে, যেন শহরবাসীদের কেউ প্রশ্নটি তুলেছে। দায়িত্ব আবার কিসের? সে কি সারা জীবন তাদের খেদমত করে নি, তাদের উন্নতির জন্যে ভালোর জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নি, নিজের চিন্তা ছেড়ে তাদের চিন্তায় কত সময়ে বিনিদ্ররজনী কাটায় নি? তাছাড়া সমাজ বা ধর্ম যা দাবি করতে পারে তার কাছ থেকে সে-দাবি অনুযায়ী অক্ষরে-অক্ষরে সে তার কর্তব্য পালন করেছে। তাদের প্রতি দয়ামায়া বিবেচনা দেখিয়েছে, সাহায্য করেছে নানা উপায়ে, পাই-গণ্ডা হিসেব করে ছদ্‌কা জাকাৎ দিয়েছে, ফকির-মিসকিন খাইয়েছে। এর বেশি কেউ তার কাছে দাবি করতে পারে না—না ধর্ম না সমাজ।

তবে একটি কথা বেশ কিছুক্ষণের জন্যে তাকে কেমন বিষণ্ন করে তোলে। কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে গেলে সে-শহরে তার সমস্ত পদচিহ্ন সহসা শেষ হয়ে যাবে না কি? হয়তো সেটা এক রকমের মৃত্যুই হবে যে-মৃত্যুর মধ্যে তার এতদিনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এত আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধ-স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যে-জীবন গড়ে তুলেছে সে-জীবনে অকস্মাৎ যতি পড়বে, দীর্ঘকাল ধরে যে-একটি পথরেখা সৃষ্টি করেছে সে-পথরেখা থেমে যাবে আকস্মিকভাবে। একবার বিষণ্ন ভাবটি এমন ঘনীভূত হয়ে ওঠে যে তার মনে হয় জীবিত অবস্থাতেই সে যেন তার মৃত্যুশোকে সমাকুল হয়ে পড়েছে। তবে শীঘ্র সে মনের বিষণ্ন ভাব কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। মনকে আশ্বস্ত করে এই বলে যে, কখনো-কখনো মানুষের জীবনে আচম্বিতে যতি পড়ে, যা নিতান্ত অটল-অনড় মনে হয় তাও নিমেষে চোরাবালিতে পরিণত হয়, নদীর যে-তীরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে মানুষ স্নেহমমতার এবং আশ্রয়ের নীড় বাঁধে সে-তীরও হঠাৎ নদীগর্ভে অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ তখন সুপরিচিত পথঘাট ছেড়ে বুকে কিছু ক্ষোভ ব্যথা বেদনা নিয়ে কিন্তু আবার নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নূতন পথ ধরে।

উকিল কফিলউদ্দিন অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হয়ে যাবার উদ্যোগ-আয়োজন করতে শুরু করে, এবং তার প্রাসাদসম বাড়ির প্রথম মালিকের অনুকরণেই গ্রামের বাড়ি থেকে বিশ্বাসী

কিন্তু অলসপ্রকৃতির একটি ভাইপোকে ডেকে পাঠায় শূন্য বাড়িটা পাহারা দেবার জন্যে। এবার কারো জানতে বাকি থাকে না যে উকিল কফিলউদ্দিন কুমুরডাঙ্গা ত্যাগ করে যাবে। তবে কেন একটি লোক বৃদ্ধবয়সে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে—তা কেউ বুঝত পারে নি। তাদের কেমন মনে হয়, কী-একটা অজানা কারণেই যেন সে কুমুরডাঙ্গায় আর থাকতে ভরসা পাচ্ছে না।

একদিন দুপুরে উকিল কফিলউদ্দিন যখন সস্ত্রীক ঘাটে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণে সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হয়েছে। ইতিমধ্যে ভাড়া-করা একটি বজরা এবং একটি গয়না নৌকায় মালপত্র চড়ানো হয়েছিল। সংক্ষিপ্তভাবে বিদায় নিয়ে খোদার নাম উচ্চারণ করে উকিল কফিলউদ্দিন বজরায় উঠতে যাবে এমন সময়ে সর্পদষ্ট মানুষের মতো পা তুলে নেয় সে। কিছুক্ষণ সে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে এদিক-ওদিক তাকায় যেন কোথাও কিছু সন্ধান করে, তারপর কেমন স্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ে। এবার ঘাটের সমবেত লোকের মনে হয়, নদীর দিকে তাকিয়ে সে যেন কী শুনছে। ক্রমশ তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে, তারপর সমস্ত মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। অবশেষে অদৃশ্য কোনো হিংস্র জন্তুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যেই যেন আবার ক্ষিপ্রভঙ্গিতে বজরায় উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু এক পা মাত্র উঠিয়ে সহসা বেসামাল হয়ে ধরাশায়ী হয়—দেহের অর্ধেক পানিতে অর্ধেক জমিতে। কেউ যখন তাকে তুলবার চেষ্টা করে তখন উকিল কফিলউদ্দিনের ধড়ে আর প্রাণ নেই।

উকিল কফিলউদ্দিন নূতন একটি পথ ধরতে সক্ষম হয় বৈকি, কেবল সে-পথ জীবিতদের জানা নেই, সে-পথের ব্যথা-বেদনা বা আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে আবার রোদ ঝলমল করে উঠলে মুহাম্মদ মুস্তফা আপিস অভিমুখে রওনা হয়ে পড়ে। কিছুদূর গিয়েছে এমন সময়ে পথে একটি ক্ষীণতনু নারীমূর্তি দেখতে পেলে সে চমকে ওঠে। মাথার ওপর নত করে রাখা একটি মস্ত কালো ছাতার জন্যে মুখটি ঠিক দেখতে পায় না, তবু তার মনে হয় সে যেন খোদেজা : একই শারীরিক গঠন, একই হাঁটার ভঙ্গি, চিবুকের যে-অংশটি নজরে পড়ে তাও মৃত মেয়েটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সাদৃশ্য তাকে ভয়ানক বিস্মিত করে, এবং নিষ্পলক দৃষ্টিতে ধীরপদে এগিয়ে-আসতে-থাকা মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। এমনভাবে কোনো মেয়েমানুষের দিকে কখনো তাকায় নি বলে সে লজ্জা বোধ করে কিন্তু তবু দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারে না। শীঘ্র তার দিকে তাকিয়ে থাকতে তেমন বাধেও না, কারণ তার মনে হয় যে-মেয়ে দেখতে ঠিক খোদেজার মতো তার দিকে তাকালে ক্ষতি নেই। তাছাড়া, ক্ষতি আছে কি ক্ষতি নেই, কাজটি ঠিক কি বেঠিক—এ-সব ভাবা হয়তো সম্ভবও হয় না; মানুষের পক্ষে সব সময়ে ন্যায়-অন্যায়ের কথা ভাবা সম্ভব কি?

মেয়েটি ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে, হাঁটার ভঙ্গিটা ঈষৎ মাজা-ভাঙ্গা ধরনের। ছাতার নিচে গভীর ছায়া, ছায়ার বাইরে উজ্জ্বল সূর্যালোক। ছায়ার মতো, মরীচিকার মতো সে এগিয়ে আসে মুখশূন্যভাবে। যতই নিকটে আসে ততই সে কেমন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে : মুহাম্মদ মুস্তফা কেবল একটি আকার দেখতে পায়।

তবু এক সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা তাকে চিনতে পারে। প্রখর সূর্যালোকের মধ্যে কালো ছাতার নিচে যাকে ছায়ার মতো একটি অস্পষ্ট আকারের মতো দেখতে পায় সে কি মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে নয় যে স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে, যে সর্বপ্রথম কী-একটা বিচিত্র কান্না শুনতে পেয়েছিল, এবং বাজারের পথে যাকে নিয়ে একদিন কী একটা ঘটনাও ঘটেছিল? সেদিন কে যেন মেয়েটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তবে তাকে চিনতে পারলেও সে নিরাশ হয় না, যেন একই মেয়ের পক্ষে দুটি ভিন্ন মানুষ হওয়া সম্ভব, যেন একটি সত্য হলে আরেকটি সত্য হবে না তার কোনো মানে নেই।

ছাতার তলে ছায়াটি নাচে, অস্পষ্টতা থেকে থেকে শূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যায়। তবে ছাতাটি ভেসেই থাকে স্রোতের ওপর ভাসমান বৃক্ষপল্লবের মতো। মেয়েটি আরো এগিয়ে আসে, পূর্ববৎ ধীর-মন্থর গতিতে, নিঃশঙ্কচিত্তে। দু-জনের মধ্যে এখন কয়েক গজের ব্যবধান মাত্র।

নিজেরই অজান্তে মুহাম্মদ মুস্তফা কখন দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একবার সে নড়বার চেষ্টা করে কিন্তু তা নিদ্রাচ্ছন্ন স্বপ্ন-দেখতে-থাকা মানুষের চেষ্টার মতো কোনো ফল প্রদান করে না; তার নড়বার ক্ষমতা নেই, সে যেন মাটিতে শিকড় গেড়েছে। বুকে হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়। মেয়েটি আরো কাছে এসে পড়লে তার সান্নিধ্য হাওয়ার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো কিছু সৃষ্টি করে এবং তারই সূক্ষ্ম কণা সহস্র ধারায় অদৃশ্যভাবে মুহাম্মদ মুস্তফাকে আঘাত করে; সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে। অবশেষে সে যখন বুঝতে পারে পেছনের দিকে ছাতা হেলিয়ে মেয়েটি বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তখন সে সহসা সমগ্র মনে একটি ভয় বোধ করে, কারণ তার মনে হয় কী-একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটবে। একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটেও। কোথাও সে একটি প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পায়, ক্ষণকালের জন্যে মনে হয় সে রোষমত্ত বজ্রনিনাদ শুনছে। তবে তার অতিশয় ভীতবিহ্বল মনও আওয়াজটি চিনতে পারে : প্রচণ্ড শব্দটি অদূরে একটি বাড়ির টিনের ছাদে বৃষ্টি পড়ার শব্দ, যা শিলাবৃষ্টির মতো উচ্চ-উৎকট আওয়াজ ধারণ করেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবল বৃষ্টি নেবেছে মেঘশূন্য আকাশ থেকে বর্ষণের মতো। চমকিত হয়ে ওপরের দিকে তাকালে বড়-বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির পানি সোজাসুজি মুহাম্মদ মুস্তফার চোখে প্রবেশ করে এবং সহসা সে যেন দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে। অবশ্য শীঘ্র দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে ওঠে, মেয়েটিকে আবার দেখতে পায়, তবে স্পষ্টভাবে নয়, এবং এবার তার মনে হয় মেয়েটি যেন একটি ঝর্নাধারার ওপাশে দাঁড়িয়ে। মুখটি ঠিক দেখতে পায় না, দেখতে পায় কেবল এক জোড়া স্থির চোখ। মানুষের চোখ সদা ঘোলাটে, সদা অপরিচ্ছন্ন, মানুষের চোখ যখন নির্ভাবনায় শূন্য হয়ে থাকে তখনো স্রোতহীন পানির মতো পঙ্কিলতায় ঘনীভূত হয়ে থাকে। তবে মেয়েটির চোখ যেন পরিস্রুত, সর্বদোষ বিনির্মুক্ত। এমন চোখে আবার ক্রোধ-বিদ্বেষ পরিষ্কারভাবেই ধরা পড়ে। তার চোখে যেন ক্রোধ-বিদ্বেষ, হয়তো-বা ঘৃণাও।

ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ে, তবে কেমন নিঃশব্দেই পড়ে যেন; কোথাও যেন কোনো শব্দ নেই, অদূরে টিনের ছাদও যেন নীরব। মেয়েটিকে সে আর দেখতে পায় না, কারণ ততক্ষণে হয়তো বৃষ্টির জন্যে হয়তো কোনো কারণে আপনা থেকেই তার চোখ নিমীলিত হয়ে পড়েছে।

মুহাম্মদ মুস্তফা তখনো মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে—এমন সময় সাইকেলে করে একটি লোক হুড়মুড় করে প্রায় তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে; বোধহয় প্রবল বৃষ্টির জন্যে সে তাদের দেখতে পায় নি। তাছাড়া কুমুরডাঙ্গা শহরে সাইকেলের তেমন প্রচলন নেই বলে যারা সাইকেল ব্যবহার করে তারা অনেকদিন চালিয়েও দুটি মাত্র চাকার ওপর দেহভার রক্ষা করার কায়দাটি কখনো করায়ত্ত করতে পারে না, এবং তাই তারা সামনের চাকার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কেমন সর্পিলভঙ্গিতে অগ্রসর হয়; হয়তো তাদের ধারণা সামনের চাকাটির ওপর চোখ না রাখলে সেটি সহসা অবাধ্য ঘোড়ার মতো কোথাও ছুটে পালিয়ে যাবে।

সচকিত হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা লোকটির দিকে তাকায়, এবং সহসা তার চমক ভাঙ্গে বলে ঘোর বৃষ্টির মধ্যেও তাকে চিনতে পারে; সাইকেলের আরোহী কাছারির প্রসেস সার্ভার আবদুল গনি।

প্রসেস সার্ভার আবদুল গনি কয়েক মুহূর্ত অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গিতে এক পা অর্ধচক্রাকারে ঘুরিয়ে ঝুপ্ করে সিটে বসে প্রথমে বেসামালভাবে, তারপর অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে কিন্তু বেশ দ্রুতগতিতে প্রস্থান করে।

নিজের আচরণে নিজেই ভয়ানকভাবে বিস্মিত হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা কাছারিতে হাজির হয়। কিছু সংযত হলে সে লজ্জা বোধ করে। তার মনে হয়, অপরিচিত মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে

াকার খবর প্রসেস সার্ভার আবদুল গনির মারফতে ইতিমধ্যে চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়েছে এবং া নিয়ে সকলে বলাবলি করতে শুরু করেছে। খারাপটাই সর্বপ্রথম মানুষের মনে আসে। কে ানে কীভাবে প্রসেস সার্ভার আবদুল গনি খবরটি বিতরণ করেছে এবং নানা মুখে কী রঙ না াড়েছে তাতে। তবে লোকেরা কী বলাবলি করছে তা নয়, তার নিজের আচরণ আবার তাকে চিন্তিত করে। এর অর্থ কী? তাছাড়া এবার সে বুঝতে পারে, যে-মেয়েটির মধ্যে খোদেজার াদৃশ্য দেখতে পেয়েছিল সে তাকে কেমন ভীতিবিহ্বল করে তুলেছিল। তার অর্থই-বা কী?

সে কিছু বুঝতে পারে না। তবে শীঘ্রই এসব চিন্তা জোর করে মন থেকে দূর করে। এবার তার স্মরণ হয় বন্ধু তসলিমের চিঠির কথা। ক-দিন ধরে চিঠিটা পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত জবাব দেওয়া হয় নি। চিঠিটা বের করে পড়ে আরেকবার। তসলিম লিখেছে : স্টিমার বন্ধ হবার জন্যে এবং তারপর ভয়ানক জ্বরে পড়ার জন্যে তোমার যে আসা হয় নি তা আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। তবু তোমার বিয়েতে দু-দু'বার বাধা পড়েছে। সব কিছু বুঝলেও তিনি যেন সন্তুষ্ট নন, মনে যে খট্‌কা লেগেছে, সহসা যেন প্রথম বার বিয়ে স্থগিত রাখার কারণটি এখন আর বুঝতে পারছেন না; একবার মানুষের মনে সন্দেহ দেখা দিলে পূর্বের নির্দোষ ঘটনাগুলিও সন্দেহের উদ্রেক করে থাকে। সে-দিন বলেই ফেলেছিলেন : হ্যাঁ, বাপ-মা ভাইবোন অন্য কথা, কিন্তু ফুফাতো বোনের মৃত্যুর জন্যে বিয়ের পাকা দিন ভাঙ্গার কথা কখনো শোনেন নি। থেকে-থেকে এ-ও বলছেন, এবার বিয়ের দিনটা তাঁর পীরের উপদেশ নিয়েই স্থির করবেন। পীর আবার এ-দেশে থাকে না, তার বাস ভাগলপুর না বহরমপুর এমন কোনো জায়গায়। সত্য বলতে কী, লক্ষণটা ভালো মনে হচ্ছে না। আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবকে তেমন দোষও দেয়া যায় না। মেয়ের বিয়ের ধার্য দিন দু-দু'বার ভাঙতে হয়েছে বলে লোকেরা নানা কথা তুলতে পারে—এই ভয়েও চিন্তিত হয়ে পড়বেন তা আশ্চর্য কী। তোমার সত্বর আসা দরকার, সামনাসামনি বাতচিত হলে তাঁর মনের সব খট্‌কা দূর হবে।

তসলিমের চিঠির উত্তর দেয় নি কেন? সে যা লিখেছে তা অতিশয় ন্যায্য, আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব অনেক সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন যার জন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ না-করেও পারা যায় না। আর বিলম্ব করা সত্যিই সমীচীন হবে না। যা হবার হয়ে গিয়েছে, তা আর শোধরানো যাবে না। খোদেজা তারই জন্যে আত্মহত্যা করলেও সে আর কী করতে পারে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সহসা তার রাগও হয় : সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে উদ্যত হয়েছে দেখেই খোদেজা আত্মহত্যা করবে এ কেমন কথা? তাছাড়া খোদেজা যদি নির্বুদ্ধির কাজ করে থাকে তবে সে-ই দায়ী হবে কেন? বুদ্ধিহীনা মেয়েটির প্রতি রাগ দেখা দিলে বিচিত্র উপায়ে সে সুস্থির বোধ করে। সে ঠিক করে, আগামীকাল ছুটির জন্যে দরখাস্ত করে দেবে এবং সম্ভব হলে দু-তিন দিনের মধ্যে ঢাকা রওনা হয়ে পড়বে। তার মনে এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে সে যদি তৎপরতা না দেখায় তবে আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব সত্যিই বিগড়ে যাবেন।

সে-দিন সন্ধ্যায় সে বেশ উৎফুল্ল বোধ করে। একজন সহকর্মী টর্চ হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে তার বাসায় উপস্থিত হলে সমকর্মীটির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে, তারপর সহকর্মীটি আবার টর্চ হাতে ছড়ি ঘুরিয়ে অন্য কোনো বাড়ির অভিমুখে রওনা হলে এবার সে রাতের খাওয়াদাওয়া সারে। পরে বারান্দায় গিয়ে বসেছে এমন সময় তবারক ভুইঞা এসে দেখা দেয়। আজ তার সঙ্গে সানন্দচিত্তেই কথা বলে, যেন তার প্রতি যে-একটি জড়তার ভাব দেখা দিয়েছিল সে-ভাবটি কেটেছে।

এক সময়ে সে তবারক ভুইঞাকে বলে,

"দু-তিন দিনের মধ্যে ঢাকায় যাব। ভালো দেখে একটা নৌকা ঠিক করে দেবেন।"

কথাটি বলে মনে কেমন হাল্কা-হাল্কা বোধ করে। তবারক ভুইঞা কেমনভাবে যেন তার দিকে দৃষ্টি দেয়, কিন্তু তা তাকে বিব্রত করে না।

তারপর এক সময় তবারক ভুইঞা চলে যায়। এবার সে হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এক সময় কী-একটা আওয়াজে জেগে ওঠে। তবারক ভুইঞা আবার এসেছে নাকি? সে কিছুক্ষণ পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন সেখানে অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটি ছায়া জেগে উঠবে। তবে তেমন কিছু ঘটে না। হয়তো সে কিছু স্বস্তিই বোধ করে। একটু পরে দূরে আলো দেখা দেয়। আলোটি শীঘ্র নিকটে এলে দুটি মানুষের মূর্তি জেগে ওঠে, আলোটি লণ্ঠনের রূপ ধারণ করে; লণ্ঠনের আলোয় দ্রুতভঙ্গিতে হাঁটতে-থাকা দুটি মানুষের পায়ের কিছুটা এবং তাদের বস্ত্রের নিম্নাংশ নজরে পড়ে। অত রাতে কী অজানা কারণে দ্রুতভাবে হেঁটেই মানুষ দুটি বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায়, আলোটিও এক সময়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অন্ধকার আবার জমজমাট হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরে সে-অন্ধকারের মধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি চকিত, তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনতে পায়। নিঃসন্দেহে পথের ওপাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি ব্যাঙ কোনো অপেক্ষমাণ, ক্ষুধার্ত সাপের নির্মম চোয়ালে ধরা পড়ে গিয়েছে। ব্যাঙের ভীত আর্তনাদটি তেমন জোরালো নয়, উন্মুক্তও নয়। সমগ্র মন দিয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা অসহায় ব্যাঙটির আর্তনাদ শোনে যে-আর্তনাদ রহস্যময়ভাবে রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে; অন্ধকার কাঁপে হাওয়া-আন্দোলিত বাঁশের ডগার মতো; অদৃশ্য, নিঃশব্দ সাপটি কম্পমান সে-অন্ধকারের মধ্যে বিকট রূপ ধারণ করে। আওয়াজটি মুহাম্মদ মুস্তফার সুপরিচিত, তবু তার মনে হয় সাপের মুখে ধরা-পড়া ব্যাঙের আর্তনাদ কখনো সে শোনে নি, সাপের শীতল-কঠিন নির্দয়তাও এমনভাবে কখনো অনুভব করে নি। ব্যাঙের আওয়াজ তখনো থামে নি, তবে ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। তারপর সহসা আওয়াজটা থামে : সাপের মুখে নয়, সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যেই যেন ব্যাঙটির ক্ষুদ্র প্রাণের সমাপ্তি ঘটে। কেমন নিথর হয়ে মুহাম্মদ মুস্তফা পথের ওপাশে ঝোপঝাড়ের প্রতি তাকিয়ে থাকে। কে জানে হয়তো সাপের কবল থেকে ব্যাঙটি প্রাণ নিয়ে মুক্তি পেয়েছে, হয়তো আবার পায় নি; নীরব অন্ধকারের মধ্যে সে-প্রশ্নের উত্তর নেই। রাতের অন্ধকার তার অদৃশ্য হাতে সুন্দর সত্য নির্মম সত্য— সবই নিশ্চিহ্ন করে ফেলে।

এবার রাত যেন আদিম রূপ ধারণ করে; এমন রাত মানুষ চেনে না। দূরে দিগন্তের কাছে কয়েকবার বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে ওঠে, তবে নিঃশব্দ সে-বিদ্যুৎঝলক চোখ ঝলসে দিলেও কেমন অসত্য মনে হয়। একটু পরে একটি বাদুড় এসে নিকটে বার-কয়েক ঘুরপাক খায়, তারপর রাতের অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কখন মুহাম্মদ মুস্তফা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকবে, কারণ তার মনে হয় সে যেন কুমুরডাঙ্গা নামক একটি মফস্বল শহরের অন্যতম সরকারি বাড়ির বারান্দায় বসে নেই, বসে রয়েছে একটি নৌকার ওপর। নৌকা ঈষৎ দুলছে, থেকে-থেকে পানি থেকে ছলছল শব্দও আসছে। খালের পথ। তবে সে চাঁদবরণঘাটে স্টিমার ছেড়ে ছাপরশূন্য নৌকায় উঠেছে। দুপাশে সুপরিচিত মাঠ-ক্ষেত, দূরে গাছপালায় ঘেরা ছায়াশীতল গ্রাম। তারপর অনেক সময় কাটে; পথটি যেন বেশ দীর্ঘ। শীঘ্র কোনো কারণে সে বিস্মিত হয়। সে ভাবে : চাঁদবরণঘাটে স্টিমার থেকে নেবে খালের এ-পথ দিয়ে চিরদিনই কি তাকে যেতে হবে? তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষ বিস্ময়কর কথাও বেশিক্ষণ ভাবে না, ভাবছে মনে হলেও তার ভাবনা অগাধ পানির ওপর সমীরণ-আলোড়িত ঈষৎ তরঙ্গমালার মতো হাল্কাভাবে খেলা করে, নিচে তন্দ্রা অগাধ পানির মতোই স্থির হয়ে থাকে। কিন্তু খাল কোথায়? এ যে পুকুর, শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো ছোট পুকুর যার পাড় অসমান, যেন বিশালাকার কোনো প্রাণী নখাঘাতে পাড়টির ঐ অবস্থা করেছে। তবে পুকুরের পাড়ের দিকে বা পাড়স্থিত গাছপালার দিকে তার দৃষ্টি নেই। দৃষ্টি একটি মুখের ওপর যে-মুখ সে-পকুরের পানি থেকে ভেসে উঠে এসেছে। সম্পূর্ণভাবে নয়, কারণ ওপরে এসেও আবার কিছু ডুবে রয়েছে যে-জন্যে তা অপরিচিত মনে হয়। তবু সে-মুখটি অপরিচিত মনে হবে কেন? সে কি খোদেজার মুখ ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছে? শুধু তার মুখ নয়, ভাবভঙ্গিও

অপরিচিত ঠেকে; এমন ভাবভঙ্গি খোদেজার মুখে কখনো লক্ষ্য করে নি। ঠোঁটের পাশে কেমন বিদ্রূপাত্মক হাসি, সামান্য তিরস্কারের আভাস—যা খোদেজার মুখে কখনো দেখে নি। না, বিদ্রূপাত্মক হাসি বা তিরস্কারের ভাব নয়, তার মুখে গভীর দরদের ছায়া, এবং যে-বড়-বড় চোখ খোদেজার চোখের মতো ঠিক নয় সে-চোখে উৎকণ্ঠা। তবে কি কিছুই হয় নি? সে কোনো অন্যায় করে নি, খোদেজারও মৃত্যু হয় নি? সবই কি দুঃস্বপ্ন মাত্র?

এ-সময়ে কী একটা প্রবল ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লে মুহাম্মদ মুস্তফার তন্দ্রা ভাঙ্গে। তবে বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্তন করলে সে বুঝতে পারে দুঃস্বপ্নটি ঘুমতন্দ্রার জগতের নয়, আসল জীবনেরই একটি অংশ যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব নয়। এবার সে তন্দ্রাহীন চোখে বসে থাকে অর্থ-উদ্দেশ্যহীনভাবে। তারপর এক সময় তার মনে হয় সে যেন একা নয়, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ তবারক ভুইঞার কণ্ঠস্বর যেন কানে পৌঁছায় নি, স্মৃতির চোখে যে-নিরাকার নিশ্ছিদ্র অন্ধকার জেগে উঠেছিল সে-অন্ধকারে সমস্ত কিছু, এমনকি মানুষের কণ্ঠস্বরও বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তবে শীঘ্র আবার সকর্ণ হই। তার কথা না-শুনে উপায় কি? এখনো সে মুহাম্মদ মুস্তফার বিষয়ে কিছু বলে নি বটে তবু হয়তো এমন এক সময় আসবে যখন তার কথা না-বলে পারবে না। হয়তো কুমুরডাঙ্গার কাহিনীটা বলার উদ্দেশ্য অবশেষে মুহাম্মদ মুস্তফার সম্বন্ধে যা বলবে তারই জন্যে একটি উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যথাযোগ্য পটভূমি তৈরি করা। অথবা তার বিশ্বাস কুমুরডাঙ্গা মুহাম্মদ মুস্তফাকে প্রভাবিত করেছিল, তাই সে-শহরে যা ঘটেছিল তা প্রথমে না বললে মুহাম্মদ মুস্তফার কথা সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে না।

তবারক ভুইঞা কার মৃত্যুর কথা যেন বলে। শীঘ্র স্মরণ হয়, কুমুরডাঙ্গার গণ্যমান্য উকিল কফিলউদ্দিন শহর ছেড়ে যাবার জন্যে ঘাটে উপস্থিত হয়েও যেতে পারে নি, বজরায় উঠবার সময়ে হঠাৎ তার মৃত্যু ঘটে। তবারক ভুইঞা বলে, একটি বৃদ্ধ মানুষের আকস্মিক মৃত্যুও মানুষকে বিস্মিত করে না, কারণ বয়সের ভারে যার জীবনগতি শত রকমে ধীর-মন্থর হয়ে পড়েছে তার মৃত্যুর দিন যে আর দূরে নয় তা সকলে তাদেরই অগোচরে মেনে নেয়। তবে উকিল কফিলউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শহরময় প্রচারিত হলে সবাই স্তম্ভিত হয়ে পড়ে, যেন তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, জরা-বার্ধক্য সে-মৃত্যুর জন্যে দায়ী নয়। কাছারি-আদালতে, কাছারি-আদালতের সামনে ঘাসশূন্য ধুলাচ্ছন্ন মাঠে, বাজারের পথে, সে-পথের দুপাশে দোকানগুলিতে, মানুষের বাড়িতে উঠানে সর্বত্র একটি থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয়। সকলের মনে একটি প্রশ্নই ঘোরাফেরা করে : বজরায় উঠতে গিয়ে উকিল সাহেব সর্পদষ্ট মানুষের মতো ক্ষিপ্রবেগে পা তুলে নিয়েছিল কেন, কীই-বা শুনতে পেয়ে এমন ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল? ডাক্তার বোরহানউদ্দিন বলে, ঘাটে পৌঁছাবার পর বৃদ্ধ মানুষটির হৃৎপিণ্ড হঠাৎ বিকল হয়ে পড়েছিল, কিন্তু এ-ব্যাখ্যায় কেউ সন্তুষ্ট হয় না। সবারই মনে হয়, ডাক্তার বোরহানউদ্দিন আসল কথাটা বুঝতে পারে নি : হৃৎপিণ্ড বিকল হলেও কেন হয়েছিল, সে-কথা। নিঃসন্দেহে উকিল সাহেব কিছু শুনতে পেয়েছিল, বজরায় উঠতে যাবে এমন সময়ে কী-একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তার কানে ফেটে পড়েছিল। এবং তা নদীর কান্না ছাড়া আর কী?

উকিল কফিলউদ্দিন বিচিত্র কান্নাটি শুনতে পেয়েছিল বলেই সর্পদষ্ট মানুষের মতো বজরা থেকে পা তুলে নিয়েছিল, সে-জন্যেই তার চোখ বিস্ফারিত এবং মুখ রক্তশূন্য হয়ে পড়েছিল—সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মনে পূর্বের আশঙ্কাটি ফিরে আসে, কী-একটা কথা অস্পষ্টভাবে মনের প্রান্তে ঘোরাঘুরি করতে শুরু করে।

পরদিন ফজরের নামাজের পর হবু মিঞা মুহুরি বাইরের ঘরে বসে ছিল। নিত্য এ-সময়ে সে বাইরের ঘরে এসে বসে, রোগ-ব্যাধিতে শয্যাশায়ী না হলে এ-নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না কোনোদিন। শীতের দিনে গায়ে আলোয়ান, গ্রীষ্মের দিনে নগ্ন গা, মাথার চুল এলোমেলো, ঈষৎ

স্ফীত চোখে-মুখে গভীর প্রশান্তি, কিছু বিমনস্কভাব। দিন-রাতের মধ্যে এ-সময়টাই তার সবচেয়ে প্রিয়। বাইরের ঘরে তখন ভালোমতো আলো প্রবেশ করে না, তবে যে-অন্ধকার তখনো জমে থাকে তা যেন রাতেরও নয় দিনেরও নয়; সে-অন্ধকার অনেকটা দিঘির গভীর তলদেশের অন্ধকারের মতো। সে-সময়ের নির্জনতাও বিশেষ ধরনের যা মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করা যায়, কারণ সে-নির্জনতাও যেন রাতের বা দিনের অংশ নয়; সে-নির্জনতার মধ্যে মানুষের মন ধীরে-সুস্থে কোথাও কোনো তাগিদ-তাড়া বোধ না করে দিঘির পানির গভীরে মাছের মতো শ্লথগতিতে অনায়াসে সঞ্চরণ করে। বস্তুত ফজরের এই সময়ে কিছুই সে ভাবে না, এমন কি যে-ছেলেটি কোনোদিন আরোগ্য লাভ করবে না তার আসন্ন, অনিবার্য মৃত্যুও তার মনে কোনো ছায়া সঞ্চার করে না।

তবে আজ হবু মিঞা মুহুরির মনে গভীর অশান্তির জ্বালা; কী-একটা কথা সে সমগ্র মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু সক্ষম হয় না বলে মনে অস্থির-অস্থির বোধ করে।

যখন সে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজ্ঞান হয় তখন সূর্য উঠেছে, ক্ষুদ্র বারান্দা অতিক্রম করে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে রোদ লুটিয়ে পড়েছে ধুলাচ্ছন্ন ফাটলধরা মেঝের ওপর। নির্জন ঘরেই সে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে,

"কান্নাটি শোনামাত্র উকিল সাহেব তার অর্থ বুঝতে পেরেছিল।"

উকিল কফিলউদ্দিন কান্নাটির মধ্যে কী দেখতে পেয়েছিল সে-কথা অন্যেরা যখন জানতে পারে তখন তারা বিস্মিত হয় না। সে-কথা তারা নিজেরাই কি জানে না? জানে, সব বোঝে, কেবল এ-কদিন নিজেদের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করেছে কারণ এমতক্ষেত্রে আর কী করা যায়? তারা ভাবে কান্নাটি শুনবার জন্যে তাদের আগ্রহের সীমা নেই, তা শুনবার জন্যে অধীর হয়ে রয়েছে, কিন্তু আসলে তা শুনতে পাবে এই ভয়ে তারা কি সদা-সন্ত্রস্ত নয়? তারা ভাবে কান্নাটি শুনতে পেলে কী-একটা অপরূপ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে, বা মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ে সকিনা খাতুন যা বলে তা নিতান্ত উদ্ভট হলেও সম্ভব, বা কান্নাটি কোনোরকমের কানের ভুল কিম্বা বড়জোর একটি দুঃস্বপ্ন। কিন্তু এ-সব কি একটি নিদারুণ সত্য ঢেকে রাখার ফিকিরফন্দি নয়? কিন্তু কতদিন আর ঢেকে রাখা যায়? এ-সব কলাকৌশল বা মন-ভুলানোর কারসাজিতে এ-কথা কি ঢেকে রাখা সম্ভব যে শীঘ্র কুমুরডাঙ্গায় ভয়ানক কিছু ঘটবে এবং কান্নার আওয়াজটি তারই পূর্বসঙ্কেত?

কীভাবে, কী বিচিত্র যুক্তির সাহায্যে এমন একটি বিশ্বাস তাদের মনে বাসা বেঁধেছিল কে জানে, কিন্তু এবার তারা সহসা একেবারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে যে নদীর দিক থেকে অনেকে যে-কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় তা ভয়ঙ্কর কোনো বিপদের পূর্বসঙ্কেত। হয়তো দুঃখকষ্টে জর্জরিত নিপীড়িত মানুষ তারই অগোচরে কেয়ামত বা এমন কিছু সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করে কারণ চতুর্দিকে যা সে দেখতে পায় তার অস্তিত্বের মধ্যে কোনো অর্থ খুঁজে পায় না, এবং তাই তার ধ্বংসই কামনা করে।

কুমুরডাঙ্গায় শীঘ্র ভয়ানক কিছু হবে, কিন্তু কী হবে? যে-ভয়ঙ্কর বিপদ গুটিগুটি পায়ে কুমুরডাঙ্গার দিকে এগিয়ে আসছে, সে-বিপদের রূপটা কী রকম? তা কি এমন কোনো মহামারী যা সমগ্র শহর উজাড় করে দেবে? বা কোনো মহাপ্লাবন যা দুরন্তবেগে ছুটে এসে মানুষের ঘরবাড়ি গোলা-গোয়াল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে? অথবা কোনো প্রচণ্ড ভূমিকম্প যা নিমেষের মধ্যে পায়ের নিচের শক্ত জমিকে বিশালকায় কোনো জন্তুর মুখগহ্বরে পরিণত করবে? কী হবে তা কারো পক্ষে পরিষ্কারভাবে ভাবা সম্ভব হয় না, এবং হয় না বলে আশঙ্কাটি কোনো নির্দিষ্ট আকারের মধ্যেও ধরে রাখা সম্ভব হয় না; সে-আশঙ্কা সকলের মনে যে-গভীর ভীতির সৃষ্টি করে তার মধ্যে সমস্ত চেতনা শুষ্ক ছোবড়ার মতো নিষ্প্রাণ হয়ে ওঠে।

তারপর কেউ কান্নার কথাটি আর উল্লেখ করে নি : কেউ শুনে থাকলেও কথাটি গোপন করে রাখে। এক সময়ে যা শুনতে পাওয়া কারো-কারো নিকট সৌভাগ্যের বিষয় মনে হয়েছে,

যা শুনলে গর্বের সঙ্গে সকলকে বলেছে, না শুনলেও শুনেছে বলে মিথ্যা দাবি জানিয়েছে- তা এখন গোপন করে রাখাই তাদের সমীচীন মনে হয়। কে শুনতে চায় সে-কান্নার কথা যে-কান্না কোনো অভাবনীয় প্রলয়কাণ্ডের অগ্রধ্বনি, কোনো ধ্বংসলীলার পূর্বাভাস? কেবল কান্নার কথা ঢেকেও কেউ ঢাকতে পারে নি, কারণ সবাই বুঝতে পারে সে-বিষয়ে আকস্মিক নীরবতার মানে এই নয় যে তা থেমে গিয়েছে : বস্তুত কান্নার বিষয়ে আকস্মিক নীরবতায় কান্নাটির আওয়াজ যেন আরো উচ্চতর হয়ে ওঠে, যা ছিল সবিরাম ধ্বনি, যা মধ্যে-মধ্যেই কেবল শোনা যেত, তা অবিরাম ধ্বনিতে পরিণত হয়।

কুমুরডাঙ্গায় ভয়ানক কিছু একটা ঘটবে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পড়লে শহরবাসীরা আরো অনেক কিছুতে আসন্ন বিষম বিপদের পূর্বচিহ্ন দেখতে পায়, অনেক সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা তাদের চোখে বিশেষ অর্থ গ্রহণ করে। কারো হাতের চুড়ি ভেঙ্গে গেলে, কলসিটা উত্তরদিকে হেলে পড়লে, বা সহসা কোনো মৃত লোক স্বপ্নে দেখা দিলে মনে প্রশ্ন জাগে : এ-সবের অর্থ কী ? পাশের বাড়িতে হয়তো একটি শিশু বায়ুশূলের বেদনায় তারস্বরে কাঁদতে শুরু করেছে। শিশুটি কেন এমনভাবে কাঁদে? সন্ধ্যাকাশে অশ্রান্তভাবে উড়তে থাকা একঝাঁক পাখি দেখা দিয়েছে। পাখিগুলি এমন অস্থির হয়ে উঠেছে কেন? গোয়ালের গরুর দুধ কমে গিয়েছে। তার কারণ কী? অনেক কিছু অস্বাভাবিকও মনে হয়। দূর আকাশে মেঘগর্জন শোনা গেলে মনে হয় এমনভাবে মেঘ কখনো ডাকে না। নিঃশব্দ নিথর হাওয়াশূন্য রাতে হঠাৎ গাছের শাখায় অস্ফুট মর্মরধ্বনি জাগলে সে-আওয়াজ কানে অপরিচিত ঠেকে; গাছের পাতা এমনভাবে কোনোদিন যেন শব্দ করে নি। কাছারি-আদালতের পাশে অবস্থিত ট্রেজারি থেকে ঢন্‌ঢন্ করে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সময় ঘোষণা করা হয়। সে-আওয়াজ আচম্বিতে কর্ণগোচর হলে মনে হয় সুপরিচিত ঘণ্টাটি কেমন বেসুরোভাবে বাজছে। গভীর রাতে নীরবতা প্রগাঢ় হয়ে উঠলে মনে হয় সে-নীরবতা নীরবতা নয়, অন্য কিছু; হয়তো শ্বাসরুদ্ধ করা অপেক্ষা মাত্র। মানুষের কণ্ঠস্বর, চলাফেরার ধরন, তাকানোর ভঙ্গি—এ সবও কেমন-কেমন ঠেকে।

কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মতিভ্রমই হয়ে থাকবে, কারণ যারা কান্নার কথাটি পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করে নি তারাও একটি অস্ফুট আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পায় নি। কোনো-কোনো সময়ে মানুষের কাছে যুক্তির অস্ত্র অকেজো মনে হয়। ভয়ানক কিছু-একটা ঘটবে—এমন একটি ধারণা যদি কারো মনে দেখা দিয়ে থাকে তা কোনো যুক্তির সাহায্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেয়া যায় কি? সমস্ত সৃষ্টি কি একদিন অচিন্তনীয় একটি সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে না, সূর্যচন্দ্র তারানক্ষত্র নীহারিকার দল বিলুপ্ত হবে না একটি আকস্মিক তুমুল বিপর্যয়ের মধ্যে? আজ হবে না কাল হবে, কাল নয় সুদূর ভবিষ্যতে কোনো একটি দিনে কল্পনাতীত ঘটনাটি ঘটবে—এই বলেই কি মনকে প্রবোধ দেয়া যায়? অদৃশ্য ভবিষ্যতের বুকে যা লুক্কায়িত তার বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না : নিষ্ঠুর ভবিষ্যতের কার্যকলাপ নিতান্ত আকস্মিক, তার সম্মুখে মানুষ একেবারে অসহায়। স্নেহমমতা, সুখশান্তির পশ্চাতে ছুটে মানুষ ভবিষ্যতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, কিন্তু নির্মম ভবিষ্যৎ সে-সব বিনাখবরে বিনাকারণে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে। বস্তুত, যারা বুদ্ধিমত্তা বা যুক্তির দ্বারা নিজেকে আশঙ্কামুক্ত করার চেষ্টা করে তাদের শীঘ্র মনে হয় সে-সব চেষ্টা বৃথা : দুর্বল-ডানা ক্ষীণশক্তি একটি পাখি অকূল সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে না, একটি প্রদীপ অসীম অন্ধকার দূর করতে পারে না।

তবে কোনো আশা নেই বুঝলেও মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে কিছু-না-কিছু করেই, বুদ্ধিতে যা কুলায়, যা ভীতবিহ্বল মনে সমীচীন মনে হয় তা করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরাও কিছু একটা করে।

একদিন সন্ধ্যার দিকে দর্জিপাড়ার রহমত শেখ একটি নবজাত বাছুরকে বুকে জড়িয়ে এবং হাতে একটি ধারালো ছুরি নিয়ে নদীর দিকে ছুটতে শুরু করে। রহমত শেখ চিরদুঃখী।

বহুদিনের নৈরাশ্য এবং অর্থকষ্টের পর ইদানীং কাছারি-আদালতের কাছে সে একটি পানবিড়ির দোকান খুলতে সক্ষম হয়েছে,—যে-দোকান নিয়ে তার গৌরব এবং আশার অন্ত নেই। তবে কুমুরডাঙ্গা শহরে অজানিত ভয়টি নেবে আসার পর থেকে তার মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে সে-দোকানটি সে হারাবে এবং তারপর আবার শুরু হবে তার অসহ্য অর্থকষ্ট, অন্তহীন কঠোর পরীক্ষা যার শেষে কোনো পুরস্কার বা প্রতিদান নেই।

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকে। পথে-ঘাটে তখন মানুষের চলাচল কমেছে। যারা তাকে দেখতে পায় তাদের কেউ-কেউ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, ছুটতে-থাকা লোকটির দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকিয়ে থাকে, কেউ-কেউ আবার সে কেন এমনভাবে ছুটছে তা জানবার জন্যে উদ্যম কৌতূহল বোধ করলে তার পিছু ধরে। কাজেই রহমত শেখ যখন নদীতীরে এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণে ছোটখাটো একটি ভিড় জমে গিয়েছে তারে চতুষ্পার্শ্বে। তবে তাদের বিষয়ে তাকে সচেতন মনে হয় না, যে-উদ্দেশ্যে সে নদীতীরে উপস্থিত হয়েছে সে-উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্যে উদ্যত হয় ক্ষিপ্রভঙ্গিতে। প্রথমে সে ধারালো ছুরি দিয়ে বাছুরটির গলা কাটে, ফিনকি দিয়ে তাজা উষ্ণ রক্ত উঠে তার দেহ এবং বস্ত্রের খানিকটা রঞ্জিত করে, যার উগ্র রঙের তুলনায় সন্ধ্যাকাশের রক্তিমাভা ফিকা-পানসে মনে হয়। তারপর রহমত শেখ রক্তাক্ত, মস্তকছিন্নপ্রায় বাছুরটি আবার বুকে জড়িয়ে ধরে তীর বেয়ে নিচে নেবে যায়, চোখে-মুখে নিথর ভাব। পানিতে নেবে সে হাঁটতে থাকে; হাঁটু, কোমর, তারপর বুক পর্যন্ত সে-পানি উঠে আসে। এবার সে বাছুরটিকে শ্লথগতি স্রোতে ছেড়ে দেয়, চতুর্দিকে নদীর পানি গাঢ় হয়ে ওঠে।

দর্জিপাড়ার রহমত শেখ যে-অদ্ভুত কাণ্ডটি করে বসে তার মর্মার্থ কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা প্রথমে বুঝতে পারে নি; শুরুতে কাজটি নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়ে থাকবে তাদের কাছে। কিন্তু শীঘ্র তারা বুঝতে পারে। এবং একবার বুঝতে পারলে তাদের আর ধরে রাখা যায় না, কেউ ধরে রাখার চেষ্টাও করে না। দলে-দলে তারা নদীর তীরে উপস্থিত হতে শুরু করে, হাতে এটা-সেটা। যে যা পারে, যা যার কাছে মূল্যবান মনে হয়, তাই নিয়ে আসে : হাঁড়ি-পাতিল, জামা-কাপড়, চাল-ডাল, টাকা-পয়সা, এমনকি সোনা-রূপার গহনাও। এ-সব তারা নদীর পানিতে ছুঁড়তে শুরু করে।

এমনিতে দরিদ্র নিঃস্ব মানুষেরা দু-দিনে আরো দরিদ্র নিঃস্ব হয়ে পড়ে, তাদের নানা প্রকারের মূল্যবান অমূল্যবান দরকারি-বেদরকারি জিনিস মরণোন্মুখ নদীর বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে চিরতরে, অর্থহীনভাবে।

সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে খোদেজা একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে যে-আত্মা সারা জীবন তাকে পদে-পদে অনুসরণ করবে, অদৃশ্যভাবে, ছায়ার মধ্যে মিশে থেকে, হয়তো-বা তাকে এক সময়ে ধ্বংসও করবে। সেদিন রাতে সে যখন তন্দ্রাহীন চোখে বারান্দায় বসে ছিল তখন খোদেজারই উপস্থিতি অনুভব করেছিল। ভয়টাও তখন জেগেছিল—এমন ভয় যা মানুষের চোখের সামনে থেকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

প্রথমে মুহাম্মদ মুস্তফা বুঝে উঠতে পারে না কী করবে সে। প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার বিরুদ্ধে কীই-বা করতে পারে মানুষ? জীবিত মানুষকে বোঝানো যায়, অন্যায়-অবিচার করলে তার কাছে মাফ চাওয়া যায়, ক্ষতিপূরণ খেসারত দেয়া যায় তাকে, কিন্তু যে কায়াহীন আত্মায় পরিণত হয়েছে তার কাছে কী করে মাফ চাওয়া যায়, কী করেই-বা ক্ষতিপূরণ-খেসারত পৌঁছানো যায়? জীবন্ত মানুষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও সম্ভব কারণ তার শক্তি যতই দুর্দান্ত হোক-না কেন সে-শক্তি তার দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দেহহীন আত্মার শক্তির সীমা নেই। তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া দুষ্কর।

দু-দিন পরে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি ভয়ানক সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন হয়তো রবিবার ছিল, হয়তো সে আপিসে যায় নি। সেদিনের কথা কিছু কিছু তার মনে পড়ে, কিছু কিছু একেবারেই মনে পড়ে না। এ-কথা বেশ মনে পড়ে, তবারক ভুইঞা বার বার এসেছিল সেদিন। হয়তো তার মনে কেমন একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল, এবং সে-জন্যে তার কৌতূহলও অদম্য হয়ে উঠেছিল। তবে তার কৌতূহল মুহাম্মদ মুস্তফাকে আর বিচলিত করত না। অন্য একটি অদৃশ্য দৃষ্টিও কি সর্বক্ষণ তার ওপর নিবদ্ধ নয়, তার পদক্ষেপ কেউ কি লক্ষ্য করে দেখে না প্রতিমুহূর্তে? শুধু তার প্রত্যেক বাহ্যিক আচরণ কার্যকলাপ নয়, মনের ক্ষীণতম আন্দোলন অস্ফুট বাসনা-কামনাও সেই নিরন্তর দৃষ্টির হাত থেকে নিস্তর পায় না। সে-দৃষ্টির তুলনায় তবারক ভুইঞার দৃষ্টি তেমন কিছু নয়। তাছাড়া কতখানিই-বা সে দেখতে পায়? তার কৌতূহল অস্বাভাবিকও মনে হয় না। অপরাধী তার অপরাধ স্বীকার করবে কিনা এবং স্বীকার করবার পর তার মনে অনুতাপ-অনুশোচনা বা ভীতি দেখা দেবে কিনা—এ-সব বিষয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক। সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে বিচারক অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত করে কেবল, অপরাধী তার মনের নিভৃতে অপরাধ স্বীকার করেছে কিনা, তার জন্যে অনুতপ্ত বা ভীত হয়েছে কিনা—সে-জন্যে তার কৌতূহল নেই কারণ সে-সবের ওপর অপরাধ বা শাস্তির কমতি-বাড়তি নির্ভর করে না। কিন্তু সে-সবে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। বস্তুত সে আরো কিছু জানতে চায়। অনুতাপ, অনুশোচনা বা ভীতির কি একটি পরিণতি নেই? মেঘ জমলে বর্ষণ হয়, বীজ রোপণ করলে গাছ হয়, বাঁধ ভাঙ্গলে ধরে-রাখা পানি নিঃসৃত হয়; অনুতাপ অনুশোচনা ভীতিরও পরিণতি থাকে। তবারক ভুইঞা জানতে চায় এবার মুহাম্মদ মুস্তফা কী করবে, তার অনুতাপ অনুশোচনা বা ভীতি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। কিন্তু শুধু সে নয়, অদৃশ্য দৃষ্টিও সে-সব জানতে চায়। তবারক ভুইঞা তাকে বিচলিত করবে কেন? তাছাড়া একবার রঙ্গমঞ্চে নাবলে দর্শক সম্বন্ধে অভিনেতা আর তেমন সচেতন থাকে না : দর্শক তখন ছায়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবারক ভুইঞা ছায়ার মতো কোথাও দেখা দিলেও তার বিষয়ে সে আর তেমন সচেতন হত না।

এক সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা বোধ হয় ঘুরঘুর করতে শুরু করে—এ-ঘরে, সে-ঘরে, বারান্দায়। যে-কাজ করবার জন্যে মনস্থির করেছে তার জন্যে উপযুক্ত একটি জায়গা খুঁজছিল নিশ্চয়। এ-জীবনে সব কিছুর জন্যেই প্রথমে উপযুক্ত জায়গা ঠিক করতে হয় : কোথায় পুকুর খনন করতে হবে, কোথায় চারা লাগাতে হবে, কোথায় একটি শিশুর জন্ম হবে, কোথায় ঘর-সংসার পাতবে, কোথায় অন্তিম শয্যায় শায়িত হবে। তবে নিচের কোনো ঘর হয়তো পছন্দ হয় নি, কারণ সিঁড়ি ভেঙ্গে সে ওপরে চিলেকোঠায় উঠে আসে। খড়খড়ি-দেয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন চিলেকোঠায় সে কতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টি দেয়। ঘরটি নোংরা। মেঝেতে ছড়ানো কাগজপত্র, অনেকদিনের সঞ্চিত ধুলা, পাখির বিষ্ঠা বা পরিত্যক্ত পালক, এক কোণে কবে কার ছেড়ে যাওয়া অতিশয় পুরাতন ছেঁড়া জীর্ণ একটি তোশক। দেয়ালে দরজায় আগের বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েদের কাঁচাহাতের হিজিবিজি লিখন, একটি মানুষের নকশা : গোলাকার মুখে মস্ত দুটি চোখ, নাকের দুটি ছিদ্র চোখের চেয়েও বড়, হাত-পা কিন্তু চারটি রেখা টেনে কোনো মতে শেষ করা। ঘরের অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হলে এ-সব সে ধীরে-ধীরে দেখতে পায়।

চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফা সহসা খোদেজার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। রাতদিনই সে তাকে অনুসরণ করে। এবারও তাকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে এসেছে এবং পেছনে কোথাও ছায়ার মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখছে। একটু পরে সে চুড়ির ঝঙ্কারও শুনতে পায়, এবং সে-আওয়াজ তেমন সুস্পষ্ট না হলেও তার শিরদাঁড়া শীতল হয়ে ওঠে। একবার ইচ্ছা হয় পেছনে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু না-নড়ে সে পূর্ববৎ স্থির হয়ে থাকে। তবে না-তাকালেও সে খোদেজাকে যেন দেখতে পায়, যদিও তেমন

পরিষ্কারভাবে নয়। তাছাড়া তার মুখটি যেন মোক্তার মোছলেহউদ্দিনের মেয়ের মতো—যাকে সেদিন পথে দেখেছিল। হয়তো সে-জন্যে সহসা ক্ষণকালের জন্যে কী-একটা ভাবে সে অভিভূত হয়ে পড়ে, কারণ তার মনে হয় খোদেজার মৃত্যু হয় নি, পথে-দেখা মেয়েটির মতোই সে জীবিত। তারপর ভাবে : খোদেজা তাকে দেখছে দেখুক। সে কি একটি ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত নেয় নি? একসময়ে খোদেজা দেখতে পাবে, মনভরে প্রাণভরে দেখতে পাবে। সে সুস্থির হয়।

সে-বার হয়তো বেশিক্ষণ চিলেকোঠায় থাকে নি। হঠাৎ তার মনে হয়, তবারক ভুইঞা এসেছে। তখন সে দড়িটা লুকিয়ে ফেলে; সেটি ব্যবহার করবার সময় এখনো আসে নি। তবে তাড়াতাড়ি করে লুকিয়ে ফেলেছিল বলে খুঁজে বের করতে পরে কষ্টই হয়েছিল।

হয়তো দড়িটা যখন লুকাবার চেষ্টা করছিল তখনই নেহাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কলিজাটির কথা মনে পড়েছিল। না, তখন নয়। যখন কলিজাটির চিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন সে শোবার ঘরে চৌকির ওপর চুপচাপ করে বসে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। বহুদিন আগে গ্রামের একটি মেয়েলোকের কাছে কলিজাটির কথা প্রথম শুনেছিল। মেয়েলোকটি বলত, খোদা কলিজার মতো দেখতে, কলিজার মতোই অবিরত থরথর করে কাঁপে। একবার তার কথা শুনে বড় চাচা বা বাপ খেদমতুল্লা আহত পশুর মতো হুঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। তারপর থেকে মেয়েলোকটি গোপনে-গোপনে তাকে কলিজার কথা বলত, কারণ সে জানত ভয় পেলেও মুহাম্মদ মুস্তফা তা বিশ্বাস করে। খোদা যে নিরাকার—তা একদিন সম্পূর্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করলেও মুহাম্মদ মুস্তফা কলিজাটির কথা অনেক দিন ভুলতে পারে নি এবং কখনো-কখনো সেটি আপনা থেকেই কোথেকে সহসা তার মনশ্চক্ষুতে এসে দেখা দিয়ে থরথর করে কাঁপত। রঙটা লাল। তবে টাটকা লাল নয়; তাতে যেন কালচে ধরেছে। মানুষের মনে সত্য এবং অসত্য নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করতে পারে একবার যদি উভয়ের অস্তিত্ব গোপন করার কৌশলটা করায়ত্ত করে নেয়া যায়।

কলিজাটি বহুদিন পরে তার মনশ্চক্ষুতে ভেসে ওঠে বলে সে গভীর কৌতূহল বোধ করে, একটু ভয়-ভয়ও করে, এবং শীঘ্র এমনও মনে হয় সেটি যেন বাস্তবরূপ ধারণ করেছে, যেন সত্যি তা দেখতে পাচ্ছে : তার চোখের সামনে শূন্যে ঝুলে থাকা কলিজাটি কাঁপতে থাকে থরথর করে, অশ্রান্তভাবে, নির্দয়ভাবে। নির্দয়ভাবে কারণ সে কলিজার কম্পন কখনো যেন থামবে না, কখনো শান্ত হবে না; সেটি এমনই কিছু যার শেষ নেই, যা অমর।

সে যেন আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে চিলেকোঠায় উঠে এসেছে। সে-বারই কি জানলার খড়খড়ি দিয়ে পেছনের বাড়ির উঠানের দিকে তাকিয়েছিল? ঠিক মনে নেই। প্রথমবার যখন সে-বাড়ির উঠানের দিকে তাকায় তখন রোদটা যেন পড়ে এসেছে। হয়তো সে-বার দড়ির সন্ধানে ওপরে উঠে এসেছিল। তখনো খাওয়াদাওয়া করে নি, দ্বিপ্রহরের প্রখর রোদ নির্মমভাবে খাঁ খাঁ করছে। দড়িটা খুঁজে পায় নি। পরে একটু বিরক্ত হয়ে খেতে বসে পেছনের বারান্দায়, পাটির ওপর। ঝুঁকে পড়ে দ্রুতভাবে খায়, যেন খাওয়া শেষ হলে দূরে কোথাও যাবে। তাই অন্য দিনের তুলনায় গোগ্রাসে অনেক খায়। প্রথমে পুঁটিমাছগুলি মস্ত মস্ত লোকমার সঙ্গে গলাধঃকরণ করে, তারপর গোস্তের ছালন এবং ডালের সাহায্যে দু-তিন বাসন ভাত খতম করে। খাওয়া শেষ হলে ভরা পেটে বারান্দার প্রান্তে হাতমুখ ধুতে বসে অনেকক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে থাকে, কারণ সহসা বন্ধু তসলিমের চিঠির কথা তার মনে পড়ে। সে-চিঠির জবাব দেয় নি। চিঠির পর একটি তারও এসেছে; তার নীরবতায় বন্ধু তসলিম বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে থাকবে। সে-তারেরও জবাব দেয় নি। কী উত্তর দেবে? বন্ধু তসলিম দু-চার দিনের মধ্যে খবরটা পাবে, তখন সব বুঝতে পারবে সে। হয়তো প্রথমে সে বড় দুঃখিত হবে, আফসোসও হবে তার। সে ভাববে, এতদিন এত কষ্ট করে সে পড়াশুনা করেছিল এই জন্যেই কি? পরে সে বুঝবে। তবে তার চিঠি বা টেলিগ্রাম, তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব, এমনকি দেশের বাড়ি আপনজন সবই বহু দূরে মনে

হয় ; সে যেন কোথায় একটি নদী পেরিয়ে চলে এসেছে সে-সব পেছনে ফেলে।

না, অপরাহ্ণের দিকেই চিলেকোঠার জানলার খড়খড়ি দিয়ে পেছনের বাড়ির উঠানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মনে পড়ে, সে-বাড়ির উঠানে তবারক ভুইঞাকে দেখতে পেলে সে ভয়ানকভাবে চমকে উঠেছিল। সে জানত পেছনে কোথাও তবারক ভুইঞা থাকে, কিন্তু তার বাড়ি যে সরকারি বাংলোর পেছনের দেয়াল ঘেঁষেই—তা কখনো ভাবে নি।

উঠানের একধারে নিমগাছের তলে খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে তবারক ভুইঞা কাঠি জাতীয় কিছু দিয়ে নতমাথায় মাটি খুঁড়ছিল। লেপা-জোপা তক্‌তকে পরিচ্ছন্ন উঠান। ছোটখাটো বাড়িটির ভেতরের বারান্দাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বারান্দার প্রান্তে একটি পিঁড়ি, পিঁড়ির পাশে পেতলের বদনা। বদনাটাও মাজাঘষা, ঝকঝকে। ভেতরটা নজরে পড়ে না ঠিক, তবু মনে হয় সেটি স্বচ্ছ পানিতে ভরা। নিঃসন্দেহে সে-পানি উঠানের অন্যধারে কুয়াটি থেকেই এসেছে। কুয়াটি তেমন উঁচু নয়, তবু একপাশে একটা ধাপের মতো। কুয়ার ওপরে একটা বালতি। বালতিটিও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পরে সে-বাড়ির উঠানে বউটিকে দেখতে পায়। তাকে প্রথমে দেখে নি, তাই বুঝতে পারে নি কোথেকে সে এসেছে। মুহাম্মদ মুস্তফার বাড়ির দেয়ালের দিকে আরেকটা ছোট-খাটো ঘর, যার ছাদটাই কেবল নজরে পড়ে। বোধহয় রান্নাঘর। হয়তো সেই রান্নাঘর থেকে বউটি বেরিয়ে এসেছে। সে কি তবারক ভুইঞার স্ত্রী? উঠানের মধ্যখানে এসে দাঁড়িয়ে সে থামে, তারপর এধার-ওধারে কিছু যেন খুঁজে হাত তুলে একবার খোলা চুল ঝাড়ে। পিঠভরা চুল, ভেজা, রোদে তাই চিকচিক করে। এদিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে মুখটা দেখা যায় না, তবে মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী, নিটোল দেহের গঠনটা ভালো। পরনে ডোরাকাটা শাড়ি, পা খালি। কী কারণে নিষ্পলক দৃষ্টিতে বউটির দিকে মুহাম্মদ মুস্তফা তাকিয়ে থাকে। তারপর ভেতর থেকে একটি বৃদ্ধ মানুষ ধীর পায়ে বেরিয়ে এসে পিঁড়িতে বসে। তবারক ভুইঞা নড়ে না, কিন্তু মাথায় ঘোমটা টেনে বউটি কোথাও অদৃশ্য হয়ে যায়।

তারপর থেকে সেদিন মুহাম্মদ মুস্তফা অনেকবার চিলেকোঠায় এসে জানলার খড়খড়ি দিয়ে সে-বাড়ির উঠানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। পরে তবারক ভুইঞাকে দেখে নি, কিন্তু বউটিকে বার বার দেখেছে। মেয়েটির গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, দূর থেকেও কেমন মনে হয় মুখটা মন-খোলা মুখ। দ্রুতপায়ে হাঁটে, কিন্তু যখন দাঁড়ায় তখন এক পায়ে ভর করে দাঁড়ায় বলে মাজার এক পাশে খাঁজ পড়ে, দেহটা একটু বেঁকে যায়। তবে সে যেন সদা কর্মব্যস্ত। এই এসে উঠানে দেখা দেয়, এই আবার অদৃশ্য হয়ে যায় রান্নাঘরে বা বাসঘরে, আবার বেরিয়ে এসে কুয়ার ধারে যায়। যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়ায়। তবে তেমনটা মনে হয় কারণ মুহাম্মদ মুস্তফা দেখতে পায় না বা বুঝতে পারে না কেন সে ঘোরাঘুরি করে। উদ্দেশ্য থাকলেও সে-উদ্দেশ্য কী তা জানবার জন্যে কোনো কৌতূহল বোধ করে না সে, মেয়েটির আসা-যাওয়াই সে কেবল লক্ষ্য করে দেখে। যখন মেয়েটিকে দেখতে পায় না তখন সে নিরাশ বোধ করে না : সে অপেক্ষা করে। তাছাড়া তাকে দেখতে না পেলেও মনে হয় সে যেন অদৃশ্য হয়ে যায় নি, উঠানে, বাড়ির বারান্দায়, কুয়ার পাশে, নিমগাছের তলে—সর্বত্র তার স্পর্শ।

পরে একবার মনে হয়েছিল, পেছনের বাড়ির উঠানে ডোরাকাটা শাড়ি-পরা মেয়েটিকে দেখার পর একবারও সে চিলেকোঠার জানলা থেকে নড়ে নি। হয়তো ধারণাটি ভুল নয়। বউটির আকর্ষণেই সে যে অমনি করে জানলার পাশে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল তা ঠিক নয়, নিঃসন্দেহে প্রতিবেশীর বাড়ির তক্‌তকে উঠানে, ছোট কুয়াটিতে, নিমগাছের ছায়ায়, রান্নাঘরের ছাদে, এমনকি বারান্দায় পিঁড়ি-বদনায় সে এমন কিছু দেখতে পেয়েছিল যা তাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে থাকবে। সে জন্যে জানলা থেকে সে নড়তে পারে নি। হয়তো তাও সত্য নয়। সত্য এই যে, চিলেকোঠার জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকাবার পর

যে-অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে সে দাঁড়িয়েছিল সে-ঘরের দিকে দৃষ্টি দিতে তার মন চায় নি। এবং সে-জন্যে নিদারুণ সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার চেষ্টায় বিলম্বও হয়েছিল।

তারপর কখন উঠানটি সহসা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে। রাত হয়েছে তা প্রথমে সে বুঝতে পারে নি কারণ ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে-আসা, লেপাজোকা তকতকে উঠানে ছায়া জমে ওঠা—এ-সব লক্ষ্য করে নি। বিহ্বলতা কাটলে সে ভাবে, তবে রাত্রি নেবেছে, যে-রাত এমনিভাবে অন্যত্রও নেবেছে : তার দেশের বাড়ির সামনে ধানক্ষেতে, দূরে শান্ত খালটিতে, আরো দূরে চাঁদবরণঘাটের পাশে বড় নদীর বুকে। অকারণে এ-সময়ে মা আমেনা খাতুনের কথাও একবার তার মনে পড়ে, যার কথা কদাচিৎ মনে হয় তার; মাতা-পুত্রের মধ্যে যদি স্নেহের ধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে সে-ধারা ভূমিগর্ভস্থ ধারার মতোই অদৃশ্য—তা চোখে দেখা যায় না, তার কলতানও কানে পৌঁছায় না। তবে সে-ধারাটি দৃশ্যমান হলেও কয়েক মুহূর্তের জন্যেই হয় কেবল।

কখন চিলেকোঠা থেকে নেবে এসেছিল মনে নেই, যদিও চিলেকোঠা থেকে অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসতে কিছু কষ্ট হয়ে থাকবে। যা মনে পড়ে তা এই : লণ্ঠনের পলতেটা উঁচিয়ে আলোটা বাড়িয়ে শোবার-ঘর এবং ভেতরের বারান্দার চৌকাঠের পাশে লণ্ঠনটি স্থাপন করে চৌকিতে এসে বসেছে, দৃষ্টি মেঝের দিকে। তবে দৃষ্টি মেঝের দিকে হলেও কলিজাটি সে সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছে : কলিজাটি কাঁপছে থরথর করে, আগের মতোই অশান্তভাবে, তবে আগের চেয়ে আরো জোরে। কিছুক্ষণ চৌকির ওপর স্থির হয়ে বসে থাকার পর সে বুঝতে পারে কলিজাটির মতো চৌকিটিও যেন কাঁপতে শুরু করেছে, প্রথমে মৃদুভাবে, তারপর প্রবলভাবে।

চৌকিটা অবশেষে স্থির হয়। এবার সে ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি দেয়, যেন সে-ঘর এবং সে-ঘরের জিনিসপত্র আগে দেখে নি। ঘরে বিশেষ কিছু নেই। চৌকিটা ছাড়া আসবাবপত্রের মধ্যে একটি ছোট টেবিল, ওধারে একটি আলনা যেখান থেকে কিছু কাপড়চোপড় ঝোলে। আলনার কাছে একজোড়া ইংরেজি জুতা। জুতাজোড়াটি নূতন, কুমুরডাঙ্গায় আসার কিছুদিন আগে কিনেছিল, এখনো তা পরে হাঁটলে পায়ের গোড়ালির পেছনে ব্যথা করে। জুতাজোড়ার পাশে একটি গাঢ় খয়েরি রঙের চামড়ার সুটকেস। সেটিও নূতন। তার ভেতরে কী, সে জানে। একটি চারখানা নকশার লুঙ্গি, একটি শার্ট, একটি সবুজ রঙের আলোয়ান, এবং দু-একটা পুরাতন বই। একটি বই বেশ পুরাতন। সেটি ইংরেজি অভিধান, অনেকদিনের সম্পত্তি। মলাট ছেঁড়া, প্রথম দু-চারটি পাতা কবে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তবে এখনো মনে পড়ে, একদিন অভিধানটির প্রথম কি দ্বিতীয় পাতায় সে একটি লম্বা ধরনের নাম সযত্নে বড় বড় অক্ষরে লিখেছিল। তার পিতৃদত্ত নাম মুহাম্মদ মুস্তফা, তবে সে যখন নবম শ্রেণীতে উঠেছে তখন ঝোঁকের মাথায় নিজের নামে বাহার তুলে বই-খাতাপত্রে লিখতে শুরু করে : চৌধুরী আবু তালেব মুহাম্মদ মুস্তফা। তারা চৌধুরী নয়, আরবি শব্দ নিয়ে খেলা করার পাণ্ডিত্যও তার নেই, তাছাড়া এ-ও তার অজানা ছিল না যে অনেকে নামের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে নিজের দাম বৃদ্ধির চেষ্টা করলেও মানুষ আবার যা অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত তা দ্বিরুক্তি না করে প্রত্যাখ্যান করে বলে লম্বা নামধারী লোকেরা অতি সংক্ষিপ্ত, এমনকি দুদু মিঞা সোনা মিঞা এ-সব বাল্যকালের হাস্যকর উপনামেই পরিচিত হয়ে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করে। তবে তাতে সে দমিত হয় নি।

সুটকেসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এমন সময় সেটি অকস্মাৎ কাঁপতে শুরু করে : সুটকেসটি যেন একটি শুষ্করক্ত গাঢ় রঙের কলিজায় পরিণত হয়েছে। সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়। হয়তো এবার দরজার নিকটে স্থাপিত লণ্ঠনের দিকে তাকায়। তবে কলিজাটি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেখানেও হাজির হয় এবং আকারে সহসা ছোট হয়ে লণ্ঠনের গায়ে পতঙ্গের মতো ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। মুহাম্মদ মুস্তফা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এই আশায় যে,

পতঙ্গটি পুড়ে মারা যাবে, তার চঞ্চল ক্ষুধার্ত ডানা স্তব্ধ হবে, কিন্তু পতঙ্গটি স্তব্ধ হয় না। এবার মেঝের দিকে তাকালে সেখানেও কলিজাটি দেখতে পায়; মেঝের ওপর সেটি ডাঙায় তোলা মাছের মতো ধড়ফড় করছে যেন। সে আশা করে পানির অভাবে শীঘ্র মাছটির ধড়ফড়ানি শেষ হবে, তার দেহ স্থির হয়ে পড়বে, কিন্তু তাও হয় না, পতঙ্গের মতো মাছটিও ধড়ফড় করতে থাকে। বিচিত্র কলিজাটি সত্যই অমর : আগুনে তা দগ্ধ হয় না, দম বন্ধ হলেও তার শ্বসনকার্য থামে না।

হয়তো অমর কলিজাটির কথা ভুলবার জন্যেই এবার সে কিছু ভাববার চেষ্টা করে, যা মনে আসে তাই, অনির্দিষ্ট তুচ্ছ কথা। প্রতিবেশীর বাড়ির উঠানের কথা, সে-বাড়ির বউ-এর কথা, তার দাঁড়াবার ভঙ্গির কথা। তারপর গরুটির কথা ভাবে; সেদিন সকালে খুঁটিবাঁধা একটি গরু কী করে মুক্তি পেয়ে গলায় দড়ি নিয়েই পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকেছিল। তার সে উকিলটিকে দেখতে পায় : শীর্ণ চোয়াল-উঁচু মুখ, কানের নিচে গলা পর্যন্ত মস্ত জন্মদাগ, চোখে অশ্রান্ত ধূর্ততা। এবার আরেকটি মানুষের মুখ দেখতে পায় যাকে সে চেনে না; পথেই তাকে দেখে থাকবে। লোকটির মুখভরা বসন্তরোগের চিহ্ন, চোখে হাবাগোবা ভাব, থুতনির নিচে হাল্কা দাড়ি। তবে যাই সে ভাবুক, যে-চিত্র বা দৃশ্য তার চোখে ভেসে উঠুক না কেন, থরথর করে কাঁপতে থাকা বস্তুটির হাত থেকে নিস্তার পায় না : সেটি যেন চোখের পর্দায় স্থান পেয়েছে। সেটি তার বুকেও স্থান পায় নি কি? মনে হয় কলিজাটি তার বুকের মধ্যে ধুকধুক করে কাঁপতে শুরু করেছে ; কলিজাটি তার হৃৎপিণ্ডকে আঁকড়ে ধরেছে। হয়তো অনেক রাত হয়েছে, চতুর্দিকে গভীর নীরবতা। সে-নীরবতার মধ্যে কলিজার স্পন্দন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে, যেন একনাগাড়ে কেউ ঢেঁকি চালিয়ে যাচ্ছে। অদূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে খোদেজা অপেক্ষা করে।

তখনই কি তাবিজগুলি খুলতে শুরু করে? সময়টা মনে নেই। তবে মনে পড়ে তাবিজগুলি খুলতে বেশ কষ্ট হয়েছিল। পুরাতন গিঠটা খুলতে পারে নি, কালো রঙের সূতাটা অনেক পুরানো হলেও তা লোহার শৃঙ্খলের মতো শক্ত মনে হয়েছিল। হাতের পেশিতে বিপুল শক্তি প্রয়োগ করে অবশেষে সূতাটি ছিঁড়ে ফেলতে সক্ষম হয়। তারপর আরেকটি দৃশ্য মনে পড়ে। শোবার ঘরের পাশের কামরায় ওপরে কড়িকাঠে লাগানো হুকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে—যে-হুক্ থেকে এ-বাড়ির আগের বাসিন্দারা শীতের দিন শেষ হলে লেপ-কম্বল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখত। মনে হয় শোবার ঘর থেকে টেবিলটা এনেছিল, সে-টেবিলের ওপর একটি কাঠের চেয়ারও তুলেছিল। দড়িটার কথা মনে নেই। নিঃসন্দেহে দড়িটাও এনে থাকবে।

তবে সে-সময়েই সে ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করে। কী ভীষণ সে-কাঁপুনি। দেখতে-না-দেখতে সমস্ত দেহ একটি অদম্য কাঁপুনিতে পরিণত হয়—যে-কাঁপুনিতে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্ত্র-তন্ত্র মাংসপেশি স্নায়ু শিরা-উপশিরা আলগা হয়ে পড়ে ভেসে যায়। তারপর সে আর কিছু করতে পারে নি, কিছু দেখতেও সক্ষম হয় নি।

পরদিন বেশ সকালে-সকালে সে কুমুরডাঙ্গা ত্যাগ করে।

তবারক ভুইঞা বলছিল : কখনো-কখনো মানুষের বিশ্বাসে পর্বত জাগে, মরুভূমিতে পদ্মা-যমুনার মতো বৃহৎ ধারার সৃষ্টি হয়। বাকাল নদীর বুকে নানা প্রকার মূল্যবান-মূল্যহীন জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলার কয়েক দিনের মধ্যেই শহরবাসীদের সহসা মনে হয়, ফাঁড়া কেটেছে। সঙ্গে-সঙ্গে যে-আশঙ্কায় ক-দিন ভীতবিহ্বল হয়েছিল সে-আশঙ্কাও কমে। ধীরে-ধীরে কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীরা ভয়মুক্ত হয়, একটি কাল্পনিক বিপদের সম্ভাবনা তাদের মনে যে-ছায়ার সঞ্চার করেছিল, সে-ছায়া দূর হয়। তবু সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিস্থ হতে তাদের কিছু সময় লাগে, যেন ঘটনাটি কোথাও একটি গভীর ক্ষত রেখে গিয়েছে। তারা নিস্পৃহ নিরানন্দ হয়ে থাকে, ভয় কাটলেও কোথাও আশার কিছু দেখতে পায় না, দুশ্চিন্তা দূর হলেও সুখচিন্তার কারণ খুঁজে পায় না।

তারপর নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধ-হয়ে-যাওয়া স্টিমারঘাটের স্টেশনমাস্টার খতিব মিঞা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করে।

একদিন খতিব মিঞা খবর পায়, কোম্পানির চাকুরি থেকে তাকে অবসর দিয়ে দেয়া হয়েছে। খবরটা তাকে গভীরভাবে বিচলিত করে। তবে শেষরাতে উঠে হুঁকা ধরিয়ে ভেতরের উঠানে বসে আপন মনে বিষয়টা ভেবে দেখে স্থির করে, সেটি তেমন দুঃখের কথা নয়। অবসরের সময় ঘনিয়ে এসেছিল, কেবল বছরখানেকের মতো বাকি ছিল চাকুরির মেয়াদ, যা কাল হত তা না-হয় আজ হয়েছে। বড় কথা এই যে, কোম্পানি শূন্য-হাতে বিদায় দিচ্ছে তা নয়, নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণ দেবে। বলতে গেলে ব্যাপারটি বেশ লাভজনকই। হাতে কিছু কাঁচা টাকা পাবে; এত টাকা একসঙ্গে জীবনে কখনো সে দেখে নি। তাছাড়া বিনাকাজে পাবে বলে তা মুফতে-পাওয়া টাকার মতোই মনে হবে। এত বছর ধরে যাদের খেদমত করেছে গভীর আনুগত্যের সঙ্গে, যাদের নুনও খেয়েছে, তাদের বিবেচনাজ্ঞান ন্যায়পরতার প্রমাণে খতিব মিঞার চোখ কৃতজ্ঞতায় একটু সজল হয়ে ওঠে।

তবে একটি বিষয় তাকে বড়ই চিন্তিত করে তোলে। এবার কোথায় যাবে, কোথায় তার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবে? সে জানে, তিন ঘাট দূরে তালগাছের পাশে ডোবার ধারে তার দেশের বাড়িতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। সেখানে তার জায়গা কোথায় ? গ্রামবাসী দুটি ভাই-এর ক্রমবর্ধমান পরিবার কোথাও একটু ফাঁক রেখেছে কি? তাছাড়া বহুদিন স্টিমার-কোম্পানির চাকুরির উপলক্ষে বাইরে-বাইরে জীবনযাপন করার ফলে পৈতৃক বাড়ির ওপর একদিন যে স্বত্বাধিকার ছিল তা যেন কী করে হারিয়ে ফেলেছে। তা দাবি করা যায় বটে কিন্তু দাবি করার সাহস হবে না। অবশ্য পৈতৃক ভিটার পাশে কিছু জমি কিনে আস্তানা গাড়ার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু কী কারণে তাও সম্ভব মনে হয় না। আসল কথা, ভাইদের সঙ্গে কি পাশে বাস করতে পারবে না। কথাটি আগে পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখার অবকাশ হয় নি, প্রয়োজনও পড়ে নি, কিন্তু আজ না-ভেবে উপায় নেই। ভাইদের সঙ্গে তেমন আর মিল কোথায়? এতদিন কোম্পানির চাকুরি করার ফলে তাদের রুচি আর এক নয়। তার বড় ছেলেটা বি. এ. ফেল হলেও পাটের কলে চাকুরি নিয়েছে, মেয়েটাও কিছু পড়াশুনা করেছে, ভাইদের ছেলেমেয়েদের মতো অজ্ঞ মূর্খ বা চাষাভুষা থেকে যায় নি। কয়েক বছর আগে বৃদ্ধা গর্ভধারিণীর মৃত্যু ঘটলে তার দাফন-জানাজার জন্যে খতিব মিঞা সেই যে একবার দেশে গিয়েছিল তারপর আবার যাবার সুযোগ হয় নি, প্রবৃত্তিও হয় নি। হয়তো সে-বারই বুঝেছিল সেখানে আর কখনো ফিরে যেতে পারবে না। না, দেশের বাড়ি চিরতরেই ছেড়েছে।

কিন্তু কোথায় যাবে, কোথায়-বা জীবনের শেষ কয়েকটি দিন অতিবাহিত করবে? সে বেশ ভাবিত হয়ে পড়ে, কারণ সপ্তাহখানেকের মধ্যে নদীর তীরে কোম্পানির যে-বাড়িতে গত পাঁচ বছর বসবাস করেছে তা ছেড়ে দেবার পর কোথায় যাবে তা বুঝে উঠতে পারে না। এবার অবসরপ্রাপ্তি ভয়াবহ রূপই ধারণ করে।

যখন খতিব মিঞার মনে হয় যাবার কোনো জায়গা নেই তখনই সহসা সে ভাবে, কোথাও যাবে না, কুমুরডাঙ্গাতেই থেকে যাবে। এ-শহরে তার জন্ম হয় নি, বাড়িঘর নেই, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব বলেও কেউ নেই, তবু একনাগাড়ে পাঁচ-পাঁচটি বছর কাটিয়েছে। এ-শহরে থেকে গেলে ক্ষতি কী?

রাতের গুমোট ভেঙে হঠাৎ ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে শুরু করে, যে-হাওয়া চিন্তায় টান্-হয়ে-থাকা কপালে এসে লাগলে সহসা খতিব মিঞার মনে হয় জ্বর ছেড়েছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আপন মনে বলে, না, কোথাও যাবে না, কুমুরডাঙ্গায় থেকে যাবে, এ-শহরেই কোথাও একটু জমি কিনে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করবে। পূর্বাকাশে যখন প্রত্যুষের ক্ষীণ ধূসর আলো দেখা দেয় তখন খতিব মিঞা মনে-প্রাণে শান্ত বোধ করে, অবসরপ্রাপ্তি আর ভয়াবহ মনে হয় না।

তখন বেশ বেলা হয়েছে। কী খেয়ালে ঈদ-মিলাদের জন্যে শোভনীয় পোশাক পরে, কানের পেছনে একটু আতর লাগিয়ে খতিব মিঞা বেরিয়ে পড়ে কাছারি-আদালত এবং বাজার অভিমুখে, মাথায় ছাতা, পদক্ষেপ ধীরস্থির; অবসরপ্রাপ্ত মানুষের আবার তাড়াহুড়া কিসের? নদীর ধার দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর পথটি নদীর তীর ছেড়ে হঠাৎ সোজা হয়ে পাকা সড়কের রূপ ধারণ করে, নদীর দিকে কয়েকটি বাড়িঘর দেখা দেয়। তবে কাছারি-আদালতের সামনে পৌঁছুলে সে-সব বাড়িঘর আবার অদৃশ্য হয়ে পড়ে; আদিগন্ত দৃষ্টি ছুটে যেতে আর বাধা থাকে না। তবে নদীর পানে সে তাকায় না; বহুদিন নদীর তীরে বসবাস করেছে বলে নদীতে তার কৌতূহল নেই। তাছাড়া নদীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি চিরতরে ছিন্ন হয় নি? নদীর দিকে নয়, এবার যে-কাছারি-আদালত এবং তার সামনে যে-মাঠটি দেখতে পায় সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে সে একটু ইতস্তত করে থেমে পড়ে, যেন এগুতে কেমন ভয় হয়। তবে শীঘ্র আবার হাঁটতে শুরু করে। মাঠে নাবার আগে আরেক দফা থেমে একটি পান-সিগারেটের দোকান থেকে পান কেনে, একটু ভেবে এক বাণ্ডিল বিড়িও খরিদ করে নেয়। এ-সময়ে সে কয়েক জোড়া কৌতূহলী দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে, কিন্তু কেউ কিছু না বললে মাঠে নেবে কাছারি-আদালতের দিকে রওনা হয়। সে জানে, কাছারি-আদালতের সামনে পরিচিত লোকের অভাব হবে না। এ-শহরে পাঁচ বছর কাটিয়েছে, কত লোক তার হাতে টিকিট কিনেছে, কত লোক তারই সঙ্গে স্টিমারের জন্যে অপেক্ষা করেছে। তবে সে যে-কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে কোনো ইচ্ছা বোধ করে তা নয়। তার মনে হয় কুমুরডাঙ্গার যে-কোনো লোক হলেই চলবে, যা তার বলার সাধ জেগেছে তা কোনো বিশেষ কারো জন্যে নয়, সমস্ত শহরের জন্যে; এ-শহরের সকলের মধ্যেই সে কি বাস করবে না ? সে আর কোম্পানির লোক নয়, বিদেশীও নয়, তাদেরই একজন।

বার-লাইব্রেরির নিকটবর্তী হলে খতিব মিঞা বুঝতে পারে তাকে দেখে অদূরে কে যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে দেখে, উকিল আরবাব খান। বয়স বেশি নয়, তবে ইতিমধ্যে আরবাব খান বিচক্ষণ উকিল হিসেবে নাম অর্জন করেছে। কেমন অন্তরবিদ্ধ-করা ধারালো দৃষ্টিতে উকিল তার দিকে তাকিয়ে, স্বাভাবিক নীরস গম্ভীর মুখে একটা বিরূপভাব সুস্পষ্ট। তাকে দেখেই যে উকিলের মুখে বিরূপভাব দেখা দিয়েছে সে-বিষয়ে খতিব মিঞার সন্দেহ থাকে না। স্টিমার-কোম্পানি তাদের প্রতি একটি গুরুতর অবিচার করেছে—এমন একটি ভুল ধারণার জন্যে স্টিমার-কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ওপর শহরবাসীদের মনে যে-রাগ দেখা দিয়েছিল সে-রাগ হয়তো সম্পূর্ণভাবে কাটে নি।

"ছুটি পেলাম।" হেসে তাড়াতাড়ি বলে খতিব মিঞা।

"মানে?"

"আমার অবসর হয়ে গেল। স্টিমারঘাট বন্ধ হল, আমার চাকুরিজীবনও শেষ হল।" এবার উকিল আরবাব খান কিছু না বললে আবার দ্রুতকণ্ঠে বলে, "অবসর হত একদিন, তা হয়েছে। সে-কথা নয়। ঠিক করেছি কুমুরডাঙ্গায়ই থেকে যাব।"

উকিল আরবাব খানের চোখে কী-একটি ছায়া দেখা দেয়। হঠাৎ খতিব মিঞা অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। সে বুঝতে পারে, আজ সকাল থেকে নিজেকে সহসা কুমুরডাঙ্গার অধিবাসী বলে গণ্য করতে শুরু করলেও এ-শহরের অধিবাসীদের চোখে সে বিদেশী মাত্র। এ-শহরে পাঁচ-পাঁচটি বছর কাটালেও এ-শহরে ঠিক বাস করে নি, কারণ ডাঙায় থেকেও সে ঠিক ডাঙায় থাকে নি। তাছাড়া এ-শহরের সমাজে যদি একটি ছোটখাটো স্থান দখল করেছিল, কিছু মানসম্মানের অধিকারী হয়েছিল, সে-সবের সূত্র ছিল স্টিমার-কোম্পানি; সে-সূত্র ছিন্ন হয়েছে। এখন কোম্পানির রক্ষাবর্ম ছাড়া শুধুমাত্র খতিব মিঞা হিসেবে একাকী কুমুরডাঙ্গার অধিবাসীদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের একজন বলে, তারা তাকে গ্রহণ করুক—এই প্রার্থনা নিয়ে। তার সহসা ভয় হয়, তারা কি তাকে আশ্রয় দেবে, তাদেরই

একজন বলে গ্রহণ করবে ?

উত্তেজিত হলে বা মনে কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে খতিব মিঞার জবানে তোতলামির ভাব জাগে। তো-তো করে সে আবার বলে, "বুঝলেন না, এ-শহরে মন পড়ে গিয়েছে। সে-জন্যেই ঠিক করেছি এ-শহরে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।"

উকিল আরবাব খানের মুখভাবে কোনো পরিবর্তন হয় না, তবে ছায়াটি যেন কাটে; হয়তো বিরূপভাবটি ঈষৎ নরম হয়।

কাছারি-আদালতের সামনে কিছু সময় কাটিয়ে খতিব মিঞা আবার বাজারের দিকে রওনা হয়। বাজারের পথে প্রবেশ করার আগে সে-ই থমকে দাঁড়ায়, কারণ সে দেখতে পায় ডাক্তার বোরহানউদ্দিন এগিয়ে আসছে। তাকে দেখে খতিব মিঞার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কারণ সে জানে লোক হিসেবে ডাক্তার বোরহানউদ্দিন বড় ভালো, তার মধ্যে কোনো কুটিলতা নেই, দেমাগ-অহঙ্কার নেই। তার সামনাসামনি হলে খতিব মিঞার মুখ দিয়ে অজস্র শব্দ বেরিয়ে আসে আথালি-বিথালিভাবে। তার অবসরপ্রাপ্তি, ক্ষতিপূরণের বিষয়ে বিবেচনাজ্ঞানশীল স্টিমার-কোম্পানির সিদ্ধান্ত, অবসরজীবন সম্বন্ধে নানা পরিকল্পনা, পাটকলের কর্মচারী-ছেলের ভবিষ্যৎ—কত কথাই-না সে বলে। হয়তো তার এই খেয়াল হয়, কুমুরডাঙ্গা শহরের অন্তরে স্থান পেতে চাইলে সে-শহরের অধিবাসীদের প্রথমে তার অন্তর উন্মুক্ত করে দেখানো দরকার। তবে কুমুরডাঙ্গার বিষয়ে বলতে গিয়ে সে সহসা বেসামাল হয়ে পড়ে।

"প্রথম দিনই শহরটা ভালো লেগেছিল। বুঝলেন না, এ-শহরে বড় মায়া পড়ে গিয়েছে। কী করে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে যাই বলুন?"

অবশেষে ডাক্তার বোরহানউদ্দিনকে রেহাই দিয়ে খতিব মিঞা বাজারের পথে পা বাড়ায়। ততক্ষণে মনে-প্রাণে বেশ উৎফুল্ল বোধ করতে শুরু করেছে, কী-একটা উত্তেজনায় পদক্ষেপ দ্রুত হয়ে উঠেছে। কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময়ে নম্রকণ্ঠের সম্ভাষণে ফিরে তাকিয়ে দেখে অপরিচিত একটি যুবক স্মিতমুখে তার দিকে দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে। যুবকটি তার পরিচয় দিলেও তাকে চিনতে পারে না, কিন্তু উচ্চকণ্ঠে বলে, "কেন চিনব না, খুব চিনি আপনাকে। ধরতে গেলে আমি এ-শহরেরই মানুষ। যা বাকি ছিল তা এবার পূর্ণ হল। বুঝলেন না, এ-শহরেই থাকব ঠিক করেছি। যাবার জায়গার অন্ত নেই, তবে এ-শহরে যেন শিকড় গজিয়ে ফেলেছি।" হঠাৎ থেমে অপ্রত্যাশিতভাবে যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করে, "এদিকে লোকেরা পানের বরজ করে নাকি?"

প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিত হলেও অর্থহীন নয়। বাল্যকাল থেকে পানের বরজের প্রতি খতিব মিঞার একটি দুর্বোধ্য আকর্ষণ। সময়-অসময়ে খবরাখবর নিয়ে কোমলপ্রাণ পানপাতার লালন-পালনের কলাকৌশল সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞান অর্জনও করেছে এই আশায় যে একদিন সুযোগ পেলে বরজ দেবার স্বপ্ন কার্যে রূপান্তরিত করবে। হঠাৎ পুরাতন শখটি জাগে তার মনে। ভাবে, কুমুরডাঙ্গায় কিছু জমি নিয়ে বাড়ি করতে পারলে একটা পানের বরজ দেবে। "বুঝলেন না, এ-জমিতে যা লাগাবেন তাই ফলবে। সোনার জমি আর কি।"

বাজারের পথের দু-পাশে এ-দোকানে সে-দোকানে কিছু কিছু সময় কাটায় খতিব মিঞা, কিন্তু ছলিম মিঞার সাইকেলের দোকানেই আড্ডা জমে যায়; হয়তো দুজনেই অবিলম্বে পরস্পরের গাছ-লতাপাতা করবার শখটি আবিষ্কার করে। তবে শীঘ্র পানের বরজের কথা ভুলে গিয়ে খতিব মিঞা আবার কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে এমন সব কথা বলতে শুরু করে যা আগে কখনো তার মাথায় আসে নি, এবং যা বলতে গিয়ে নিজেই কী-একটা ভাগাবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে।

"বুঝলেন না, সারা জীবন এখানে-সেখানে ঘরছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, এবার এক জায়গায় আরাম করে বসতে পারব। তবে সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, যে-জায়গায়

একবার মানুষের মন পড়ে যায় সে-জায়গায় বাস করার সুযোগ পেলে সে আর কিছু চায় না। কিন্তু যে-সে জায়গায় কি আবার মন পড়ে? জায়গা এমন হওয়া চাই যার মাটি মনে ভয় সৃষ্টি করে না। কুমুরডাঙ্গায় পা দিয়েই বুঝেছিলাম এ-মাটিতে ভয় নেই। মৃত্যুর পর এমন মাটির বুকে আশ্রয় নিতে পারা বড় সৌভাগ্যের কথা।"

ছলিম মিঞার ভ্রূর মধ্যস্থ গভীর রেখাগুলি পূর্ববৎ জেগে থাকলেও তাদের গভীরতা হ্রাস পায় যেন। অল্পক্ষণ নীরবতার পর সে জিজ্ঞাসা করে,

"কোম্পানির বাড়ি ছাড়ার পর কোথায় যাবেন ?"

খতিব মিঞা এ-পর্যন্ত সে-বিষয়ে একবারও ভাবে নি। কিছু অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দেয়, "একটা ছোটখাটো বাড়ি ভাড়া করে নেব। বাড়ি তোলা পর্যন্ত— "

মেঝের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ছলিম মিঞা সহসা মুখ তোলে, যেন কোনো ব্যাপারে সে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"মনের মতো ভাড়াটে বাড়ি যতদিন না পান ততদিন আমার ওখানেই থাকবেন। দুটিমাত্র প্রাণী, ছেলেপুলে নেই। আপনাদের কোনো তকলিফ হবে না।"

অল্প সময়ের জন্যে অবসরপ্রাপ্ত স্টেশনমাষ্টার খতিব মিঞা বাক্যহারা হয়ে পড়ে, তারপর তার চোখের প্রান্তে হয়তো অশ্রুর আভাস দেখা দেয় বলে সেখানে ঈষৎ উজ্জ্বল কিছু নজরে পড়ে। পরে একটু ভাঙ্গা গলায় উত্তর দেয়, "তা আপনার ওখানেই থাকব।" এবার তার চোখের পানি পরিষ্কারভাবে দেখা যায়।

শুধু খতিব মিঞার নয়, শহরের অনেক লোকের চোখ সেদিন অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, কারণ খতিব মিঞা কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে তার মাটি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলে বেড়ায় তা অবিলম্বে সকলের কর্ণগোচর হয়; কুমুরডাঙ্গা সম্বন্ধে এমন সব কথা কেউ কখনো বলে নি। সহসা সেদিন থেকে সকলের মধ্যে নূতনভাবে জীবনসঞ্চার হয়, নৈরাশ্য নিরানন্দভাব দূর হয়।

দূরে রাতের অন্ধকারে সহসা ঘাটের আলো জেগে ওঠে : অনেক নদনদী অতিক্রম করে এ-ঘাট সে-ঘাটে থেমে যে-স্টিমারটি সেই সকাল থেকে চলছে তার চলা শেষ হতে আর দেরি নেই। ঘাটে আলো দেখে যাত্রীরা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে, যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে অকস্মাৎ আলোকরশ্মি এসে পড়লে দরজা খুলে গিয়েছে বুঝে কয়েদিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নিমেষের মধ্যে তাদের কণ্ঠস্বরে স্টিমারের এ-মাথা থেকে ও-মাথা মুখরিত হয়ে পড়ে, ব্যস্তসমস্ত হয়ে তারা স্থলে অবতরণ করার জন্যে তৈরি হয়। এবার তবারক ভুইঞা থামে, তারপর তার সামান্য তল্পিতল্পা গুছিয়ে নেবার জন্যে উদ্যত হয়।

আমি একটু নিরাশ হয়ে ভাবি : তবে মুহাম্মদ মুস্তফার নামটি একবারও উল্লেখ না করে তবারক ভুইঞা চলে যাবে। তার সঙ্গে হয়তো আবার কখনো দেখা হবে না; যে-ঘাটে আমরা দুজনেই নাবব সে-ঘাটে শুধুমাত্র একটি দিন কাটিয়ে পরদিনই আমার ফিরে যাবার কথা।

মুহাম্মদ মুস্তফার বিষয়ে তার এই মৌনতার কারণ কী? কুমুরডাঙ্গা নামক শহরের যে-বিচিত্র কাহিনী সে আমাদের বলে শুনিয়েছে তার সঙ্গে হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফার কোনো যোগযোগ ছিল না, তবু কোনোপ্রকারে তার নামটি কি একবার মুখে নিতে পারত না? সে কি তার কথা ভুলে গিয়েছে, না কোনো কারণে অসংখ্য লোকের নাম-ধাম-বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ স্মৃতিপটেও তাকে স্থান দেয় নি? ইচ্ছা হয় সরাসরি জিজ্ঞাসা করি মুহাম্মদ মুস্তফার কথা তার মনে পড়ে কিনা, পড়লে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে যাবার পর তার কী হয়েছিল, সে কী করেছিল—তা জানে কিনা। তবে জিজ্ঞাসা করা হয় না, কারণ মনে হয় মুহাম্মদ মুস্তফার বিষয়ে তার মৌনতা অনিচ্ছাকৃত নয়। সে সব জানে এবং সব জানে বলেই, তার নাম নিতে পারে নি। হয়তো তার কথা সে ভালোভাবে বোঝেও না; মানুষ যা বোঝে না সে-বিষয়ে সে কিছু বলতে চায় না। হয়তো কে জানে, যা ঘটেছিল তার জন্যে সে নিজেকে কোনো প্রকারে দায়ী মনে করে।

মুহাম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গা থেকে ঢাকা যায় নি, তার সুহৃদ বন্ধু তসলিম বা আশরাফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে নি, সোজা দেশের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল—চোখে ঘুমাভাবের রুক্ষতা, মুখে কী-একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। বেশভূষায় নূতন হাকিমের কোনো চিহ্ন ছিল না : মাথার চুল উস্কখুস্ক, পরনের লুঙ্গির প্রান্তভাগ কর্দমাক্ত, ছাত্রবয়সে কখনো-কখনো যেমন হাতে জুতা নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হত তেমনি হাতে একজোড়া নূতন জুতা। চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে। মা-জান পরে বলেছিল, সে যখন সন্ধ্যার কিছু আগে নিঃশব্দে উঠানের প্রান্তে দেখা দেয় তখন কী কারণে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল। তবে আমার বা বাড়ির অন্য কারো সাহসে কুলায় নি জিজ্ঞাসা করি তার কী হয়েছে, কেন এমন চেহারা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে। তার মা আমেনা খাতুন সে-রাতেই তার জন্যে ভাপা পিঠা বানাতে বসে। তবে হাতে কেমন জড়তা বোধ করেছিল বলে সেবার তা তেমন মুখরোচক হয় নি।

আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি। জানতাম, মুহাম্মদ মুস্তফা নিজে থেকে না বললে তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারা সহজ নয়। এ-ও জানতাম, বলবার কিছু থাকলে বা বলবার ইচ্ছা হলে এক সময়ে আমাকেই বলবে।

হয়তো দ্বিতীয় দিন সে বলে। বলে ধীরে-ধীরে, একটু-একটু করে, এমনভাবে যেন অন্য কোনো মানুষের কথা বলছে, বা যা-বলছে তা নিজের কাছেই অসম্ভব মনে হয়। সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল তা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারে নি। প্রথমে আমাকে আন্দাজ-অনুমান করতে হয়, পরে খণ্ড-খণ্ড কথা একত্র করে অত্যাশ্চর্য কথাটি বুঝতে সক্ষম হই। তবে তা সত্য মনে হয় নি, নিদারুণ ভীতির জন্যে কাজটি করতে পারে নি তাও বিশ্বাস করি নি; মূল কথায় বিশ্বাস না হলে আনুষঙ্গিক কথায় কি বিশ্বাস হয়? হয়তো-বা আমার মনে হয়, সে যদি আত্মহত্যার চেষ্টা করেও থাকে তাহলেও গোড়া থেকেই জানত শেষপর্যন্ত তাতে সফল হবে না কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল যে-কাল্পনিক প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মা তাকে ভীতিবিহ্বল করে তুলেছিল তাকেই ফাঁকি দেয়া : ফাঁকি দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয় জেনেও কোনোপ্রকারে ফাঁকি দিতে সক্ষম হবে—এমন একটা আশা মানুষ কখনো ছাড়তে পারে না।

তবে একটি কথায় বড়ই বিস্মিত হই। সেটি এই যে, খোদেজা তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—বাড়ির লোকেদের এই ভিত্তিহীন অমূলক ধারণাটি কী করে মুহাম্মদ মুস্তফা বিশ্বাস করে নিয়েছে। কিন্তু কেন বিস্মিত হয়েছিলাম? সে কি সব কথাই নির্বিবাদে মেনে নেয় না? সে যে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছিল, তাই কি অস্বাভাবিক নয়? কে জানে, খোদেজা তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে—এমন কথা সে বিশ্বাস করে তা আমার পছন্দ হয় নি।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম, অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম, তবে প্রথমে মুহাম্মদ মুস্তফার মনের অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারি নি : কারো চিন্তাধারা কোনো বিশেষ সীমানা অতিক্রম করে গেলে সে কীভাবে কেন ভাবে—এ-সব বোঝা দুষ্কর। আমি অনেক কথাই বুঝতে পারি নি। এ-কথাও বুঝতে পারি নি যে আমিই তাকে রক্ষা করতে পারব—এই বিশ্বাসে মরিয়া হয়ে সে আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে।

আমার অবিশ্বাস্য মনে হলেও সে সত্যিই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল। এমন একটি নিদারুণ কাজ করতে বসেছিল তা নিজেই উপলব্ধি করলে সে ভয়ানকভাবে বিচলিত হয়ে পড়ে, এ-ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে তার মধ্যে সাংঘাতিক কিছু না-ঘটলে এমন একটি কাজ করার কথা ভাবতেও পারত না। কিন্তু তার মানসিক বিভ্রান্তি যদি ঘটে থাকে তার কারণ কী ? সে কেবল একটি উত্তরই খুঁজে পায়। তার মনে হয় যে-মেয়েটি আত্মহত্যা করে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে, তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে শুরু করছে, সে-ই দায়ী তার বিভ্রান্তির জন্যে, সে-ই তাকে মৃত্যুর দ্বারে নিয়ে গিয়েছিল; তার কার্যকলাপ

আর তার ক্ষমতার অধীন নয়, মেয়েটির আত্মা তার মন দখল করে তার ইচ্ছাশক্তি কাবু করে ফেলেছে, তাকে পরিচালিত করেছে নির্দয় ধ্বংসকারিণীর রূপ নিয়ে। চমকিত হয়ে সে এবার অনেক কিছুর মধ্যে গূঢ় অর্থ দেখতে পায়। যে-দিন বিয়ে করার উদ্দেশ্যে কুমুরডাঙ্গা থেকে স্টিমারযোগে ঢাকা অভিমুখে রওনা হবে সে-দিনই কেন স্টিমার-চলাচল বন্ধ হবে, পরদিন কি বন্ধ হতে পারত না? তারপর সহসা তার জ্বরে পড়া, আরোগ্যলাভ করেও ঢাকা যাওয়ার বিষয়ে গড়িমসি বা হচ্ছে-হবে ভাব, পরে তসলিমের চিঠি বা তারের জবাব না দেয়া। এ-সবের পশ্চাতে সেই প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মার ইচ্ছাই নিহিত : তার মনে হয় এ-সবের অন্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। যে-মেয়ে মৃত্যুর পর অবিমিশ্র জিঘাংসায় পরিণত হয়েছে, তার ক্ষমতা দেখে মুহাম্মদ মুস্তফা এবার অতিশয় ভীত হয়ে পড়ে। হয়তো এ-সময়ে সে কিছু সম্বিৎ ফিরে পায়, একটু সুস্থিরভাবে ভাবতে সক্ষম হয়। সে বুঝতে পারে তাকে কিছু করতেই হবে, যে করে হোক নিজেকে বাঁচাতে হবে। সহসা তার মনে হয়, আমার সঙ্গে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। আমি কী ভাবি? আমিও কি বিশ্বাস করি খোদেজা আত্মহত্যা করেছিল? আমাকে কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করে নি, জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনও বোধ করে নি। হয়তো আমি জানি তা সত্য নয়। এবং আমি যদি বলি তা সত্য নয়, বাড়ির লোকেদের ধারণাটির পশ্চাতে উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নেই, তবেই খোদেজার নামে কী-একটা দুরাত্মা যে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে, তাকে কী-একটা অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—তার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্যেই সে এমনভাবে কুমুরডাঙ্গা ছেড়ে বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল।

তবে আমার যেন কী হয়েছিল, সত্য উত্তর মুখে এসেও মুখেই থেমে গিয়েছিল। কেবল বলেছিলাম,

"কী করে বলি? আমি তখন বাড়ি ছিলাম না।"

এমনভাবেই উত্তরটি দিয়েছিলাম যেন খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তা আমি নিশ্চিতভাবে জানি, কিন্তু তা মুখ ফুটে বলা সম্ভব নয়।

কেন সত্য কথাটি বলি নি, যা একেবারে ভিত্তিহীন বলে জানতাম তা ভিত্তিহীন বলে দ্বিধাশূন্য কণ্ঠে ঘোষণা করি নি কেন? আমার মনেও কি অবশেষে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল? না, সন্দেহ নয়, মনে সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার প্রতি ভয়ানক ক্রোধ বোধ করেছিলাম; তার প্রতি কখনো এমন ক্রোধ বোধ করি নি। ক্রোধ বোধ করেছিলাম এই দেখে যে খোদেজা আত্মহত্যা করেছে তেমন একটা বিশ্বাস হলেও মুহাম্মদ মুস্তফার মনে একটু অনুতাপ নয়, মৃত মেয়েটির প্রতি ঈষৎ স্নেহমমতা নয়, সামান্য বিয়োগশোক নয়, নিদারুণ ভীতিই দেখা দিয়েছে। হয়তো তাও সহ্য হত যদি সরলা নিষ্পাপ খোদেজা তার চোখে একটি প্রতিহিংসাপরায়ণ দুষ্ট আত্মায় পরিণত না হত। তা কিছুতেই সহ্য হয় নি। বোধ হয় সে-জন্যেই সত্য কথা বলা সম্ভব হয় নি।

তবু বলতাম যদি জানতাম সত্য কথা না বললে কী পরিণতি হবে, যদি বুঝতাম ইতিমধ্যে মুহাম্মদ মুস্তফা একটি অতল গহ্বরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে : যারা তেমন একটি গহ্বর থেকে বহুদূরে তারা তার অস্তিত্বের কথা ভাবতেও পারে না।

পরদিন তখনো সূর্য ওঠে নি, এমন সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফার মা আমেনা খাতুনের মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনতে পাই। তেমন একটি আর্তনাদ শুনেছিলাম বেশ কয়েক বছর আগে, চাঁদরবণঘাটে : সেদিনও আমেনা খাতুনই আর্তনাদ করে উঠেছিল। আর্তনাদ শোনামাত্র বুঝতে পারি। তবে তখন আর করার কিছু ছিল না; কেউ আর কিছু করতে পারত না।

যখন বাড়ির পশ্চাতে উপস্থিত হই তখন দেখতে পাই, যে-তেঁতুলগাছের তলে বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিল সে-গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ

দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে-চোখ শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মতো ক্ষুদ্র পুকুরে কী-যেন সন্ধান করছে।

সহসা সচকিত হয়ে দেখি তবারক ভুইঞা উঠে পড়েছে। উঠে পড়েও কয়েক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে থাকে, মুখে অন্যমনস্ক ভাব, চোখের কোণে ক্ষীণ হাসিটি আর নেই। তারপর গা-মোড়া দিয়ে আলস্য ভেঙে সে বলে,

"নদী কি তার নিজের দুঃখে কেঁদেছিল ? নদী কেঁদেছিল তাদের দুঃখেই।"

যাত্রীদের অনেকে নিচের পথ ধরেছে। আমিও তাদের দলে ভিড়ে পড়ি।

পরে স্টিমার ঘাটে ভিড়বার জন্যে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে অপেক্ষা করছি তখন তবারক ভুইঞার শেষোক্তিটি সহসা মনে পড়ে। কিছুক্ষণ আগে ওপরে সে বলেছিল, নদী যদি কেঁদে থাকে তবে নিজের দুঃখে নয়, কুমুরডাঙ্গার অসহায় অধিবাসীদের দুঃখেই কেঁদেছিল। হয়তো সবই সে জানে, হয়তো কথাটি বলবার সময়ে মুহাম্মদ মুস্তফার কথাই সে ভেবেছিল।

স্টিমার ধীরে-ধীরে ঘাটের পাশাপাশি হয়, তার চতুষ্পার্শ্বে উচ্ছৃঙ্খল পানি শতশত হিংস্র সরীসৃপের মতো গর্জন করে। তবে সহসা আমার মনে হয় নদী যেন নিষ্ফল ক্রোধেই কাঁদছে। হয়তো নদী সর্বদা কাঁদে, বিভিন্ন কণ্ঠে, বিভিন্ন সুরে, কাঁদে সকলের জন্যেই। মনে মনে বলি : কাঁদো নদী, কাঁদো।

পরিশিষ্ট : এক

হায়াৎ মামুদ

গ্রন্থপরিচয়

১৯৪৮

লালসালু

'লালসালু' উপন্যাস সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সবচেয়ে বিখ্যাত ও সর্বাধিক পঠিত বই। এর একটি কিশোরসেব্য হ্রস্বীকৃত রূপও প্রকাশিত হয়েছিল কলেজপাঠক্রমে খাপ খাওয়াবার জন্য, জনপ্রিয়তার এও এক মাপকাঠি।

সাতচল্লিশে দেশবিভাগের পর তিনি চাকরি নিয়ে স্থায়ীভাবে পূর্ববঙ্গে চলে এসে ঢাকায় থাকতে শুরু করেন। এই উপন্যাস রচনার আরম্ভ, শেষ ও প্রকাশ সবই ঢাকায়। প্রথম প্রকাশ করেন 'কমরেড পাবলিশার্স', ১৯৪৮ সালে। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছিলেন শিল্পাচার্য—তখন সমবয়সী তরুণ শিল্পী—জয়নুল আবেদীন। দ্বিতীয় মুদ্রণ ছাপেন 'কথাবিতান' বারো বছর পরে, এপ্রিল ১৯৬০ সালে এবং ক্রমান্বয়ে ১৯৬৩, ১৯৬৫ ও ১৯৬৭ পর্যন্ত তাঁরা মুদ্রণ অব্যাহত রাখেন। এর পরে নওরোজ কিতাবিস্তান এখন পর্যন্ত বইটি ছেপে আসছেন।

দ্বিতীয় মুদ্রণের সময়ে 'কথাবিতান' গ্রন্থারম্ভে প্রকাশকের তরফ থেকে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, এখানে তা পরিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা যা লিখেছিলেন এখানে তা, মুদ্রণপ্রমাদসহ, লিপিবদ্ধ হল :

> 'লাল সালু' আজো পর্যন্ত পূর্ববাংলার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে সুধীমহলে স্বীকৃত। তেমনি কথাশিল্পি হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বেও প্রায় কেউই দ্বিমত পোষণ করেন না।
>
> অল্পপরিসর পটভূমিকায় উপন্যাসের মৌলিক চরিত্র ধর্মরক্ষা এক কঠিন কাজ। সেই কঠিন কাজে লাল সালুর লেখক সফল হয়েছেন, একথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা চলে।
>
> মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা নানা পথে নানা মাধ্যমে উত্তর খুঁজতে থাকে। জীবন নিঃশেষ হতে থাকে জীবনের ঘাটে ঘাটে; কিন্তু জিজ্ঞাসার উত্তর তবু পাওয়া যায় না। প্রশ্ন থেকে প্রশ্নান্তরে যে ব্যাকুল হৃদয় আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান চায় সে হৃদয়ের সান্ত্বনা মেলেনা শেষ পর্যন্ত কোথাও।
>
> লাল সালুর রক্তরঙিন আবরণে ঢাকা থাকে বহু বেদনা বহু বঞ্চনার কাহিনী—লেখা থাকে বহু ব্যর্থ কামনার ইতিহাস। সেই ইতিহাসের নগ্ন বিধৃতি সমগ্র লাল সালুতে।
>
> অন্ধকার ঝোড়ো রাত্রির প্রান্তিক নির্জনতায় এক রহস্যময় গোরস্তানে মুক্তবক্ষ জমিলার ঋজু-নগ্ন পায়ের ইঙ্গিত মজিদের সমগ্র জীবনের ব্যর্থতাকে সাহঙ্কারে চিহ্নিত করে রাখলো। সেই চিহ্নিত ব্যর্থতার করুণ ইতিহাস লাল সালু।
>
> লাল সালুর প্রথম সংস্করণের প্রকাশক নানা কারণে বইটিকে তেমন শোভন করে তুলতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও বইটি পাঠকমহলে আশাতীত আলোড়ন তুলতে

সক্ষম হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্যে আমরা তাই সাগ্রহে লেখকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হই।

লেখক বর্তমানে সুদূর জার্মানীতে আছেন। আমরা নিজেদের দায়িত্বে বইটিকে শোভন ও সুন্দর করে প্রকাশের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। লেখককে এবং পাঠকমহলকে যদি এ বই খুশি করতে পারে তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম সার্থক বলে গণ্য হবে।

এই ভূমিকা থেকে দুটি তথ্য আমরা জানতে পারি : প্রথমত, প্রথম সংস্করণ যথাযোগ্য শোভন করে ছাপানো সম্ভব হয় নি; দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয় মুদ্রণের সময়ে লেখক দেশের বাইরে ছিলেন, অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি—প্রুফ সংশোধন বা মুদ্রণ সংক্রান্ত কোনো কিছুই তদারকি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিষয়টি সবিস্তারে বলার কারণ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রায় সমস্ত বই তাঁর প্রবাসজীবনে ছাপা হয়েছে এবং বিভিন্ন মুদ্রণে বা একই মুদ্রণে বানানের অসমতা ও বৈচিত্র্য, শব্দের বা শব্দবন্ধের পরিবর্তন কিংবা স্থানচ্যুতি ইত্যাদি আমরা দেখতে পাই। কিন্তু বিভিন্ন মুদ্রণ পরীক্ষা করেও আমরা লেখকের অভিপ্রায় বা বানান সম্পর্কিত প্রবণতা বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা নিতে পারি না। মুদ্রণপ্রমাদ তো প্রতিটি মুদ্রণেই যথেষ্ট। তার পরেও, আমরা 'লালসালু'র ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ মুদ্রণের পাঠ মিলিয়ে বর্তমান গ্রন্থের পাঠ নির্ধারণ করেছি।

১৯৬৩-সালের মুদ্রণেও প্রকাশকের বক্তব্য মুদ্রিত ছিল; তা পূর্ববর্তী মুদ্রণের (১৯৬০) অনুরূপ, কেবল সর্বশেষ অনুচ্ছেদ ব্যতিরেকে। সে অনুচ্ছেদটি এই : "আশাতীত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আজ তৃতীয় মুদ্রণের অবকাশে আমরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি।" ১৯৬৫ সালের এপ্রিলে চতুর্থ মুদ্রণের সময়ে প্রকাশক একটি দীর্ঘ বক্তব্য পাঠকবৃন্দের সামনে হাজির করেন, তার সবটুকু অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (জানুয়ারি ১৯৮৬) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলীর ১ম খণ্ডের ৩৬১-৬২ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কথাবিতানের পরবর্তী মুদ্রণগুলোতেও এই বক্তব্য ছাপা হয়েছিল।

ওয়ালীউল্লাহ্-গবেষক সৈয়দ আবদুল মকসুদ 'লালসালু'র পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখেছেন, পাণ্ডুলিপির মূল পাঠ ও প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান : নির্মম সংক্ষেপণ ও পরিমার্জনার পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর প্রথম উপন্যাসকে পাঠক-সম্মুখে হাজির করেছিলেন। ছাব্বিশ বৎসরের যুবক ও প্রতিষ্ঠা-উন্মুখ বাঙালি লেখকের পক্ষে এহেন কাণ্ডজ্ঞান দুর্লভ, এবং তা তাঁর পরিণত মেধা ও উন্নত শিল্পবুদ্ধির প্রমাণ দেয়।

১৯৬৪

চাঁদের অমাবস্যা

ষোলো বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস। ১৯৬৪ সালে 'নওরোজ কিতাবিস্তান' প্রকাশনালয় ছেপেছিলেন। প্রকাশক শিশুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলী তাঁর পুরোনো বন্ধু ছিলেন। গ্রন্থের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন লেখক স্বয়ং। গ্রন্থারম্ভের পূর্বেই, সাধারণত যে-পৃষ্ঠায় উৎসর্গ লেখা থাকে, এই বাক্যদ্বয় মুদ্রিত হয়েছিল :

> 'এই উপন্যাসটির বেশির ভাগ ফ্রান্সের আলপ্‌স্ পর্বত অঞ্চলে পাইন-ফার-এলম গাছ পরিবেষ্টিত ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে লেখা হয়। মঁসিয় পিয়ের তিবো এবং মাদম ঈতন তিবোকে তাঁদের সহৃদয় আতিথ্যের জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।'

পরবর্তী কালে এই উপন্যাসের একাধিক বার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। আমরা বর্তমান গ্রন্থে 'চাঁদের অমাবস্যা'র প্রথম সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করেছি; মুদ্রণপ্রমাদ ও অসতর্কতাজনিত ত্রুটি সংশোধন করে নিয়ে এখানে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৬৮

কাঁদো নদী কাঁদো

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র তৃতীয় ও সর্বশেষ উপন্যাস। মে ১৯৬৮–তে 'নওরোজ কিতাবিস্তান' প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় মুদ্রণ বেরয় ১৯৭২–এর সেপ্টেম্বরে; তার বৎসরখানেক পূর্বেই ঔপন্যাসিক প্রয়াত হয়েছেন তাঁর পারী–র বাসভবনে। তাতে 'প্রকাশকের নিবেদন' হিসাবে নাতিদীর্ঘ একটি রচনা সন্নিবেশিত হয়েছিল; সে–লেখাটিতে স্মৃতিতর্পণের সঙ্গে লেখকের শিল্পীচারিত্র্য বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য কিছু পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ আছে। সমগ্র রচনাটি অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর সম্পাদিত প্রথম খণ্ডের 'গ্রন্থপ্রসঙ্গ' অংশে উদ্ধৃত করেছেন।

বর্তমান 'উপন্যাসসমগ্র'–তে আমরা 'কাঁদো নদী কাঁদো'–র প্রথম সংস্করণের পাঠ মান্য করেছি; মুদ্রিত হয়েছে অবশ্য মুদ্রণবিভ্রাট সংশোধন করে নিয়ে।

পরিশিষ্ট : দুই

হায়াৎ মামুদ

জীবনপঞ্জি

জন্ম চট্টগ্রামের ষোলশহরে, ১৯২২ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে। পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান তিনি। বাবা সৈয়দ আহমদউল্লাহ্ ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। মা নাসিম আরা খাতুনও একই ধরনের উচ্চশিক্ষিত ও রুচিশীল পরিবার থেকে এসেছিলেন, সম্ভবত অধিক বনেদি বংশের মেয়ে ছিলেন তিনি। ওয়ালীউল্লাহ্‌র আট বছর বয়সের সময় তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। দু' বৎসর পর তাঁর বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের করটিয়ায়। বিমাতা এবং বৈমাত্রেয় দু-ভাই ও তিন-বোন সকলের সঙ্গেই ওয়ালীউল্লাহ্‌র সম্পর্কের কখনো অবনতি হয় নি। তাঁর তেইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলকাতায় চিকিৎসা করতে গিয়ে বাবা মারা গেলেন।

শিক্ষা তাঁর পিতৃ-মাতৃবংশের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম ডিগ্রিধারী ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্। বাবা এম. এ. পাস করে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরিতে ঢুকে যান; মাতামহ ছিলেন কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স থেকে পাস করা আইনের স্নাতক; বড় মামা এম. এ. বি. এল পাস করে কর্মজীবনে কৃতী হয়ে 'খানবাহাদুর' উপাধি পেয়েছিলেন এবং এঁর স্ত্রী—ওয়ালীউল্লাহ্‌র বড় মামী ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ পরিবারের মেয়ে, উর্দু ভাষার লেখিকা ও রবীন্দ্রনাথের গল্প-নাটকের উর্দু-অনুবাদক।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের এই সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনন ও রুচিতে প্রভাব ফেলেছিল। তাঁর আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি ছিল ডিস্টিঙ্কশনসহ বি. এ., এবং অর্থনীতি নিয়ে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও শেষে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই বাহ্য তথ্যের সাহায্যে তাঁর মেধাশক্তি, মনের গড়ন ও রুচির শীর্ষচুম্বী মান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে যদি-না তাঁর মানুষ-হয়ে-ওঠার পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রাখি।

সরকারি চাকরির কারণে পিতার কর্মস্থল পরিবর্তনশীল হওয়ায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র শিক্ষাজীবন পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের স্কুল-কলেজে কেটেছিল। এ জাতীয় উল্লম্ফনবৃত্তির জীবনের একটি বড় অসুবিধে হল, জীবন কোনোখানে থিতু হয়ে বসবার অবকাশ পায় না এবং স্মৃতির পসরা কোথাও ভারি হয়ে জমে ওঠে না। এক্ষেত্রে বাড়তি প্রতিবন্ধক ছিল আমলা পিতার প্রাশাসনিক চাকরি; সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ সেখানে কম, 'সাধারণ' ও 'অসাধারণে'র মধ্যিখানে ভয়-সম্মান-

অবিশ্বাস-সন্দেহ এমন ব্যবধানের প্রাচীর তুলে রাখে যা ডিঙিয়ে যাওয়া দু' পক্ষেরই অসাধ্য।

ওয়ালীউল্লাহ্‌র চরিত্রের ধাঁচ নির্মাণ করেছিল ঘর ও বাহিরের এই নৈঃসঙ্গ্য। এর ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্তর্চারী ও বহির্বিমুখ, লাজুক ও সঙ্কোচপ্রবণ, এবং বন্ধুনির্বাচনে অনুদার কিন্তু মেধাবী। লক্ষণীয় যে, তাঁর বন্ধুবৃত্ত বিশাল ছিল না, কিন্তু যাঁদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নি। অন্য দিকে তাঁর অধিকাংশ সুহৃদই পরবর্তী কালে তাঁদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এত খ্যাতিমান হয়েছেন যে তা ওয়ালীউল্লাহ্‌র অন্তর্গত প্রবণতা প্রমাণ করে। তাঁর মনের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বৈদগ্ধ্য ও নান্দনিকতার দিকে, এবং এই কাঠামোটি তৈরি হয়ে উঠেছিল তাঁর খানবাহাদুর মাতুলের পারিবারিক সান্নিধ্যে ও প্রভাবে।

কর্মজীবন

পঠদ্দশাতেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কর্মজীবন শুরু হয়। বাধ্য হয়ে নয়, স্ব-ইচ্ছায়। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ নসরুল্লাহ এম. এ. ও বি. এল পাস করেছিলেন। তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল এম. এ. পড়াটা, ভর্তি যখন হয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু ১৯৪৫ সালে তিনি ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় চাকরি নেন। এ বৎসর তাঁর পিতাও প্রয়াত হন (২৬শে জুন)। তার তিন মাস আগে, মার্চ মাসে, তাঁর প্রথম বই 'নয়নচারা' গল্পগ্রন্থ বেরিয়ে গিয়েছিল। নিয়মিত লেখালেখি শুরু করেছিলেন ১৯৪১/৪২ নাগাদ। এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে তিনি ভবিষ্যৎ-জীবন হিসেবে লেখকবৃত্তি বেছে নেওয়ার কথা হয়তো-বা ভাবছিলেন। পঁয়তাল্লিশে যখন প্রথম বই বেরয় সে-সমকালে কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে; সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ একাধারে পণ্ডিত ও সৃজনশীল ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শে আসছেন ক্রমান্বয়ে। পড়াশোনা ছেড়ে চাকরি নেওয়ার পিছনে এসব ঘটনাও কার্যকর ছিল হয়তো-বা।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগ হওয়ার পরপরই 'স্টেট্‌সম্যান'-এর চাকরি ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন সেপ্টেম্বরে নতুন চাকরি নিয়ে : রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা-সম্পাদক। কাজের ভার কম ছিল। 'লালসালু' উপন্যাস রচনায় হাত দিলেন নিমতলির বাসায়। পরের বছরই এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশ করল কমরেড পাবলিশার্স। ঢাকা থেকেই বেরুল। তবে, প্রকাশনসংস্থাটি এক অর্থে তাঁদের নিজেদেরই ছিল; কারণ এর স্বত্বাধিকারী ছিলেন তাঁর বড় মামা খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলাম, উপরন্তু তিনি নিজে কিছুকাল এর কর্মাধ্যক্ষও ছিলেন।

করাচি কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক হয়ে ঢাকা ছাড়েন ১৯৪৮ সালে। সেখান থেকে নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসে তৃতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আতাশে হয়ে যান ১৯৫১-তে। অতঃপর একই পদে অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে বদলি ১৯৫২-র শেষ দিকে, ১৯৫৪-য় ঢাকায় ফিরে এলেন তথ্য-অফিসার হিসেবে ঢাকাস্থ আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে। '৫৫-তে পুনরায় বদলি করাচিতে, তথ্য মন্ত্রণালয়ে। এরপর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার

তথ্যপরিচালকের পদাভিষিক্ত হয়ে, ১৯৫৬-র জানুয়ারিতে; দেড় বছর পর এই পদটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে জাকার্তার পাকিস্তানি দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আতাশে হয়ে রয়ে গেলেন ১৯৫৮-র ডিসেম্বর অবধি। এরপর ক্রমান্বয়ে করাচি-লণ্ডন-বন, বিভিন্ন পদে ও বিভিন্ন মেয়াদে। ১৯৬১-র এপ্রিলে ফার্স্ট সেক্রেটারির পদমর্যাদায় প্রেস-আতাশে হিসেবে যোগ দিলেন পারী-র পাকিস্তানি দূতাবাসে। একনাগাড়ে ছ' বছর ছিলেন তিনি এ-শহরে। এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'লালসালু'র ফরাসি অনুবাদ 'লার্‌ব্র্‌ সাঁ রাসিন্‌' (L' arbre sans racines), অর্থাৎ শিকড়হীন গাছ। দূতাবাসের চাকরি থেকে চুক্তিভিত্তিক পদ 'প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট' হিসেবে যোগ দেন ইউনেস্কোতে, ১৯৬৭-র ৮ই আগস্ট; চাকরিস্থল পারী শহরেই। এ বছরই লণ্ডনের শ্যাটো এ্যাণ্ড উইণ্ডাস প্রকাশনালয় 'লালসালু'র ইংরেজি ভাষান্তর বের করে Tree Without Roots নাম দিয়ে, ঔপন্যাসিকের নিজেরই করা অনুবাদ।

১৯৭০-এর ৩১শে ডিসেম্বর ইউনেস্কোয় তাঁর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার ইসলামাবাদে বদলি হওয়ার প্রস্তাব দেয়, কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন নি। পারীতেই থেকে গেলেন।

এর মধ্যে তাঁর স্বদেশে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতগত অবস্থান পাল্টাতে থাকে। উনসত্তরের পর থেকে দুই পাকিস্তানের মধ্যে প্রতারণা ও অবিশ্বাস-সঞ্জাত দ্বন্দ্ব স্পষ্টতই রাজনৈতিক সংকট ও সংঘাতের দিকে এগোতে থাকে। ১৯৭১-এ যে ওয়ালীউল্লাহ্‌ ইসলামাবাদে ফেরেন নি, তার মাসুল তাঁকে দিতে হয়েছিল : বাইশ বছরের সরকারি চাকরির শেষে প্রাপ্য কোনো সুবিধা তিনি পান নি। শেষ জীবন বড় আর্থিক দুশ্চিন্তা ও কষ্টে কেটেছিল।

বিবাহ

তাঁর স্ত্রী ফরাসিনী। নাম : আন্‌-মারি লুই রোজিতা মার্সেল্‌ তিবো। তাঁদের আলাপ হয়েছিল সিড্‌নিতে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ যেমন পাকিস্তানি দূতাবাসে, আন্‌-মারি তেমনি কর্মরতা ছিলেন ফরাসি দূতাবাসে। দেড়-দু' বছরের সখ্য ও ঘনিষ্ঠতা রূপান্তরিত হয় পরিণয়বন্ধনে। ওয়ালীউল্লাহ্‌ তখন করাচিতে। সেখানেই ১৯৫৫ সালের ৩রা অক্টোবর তাঁদের বিয়ে হয়। ধর্মান্তরিতা বিদেশিনীর নাম হয় আজিজা মোসাম্মত নাসরিন। নবলব্ধ নামকে বিয়ের কাবিননামাতেই নির্বাসন দিয়েছিলেন দু'-জনে। অনুমান করা চলে সর্বতোভাবে আধুনিক দুই মানুষের প্রাচীন ও অসংস্কৃত একটি প্রথার কাছে নতিস্বীকারে আনন্দ ছিল না; প্রেমের মূল্য ধর্মান্তরীকরণে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা।

তাঁদের দু' সন্তান : প্রথমে কন্যা সিমিন ওয়ালীউল্লাহ্‌, তার পরে পুত্র ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ্‌।

সম্মাননা

পি. ই. এন. পুরস্কার পান 'বহিপীর' নাটকের জন্য। তখন তিনি করাচিতে, ১৯৫৫ সালে। নাটকটি গ্রন্থাকারে বের হয়েছিল পাঁচ বছর পরে। ঘটনাটি এরকম : ঢাকায় P.E.N. Club-এর উদ্যোগে পঞ্চান্ন সালে এক আন্তর্জাতিক লেখকসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বাংলা নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে 'বহিপীর' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কৃত হয়।

১৯৬১ সালে উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১৯৬৫-তে আদমজী পুরস্কার লাভ করেন 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের জন্য।

জীবনাবসান

অত্যন্ত অকালে প্রয়াত হন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। মাত্র উনপঞ্চাশ বৎসর বয়সে, ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর গভীর রাত্রে অধ্যয়নরত অবস্থায় মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে। পারী-র উপকণ্ঠে তাঁরা একটি ফ্ল্যাট কিনেছিলেন, সেখানেই ঘটনাটি ঘটে। ওখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি রাজনীতিসম্পৃক্ত মানুষ ছিলেন না, কিন্তু সমাজ ও রাজনীতিসচেতন ছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি চাকরিহীন, বেকার। তৎসত্ত্বেও ফ্রান্সে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে জনমত তৈরির চেষ্টা করেছেন, সঙ্গতিতে যতটুকু কুলোয় তদনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছেন কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ তহবিলে। তাঁর সন্তানদের ধারণা, তাদের পিতার অকালমৃত্যুর একটি কারণ দেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা, আশঙ্কা ও হতাশা। তিনি যে স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারেন নি সে-বেদনা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের সকলেই বোধ করেছেন। তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু, পরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, আবু সাঈদ চৌধুরী ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যুর সাত মাস পরে তাঁর স্ত্রীকে এক আধাসরকারি সান্ত্বনাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তাতে লিখেছিলেন : আমাদের দুর্ভাগ্য যে মিঃ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মাপের প্রতিভার সেবা গ্রহণ থেকে এক মুক্ত বাংলাদেশ বঞ্চিত হল; আমাকে এটুকু বলার সুযোগ দিন যে আপনার ব্যক্তিগত ক্ষতি বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি।

আসলেই, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ আমরা নিয়তই উপলব্ধি করি তাঁর সৃষ্টির সান্নিধ্যে গেলে।

গ্রন্থপঞ্জি

(কালানুক্রমিক)

নয়নচারা। [ছোটগল্প]। চৈত্র ১৩৫১/ মার্চ ১৯৪৫; কলকাতা
লালসালু। [উপন্যাস]। শ্রাবণ ১৩৫৫/ জুলাই ১৯৪৯; ঢাকা
বহিপীর। [নাটক]। ১৯৬০; ঢাকা
চাঁদের অবাবস্যা। [উপন্যাস]। ১৯৬৪; ঢাকা
সুড়ঙ্গ। [নাটক]। এপ্রিল ১৯৬৪; ঢাকা
তরঙ্গভঙ্গ। [নাটক]। আষাঢ় ১৩৭১/ জুন ১৯৬৫; ঢাকা
দুই তীর ও অন্যান্য গল্প। [ছোটগল্প]। আগস্ট ১৯৬৫; ঢাকা
কাঁদো নদী কাঁদো। [উপন্যাস]। মে ১৯৬৮; ঢাকা

রচনাবলি

গল্প-সমগ্র। মার্চ ১৯৭২; কলকাতা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী : ১ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন)। ১৯৮৬; ঢাকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-রচনাবলী : ২ (সম্পা. সৈয়দ আকরম হোসেন)। ১৯৮৭; ঢাকা